অন্য গল্প

সম্পাদনা : কমল চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫

প্রকাশক ঃ
শান্তনু ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স
৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
সুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

স্মরণে

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষকুমার ঘোষ
কমলকুমার মজুমদার
অসীম রায়

প্রকাশকের কথা

জামশেদপুরের 'কৌরব' পত্রিকার মুদ্রাকর হিসাবে আমাদের পাশের ঠিকানার প্রেস প্রত্যেকসংখ্যা 'কৌরব' দু-কপি করে পায় ; আর, তার একখানা ঠিক চলে আসে আমার হাতে, পড়বার জন্যে। আমি পড়ি এবং আমার বই-জমানোর অভ্যাসে তা পরপর তাকে সাজিয়ে রাখি। এইভাবে 'কৌরব' ৫৩টি সংখ্যার অ-নে-ক-গু-লো-ই আমার কাছে জমা হয়ে গেছে।

কবিতা আমার ধাতে সয়না, খুব খটমট না-হলে প্রবন্ধ আমি পড়ি, তবে গল্প-গুলো সবই পড়ে ফেলি, আর, তারপরই মনে হয়—এরকম গল্প তো আর-কোথাও বেরোয় না। এর কতক বুঝি, কতক বুঝি না ; কয়েকটা তো একবারের চেষ্টায় পড়তেই পারি না, দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে পড়তে হয়—আবার অনেক গল্প পড়েই দারুণ ভালো লাগে—কিন্তু সে-ভালোলাগা কিরকম যেন অন্যরকমের।

এই ভালো-লাগা অন্যরকমের গল্পগুলোই আমায় ভাবাতো। বন্ধুদের পড়তে বলতুম। সাধারণ পাঠকবর্গও পড়ুন—মনে হতো। এখন সেই ভাবনার ইতি হলো—এইসব গল্প নিয়ে যে সফল কমার্শিয়াল ভেঞ্চার করা যায়—এতে আর কোনো দ্বিধা সন্দেহ নেই। তাই প্রকাশ করছি কৌরব-সংখ্যাগুলো থেকে বাছাই করা গল্পসংকলন —'অন্য গল্প'।

নিবেদক

গৌরকিশোর ঘোষ

আমার মা নরেশনন্দিনী

মা আমার ৺নরেশনন্দিনী। বাবা শ্রীগিরিজাভূষণ। এটা মায়ের বাবার বাড়ির নাম। তবে দাদুরা, দিদিমারা (মায়ের খুড়ি, জ্যেঠি, পিসিরা) আর বড় মামা মাকে ডাকতেন 'বুড়ি' বলে। শশুর বাড়িতে এসে মায়ের নাম পাল্টে যায়। বড় জ্যেঠিমা আমাকে বলেছিলেন, 'তোর বাবাই তো নরেশ বদলে সাধনা নাম রাখল। সখ কত!' ভোটার তালিকাতেও মায়ের নাম সাধনা! র‍্যাশন কার্ডেও ওই নাম। আমার জন্ম মামার বাড়িতেই হয়েছিল, হয়ত এই কারণেই, আমার মুখে বুলি ফোটা ইস্তক আমি নাকি মাকে ডাকতাম 'নরেশ' বলে।

মা বাংলা বেশ ভালোই পড়তে পারতেন। মায়ের পিসিমার মুখে শোনা, আমার মা ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। এক সময় চিঠিপত্র লিখতেন। জ্যেঠিমা বলেছেন, মাকে দেখতে গিয়ে বড় জ্যেঠামশায় মাকে নাম লিখিয়ে ছেড়েছিলেন। মা নাকি ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে 'নরেশনন্দিনী' লিখে দিয়েছিলেন। জ্যেঠামশাই তাতেই মুগ্ধ। বাড়ি এসে তিনি পাছা থাবড়াতে থাবড়াতে, জ্যেঠিমার বর্ণনা, বলেছিলেন, 'এই দেখো, এই দেখো, কোথায় গেলে সব, এই দেখো মেয়েটার হাতের লেখা। একেবারে পাকা কায়েতের মতো লেখা। শিগ্গির মাকে দেখিয়ে নিয়ে এসো।' বাবা নাকি বলেছিলেন, 'এই লেখা হল পাকা কায়েতের মতো লেখা! দাদার যত কাণ্ড!' জ্যেঠিমা বলেছিলেন, 'তোর মা খুব সরল ছিল, বুঝলি। তোর মা প্রথমদিকে ঠাকুরপোকে যে সব চিঠি লিখত, তাতে পাঠ লিখত না। এই নিয়ে আমরা হাসি ঠাট্টা করতাম। বলতাম, তোর বর আজকালকার ছেলে, ও রকম নাড়া খাড়া চিঠি লিখিস কেন লা? ওতে কি বরের মন পাওয়া যায়? তোর মা তো এই শুনে ঘাবড়ে গেল। ওকে চাঙ্গা করতে আমরাই পরামর্শ দিয়েছিলাম, প্রাণনাথ বলে পাঠ লিখতে। তাই শুনে তোর মা লিখল, 'পাননাথ'। তোর বাবা সেই নিয়ে তোর মাকে খুব খ্যাপাত। বলত, পাননাথ পান নিয়ে এসো।

মাকে আমিও খুব ঘাবড়ে দিয়েছিলাম, আমার বিয়ের সময়ে। আমার রেজিষ্ট্রি পদ্ধতিতে বিয়ে হবে। বিয়ের তিন চার দিন আগে মাকে গম্ভীর-ভাবে বললাম, 'মা ভাল করে নাম সই প্র্যাক্‌টিশ কর। হাকিমের সামনে তোমাকে সই করতে হবে। সই খারাপ হলে বিপদ হতে পারে।' মায়ের তো কুলকুল করে ঘাম বের হতে লাগল। মা বলল, 'খুকা তোরে ব্যাগাত্যা করি, তুই তালি আমারে ওখানে নিয়ে যাস নে। আমি এখানে আলিই বৌরি আশির্বাদ করবা নে। সই ফই আমার তো ঠিক থাকে না। কিসির থে কি হবে, তাই নিয়ে বিপদ।' শেষ পর্যন্ত মায়ের মনোবল ফেরাবার জন্য আমাকে বলতে হল, 'ভয় নেই, তোমার সই পাকা কায়েতের মতো। কদিন একটু অভ্যাসটা করে নাও। কোনও বিপদ হবে না।' মা একগলা ঘোমটা দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে 'সাধনা' নামটা বিয়ের রেজেস্ট্রি খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। আমি হলাম, মায়ের ছয় ছেলেমেয়ের মধ্যে একমাত্র ছেলে। তাও আবার বড় ছেলে। কিন্তু মায়ের সারাজীবন ধরে তাঁর 'খুকা'ই থেকে গেলাম।

মা মৃত্যুর সময়েও ইষ্টনাম উচ্চারণ করেছেন কি না, আমার সন্দেহ। হয়ত খুকা বলেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়েছে। মায়ের মৃত্যু হয় পার্ক ভিউ নার্সিং হোমে। ভোর রাত্রে। তাঁর একদিকে ছিল হৃদরোগ, আর একদিকে ব্রংকিয়াল্ অ্যাজ্‌মা। তদুপরি বিছানা থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ফিমার বোন্ ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবং তার উপর অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। আমিও তখন হৃদ্‌রোগে বেজায় কাবু। সেদিন ঘুমের ওষুধের ঘোর ছিঁড়ে গেল, খুকা ডাক শুনে। মায়ের গলা। নিস্পন্দ শুয়ে রইলাম উৎকর্ণ হয়ে। ততক্ষণে আমি জেনে গিয়েছি, কী ঘটে গিয়েছে। একটু পরেই টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। আমার স্নায়ু টানটান। ছেলে ভাস্কর উঠে টেলিফোন ধরল। তারপর নিঃশব্দে তার মাকে ঠেলা মেরে তুলে নিয়ে গেল। ওরা আমাকে খবরটা দেবে কিনা, তা নিয়ে ইতস্তত করছিল। আমি ওদের ডাকলাম। বললাম, আমি জানি। এখন রাত কত? প্রায় চারটে বাজে। বললাম, আর একটু বেলা হোক, তখন সবাইকে খবর দিস।

মাত্র দুরাত আগেই মা আমাকে বলেছিলেন, 'খুকা, ইবার বাড়ি যাব।' আমি বলেছিলাম, 'যাবে বৈকি। ডাক্তারবাবু ছুটি দিন।' মা বললেন, 'এখানকার বাড়ি নয়, একেবারে ওই বাড়ি যাব।' মায়ের সঙ্গে এই আমার শেষ কথা।

মা আমার থেকে ষোল বছরের বড় ছিলেন। এখন আমার বয়স চৌষট্টি। মা থাকলে তাঁর বয়স আজ আশি হত। আমিই তাঁর প্রথম সন্তান। আমাকে নিয়ে, আমার মতিগতিকে নিয়ে আমার মায়ের সারা-জীবন ধরেই উৎকণ্ঠা ছিল। আমি লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারে নেমেছি। মায়ের মনে এই দুঃখ গভীর দাগ কেটে বসেছিল। মা চিরদিনই দুঃখ পেয়েছেন। খাবার কষ্ট, ছেলেমেয়েদের ভাল করে মানুষ করে তুলতে না পারার কষ্ট, সংসারবিবাগী স্বামীর স্ত্রী হবার কষ্ট, বাউণ্ডুলে অবাধ্য ছেলের মা হবার কষ্ট। ছেলের দুম করে আনন্দবাজার পত্রিকা ছেড়ে দেবার কষ্ট, ছেলে জেলে গিয়েছে তার জন্য কষ্ট। কত কষ্ট মা যে পেয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। তবু ক্রমে ক্রমে সব কষ্ট ভুলেছিলেন, কিন্তু মনে একটা কষ্টই তাঁর জীবনে কাঁটা হয়ে বিঁধে ছিল। 'আমার ছেলে গিরাজুয়েট হতি পারেনি।' ম্যাগসেসাই পুরস্কার পাবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদক সুদেব রায়চৌধুরী আমার মায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে গিয়েছিলেন। মা তাঁকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সবাই তো কচ্ছ, এত ভালো তত ভালো, তা ভালো হলিই ভালো। তবে খুকা গিরাজুয়েট পাশ তো হতি পারেনি, এই দুঃখুটাই আমার থাকে গেল।'

পতি সংসারবিমুখ, পরের সেবায় উৎসর্গ করেছেন নিজেকে, তিনি অসহায় বান্ধব। মা কিন্তু পুরো সংসারী। ছেলেমেয়েই তাঁর সব, ইষ্ট দেবতার চেয়েও বেশী। গোটা চল্লিশের দশকে মাকে দশভুজা হতে দেখেছি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দাঙ্গা, প্রথমে ছেলের টিউশনির উপর নির্ভর, পরে তাও না। অনিশ্চিত আয়। ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা তাড়িয়ে দেবে কিনা? ভাঁড়ারে ঢুঁ ঢুঁ, ওবেলার চাল আসবে কোথা থেকে? সব দুশ্চিন্তা মায়ের। মা গাছকোমর বেঁধে বাড়ির উঠোনে তরকারির বাগান করছেন, গাছের গুঁড়িতে কুড়াল মেরে কাঠ চেলা করছেন, ঝরঝর বর্ষার দিনে ভিজে কাঠ উনুনে পুরে প্রাণপণে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছেন, মায়ের চোখ জবাফুলের মতো টকটকে লাল, কোলের মেয়ে ক্ষিদেয় কেঁদে চিৎকার করছে, মা মাঝে মাঝে তাকে বুকে তুলে শুকনো বুকের দুধ দেবার চেষ্টা করছেন, বাসন মাজছেন, কুয়ো থেকে জল তুলে ঘড়া গামলা ভরছেন, একটু বড় বয়সের মেয়েদের ক্ষিধে থামাবার ওষুধ হিসাবে দমাদম পিটছেন, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফ্যান গালছেন, খেতে দিচ্ছেন, এই রাগছেন, এই চোখের জল ফেলছেন, এই হাসছেন। এই আমার দশভুজা মায়ের মূর্তি।

নরেশনন্দিনী তিনি। তিরিশের দশক পর্যন্ত মায়ের শরীরে লাবণ্যের যে হিল্লোল বইত, লাল পেড়ে শাড়ির ঘোমটা ঢাকা মুখে, ঈষৎ ট্যারা চোখে, যৌবনের যে জোয়ার বইত, চল্লিশের দারিদ্র্য ব্লটিং কাগজের মতো ধীরে ধীরে সেটা শুষে নিয়েছে।

সেই লাবণ্য পরিপূর্ণভাবেই আমার মাকে ঢেকে রেখেছিল, মায়ের মৃত্যুর পর। নার্সিং হোমের শয্যায় শায়িত নিথর প্রশান্ত মায়ের মধ্যে শেষবারের মতো আমি আমার ছেলেবেলার সেই দশভুজাকে ফিরে পেয়েছিলাম। বিসর্জনের নয়, এ মা আমার বোধনের প্রতিমা।

বাবার সম্পর্কে মনে ক্ষোভ ছিল আমার মায়ের, অভিমানও ছিল অন্তহীন। তার প্রকাশ যে ঘটেনি তাও নয়। তবু বলব মা ছিলেন পতিপরায়ণা। পতিই সতীর পরম গতি, মা এই নীতিই মেনে চলতেন। আমাদের নির্বাচন প্রথাই পতির নির্দেশ অমান্য করিয়ে মাকে এই সংস্কার থেকে খানিকটা মুক্ত করেছিল। ১৯৫২ সালে আমাদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। 'তার কয়েক বছর আগেই মা আর বোনেরা নবদ্বীপের বাসা ছেড়ে আমার কলকাতার বাসায় এসে গিয়েছেন। বাবার ঠিকানা তখন আমাদের ভাল জানা ছিল না। কখনও শুনতাম তাঁকে শান্তিপুরে দেখা গিয়েছে, কেউ বলত তিনি নবদ্বীপের সহজিয়া আখড়ায় ভিড়ে গিয়েছেন, কেউ বা বলত তিনি কৃষ্ণনগরে আছেন। একেবারে সুকুমার রায়ের গেছো দাদা।

যেহেতু মাঝে মাঝে তিনি কলকাতাতেও আসতেন, তাই তাঁরই নির্দেশে রেশন কার্ড করিয়ে রাখা হয়েছিল। অতএব বাবার নাম ভোটার তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমবার ভোটের আগের দিন কি তারও একদিন আগে, ঠিক মনে নেই, বাবা এসে হাজির হলেন। এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বাবা আর মা দুজনে মিলে কাকে ভোট দেবেন, খুবই একান্তে বসে সেই আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। অনেক রাতে ঠিক হল, কাকে ভোট দেওয়া যায়। বাবা মা দুজনেই একমত হলেন, অর্থাৎ বাবার নির্দেশ মা একবাক্যে মেনে নিলেন। ১৯৫৭ সালেও একই ঘটনা। সেবারেও বাবা ভোটের আগে এলেন, মায়ের সঙ্গে বসে পরামর্শ করলেন, অর্থাৎ নির্দেশ দিলেন, কাকে ভোট দিতে হবে এবং মা সেই নির্দেশ মেনেও নিলেন। এর পরপরই হল কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। সেবারে বাবা নেই, আসেননি।

মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁরে খুকা, ইবার কী হবে ? কারে ভোট দেবো ?' আমি বললাম, 'ভোটের ব্যাপার সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। তোমার যাকে দিতে ইচ্ছে হয়, তাকেই দেবে। এটা ইষ্টমন্ত্রের মতো। জানাজানি করতে নেই।' মা শুধু বললেন, 'তাই বুঝি।' সেবার আমার সঙ্গে ভোট দিতে গেলেন। পরের সাধারণ নির্বাচনেও বাবা এসেছিলেন। আগের মতোই মায়ের সঙ্গে পরামর্শে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা সরাসরি বলে দিলেন, 'আমার যারে খুশি, তারে আমি ভোট দেব। তুমার কথা আর খাটবে না। তুমার যাবে খুশি তুমি তাবে দ্যাও গে।' আমার মাকে যাঁরা জানতেন, তাঁরাই বুঝবেন, আমার মায়ের মধ্যে কী নিঃশব্দ বিপ্লবই না ঘটে গিয়েছে। অন্তত ভোটের ব্যাপারে যে পতির নির্দেশ অমান্য করা যায়, এটা বিপ্লব বই কি।

সংস্কারে কুসংস্কারে সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ছিলেন আমার মা, আবার তেমন বাড়িরই বউ। তাই মায়ের মনে হিন্দু মুসলমানে ভেদ ছিল, ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্কারও ছিল। যতটা পারতেন ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন। এই সময়ই আমাদের নবদ্বীপের বাড়িতে, এমনই ছোট সে বাড়ি যে সেখানে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার পরিসর ছিল না, আমার জনা পাঁচেক মুসলিম বন্ধু এসে উঠল। আমি তাদের হিন্দু পরিচয়েই আমাদের বাড়িতে এনে তুলে-ছিলাম। কিন্তু ধরা পড়তে খুব দেরি লাগেনি। 'খুকার বন্ধু' বলেই সে যাত্রায় তারা 'অতিথি নারায়ণ' হিসাবেই পার পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে ঝড় উঠল বাংলাদেশে। মায়ের মন দেখি আহসানুউলের জন্য, যাকে নবদ্বীপে আমি মায়ের সঙ্গে আশামুকুল বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তারপর আহ্সাবেরা সপরিবারে আমাদের বাড়িতে এসে উঠল। মায়ের উদ্বেগ কাটল। কিন্তু আহ্সাবের পরিবারের লোকেদের উদ্বেগের আর অন্ত রইল না। ওদের দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল, আমার ছোট ছেলেরই সমবয়সী। তাদের বাপ মা তাদের পই পই করে বারণ করে দিল, তারা যেন খবর্দার দাদির ঘরে না ঢোকে বা তাঁর কোনও জিনিসে যেন হাত না দেয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। একদিন বাড়ি ফিরে শুনি, এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। মা আমার এক ভাগ্নেকে মেরেছিলেন। আর সেদিনই সন্ধ্যেবেলা পেটের ব্যথা না বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে-ছিলেন। আর রুদ্র (আহ্সাবের ছোটছেলে, দস্যিটা) নাকি মায়ের ঘরে ঢুকে, মায়ের বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে, আল্লাহ্ যে অন্যায়কারীকে সাজা

দেন, কোরাণের এই পবিত্র বাণী তাঁকে শুনিয়ে দিয়ে এসেছে। আমার মায়ের পরবর্তী আচরণে বোঝা গিয়েছিল, আমরা এতদিন বৃথাই ভয় করে এসেছি। কোরাণের পবিত্র বাণীর তাৎপর্য বুঝতে পেরেই হোক, আর রুদ্রর দস্যিগিরির কল্যাণেই হোক, মুসলমান সম্পর্কে মায়ের মনের আড়ালটা খসে পড়ল। রুদ্র আর আপ্পা (আমার ছেলে) তাঁর কাছে এক হয়ে গেল।

আমার এই মায়ের মুখাগ্নি আমাকে করতে হয়নি, তখন হাসপাতালে ইনটেনসিভ্ কেয়ারে আটক। মায়ের শ্রাদ্ধও আমি করিনি, আমার বিশ্বাস নেই। তাই আমার মা, সম্ভবত তাঁর সদগতি হয়নি বলেই তাঁর 'খুকা'কে আজও কাছ ছাড়া করেননি।

যখন আমার প্রথম যৌবন, তখন দুটি ছড়ায় আমি আমার বাবা আর মায়ের ছবি লিখেছিলাম। সে দুটি এই ঃ

আমার বাবা

এক যে ছিলেন ডাক্তার
অসুখ বালাই করত পালাই
শুনত যদি হাঁক তাঁর।
ছিলেন বেজায় পুজ্য কাজেই ভিজিট উহ্য
আলমারিটি থাকত ফাঁকা
পকেট দুটোও ফাঁক তাঁর।

আমার মা

এক যে ছিলেন গিন্নী
কোনও দিন সাতে পাঁচে থাকেন নি
পরের বাড়ির বিয়ের ভোজে
খুব করেছেন রান্না
নিজের ঘরের দরজা এঁটে আর করেছেন কান্না
সারা জীবন লক্ষ্মীপুজোয়
জুগিয়ে গেছেন সিন্নি
না, তিনি আসেন নি।

শংকর লাহিড়ী

আহ্ দোজ্ ট্রাইসাইক্লস্ !

মাণিকবাবুর পুতুলনাচের ইতিকথা ও ফ্রান্জ্ কাফ্কার মেটামরফো-সিস শেষবার পড়ার পর ভারতসরকারের পর্যটন বিভাগের আমন্ত্রণ পাই। ফকার ফ্রেন্ডশিপের গোল জানালা দিয়ে অতঃপর আমাকে নীচে তাকিয়ে দেখতে বলা হ'লে তাকিয়ে দেখি, বিশাল দোদুল্যমান জন্মভূমি আমার। স্বজনপোষণ, অনিয়মিত ট্রেন, সন্ত্রাস, চর্মরোগ, অসতর্ক অস্ত্রোপচার ও শালিমার গার্ডেন। এছাড়াও ভাষা জাতপাতজনিত দাঙ্গা ও প্রকল্পের তছরূপ। আমাকে দেখানো হয় সেই তালবন, টিলার ওপরে সকালবেলার সূর্য। প্রবল কোরাল আলোর সিলহিউটে ঈষৎ মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছে শশী ডাক্তার। কুসুম ফিরে গেছে পাতা মাড়িয়ে সরু আল বেয়ে। তীব্রতা—'কাকে ডাকছেন ছোটবাবু। কুসুম কি বেঁচে আছে?' শুনে পূর্বাপর মনে পড়ে অশ্রু চেপে, করিডোর বেয়ে আমি টয়লেটে যাই ও ঐ অলটিটিচিউডে শরীর নির্ভার করে অবিকল আনন্দ বোধ করি। দেখি নীচে খরস্রোতা রঙ্গিলা।

এবং শবদেহ নয়, অগণিত পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি ভেসে যাচ্ছে।

এয়ার হোস্টেস্ দুটি খুবই সপ্রতিভ। লাজুক নয় মোটেই। শিশুদের চকোলেট দিচ্ছিলো। প্যারীর ল্যাক্টো বনবন। আমাকেও তারা একটি কলম এনে দেয়, সম্ভবতঃ উপহার, শাদা অক্ষরে ছাপা ছিলো তার প্লাস্টিক শরীরে 'India is a land of rivers' বাক্যটি।

পরবর্তী দৃশ্যে গ্রেগর সামসা-র কফিন সরিয়ে ওরা তিনজনে শহরের সবচেয়ে উজ্জ্বল ট্রামে জানালার ধারে। প্যাণ্টোগ্রাফে হিসহিস শব্দ উঠছে। মেয়েটি বাবা মা'র মাঝখানে। আজ বহুদিন পর তার সরু সিফনের প্রায় কোমরভঙ্গিমা, টান টান হাত পা ও আঁটো সাঁটো ব্রেসিয়ারটি নজর করে পর পর স্টপেজগুলো পেরিয়ে, না থেমে, টিনটিনটিনটিন শব্দে

ট্রাম ছুটে যাচ্ছে। কক্ষান্তরে বহুদূরে তার ভাই-এর নিতান্ত কফিন ক্রমশঃ ডটপেনে ফুটকীর মতো হ'য়ে আসে, এরকম স্প্রিংসুলভ টান ছিলো সেই উজ্জ্বল সকালে।

ফ্লাইট শেষ হ'লে এয়ার হোস্টেস দুটির একজন আমাকে 'থ্যাংক ইউ' বলে ও আমি স্টিউয়ার্ডটিকে চাপা গলায় 'এ তো আমি আগেই পড়েছি' ব'লে ফেলি। তখনও এঞ্জিন চালু ছিলো যে কারণ তীব্র হোয়াইন-এ হোস্টেস দুটির আকণ্ঠ হাসি বাহ্যত স্তব্ধতা মনে হয়। শব্দ কত ডিসেপটিভ সেই আরেকবার আমি বুঝি।

বিন্যাস কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ছবি, ছাপার অভাবে. শুধু নির্দেশিত হোল। বাঁদিক থেকে ঘড়ির কাঁটা অনুসরণ ক'রে (clockwise) ঃ

১. 'প্যাশন প্লে অফ যীসাস' নাটকের একটি দৃশ্য। দৃশ্যটি লাস্ট সাপারের। উপন্যাসোপম ঢাউশ একটি পাঁউরুটি প্লেট-এ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।
২. গোপন বন্দরে সারিবদ্ধ একঝাঁক 'হুইস্কি' ও 'ফক্সট্রট্' শ্রেণীর বিধ্বংসী সাবমেরিন। স্যাটিলাইট থেকে নেওয়া প্যানোরামা।
৩. একটি সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে, লালফিতের বিনুনি, মুখে গ্যাসমাস্ক প'রে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট ধ'রে নিজের ছায়া মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এক ব্যাগ বই।
৪. হাইতির রাজা-রাণীর সাম্প্রতিক বিয়ের ছবি। রাণী সাতাশ-বর্ষীয়া, সুন্দরী, নাম জেনেট।
৫. এক পক্বকেশ প্রৌঢ় তাঁর লালবাড়ীর ছাদে ক্যাপস্টেন মিডিয়াম সহযোগে 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ' বইটা পড়ছেন। আলো পর্যাপ্ত নয়।

☐ দানিকেনের মতে বইটার একটা বিশেষতঃ যে এতে কোন গল্প নেই।

আমার দিদিমা ও কারুকার্যময় অঢেল গল্পগুলি একই চিতায় অমরতা উপলব্ধি করেছিলো।

রাত আকাশের অসীম বিটুমেনে 'ক্যানিস মেজর' কিম্বা একা অনন্য

পুষ্যা নক্ষত্র মনে পড়ে। এই পুষ্যা সম্বন্ধে কিছু অন্তরঙ্গতা আছে হিন্দুদের। যে বিশ্বের সবচেয়ে কনফিউজড লোকেদের ধর্ম হিন্দু।

ইংরিজী 'শীন' শব্দের সঠিক বাংলা আমার জানা নেই। শুধু অনুভব করি। (হায় ভাষা, এতটা পিছিয়ে আছো, কতদূর চ'লে গেছে জীবন)।

অশোক ও প্রেম বিষয়ক কবিতা

'Through the sheen of a London cab window I glimpsed you passing', কে তুমি? কোথায় চলেছো?....আবার একটা শহরের ওপর নেমে আসছে আশ্চর্য এই কনকর্ড। তুমিই আমায় আলো জেলে দেখাবে। তোমার প্রকরণ। তোমার সসেজ, জেলি ও নবনির্মিত কেচাপ। আর এই সারং কেবায়া (Sarong kebaya)। তোমার জটিল অলৌকিক আলো।

ভারত প্রেমকথা ও শেষের কবিতা পড়ার পর অশোকের বাড়ীতে কবে একদিন সন্ধেবেলা ঢুকে পড়েছি। অশোক মধ্যবয়সী, লাজুক, সন্তানপ্রিয় এবং প্রেমবিষয়ক কবি। সে-বছর আনন্দ ও রবীন্দ্র দুটি পুরস্কারের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে। 'প্রিপারেশন ভালোই হয়েছে' বল্লো। ওরই টেবিলে ইতস্ততঃ দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিনের একটিকে উল্টিয়ে তিরিশ-একত্রিশ পাতা খুলে সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের ঐ বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ে। 'Through the sheen of a London cab window....' ইত্যাদি। বুদ্ধিমান ওরা, পুরো পাতাটি জুড়ে সুন্দরী এয়ার হোস্টেসটির রীতিমত ক্যাবিনেট সাইজ ছবি ছেপেছিল। এক কোণে ছোট বর্জাইসে ছিলো বাতুল ঐ বাক্যগুলি।

অশোকের কবিতা আমি কখনও পড়েছি। কোন একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকার ছেলে ছিলো অশোক। তখন প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখছে। চাঁদের যে দিকটি অনুজ্জ্বল ও রহস্যময়। আমৃত্যু সে শব্দ নিয়েই মেতে ছিলো। জন্মদিনে তাকে একবার, একবারই এক শিশি টমেটোর কেচাপ দিয়েছিলাম। টোমেটোর লাল ও সুগোলের প্রতি তার ছিলো অশেষ দুর্বলতা। 'লাল টম্যাটোতে হাত বোলানো আদমীর অভ্যাস'—প'ড়ে সে, লাজুক, অতিকষ্টে স্খলন সামলেছিলো। এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার নাকি সিঙ্গাপুর যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। যার মূলে ছিলো

সম্ভবতঃ 'সারং কেবায়া' শব্দটি। হোমো ও হেটারোসেক্সের মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রিয় ও রচনাপোযোগী ঠিক করতে না পেরেই মরে গেল।

সিঙ্গাপুর আমার দেখা হয়নি কখনও, কতদিন গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ। এমন কি উপকূল থেকে মাত্র 75 কি.মি. দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম বিবর মিন্ডানাও (Lat.9°42′N Long. 126°51′E)। কখনও কি গিয়েছি বেলিলিয়াস লেন-এ? বেলিলিয়াস লেনের সূর্যোদয়। পান দোকান। মঘাই, কর্পূরী, বাংলা খিলি। বেলিলিয়াস লেনের চানাচুর-ওয়ালা, কিশোর ব্যায়ামাগার। বেলিলিয়াস লেনের সোহিনী। কাঁচা নর্দমা। ঝিঙেফুল। তারের খাঁচায় একজোড়া মনিয়া। ঢ্যাঙা—শ্যামবর্ণা—অম্লশূল—শ্বেতপ্রদর—কার্লড চুল—ব্রণ—প্যাডেড ব্রা, দাঁত সামান্য উঁচু—মাউথ 2.25 ইঞ্চেস—এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করা হ'য়েছে। সহমর্মী পাত্র চাই। সোহিনীর গায়ের রঙ কালো (আফ্রিকার উপজাতীয়দের মধ্যে সে তবে প্রার্থিত সুন্দরী)। ভাদ্রের ভরা আকাশ দেখে উন্মনা সে, জীবনের অমোঘ ফলসাগুলি পেড়ে আনতে নিজেকে পুরোপুরি খুলে ধরেও দেখে, সেও তবে এক মিসফিট। এমনকি শাস্ত্রে পর্যন্ত সেই সম্মতি পাওয়া যায়—'শ্বেতছাগ ও শ্বেতগর্দভের মূত্র ও বিষ্ঠাতে পক্ব সর্ষপের তৈল যদি অর্ক (ধুস্তূর), তুল ও পতঙ্গের চূর্ণের সহিত মিলিত হইয়া ঔষধ বিশেষে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেই তৈল তদ্‌ব্যবহারীর আকৃতিকে শ্বেত করিয়া তুলিতে পারে, ইহার নাম শ্বেতী-করণযোগ।'

সোহিনীর অসুবিধে হ'য়েছিলো। আপন স্তনের ভারে সে ছিলো সদাজাগ্রত। ঘুমের জন্যে বিজ্ঞান তাকে ভিটামিন দিয়েছে। ভোরবেলায় দেহনিঃসৃত যে বাড়তি ভিটামিন গড়িয়ে যায় ম্যানহোলের নীচে শহরের বসন্তকে বাস্তবিক সে-ই পরিস্ফুট করে। এ বছর ফ্লাওয়ার শো-এ ফুলের গন্ধে সোহিনী তা জেনেছিলো। অথচ নিজে সে, কুব্জ, এই বসন্তকে জাগ্রত ক'রেছে এ ধারণা তার ছিলো না। 'বিজ্ঞান, তোমার ভিটামিন গড়িয়ে যায় নর্দমা দিয়ে, জেগে ওঠে বসন্তনিখিল'—একথা সে তার ডায়েরীতে লেখেনি। লিখেছে, 'আজ এই বসন্তনিখিলে

ওগো দ্যাখো,
ভিটামিন
গড়িয়ে যায়

পেয়েছি তোমার, প্রিয়, রঙীন নাইলন অন্তর্বাস'। এমনই অন্তর্মুখী ও মানবিক ছিলো তার চেতনা। একদিন পরিপূর্ণ ঘুম থেকে উঠে একটা নতুন পেন্সিল কেটে ফাল্গুন ৭, শক ১৮৯০, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ পাতায় কালো তীক্ষ্ম সীসে সে এই কথা কটি লেখে। জানালার বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিলো। বৃষ্টির মধ্যে একটা মামুলি ছাতা হাতে সেদিন তাকে বড় রাস্তায় নামতে দেখেছিলাম। হর্টিকালচারে ফুটন্ত ডালিয়ার সমর্থন-প্রার্থিনীর স্তনভার বৃষ্টিতে ভিজে ওঠে ও ক্রমশঃ ভিটামিন ধুয়ে যায়। ফলতঃ বসন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সোহিনীর অসুবিধে হয়েছিলো একথা বুঝতে।

একছড়া ট্যাবলেটের মত জীবনকে সে পেতে চায়নি। যা ছিঁড়ে খাওয়ার পর প্রতিদিনই জানা যায় আর ক'টা আছে। ক্যাপসুলের লাল হলুদ অংশদুটোকে কতবার সে পরিষ্কার হাতে দুভাগ ক'রে দেখেছে। কিছু বুঝেছে কি?

সেদিন প্রথম তার ব্যক্তিগত খাতা খুলে দেখি তার অনিয়মিত স্রাব ও ঋতুবর্ণনা, যা নিম্নরূপ ঃ

গ্রীষ্ম—	ভিটামিন এ	হেমন্ত—	ভিটামিন বি-টুয়েলভ্
বর্ষা—	„ বি	শীত—	„ সি
শরৎ—	„ বি-সিক্স	বসন্ত—	„ ডি

শেষ তাকে দেখেছিলাম সবুজ টার্ফে। তার নাম ও নম্বর আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে দৌড়।

স্টেশন প্লাটফরম দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে সোহিনী। বেশী ছায়া পড়ে না এরকম আলোয় তাকে, তার ছন্দহীন সুষমাকে আমি লক্ষ্য করি। যে কোন মুহূর্তে আমাদের ট্রেন ছেড়ে চলে যেতে পারে। আমার সাথে কখনও কোন গার্ডের সখ্যতা হয়নি। আমি জানতেও পারবো না এই মুহূর্তে কোন কোন স্টেশনের টিকিট ফুরিয়ে গেল। যে ট্রেনে উঠে বসেছি তার সারা পথের সমস্ত কেবিনম্যান কি আজ কর্মরত? চান্সেস অফ ডিরেল-মেণ্ট অ্যাণ্ড আনসার্টেনটি? সাধারণত এইরকম দিনেই, যখন বৃষ্টিপাত হয়, সমবেত গ্যাংম্যানেরা তাদের বর্ষাতি বা গামবুট পাল্টে নিতে স্টোরের কাউণ্টারে ভীড় করে। খরায় আর্ত তাদের বুটজুতো ঢের হ'য়ে ওঠে

টিনশেডে। জলপতনের-ঐ-টানা-শব্দে-বিহ্বল তাদের হাতে যে নতুন সরকারী জুতো তুলে দেওয়া হয়, তা কি ভারতীয় রেলকে আরও নিশ্চিন্ত ও গন্তব্যাভিমুখী করে? গন্তব্য সম্বন্ধে আমারও কোন ধারণা ছিলো না। সোহিনীকে ভালো ক'রে বুঝতে শেখার পরেও নয়।

ঘাসের ওপর গা এলিয়ে সেইমতো শুয়ে থেকেছি। ঘাসের গন্ধে নাক ভ'রে উঠেছে। খুব ছোট ছোট পোকা মাকড়ের হাঁটাচলা. গা চুলকিয়ে ওঠা, পিঠের নীচে দু-এক টুকরো কাঁকড়, ঝুরো মাটি, শেকড়—বোঝা গেল কি ঘণ্টায় কয়েক হাজার মাইল ঐ তীব্র বেগ ও আপনাপন অক্ষের ওপর প্রতিমুহূর্তের এই আবর্তন? একদিন এরকমই জিনিয়া গ্ল্যাডিওলার জঙ্গলে শুয়ে দেখেছিলাম মেঘের ওপর দিয়ে এরোফ্লোটের ফ্লাইট নম্বর ৩০৩ উড়ে যাচ্ছে। চক্রবাল থেকে একটা তীক্ষ্ণ রেখাকে ধনুকের মতো টেনে আকাশের অন্যপ্রান্তে মহার্ঘ সে মিলিয়ে গেল।

একেকদিন সোহিনী তার বাক্স সাজিয়ে ব'সে সেই গতিকে ছুঁয়ে দেখে। দেখে তার আভ্যন্তরীণ কম্পন। যা নিজে আমিও, অক্ষরজ্ঞানহীন, কতদিন অনুভব করেছি। সঙ্গম মুহূর্তে, নগ্নতার কাছে, শ্লথ, আন্তরিক, পিঠে পিঠ লাগিয়ে, সংঘবদ্ধ জঙ্ঘা—ঠোঁট—অশ্রু—মেদ-বাহুল্য—ব্যাকটেরিয়া—ভয়। দৃশ্যতঃ মামুলি ঐ সব বাক্সে থৈ থৈ করে তার সবুজ সালোয়ার, কাঞ্চনজর্জেট, পিতলের শেষনাগ, রুদ্রাক্ষ, নীল ঝিনুকের চামচ, চন্দ্রমল্লিকার বীজ, রক্তাক্ত তুলো, ওল্ড টেস্টামেণ্ট, পীরি রইসের ম্যাপ, প্রাচীন কোল্ট রিভলবারের মিনিয়েচার মডেল, দার্জিলিঙ থেকে লেখা তেনজিঙের চিঠি, আর প্রথম ব্যবহৃত অন্তর্বাস ও শেষতম বিবাহপ্রস্তাবের খসড়া।

সোহিনীর সাথে প্রথম আমার আলাপ হয় এপ্রিল মাসে। 'Is this the cruellest month?'—জিজ্ঞেস করেছিল। পাঠাগারের শতবার্ষিকী সিঁড়ির শেষ অক্ষরগুলি থেকে রাস্তায় নেমে তারপর কতবার আমাদের চটিজুতো বদল হোল। কত নতুন ট্রাম নেমেছে রাস্তায়। ড্রাইভারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তো প্রকৃতই তরুণ।

স্থবির রামমূর্তি আমাকে ব'লেছিলো, রিহিটিং ফার্নেসে ব্রিক লেয়িং-সংক্রান্ত তোমার রিপোর্টটা আমি পড়েছি। It is all old wine in a new bottle.—সেদিন ওর নাকে দড়াম ঘুঁষি মেরে আয়না দেখিয়ে বলার, যন্ত্রণাকাতর—স্ফীতনাক—রক্তাক্ত এই তবে তুমিও সেই পুরোনো রামমূর্তি

নয় কি ? নতুন বোতল ছাড়া মানুষের আক্ষরিক আর কিছু দেওয়ার নেই, সোহিনীকে যতই ভিটামিন দিক তার ডাক্তার। মানুষের ক্ষণিক বসন্তকে মনে রেখে স্তনভার সদাজাগ্রত অন্ততঃ সে প্রয়োজনীয় একথা জানুক।

শুধু গানেরই জন্য ছিলো সোহিনীর কত বিশেষ ধরনের পোষাক। কখনও তাকে পোষাকহীন গাইতে শুনিনি। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র সাথে বড় উজ্জ্বল জরির বোতাম ঝিকিয়ে ওঠে। অথবা 'সংকোচের বিহ্বলতা'-য় ম্রিয়মাণ গোলাপী সাটিনের সেই কুঁড়ি নিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠা। পোষাকের অভাবে কত গান সোহিনী আজও গেয়ে উঠতে পারেনি। সে মুক্তি খুঁজেছিলো ভিটামিনের মধ্যে। আমি ভিটামিনের থেকে মুক্তি চেয়েছি। ঠিক এই রকম একটা পর্যায়ে আমরা পরস্পর, 'আচ্ছা তবে চলি এদিকে কখনও এলে দেখা করবেন' বলতে পারতাম। বলতে পারিনি কারণ আমাদের রাত্রিবাস, রান্নাবান্না, বর্ণপরিচয়।

ছোট ছোট সুর,
সংক্ষিপ্ত জামাকাপড়
ও শেষ কথোপকথন

সোহিনী! আমাদের পায়ের মাপ, কোমরবন্ধ, জুতোর ফিতে, আমাদের টুথব্রাশ, চুলকাটার কাঁচি, পাজামা, খবরের কাগজ, প্রিয় ছবি, সুরকার, টর্চ, জলের গ্লাশ, চিঠি লেখার কাগজ—সবই যখন আলাদা—এত ভিন্ন ভিন্ন ও প্রয়োজনীয় এই রীতি—তবে কেন যখন তখন আমার রান্নাঘরে তুমি ঢুকে পড়ো ? তোমার স্নানের জল ও খেলার ধুলোবালি কেন তুমি নিজে নির্বাচন করো না ? আমাকে কফি খেতে ডেকে কেন তুমি ব্যক্তিগত কফি-গাছ আলোয় এনে দেখালে! আমি লক্ষ্য করি তোমার চোখের সম্প্রীতি দৃশ্যহীন ঐ কুঠুরী যা হাওয়ায় ভারী পর্দাসহ কেঁপে উঠছে। বারবার তোমার ধমনীমধ্যস্থ দাঙ্গা, তোমার স্মৃতিতে উঠে এসেছে ঐ জাগুয়ার, ঐ তোমার অরন্ধন দিনের স্নেহলোলুপ শীতার্ত উনুন। শুধু দেখবে ব'লে এতেদূর জল-কাদা ঘেঁটে তুমি এলে।

২.

এইভাবে সোহিনী ও সেই ঝটকা টান। যে আমার দৃষ্টি খুলে ধরে।

'আর কিছু দেখাবো না, শুধু দেখবো ওগো দেখবো'—বলতে বলতে আমি রাস্তায় নেমে পড়ি। ও ভেবে দেখি, সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত উপাখ্যান, ইতিহাস, ডায়েরী ও প্রবঞ্চনা আমরা কবেই পেয়েছি। এত বিপুল সেই পাওয়া যে আর একটি বাড়তি সর্বনাম : তুমি বা তাহারা, অথবা একটি বিশেষণ : চিতচোর, ক্যান্টাংকারাস ও অনপনেয়। অথবা একটি অব্যয় বা উচ্ছ্বাস—এ সবই বাহুল্যমাত্র। বস্তুতঃ ক্যালেণ্ডার ও অপ্রতুল সংখ্যাগুলি ছাড়া মনুষ্যরচিত সে আর কোন্ অক্ষরমালা যা এখনও প্রকাশের অপেক্ষা রাখে? ফলে, কাজ যা বাকী থাকে, যদি থাকে, তা শুধু ক্যাটালগিং ও কমপাইলিং। এবং প্রয়োজনীয় কিছু পাংচুয়েশান। সিণ্ট্যাক্স বা ইটিমলোজি নিয়ে আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। এই পর্যায়ে দুর্গেশনন্দিনী, চৈনিবাস চরিতামৃত, এমনকি ক্ষীরের পুতুল জাতীয় কল্পকাহিনীও প্রকারান্তরে এসে যায়। 'বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির কাজ' বইটি সম্পর্কে আপাততঃ কোন আলোচনা হোল না। (কাঠকয়লা ও পোড়ামাটি কি কখনও বাদ যায়?)

মনে পড়ে, ফকার ফ্রেণ্ডশিপের গোল জানালা দিয়ে বাঁদিকে ঈষৎ ঝুঁকে নীচে তাকিয়ে দেখা সেই দোদুল্যমান টোটালিটি। খরা—বন্যা—স্বজন-পোষণ—পলিউশান—শহীদমিনার—চর্মরোগ ও অসতর্ক অস্ত্রোপচার। বিস্তৃত গালিচার একপ্রান্তে সেই সম্পূর্ণ টিলা, তালবন ও কুসুম। উল্টোদিকে অন্ধকার কুঠুরিতে গ্রেগর সামসা-র পতঙ্গশরীর। কফিন। একপ্রান্তে এঁকেবেঁকে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে আধোজাগরিত হাড়মাস শ্রীমান শ্রীল শ্রীযুক্ত (অস্তিত্ব আরোপিত) বেলিলিয়াস লেন। আরও অর্বুদ বিশেষণ ও সর্বনাম আছে। আরও জাপানি পিস্তল, রাক্ষুসে মুলো, সারিবাদি সালসা, নেড়া হরিদাস। গালিচায় মোটা সুঁচের ফোঁড় ঢুকছে। কোথাও সূক্ষ্ম রেশম ' ক্রস স্টীচ, ডাল স্টীচ, অ্যাপ্লিক। কালনেমির লংকা ভাগ থেকে আজ অব্দি : "পঞ্চাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে রে শাদা পোশাকের পুলিশ সেই যে পঞ্চারে মনে নেই স্‌সালা সেই পঞ্চারে যে একটু ডান-পা নেংচে চলতো তারপর হঠাৎ রাতারাতি স্‌সালা ক্ষেপে গেল জনগণের মুক্তির (আহা, মুক্তি, মাইরি তুমি!) জন্যে এবং রাতে দেয়ালে দেয়ালে কি যেন লিখছিলো হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম ব্যস খতম। ···শ্রমিকদের নতুন পথ দেখাবে কে. বাবু রজনীকান্ত দে আবার কে?"

এইসব বিভাজন। যাবতীয় বহুব্রীহি ও কর্মধারয়। যেখানে রক্তাল্পতা, পিত্তশূল, শ্বেতপ্রদর। গালিচা অথবা শতরঞ্চি, শীতলপাটি। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ধুলো ঝাড়ছেন। আবার ধুলো জমছে। ধুলো ঝাড়ছেন চার্লি চ্যাপলিন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ হেগ। ফিরাক গোরখপুরী। স্বামী অভেদানন্দ। মহম্মদ আলি। ভীষ্মদেব খাসনবীশ।

কতবার পাতা কেঁপে উঠেছিলো। খোলাপাতায় ইহুদির ডায়েরী। ডায়েরীর ঈষৎ হলুদ, অন্যমনস্ক সোঁদা গন্ধ। দু হাত ভরে উঠেছে লাল বেগুনি লাইল্যাক ভায়োলেট ক্রিমসন! আরও অক্ষর ছিলো। অ্যাডমিরাল গ্রে। প্রুসিয়ান ব্লু। টেরাকোটা। ক্লে। আমাদের জন্মদিনে সাবান এসেছে। পারফিউম। মৃত্যু দিনে বাগানের এক কোণে ডালিয়ার ঘন সবুজ পাতায় ধূসর পেস্টিসাইড। সূর্যমুখী। মুরদ্বীপ সংক্রান্ত এফ. এম. তরঙ্গপ্রচার। ভাটিখানা। ইটখোলার ফুকন মিস্ত্রী। আমাই-নগরের পরীক্ষিৎ ধীবর ও সোনাখুঁজেল। কাশী বিশ্বনাথ সেবাশ্রমের পোপটলাল ছগনলাল। বাবু শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দত্তচৌধুরী। থর হেয়ারডালের আনুপূর্বিক নৌকাভিযান। দা নোম্যাডস্ অফ ইস্টার্ন সাহারা। নটী বিনোদিনী। আরও ছিলো। অ্যাবস্ট্রাকশন। অ্যালিগোরি। সিঁড়ির ওপর থেকে গড়িয়ে নামছে সেই বামন। পুরীর সমুদ্র। ঢেউ-এর পর ঢেউ ভাঙছে। জল। উইপোকার স্কোয়াড্রন নেমে আসছে মশারীতে, বেহালার ছড়ে, দুধের গম্ভীর বাটিতে। আরবী আতরের ছোটো শিশি উল্টে পড়লো। একটানা করাত কলের ঘনশ্যাম ঘনশ্যাম শব্দ।

উইপোকার

স্কোয়াড্রন ও বামন

লেবোরেটরীতে শব্দ নিয়ে খেলা করছিলো অশোক। যা মাত্রই ব্রহ্ম। 'বৈদিক মন্ত্রেই আমাদের সাবান ও তোয়ালেগুলি গচ্ছিত রয়েছে জেনো' সে একবার বলে। (অবান্তর মনে হতে পারে, দক্ষিণভারতে দেবতার ভয় বড় প্রবল। বলা হয়, গর্ডফিয়ারিং। যাদের ফিয়ার নেই তারা অন্ত্যজ। 'ভেরি ব্রাইট চ্যাপ 170 সে. মি. পালঘাট ব্রাহ্মিন ফেয়ার কমপ্লেকশান চার্টার্ড অ্যাকাউনটাণ্ট টোয়েণ্টি টু হানড্রেড গুড হেলথ গর্ডফিয়ারিং'।)

তার মাথায় ছিলো এমন অনেক শব্দ যা বহুকাল ধ'রে অব্যবহৃত, কোরা। একটা স্লুইস গেট ও তার জং একটানে খুলে দেবে, বিশ্বাস করেছিলো। লেবরেটরীর দরজা, যা সাধারণতঃ বন্ধ থাকে। ফ্রস্টেড গ্লাস। ভেতর দিয়ে এ প্রান্তেও তখন বিকেলগুলি অনুভূত। ব্যুরেটে তিনদিন আগেকার ফ্রেশ্‌লি প্রিপেয়ারড পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট। পায়ের গোছে গুঁড়ো গুঁড়ো শাদা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। বাতাস বইছে না। প্রতিটি শব্দ উচ্চারিত হ'তে থাকে, তার সাথে অশোকের স্ফীতকায় বাদামী পিউপিল ও গোপন ক্যাটারাক্ট আমি দেখি। অধিবিন্না, দণ্ডসম্পৎ, তুন্নবায়, আধিবেদনিক, পশ্চাৎকোপ, বাক্‌পারুষ্য, আক্রান্দাসার,⋯ইত্যাদি। অধিবিন্না শব্দের অর্থ, দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে এমন মানুষের আগের বিবাহিতা স্ত্রী এবং ঊর্ণাকারু অর্থে পশমীদ্রব্যের শিল্পী—অশোকই আমাকে বলে।

অসংখ্য পিপেট ব্যুরেট ও বীকারের মধ্যে এই লোফালুফি। একখণ্ড কোয়াজাইট-কে সে পেপারওয়েটের মত ব্যবহার করতো। তার প্রিয় টিটাগড় কাগজ। এর পরই প্রেমবিষয়ক কবিতা। আরও পরে উদভ্রান্ত লাজুক তার হোমোসেক্স। ভরা বৃষ্টির দিনে ঝোড়ো হাওয়ায় জানালায়-মুখ-না-রেখে অশোক আমায় বলেছেঃ কনফিউশান ছাড়া মানুষের বোধহয় আর কোনো গন্তব্য নেই। এটাই তার ডেসটিনি। এ স্টেট অফ আটার কনফিউশান।—এত দৃঢ় ঘন নীল রঙের সামনে সে তবে প্রায় এসে দাঁড়িয়েছে! তার ছোট ঘর, নয় বাই এগারো।

ক্যানন FT, QL.
35 mm. SLR

অশোকের বাবা ছিলেন মার্কেটিং ম্যানেজার। বাজার ও সাপ্লাই থিওরী সম্পর্কে তাঁর ছিলো প্রবল ও স্থির জানকারি। তিনি তাজমহল দেখেছিলেন আঠারোবার। এবং ফালুট অব্দি গিয়ে অক্সিজেন না নিয়ে 180 ডিগ্রী প্যানোরামায় কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখে এসেছেন। সেজবোন প্রোডাক্ট ডিজাইনার। তার কাছ থেকেই আমি ক্যামেরাটি পাই। ক্যানন এফ টি, কিউ এল, 35 মি. মি. এসেলার।

তো এইভাবে হঠাৎই একদিন অশোককে মরে যেতে হয়। (মৃত্যু সম্পর্কে দীর্ঘ ভণিতা আমার ভালো লাগে না) নোটিশহীন, বিবরণহীন,

সম্মতিহীন। শব্দ ছেড়ে সে তখন সবেমাত্র আলোর দিকে ঝুঁকছে। মরে যাওয়ার আগের রাতে মাত্র সে পেয়েছিলো তার টেলিস্কোপ। 'Newtonian reflector with 40 × and 80 × magnifications — shows stars upto 10.5 magnitudes—Ramsden eyepiece with 40° apparent field of view —Altazimuth mounting'! সে কি খুঁজেছিলো পুষ্যা নক্ষত্র? হিন্দুদের সেই অমোঘ, যা তার মা, জন্মান্ধ, উত্তরপুরুষের কাছ থেকে শ্রুতিতে পেয়েছিলেন। মায়েরা পাঁচ বোনই ছিলেন শ্রুতিধর। যে বয়সে অশোক শ্রুতলিপি লিখতো তখন তার খাতা খুলে দেখেছি,

ক্যানিস মেজর কিম্বা পুষ্যা খুঁজেছিলো নাকি? সোহিনীর শরীরে যা আমিও।

□ তিন রাত্রি পর্যন্ত উপবাস করিয়া যদি কোনও লোক পুষ্যানক্ষত্রযুক্তকালে কালায়সদ্বারা অঞ্জনপাত্র ও শলাকা প্রস্তুত করিয়া নিশাচর প্রাণীদিগের একটির করোটি অঞ্জনদ্বারা পূরিত করিয়া মৃত স্ত্রীলোকের যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করায় এবং তৎপর সেই অঞ্জনদ্বারা নিজে অভ্যক্তনয়ন হইয়া বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহার ছায়া ও রূপ অন্যের অদৃশ্য হইবে।

অথবা

□ চারিদিন পর্যন্ত উপবাসী পুরুষ পুষ্যানক্ষত্রযুক্তকালে মৃত লোকের হাড় দ্বারা একটি বলীবর্দ্দের মূর্তি করাইবে। সেই মূর্তিকে 'সদা রবিরবিঃ ; সগণ্ডপরিঘাতি সব্বং ভণাতি' মন্ত্রদ্বারা অভিষিক্ত করাইলে দুইটি বলীবর্দ্দযুক্ত একখানি গোযান সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তৎপর সেই গোযান দ্বারা সে আকাশে চলাচল করিতে পারিবে।

মাত্র একবার বীফস্টেক খেয়েছিলো। সম্ভবতঃ বাবর আলি কিম্বা নিজাম। কোনও বন্ধুর বাড়ীও হ'তে পারে। প্রবল তার ভয় ছিলো মূলতঃ কৃমির। প্রধানতঃ কৃমিরই উৎপাতে কখনও তাকে রগচটা, এমনকি ফেরেপ্‌বাজও মনে হ'তে পারতো। অথচ কি নির্ভুল ছিলো তার জ্ঞান। আমার পোর্ট্রেট্-প্রবণতা দেখে সে আমাকে কেমিস্ট্রি অফ মুড্‌স্ সম্পর্কে

প্রশ্ন করে। ও উত্তর না পেয়ে জানায় যে মানুষের সততপরিবর্তনশীল এই মুডের মূলেই রয়েছে ব্রেনাশ্রিত দুটি বায়োজেনিক অ্যামিনো যার একটার নাম সিরোটোনিন।

প্রকৃত প্রস্তাবেই সে হ'য়ে উঠেছিলো এক মোক্ষম ক্যাটালগার। কতবার চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুঁড়ে পুনরায় দেশলাই ব্যবহারের আগেই একটানে সে জীবনের কত কত বর্ণনাত্মক কপাটগুলি সপাটে খুলে দিতে পারতো আশ্চর্য। চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে কত অপ্রচলিত শব্দ: পারিহীণিক, ধামার্গব; কত নষ্ট আদালতের বিবরণ; কত বর্ণনা; লাহুল যাওয়ার পথে সস্তা ভাতের দোকান, তিমি মাছ শিকারীদের বিবাহপদ্ধতি; কত স্মৃতি; আমার যে দিন গেছে ভেসে····; ধারণা বা অনুভূতি: দি ওয়েদার উইল নট চেঞ্জ; নিশ্চয়তা: কোয়াই সেরা, সেরা; সমাজ সম্পর্কিত জটিলতা: দা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানস্ অফ দা ইস্টার্ন ব্যাংক অফ দা রিভার হুগলী; তদ্গত মন্ত্রযোগ: সদা রবিরবিঃ সগণ্ডপরিঘাতী····; আক্ষেপ: দূরে দাঁড়ায়ে আ৻ছে, কেন আসে না কা৻ছে; এমনকি লঘুগুরু উচ্চনীচ স্থাবর অস্থাবর কত দিগ্বলয় এভাবে নাগাড়ে উন্মোচিত ক'রে খেই হারিয়ে একসময় উদভ্রান্ত ও এক্সহস্টেড (!) সে তবে থামতো।

এইরকমই এক অবস্থায় আমি ক্যামেরার খুব কাছাকাছি এসে পড়ি। পর্যাপ্ত আলোকপাত হয় এই সেই ক্যানন এফ.টি যা ভেতর দিকে খোলে আমায় অশোকের সেজবোন দিয়েছিলো সে ছিলো আশৈশব যৌবনা ও চটুল ডিজাইনার, প্রেশার কুকারের জন্মগত সেক্স সম্বন্ধে তাকেই প্রথম ভাবতে দেখেছি, আমাকে সে পোর্ট্রেট তোলার কথা বলে। আরও কিছু

ডোণ্ট জার্ক, বাট জেণ্টলি স্কুইজ

প্রাথমিক শর্ত বা আব্দার: বি রক্স্টেডি। গো অ্যাজ ক্লোজ্ টু দা অবজেক্ট অ্যাজ্ পসিব্‌ল্। ডোণ্ট ইনক্লুড হোয়াট ইজ্ নট এসেন্সিয়াল। ডোণ্ট জার্ক, বাট জেণ্টলি স্কুইজ দা শাটার। এইসব। এ ছাড়া আরও নানা ধরনের নির্দেশ। তার মোটা এনগেজমেণ্ট ডায়েরীর থার্ড ফেব্রুয়ারী থেকে নাইনথ্ অক্টোবর সেভেন পি.এম. পর্যন্ত ভ'রে গিয়েছিল সেইসব নির্দেশে। যেমন, প্যাসেঞ্জারস আর রিকোয়েস্টেড নট টু স্ট্যাণ্ড অন দা ফুটবোর্ড; কীপ ইন এ কুল ড্রাই প্লেস; পাতা মুড়বেন না, প্লিজ; মাত্র একবার ব্যবহারের জন্য; এমনকি আরও ছোট সংক্ষিপ্ত আপাতমর্মভেদী

'কমিট নো ন্যুইসেন্স' জাতীয় হাস্যকর নিশ্চয়তার কথা সে আমাকে শোনায়। যা আমাকে ক্রমশঃই বিভ্রান্ত ও ক্লান্ত ক'রে তোলে।

☐ ক্লান্তি (ওঃ কি বিপুল অশেষ !) সম্পর্কিত কতক প্রচলিত ধারণা ও ব্যবহার ঃ

ক. ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু পথে যদি

খ. কেন পান্থ ক্লান্ত হও (মতান্তরে, 'ক্ষান্ত হও')

গ. ক্লান্তি দূর করে গ্ল্যাক্সোজ-ডি

ঘ. 'শ্যেন, কঙ্ক, কাক, হংস ও ক্রৌঞ্চ পক্ষীর বীর্য্য পাদুকালেপরূপে ব্যবহৃত হইলে ইহা পুরুষকে একশত যোজন পর্যন্ত গমনে অপরিশ্রান্ত রাখিতে পারে।'

—কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

৩.

'She was already a siren. Her profile was just short of perfection. She was radiant, enchanting but tiring. A wonderful creature, but too much of a born actress to take quite seriously. But so beautiful, so graceful, so changeful in a hundred moods, so brilliant that it was enough to turn anyone's head. There were other flaws. She was a liar, cruel, selfish, perverse, vulgar.'

এই সব বিভ্রান্তি। আমার পোর্ট্রেট। শাটার স্পীড যখন খুব হাই। 500, 666, 777, এমনকি 1000। প্রত্যেক লোমকূপের ওপর লেন্স বসিয়ে চামড়ার নীচ থেকে কনফিউজড্ শুধু দেখে যাওয়া ঐ দোদুল্যমান। প্রত্যেক ভিখিরীনি ও রানীর মুখই ভিন্ন ভিন্ন। অনিশ্চিত। ম্যাট, গ্লসি, একস্ট্রা সফ্‌ট্। কতবার এদের ক্যাবিনেট সাইজের সামনে আমি থমকে দাঁড়িয়েছি। একবার পর্দা সরিয়ে মুহূর্তক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে পুনরায় আপনাপন কনফিউশানে ডুবে যাওয়া ছাড়া মানুষের আর কিই বা নিশ্চয়তা আছে। সমস্ত গদ্যপ্রবন্ধরূপক বাদ দিয়ে বস্তুতঃই চুপিসাড়ে এক সারপেণ্টাইন টানেলে ঢুকে যাওয়া। সেখান থেকে অজস্র ফোকরের ঢাকনা ঠেলে ক্লোজাপে দেখা বিশাল স্লুইস গেট। একপাশে জলগর্জন। নীহার।

অন্যপাশেই জল ঠাণ্ডা স্থির শ্যালো। ফার্ন, মস, জেলিফিশ।

অশোকের প্রথমতঃ আপত্তি ছিলো। আমি যখন ওকে ডিফারেন্সিয়াল ফোকাসিং বুঝিয়েছি। খুব কাছ থেকে নেওয়া ঘোর পোর্ট্রেটগুলোয় ফোকাস থাকতো দ্বিতীয় চোখের পিউপিল ও ল্যাশের ওপর লম্বালম্বি-ভাবে। চারদিকের আউটলাইনগুলো সামান্য অস্পষ্ট। কোথাও একটা উজ্জ্বল রেখাকে টেনে এনে দুভাগ ক'রে দিয়েছি। আলোর একটা হালকা টান এসে লাফিয়ে পড়েছে ফোরগ্রাউন্ডে। ডায়াগনাল রেখাটি যেখানে একটা ঠোঁটের (আহা, ঠোঁট !) পাউট ও সম্পূর্ণ প্রথাগত ব্যবহারকে ভেঙ্গে ফেটে ছড়িয়ে ফেলতে পেরেছিলো। প্রতিটি গ্রেনের মধ্যে দিয়ে বোঝানো যায়নি কি সেই এনচ্যান্টিং ক্রুয়েল গ্রেসফুল পারভার্স ভালগার ?

জীবনের এই সেই অনৈক্য। মহান গেঁতোমি। যার সামনে সমুদয় পুঁথি ফেলে বারেক সোহানাল্লা ব'লে আমি আছড়ে পড়ি। এইখানে নিবেদিত আমার ফোরস্কিন।

একদিন উজ্জ্বল রোদে তাকে দেখেছিলাম, কি ভীষণ ও ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে। অথচ বাতাস ছিলো মলয়, কোনো সংকেত ছিলো না, কেননা পরমুহূর্তে বাদাম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ম্যাগনেশিয়াম প্ল্যাণ্ট পার হ'য়ে সে জলের ট্যাংকে বিষ মিশিয়ে এসেছে হিংসেয়। এইসবই আলোর মধ্যে দেখা। ছবি যেখানে বিরাট। কোথাও কোনও যুক্তি তর্ক ছিলো না। আমি কোনও আশা করিনি। কোন সারিবাদি সালসা। রাজকোষ অপহরণ। মূলতঃ যা ক্রোধ, যা কিছু রচনা ও অতিকথন।

অশোকের মৃত্যুর পর। তখনও আমি তার খোঁজ করে যাচ্ছি। একদিন বিকেলবেলায় মিউজিয়ামে, আদত কিউরেটর ভদ্রলোক তখন ছুটিতে, আমি দু হাত মাথার ওপরে তুলে ঈষৎ পেছনে ঝুঁকে অতিকায় নীল তিমির বেলিনে চোখ রেখেছি, ডান হাতে আফ্রিকান ওয়াইল্ড হগ, বাঁদিকে হলঘরের প্রান্তে ফিরে সহসাই দেখতে পাই পরিপূর্ণ কঙ্কালটি কাঁচের ভেতরে ডারউইনের ক্রম অনুসারে বেবুন, শিম্পাঞ্জী, নিয়ানডারথাল ইত্যাদি পেরিয়ে যথাযথ স্থানে সন ও তারিখ সমেত, প্রথমে আমি চিনতে পারিনি কিছু সময় লাগে ও সিকিউরিটি এসে জানায় তখন নিশ্চিন্ত হই এই তবে অশোক। কেননা সে

'We take to wakan tanka (the Great Spirit) and are sure he hears us.'
—Chased-by-the-Bear.

ছিলো মুখ : মৃত্যুদিনে আমার সাথে দেখা করেনি। ফলতঃ হাড়গোড়ে তার কনফিউশানের কোন চিহ্ন নেই যেন সে নিশ্চিত জেনে গিয়েছিলো এই কাঁচঘর। এমন কি এক অস্পষ্ট শব্দদ্রুম ; বোধি অথবা প্রাজ্ঞ অনুভূতির ইমপ্রিণ্ট মুখ তার চিকবোনগুলি জুড়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিলো। যা কোনমতেই 'এ স্টেট অফ আটার কনফিউশান' নয়। তার আলনা ও ফীমারে কিছু স্পটমার্ক, লেফ্‌ট knuckle-এ মৃদু কাটাকুটি ও Occipetal সামান্য ডিসলোকেটেড হ'য়ে আছে লক্ষ্য ক'রে একদম নীচে দৃষ্টি নামিয়ে কালো হরফে 'In this glass case, as in the hearts of the people for whom he wrote, the memory of Sri Ashok is enshrined for ever' সরু নিটোল ক্লিওপেট্রাসদৃশ অক্ষরমালা দেখে অবিকল হো হো হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে সিঁড়িতে এক মোটা মাঝবয়েসী মাড়োয়ারী মেয়েছেলেকে ধাক্কা মেরে, অ্যাপোলজি না চেয়ে, এক লাফে তার তিনতলার দক্ষিণমুখী বেডরুমে এসে সূর্যাস্তে ডায়েরীটি টেনে বার করি।

দেখি মৃত্যুদিনের পাতাটি শাদা কুণ্ঠিত ও বিভ্রান্তিকর

জীবদ্দশায় তার ওপর মাত্রই দু-একবার নজর দিয়েছিলাম আমি। দৃশ্যতঃ! যখন আমাকে কনফিউজড্ করেছে। তার সম্পূর্ণকে কোনও বাক্যেই আমি ধরতে পেরেছি কি? অধিবিদ্যা বা ঊর্ণাকারু শব্দের ওপর তার জটিল মনোযোগ। টমেটো বিষয়ে আগাগোড়া অনুরাগ। অথবা যেখানে সে কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র থেকে রাজরোষ সম্পর্কিত নির্দেশ অকারণ তুলে আঠা দিয়ে সাঁটিয়েছে। 'রাজার অতুষ্টি পরিজ্ঞাত হওয়ার কতকগুলি চিহ্ন, যথা—দর্শনমাত্রে কোপ উপস্থিত হয়, বাক্য শুনেন না, কহিতে নিষেধ করেন, দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, মুখের বর্ণ ও গলার স্বর ভিন্ন করেন, একনয়ন দ্বারা অবলোকন করেন, ভ্রূকুটিভঙ্গ ও ওষ্ঠের বক্রীকরণ ঘটান, শরীরে ঘর্মোৎপত্তি হয়, অকারণে শ্বাস ও হাসির উৎপত্তি, ভূমিতে বা নিজ গাত্রে বিলেখন অর্থাৎ নখচিহ্ন বসান।'—এইসব ও আরও নানারকম বৃত্তিবিকার যা সে নিজে সম্প্রতি আমার মধ্যেও তবে লক্ষ্য করছিলো, আমি জানতে পারিনি?

অশোকের কঙ্কালটি সনাক্ত হওয়ার পর যেন মর্মান্তিক! কিভাবে রটনা

হ'য়ে যায়, যাবতীয় সাহিত্যসৃষ্টি ও প্রচেষ্টারা সময়োত্তীর্ণ। ফলে প্রবল উৎসাহে ক্যাটালগিং কমপাইলিং ও ইণ্টারপ্রিটেশান শুরু হ'য়ে যায়। যে কারণ আমি পরপর পাঁচবার বাসাবদল করি, রান্নাঘর গাড়ীবারান্দা চৌকাঠ আলসে কিচেন-গার্ডেন ওয়াড্রোব দোজ্ ট্রাইসাইক্ল্স্! এমনকি ছোট সাবান রাখার ন্যূনতম ঘুলঘুলি পর্যন্ত আক্রান্ত হয় অগণিত কপি রাইটার ক্যাটালগার ও কমপাইলার দ্বারা। এদের মধ্যে স্বল্পপরিচিত কয়েকজন এণ্টারপ্রেনারকেও (কাঁধে আহাঁটুলম্বিত ব্যাগ) আমি সিঁড়ি ও সুড়ঙ্গ পথে ফিসফিস করতে শুনি। সোহিনী ও ভিটামিন সম্পর্কিত আমারই কদাচিৎ উপাখ্যান-গুলি তারা পায়ে দ'লে মোটা মোটা ঢাউশ পুঁথি ও নভেলের ওপর পদচিহ্ন ফেলে ক্রমাগত দোতলা তিনতলায় ওঠানামা করে।

শুধুই কালক্ষেপবশে, কেননা এখনও আকাশে তারা ওঠেনি এবং ক্যামেরাটি প্রয়োজনীয় বিশ্রামরত, আমি ছাদ থেকে ইনটেলেকচুয়াল জটলা লক্ষ্য ক'রে নীচে ফেলে দিই (অনেকটাই জলাঞ্জলি দেওয়ার ভঙ্গিমায়, যেভাবে কে যেন তার চশমাটি ফেলে দিয়েছিলো) হাইতির রাজপ্রাসাদের সাতাশবর্ষীয়া সহাস্যশরীর রানী জেনেটের সেই সাম্প্রতিক প্রবন্ধটি 'We will make lots of children and live happily everafter.

দেখি তারা শাদামাটা বাক্যটির স্থানে স্থানে আণ্ডার লাইন, বিস্ময়, ঢেঁড়া ও তীরচিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন রূপকার্য সংযোজন করে।

সমগ্র নাটকের কম্পাইলেশন শেষ হ'লে যার-পর-নাই মোহিত হ'য়ে দেখি মাত্র পঁয়ষট্টিটি শব্দব্যয়ে ও একটিমাত্র নাটক (প্যাশন প্লে অফ যীশাস) উল্লেখে আলোচনা শেষ। যথাঃ নাটকটি সুদূর ব্যাভারিয়ার এক গ্রামে খ্রীস্টীয় ষোলোশো চৌত্রিশ সালে প্রথম অভিনীত হয় ও আজ অব্দি চ'লে আসছে গ্রামের পাঁচহাজার বাসিন্দা পুরুষানুক্রমে সকলেই এতে স্টেজবাঁধা সাজসজ্জা গান নাচ ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ক্রমান্বয়ে মেরী যীশু জুডাস পাইলেট বিভিন্ন সন্ত ইহুদি ও রোমান সৈন্যবাহিনী—এদের জীবিকা—কতবার যীশু ও জুডাস একই বাথরুম ব্যবহার করেন এবং পাইলেটের উদ্বৃত্ত গম ঝেড়ে বেছে পিষিয়ে রাখছে লাস্যময়ী নিতম্বিনী মেরী। প্রেমবিষয়ক দীর্ঘ একটি চ্যাপ্টার 'হাউ সেফ ইজ ক্যান্ড ফুড ?'— এই নামে ক্যাটালগিং হয়।

এবং পরবর্তী অধ্যায় 'Saturn's rings will be visibly bright

তিমির রাগে তি' গেয়ে ছাদের অন্যপ্রান্তে অশোকের স্মারক বেদিটির সামনে এসে দাঁড়াই। পরিত্যক্ত সেই আহাম্মুকের বেদীমূলে আমার ডান হাত ও একটুকরো চারকোল ঘুরে যায়।

সকল নগ্নতা দিয়ে ছবিটি আমি আঁকি

কয়েকটি বেঢপ ঢ্যাঙা নড়বড়ে ট্রাইসাইকেলের ছবি। চাকাগুলি এতই অনিশ্চিত বেসামাল ও সময়োপযোগী যে তাদের Static ও Dynamic unequilibrium স্বয়ং আমাকেও যার-পর-নাই সম্মোহিত করে।

প্রধানতঃ অশোকেরই স্মৃতি ও সম্মানার্থে এই শেষবার আমি অক্ষর-মালা ব্যবহার করি ও নীচে মুক্তাক্ষরে লিখিঃ ভয়ংকর খাদের ধার ঘেঁষে বেঢপ বেঁকা নড়বড়ে ট্রাইসাইকেল চেপে নক্ষত্রালোকে পোলো খেলছে হাজার হাজার পার্থিব নরনারীরা। চীয়ারস্!

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অন্তরীক্ষ

আমার অল্পবয়সী বন্ধু অনিমেষ বললে, ধূসর রঙের সকাল ছিল········

ধূসর বলছ ? তো, ধূসর কিন্তু, তোমাকে বলব কি, গেরুয়া, হলুদ, এসব জাতের নয়। জানো তো, বরং তা কালোর দিকে········

তাই তো বলছি। আটাত্তর ভাগ কোবাল্ট নীলে বাইশ ভাগ কালো দিয়ে, তারপরে প্রয়োজন মতো, যেখানে যে রকম দরকার ফ্লেক সাদা দিচ্ছে········

বলো, বলো, বললুম। ভালো লাগল একজন রং চিনছে, পৃথিবীটা ওর চোখে একরঙা চীনা কালিতে আঁকা নয়।

তো, সেই ধূসর রঙের বাঁধনি শাড়ী যেন, সিল্কের, ফলে স্বচ্ছ আর ঝলমলে ; ধূসরের উপরে হলুদ চুবিয়েছে নিচের পাড়ের দিকটা।

হলদেটা সবুজে ভাব নেবে না ?

তাই। তখন সকাল সাড়ে সাত হয়, ওদিকে মার্চ শেষ হয়ে এপ্রিলে পা পড়েছে ; হঠাৎ সেই স্মগ্, আমার আবার ধোঁয়াশা শব্দটা ভাল লাগে না, ম-টাকে চন্দ্রবিন্দু না করে বাঁচিয়ে রাখা যায় না ? সেই স্মগ্ যেন শাদাটে আকাশের গায়ে মেঘ যা এক নীল নীল লেগুনসমেত দৃশ্য যা দেখে যাও বলে কাউকে ডেকে এনে দেখাতে গেলে সে এর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে চেহারা বদলায়, নয় তো মিলিয়ে যায়। সেই স্মগ্ যখন সিল্কের বাঁধনি শাড়ীর রং শুকোতে নরম রোদে টেনে দেয়ার মত ব্যাপার, মনে রাখবেন স্বচ্ছ আর ঝলমলে, তার ওপারে বাড়িটাকে দেখা গেল, দরজা হাট খোলা। দরজা বলো দরজা, যেন থিয়েটারের স্টেজ-ফ্রন্ট, যা দিয়ে পর পর সাজানো উইংস্ আর স্কাইএর মতো পর পর রাখা থামের আভাস আর খিলানের ঢেউ চোখে পড়ে। শ্বেতপাথর নয়, বরং যেন গ্রানাইট, অথচ প্রচুর এক নম্বর সিমেণ্টের কল সেই বাড়িটা।

অনিমেষ ব্যস্ত লোক, তার উপরে সেই সকালে সাহিত্য সংসদের সভায় চলেছিল। রাতে এক পশলা জোর বৃষ্টি হওয়াতে ওর গন্তব্যের দিকে

সোজা পথগুলোতে তখনও ময়লা স্থির জল অনেক জায়গাতে। বাসট্রামের গোলমাল, ট্যাক্সির বিভ্রাট, ওদিকে কোঁচানো কোঁচা আর নতুন কোল্হাপুরী বাঁচাতে হয়; ফলে এ-পথ সে-পথ কেটে জুড়ে অবশেষে এই পথটাতে এসে পড়েছিল যা শুকনো, অথচ তখনও জলের ভিজে ভাব; ঠং ঠং বাজিয়ে একটা দুটো রিকসা, মিনিট তিনচারে একটা কার কিম্বা ট্যাক্সি, যেন তখনও পাড়াটার ঘুম ভাঙেনি, যদি পিঠে-ব্যাগ স্কুল ইউনিফর্ম পরা দুচারজন সদ্য মুখ ধোয়া সাত আট বছরেরগুলোকে না ধরো। কতকটা যেন অচেনা একটা স্কোয়ার, খানিকটা পুরনো, নিঝুম বলে অবাক করা।

আর সেই স্কোয়ারে বাড়িটা। তিন কাঠার উপরে বারোতলা। ওই টাকায় অনায়াসে, এমন কি সল্টসীতে, বাগানে ঘেরা চারটে বাড়ি হতে পারতো, গ্যারাজ সমেত। জোর বাতাস হলে উপরের দুতিনটে তলা নাকি কাঁপে। যেন লম্বাটে পিরামিড, .যেন মনুমেণ্ট যার মাথায় ঘড়ি মতো চেহারার গোল চোখে, যেন, চারপাশের লিমোজিন ভাসা স্রোতে লাইট হাউস। অবশ্যই চারপাশের বাড়িগুলো বাড়িটার তিনপাশের গলি দুটো এবং একটা বড় রাস্তার ওপারে যতদূর সম্ভব চেপে এসেছে। সংকীর্ণ, বিপজ্জনক; উলঙ্গ অশ্লীলতার কথাও মনে হতে পারে মাঝরাতের হাল্কা অন্ধকারে।

সংকীর্ণ তো বটেই। মাঝখানে চৌকোণ বাগানের জায়গা ছেড়ে চারিদিকে ঘিরে জল, ঘর, হল এমন কায়দায় উঠেছে। ফলে যদি নিচতলার সেই সিমেণ্ট বাঁধানো বাগান যাতে নানা আকারের, ছ ইঞ্চি থেকে তিন ফুটের ব্যাস তাদের, টব, কৃত্রিম পাহাড়, ক্যাকটাসের জন্য বালিয়াড়ি ইত্যাদি, যেখানে দাঁড়িয়ে উপর দিকে চাইলে ফাইবার গ্লাসের ডোম যা দিয়ে রাতের আলো দিনের আলো বাগানে পড়ে। ফলে নিচের চারতলা পর্যন্ত কয়েকটা করে কম্প্যাক্ট ফ্ল্যাটের কথা ভাবা যায় মাঝখানের সেই শ্যাফ্ট্কে ঘিরে. কিন্তু শেষ কয়েক তলায় সিঁড়ির আর লিফ্টের হ্যাচ ছেড়ে দিলে দুএকটা করে কেবিন কুটুরি ছাড়া আর কারই বা জায়গা হয়।

সংকীর্ণ তো বটেই। এতটুকু মনে ছিল ছেলেমেয়েদের কথা? চারটি ছেলেমেয়ে—যারা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বেড়েছে, বাড়ছে। নিজের, একেবারে নিজের খেয়ালকে তৃপ্ত করা। এই বেঢপ বেখাপ্পা বাড়ি তো করেছেই যা সংকীর্ণ, উপরন্তু যেখানে যেটুকু নগদ ছিল কি এক ট্রাস্টে রেখেছে, নিরানব্বুই বছর মেরামৎ হবে, ট্যাক্স্ দেয়া চলবে। এমন উপায় রাখেনি

তারা বাড়িটাকে হাতে নিয়ে নিজেদের মতো কিছু করে। হাতে নেয়ার কথা ওঠে না, কে যে অ্যাটর্নি, কারা ট্রাস্টি তাও গোপন। প্রয়োজনে তারাই নাকি ওয়ারিশান খুঁজে বার করবে। সে প্রয়োজন আর হয়েছে! ছেলে-মেয়েদের শ্রদ্ধা থাকে?

থাকে না। গত বিশ বছর তো সেণ্ট টেরেসার, হোম ফ্রম হোম, ওল্ড ভবানিপুরের সেই বুড়োদের বুড়ীদের আশ্রয়ে এক তলা থেকে অন্য তলায় প্রমোশন পাচ্ছে। সেই যে গল্প আছে না? চার বছর আগেই নাকি এক-তলার হুইল চেয়ার আর ক্রাচের দল, দোতলার হাত মাথা কাঁপা দলকে ছাড়িয়ে চারতলায় পেঁছেছিল যেখানে তারা কথা বলার বদলে কষে নাল গড়িয়ে বুবু করে, অর্থাৎ পাঁচ তলার ঠিক তাদের নিচে সেই ভেজিটেবল দলের যারা ইজের ভিজে কি শুকনো বোঝে না। একশ' না হক, পঁচাশি হবেই। এসবের, অবশ্য, কোন প্রমাণ কে আর আনতে যাচ্ছে। যা অন্যত্র ঘটে তার বর্ণনা পড়ে নিলেই হয়।

এসবের মূলে কী? কলকাতার সেই যে বিপ্লব, অথবা প্লাবন অথবা বিপ্লাবন তখন তার, অর্থাৎ এই বাড়ি করনেওয়ালা ভবনাথের। পূর্বপুরুষ আধুনিক হয়েছিল। রুচিতে, সংস্কৃতিতে। যেমন কাঠের স্তূপে মৃতদেহ চাপিয়ে দাহনের কুদৃশ্যকে পরিহার করে, সুদৃশ্য কাঠের কফিনে মাটির তলার শান্তি, নিদেন, এটা পরবর্তীকালে, ইলেকট্রিক চুল্লির ঢাকা ট্রেতে মুহূর্তে অন্তর্ধান ও ছাই হয়ে ফেরাকে রুচিকর মনে করত। জীবিত অবস্থায় ডেপুটি কালেক্টর, উকীল হওয়া ছাড়া সমুদ্রে ও পৃথিবীতে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়তো, যেমন এ বংশের একজন ইংল্যাণ্ডে ডাক্তার হয়ে সেখানে বংশ স্থাপন করেছে, একজন নাকি পশ্চিম-ভারত দ্বীপপুঞ্জে আখ-চাষে কিছু ধনসংগ্রহ করেছিল যার বংশের একজন নাকি সিনসিনাটির ইলেক্‌ট্রিক চেয়ারে বসতে পেরেছিল। অধিকাংশই, অবশ্য কলকাতাতেই। আর ভবনাথ এই কলকাতা শাখার অবতংস। আধুনিক তো বটেই, কোন কোন এ বংশের মেয়ের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বরটর ছিল। সেক্‌সটেক্‌সের ব্যাপারে—আরে ও আবার ভাবনার বিষয়!

বলা হয় ভবনাথ নাকি জাহাজের ডাক্তার, অথবা এঞ্জিনীয়ার, অথবা ফার্স্ট অফিসার হয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল। কখন আসত, কখন কতদিন কলকাতায় থাকতো, কখন কাকে দিয়ে এই বাড়ি তৈরি করাত সব রহস্যময় থেকে গিয়েছে। তা হবেই, ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে কিংবা তাদের

জননীর সঙ্গে ট্যুরে, সব সময়েই কি যোগাযোগ হয় জাহাজ-ফেরার ? এরকম কথা আছে জাহাজে অল্প জায়গায় অনেক গুছিয়ে রাখতে হয়। এ বাড়িটায় সে অভ্যাসের ঝোঁক থাকতে পারে। নাকি ইলেকট্রনিকস্ গ্যাজেটে পরিপূর্ণ। অবশ্যই এমন কারো কারো ঝোঁক থাকে মনের যে ছোট এবং স্বল্প পরিসরই সুন্দর। যেমন বটফলে মহীরুহরা লুকিয়ে থাকে, যেমন টুনির এক বিন্দু মস্তিষ্কে প্লেনের মতো ওড়া, ডাইভ দেয়া, তার বাসা বাঁধা, শাবক পালন—সব।

অনিমেষ সেই স্টেজ-ফ্রণ্টের মতো চওড়া দরজার ওপারে সেই সবুজে হলুদ, কালচে-কোবাল্ট স্বচ্ছ ঝলমল, বাঁধনি-সিল্ক-শাড়ী হেন ধূমশার মধ্যে দিয়ে সেই কৃত্রিম বাগানটাকে দেখতে পেলে যার উপরে এখানে ওখানে ডোমের ফাইবার গ্লাস চোয়ানো আলো নানা সবুজ, লাল, সাদা, বেগুনি রঙের লতা পল্লব, ফুলে সোনালী দেখাচ্ছে। তার মধ্যে এক পুরনো প্যাণ্ট কোট পরা শুখনো শুখনো ডালিয়া, শুখনো শুখনো ফক্সগ্লাব ইত্যাদির মধ্যে ঘুর ঘুর করে লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। নকল পাহাড়ের উপরে একটা দৈত্য-নাগকেশর দেখতে পেলে যার পাপড়িগুলো সাদার বদলে হাল্কা গোলাপী, আর যার কেশর-গোলক ক্রোম হলুদ। সেই দণ্ডে সে অনুভব করলে নাগকেশরের আতর তার গায়ে পড়ছে। সে আর দাঁড়ায় নি।

ভবনাথ তার পঁচাশি সত্ত্বেও এক সকালে সেণ্ট টেরেসার সেই হোম ফ্রম হোম থেকে এক বেতের লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে নেমে পথে এসে ক্রমে একটা বাসে, তার পরে একটা ট্যাক্সিতে, পরে পথের ধারে বসে থেকে হিচ-হাইক করে (তেমন স্খলিত চরণ হাত-পা-মাথা-কাঁপা বুড়োকে না দয়া করে ?) বাড়িটায় এসেছিল যাকে অন্তরীক্ষ ছাড়া কিছু বলা যায় না (অনিমেষের হিসাবে মাটি ও মহাশূন্যের মধ্যে ভাসমান এক অর্থহীনতা)।

ভবনাথ দেখলে বাগানের মাঝামাঝি এক ওক কাঠের ছ সাড়ে ছ ফুট লম্বা জাহাজী মাল্লার বাক্স পড়ে আছে; সে দেখলে এখানে ওখানে টবে ডালিয়াগুলো এপ্রিল বুঝে শুখিয়ে যাবে। সে দেখলে ক্যাকটাসের জন্য করা কৃত্রিম বালিয়াড়িতে শ্যাওলা জমেছে। সে এই তিনটি বিষয়কে একত্র করার চেষ্টায় কাঁপা কাঁপা মাথা, চোখের নিচে জলের থলি এবং হলুদ রঙের জলে ফুলো মুখ সত্ত্বেও বালি দিয়ে বাক্সটাকে বোঝাই করলে, টব থেকে ডালিয়ার বালব্ বার করে সেই বালিতে পুঁতলে। তখন তার মনে

হল এটা ভালোই হল এমন সময় আসতে পারে যখন ডালিয়া আউট অব ফ্যাশন হবে। তখন এই বালব্‌গুলো কাজে লাগবে নতুন করে পৃথিবীতে ডালিয়াকে আনতে। সুতরাং অনেক কষ্টে আর চেষ্টায় সেই বাক্সের ডালাটাকে পেরেক ঠুকে আটকে, একটা গিমলেট যোগাড় করে ডালায় কয়েকটা ছ্যাঁদা বানালে। তারপর সে দেখলে বালব্‌ তুলে নেয়ার পরে ডালিয়াগুলো পড়ে পড়ে শুখোচ্ছে। সে ডালিয়াগুলোকে এনে বাক্সটার ডালার উপরে সাজালে, যেন ইংরেজি 'আর' আর 'পি' অক্ষর দুটো তৈরি হল। তখন তার নিষ্প্রভ চোখের কোণ দুটি হাসির ভঙ্গিতে কোঁচকানো।

অনিমেষ একটা ডিলুক্স বাসই পেয়েছিল। একেবারে সামনের সিটে বসে সে সেই চকচকে কাঁচের ওপারে নিষ্প্রভ চোখ দুটোর হাসির ভঙ্গিতে কোঁচকানো কোণ দুটিকে দেখতে পেলে। আর সেই ইংরেজি অক্ষর দুটো যা কালোর উপরে মাজা পিতলের মতো সোনালী। সে মনে মনে হাসল, ওতো ল্যাটিন এবং ইংরেজি দুই মন্ত্রেরই আদ্যক্ষর—শান্তিতে বিশ্রাম কর।

যাই হক, সেদিন, সেই পাঁচই এপ্রিল, ঠিক তারিখটা বলতে হলে, অনিমেষ সাড়ে দশ নাগাদ ফিরতি পথে, (বাস-পথ থেকে ফিরতে হয়েছিল চৌরঙ্গীর পরে বাস ঠিক করলে প্রকৃতপক্ষে সে নৌকা নয়) দেখলে সেই বাড়িটার সামনে অনেক গাড়িতে এক দুর্ঘট জ্যাম সৃষ্টি করেছে ঃ প্যাকার্ড, জ্যাগুয়ার, হিসপানো, এমন কি ফিয়াট, ফোর্ড, ডেইমলার, ক্রাইসলার, টয়োটা, এমন কি ভোকস্‌ওয়াগন। নতুন, পুরনো, নীল স্টীল রং, সাদা, ক্রিম, রক্ত, বাদামী। অর্থাৎ যতীন্দ্র, সুমতি, জিতেন্দ্র, মেখলা, অর্থাৎ ভবনাথের পুত্র কন্যারা, তাদের পুত্র কন্যারা সপরিবারে।

এতো বোঝাই যাচ্ছে সেই ট্রাস্টি এবং অ্যাটর্নি কোন খবর পেয়ে খবর দিয়েছে।

ভিড়ই বলতে হবে। তার ছেলেমেয়ে যতীন্দ্র, সুমতি, জিতেন্দ্র, মেখলা তো বটেই তাদের সঙ্গে কে এসেছে আর কে আসেনি। যেমন যতীন্দ্রর ডাইভোর্স করা বউ মণিমালা যে নাকি এখন অন্য লোকের স্ত্রী অন্য বংশের ছেলে-মেয়ের মা। সেও টেলিফোন তুলে অবাক! কেমন রহস্যময় হচ্ছে না? সকলেই ফোন পেলে, কেউ ব্রেকফাস্টে, কেউ দাড়ি কামাতে, কেউ বাথে, কেউ রান্নাঘরে। অবাক্‌ কে ফোন করে! যে বাড়িতে বিশ পঁচিশ বছর মানুষ নেই সেখানে কি ফোনের কানেকশান থাকে তাও আমাদের সি.এম.ডি.এ. খোঁড়া শহরে? একটা সমাধান এই হতে পারে দশ থেকে

বারো তলার মধ্যে কোন এক জায়গায় লুকানো ইলেকট্রনিকস গ্যাজেটে রেকর্ড করা কোন কণ্ঠস্বর ট্রাস্টি বা অ্যাটর্নি বা দুয়েরই অফিসে কিছু ঘোষণা করে থাকবে।

ঃ আচ্ছা, অনিমেষ····আচ্ছা, বলে যাও।

ঃ তো, সেই মণিমালা, যতীন্দ্রর ডাইভোর্স করা স্ত্রী যে একটু মোটার দিকে হলেও সুন্দরীই এখনও। আর সেক্সিও।

ঃ বেশ।

তো, মণিমালা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এ পক্ষের স্বামীর ব্যুরো টেবলের ধার পর্যন্ত এসে স্বামীকে বলতে গিয়ে মনে মনে তার উত্তর শুনলে, কে তোমাকে কেন ফোন করবে? তুমি কি মনে কর তোমার প্রথম পক্ষের ছেলে উত্তরাধিকারীদের একজন? তাতেই বা তোমাকে কেন? মনে মনে এই উত্তর শুনে মণিমালা কথাটাকে মনেই রাখলে, কিন্তু তার স্বামী অফিসে যেতেই সে তাদের নীল প্যাকার্ডকে চালিয়ে সেই বাড়িটার দিকে রওনা হল। তার পরণে নীলের গায়ে রুপোর দাঁত দুধে কড়িয়াল, স্টিয়ারিং-এর উপরে রাখা সাদা হাতে ডায়েটিং-এর ফলে নীল শিরার আভাস।

এমন কি মিসেস রায়সিন্‌হা নামে সেই মহিলাও উপস্থিত যার সঙ্গে এ পরিবারের একমাত্র সম্বন্ধ এই যে, ছোট ছেলে জিতেন্দ্র তার নন্দাই। সেই কমলা রায়সিন্‌হা যথেষ্ট বিব্রত ফোন পেয়ে। বিশ বছর পরে যা সে নিজেও প্রায় ভুলেই গিয়েছে সে কথা কি কেউ কাউকে বলে দিয়েছে? তার মেজ ছেলেকে নিয়েই কথাটা। আশ্চর্য, যদি তাকেও এই বংশের উত্তরাধিকার দেওয়ার কথা ভাবা হয়।

ভিড়টা ক্রমশই তার ছেলে মেয়েদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠছে। যেমন দোতলার ল্যান্ডিং থেকে বাঁ-হাতি করিডরে হলুদে আলোর সাময়িক নির্জনতায় সুমতিকে পেয়ে যতীন্দ্র বললে, এই মিসেস রায়সিন্‌হা, ইনি কে বলতে পার? কি সুবাদে এখানে? পায়ে পায়ে এক যুবকও, ছেলে নাকি? জ্বালাতন। সে প্রকাশ্যে কিছু বললে না, তার মনের মধ্যে যে কথাগুলো তৈরি হতে হতে সে না না, আজকের দিনে হয় বলে আধা-তরল অবস্থাতেই যাদের চেপে দিলে তারা এরকমঃ জ্বালালে দেখছি। পাজি বুড়ো।

ছোট ছেলে জিতেন্দ্র তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক বিশেষত পেসমেকার বসানোর পর থেকে। সে দাড়ি কামাতে বসে খবর পাওয়ায়

ব্রেকফাস্ট হয়নি। সুতরাং তার স্ত্রী ব্রেকফাস্টের ব্যাপার এনেছে, এবং প্রথম সুযোগেই বাঁয়ের সিঁড়ির ঘরের মুখোমুখি যার দরজা আর যার একটা ফ্রেঞ্চ উইনডো বাগানের দিকে, সিঁড়ির চলাচল আর কফিনেও চোখ রাখা যায় ইচ্ছা যদি কর, সেটা পেতেই নিরিবিলিতে স্বামীকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে নিচ্ছে। তার সতর্ক দৃষ্টি শুধু কোলেস্টেরল বর্ধকদের বর্জনেই নয়। সহজ পাচ্যতা এবং ভিটামিনবহুলতাতেও। তৃতীয়টির কথা আর বলো না, পাংচুয়াল হয় কি করে। প্রায় একঘণ্টা দেরি হয়েছেই। এখন সে শক্ত না হলে কী যে হবে ভাবতেও ভয় করে! হতো না যদি সংবাদটা পেয়ে হার্টবিট বেড়ে যাবে এরকম মনে হয়েছিল মুখ দেখে। যে ঘেমে উঠবে এরকম সেই বাড়ার ভয়ে। সুতরাং জিতেন্দ্রর স্ত্রী তার ঈষৎ পুষ্ট নীলে সাদা ফুল ব্লাউজের পিঠ দিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে ঘরের বাইরে রাখতে চেষ্টা করছে। সে দরজার কাছে এক কালের বড়জা মণিমালাকে দেখে চোখা-চোখি হওয়ার ভয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে পিঠ দিলে। মণিমালার টকটক্ করে কথা বলার অভ্যাস ছিল, বলে বসতে পারে, এটা কিন্তু ঠিক ভাল হল না, দরজার ওপারে কফিন আর এপারে খেতে বসা। তখন ওটা দরজা নয়, জানলা, এসব বলে লাভ হয় না। ফলে মণিমালা জিতেন্দ্রের মুখ দেখে বললে হেসে, হকচকিয়ে দিয়েছি তো? ব্রেকফাস্টও শেষ করতে পারেননি? মুখে খাবার নিয়ে জিতেন্দ্র কিছু বলতে গেল, কিন্তু সেটা বিপজ্জনক। সুতরাং তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি ফিরল, বললে, ওমা আপনি? কি সৌভাগ্য আমাদের। ওদিকে, ওদিকে, কফিনটা ওই বাগানে।

তা কি বাগানে থাকা উচিত? বলতে পার জল বৃষ্টি লাগবে না, বরং ওই ডোমটা এখন তো নীলাভ আর গোটা বাড়িটাকেই তো সেপালকর্ বলতে পার। তা হলেও হলে শায়িত রাখাই নিয়ম। সুতরাং মৃদু জুতো, সিল্ক, আর আলাপের হাল্কা শব্দ তুলে একতলা দোতলা এমন কি তেতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত কৌতূহল প্যাঁচানো পথে উঠে উল্টো প্যাঁচে নেমে এল। আর তারপরে অনেক ইচ্ছুক হাতে ভর করে বাক্সটা হলে স্থাপিত হল। তারপর, এখন, কেউ যেন ঠিক করতে পারছে না কিভাবে সেটার দিকে এগোনো যায়। মাথা নিচু করে কিছু দূরে দূরে দাঁড়াবে? পাশে হাটু পেতে বসবে? ওটাকে এক হাতে ছুঁয়ে কেউ হাত কেউ রুমালে চোখ ঢাকবে? কফিনটা কি এই বাগানেই পুঁতে দেয়া হবে, কিংবা ট্রাকে, না হয় ফুলে সাজানো ট্রাকেই, ইলেকট্রিক চুল্লিতে নেওয়া হবে? আরও মুস্কিল

এই যাকে ফ্যামিলি সার্কল্ বলে তার বাইরে লোক এসেছে। তারাই যেন ভিড়ে গিজ্ গিজ্ করছে। এমন মহিলা পুরুষও আছে যারা বুড়োর চার ছেলে মেয়ের একজনেরই পরিচিত, অন্য সকলের অপরিচিত। এখন এখানে কফিনের ঘরে দাঁড়িয়ে কি পরস্পরের পরিচয় নেওয়া হবে? মৃতের অসম্মান ঘটে না? তা হলেও রুড হওয়া যায় কি?

একটা কথা হচ্ছে বটে ডালাটা খোলা হক, পেরেক তো আলগাই মনে হয়, মৃতকে শেষ সম্মান জানানো হক। তার মুখের দিকে চাওয়া হক। যৌবনের একটা পারস্পরিক টান আছে। যুবাযুবতীরা পরস্পর অপরিচিত হলেও, (আর অপরিচিতই বা থাকছে কি করে তারা সকলেই কি সেই এক বুড়োর সঙ্গে জড়িত নয়—যার প্রমাণ তারা এখানে উপস্থিত?) বড়দের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে এবং জানালা দরজা না আটকে বরং দেয়াল বরাবর দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন একজনের প্রদর্শিত পথে পথ চিনে—ক্রমশ সেটাকেই অলিখিত এটিকেট বলে মানছে।

তাদের মধ্যে এক যুবতী যার খুব হাল্কা উলের গলাবন্ধ হলুদ সোয়েটারে সুন্দর বাস্ট, নীল স্ল্যাকস্ এবং টকটকে লাল ঠোঁট এবং নখ, বলে ফেললে, আসলে ওঁরা তবু তো দেখেছেন, আমরা? আমাদের জন্মের আগে থেকেই তো হোমে।

একজন, তার কিছুটা থ্যাবড়ানো নাকে সোনালি ফ্রেমের চশমা, লালচে গন্ড, হাল্কা খয়েরি ছোট দাড়ির গোলালো মেয়েলি মুখ, সাদা ট্রাউজার্স এবং হাতা গুটোনো সমুদ্র নীল শার্ট, বললে, তাই নাকি হোমে?

অন্য একজন, যার পোলকাভর্ট্ শার্ট, হাল্কা নীলে গাঢ় নীল স্ট্রাইপ শার্ট, শ্যামল রং আর টানা চোখ, বললে, হোমে? হোমে বলছেন? আশ্চর্য তো।

প্রথম যুবতী বললে, এটাই কিন্তু আমাদের শেষ চান্স ওঁকে দেখে নেয়ার।

অন্য এক যুবতী, যার চাপা টকটকে লাল ট্রাউজার্সের উপরে সাদা পাঞ্জাবী যার ডান হাতের প্রথম দু'আঙুলের ডগা সিগারেটে কমলা, বললে, হোমে নাকি মৃত্যুর আগে প্রায় ভেজিটেবল হয়ে যায় কেউ কেউ।

অন্য আর এক যুবক, যার টকটকে লাল টিশার্ট, সাদা ট্রাউজার্স, কোলহাপুরী স্যান্ডাল, আর রক্তে ভারি মুখ, উঁচু গলায় বললে, বলতে জড়িয়ে জড়িয়ে হাসলও, দেখলেই কি চিনব? কেউ কি চেনে? মাইরি,

যদি কেউ ডেড্‌বডি একটা কুড়িয়ে এনে ভরে রেখে থাকে, কফিনে? হে হে হে।

হলে তখন পিন পড়লে শব্দ হবে।

তখন বড় ছেলে যতীন্দ্র বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে গেলে তার স্ত্রী মৃদুভাবে তার হাতে চাপ দিয়ে তাকে নিরস্ত করে বললে, আমরা এখন বরং ওপাশের ঘরটায় গিয়ে বসি এখনও তো লোক আসা শেষ হয় নি, ম্যাগো, কত লোক যে আসছে! নিকটজনরা যে শোক করে তার উপায় নেই।

যতীন্দ্র, সুমতি, জিতেন্দ্র আর মেখলা আর তাদের বর্তমান স্ত্রী এবং স্বামীরাই নিশ্চয়ই কফিনের সব চাইতে কাছে দুই পংক্তিতে আর সুরুচি-সম্পন্ন দূরত্ব আর ব্যবধান রেখে। তাদের পরের সারিতে হাত তিনেক দূরে আর দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো সেই যুবক যুবতীদের পংক্তি থেকে হাত পাঁচেক সামনে একাই একটা পংক্তি। তার পরনে তো সেই নীল-রূপার দাঁত ওয়ালা দুধ কড়িয়াল, আর এখন বোঝা যাচ্ছে তার ভ্রূ দুটো প্লাক করে আঁকা। মণিমালা সে রকম একা কারণ সাক্ষাৎ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যুক্ত অথচ ডাইভোর্সড্‌ একজন হিসাবে, ঘটনাচক্রে, সে এখানে এখন একাই।

সে-ই প্রথম নড়াচরার সূত্রপাত করলে। নিঃশব্দে, আলোতে মৃদু হিল্লোল হবেই, এক হাত বাঁয়ে এবং দু'হাত সামনে এগোল সে যার ফলে দেয়াল ঘেষা যৌবনের সারির দুই যুবকও তেমনও এগোল যাদের একজনের সমুদ্র নীল হাত গুটানো শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স, সোনালি চশমা আর হাল্কা খয়েরি দাড়ি, আর অন্যজন এই প্রথম যেন সে তার সাদা সিল্কের পায়জামা আর বাটিক সিল্কের পাঞ্জাবী নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

ঃ আচ্ছা, অনিমেষ, এরা দুজন সেই ফ্লোরকে সে রকম করে কভার····

ঃ তাই স্বাভাবিক নয়? তারা দুজনেই মণিমালার ছেলে, এ পক্ষের আর ও পক্ষের বয়সে তিন বছরের তফাৎ হবে। কিন্তু দুজনের মধ্যেই আর্টিস্ট, কবি, এরকম একটা সামান্য আছে না? বাটিক সিল্কেরটিই বরং প্রথম। কেমন চিন্তাশীল আর বিষণ্ণতার মৃদু আভাস।

তো, মণিমালা বললে, যতীনবাবু; আসলে তুমি এখন হেড অব দা ফ্যামিলি! সকলেই ব্রেকফাস্ট করে এসেছে। যদি সব লোক এখনও না এসে থাকে, তুমি বরং লাঞ্চ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমার মনে হয় একটা বুফে লাঞ্চ তোমার ঘোষণা করা ভালো হয়।

মণিমালার গলা উঁচু নয়, কিন্তু দূরে পেঁছাতে অদ্ভুত রকমে পারদর্শী। সুতরাং যতীন্দ্র ফিরল, ফিরেই দাঁড়াল তাকে হাসতে হয় দুএক পা সরে এসে বক্তার মতো একা হয়ে দাঁড়াতে হল, বললে, কে, মণিমালা, থ্যাংকু, থ্যাংকু, তা তো বটেই। বুফে লাঞ্চ কি হয়? তাই হক, বেলা দুটোয়, কেমন? লাঞ্চের আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা এখানে আবার একত্র হব।

এই বলে সে বাঁয়ের দরজার দিকে এগোল। তার এপক্ষের স্ত্রী তার বাহুতে হাত রাখল। তার দেখাদেখি সকলেই তখন হল থেকে বেরিয়ে পড়তে সুরু করলে, কেউ বাঁয়ে কেউ ডাইনে, যেন ফ্লোরে চক দিয়ে বাইরে যাওয়ার বাঁকা রেখা সব আঁকা আছে যা অনুসরণ করে তারা মসৃণ-গতি। ভদ্রতা বলে কথা আছে। বড় ছেলে, আর এখন তো জানাই গেল, সে-ই বর্তমানে হেড অব দা ফ্যামিলি হয়েছে, সে বেরিয়ে গেলে অন্য সকলকেও ক্রমশ বেরিয়ে পড়তে হয়। এতো বোঝাই যাচ্ছে সেই বেলা দুটোয় লাঞ্চের পরপরই তারা একত্র হবে আবার। তখন শোক-কৃত্য শুরু হবে আবার।

অঘোষিত একটা সংবাদ এক মুখ থেকে আর এক মুখে এরকম করে ছড়াল যে হয়তো লাঞ্চের আগে ডালা খোলা হবে আর শোক যাতে বিসদৃশ না হয়ে যায় আধ ঘণ্টা কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে লাঞ্চে বসা হবে।

অন্য ঘরে এসে যতীন্দ্রকে তার স্ত্রী বলল, মণিমালাও এসেছে দেখছি তার ছেলেকে নিয়ে। কি বেহায়া মেয়েমানুষ! ও কি আশা করে ওর ছেলে উত্তরাধিকারীদের একজন? যারপর সে বললে, অতক্ষণ করে কিন্তু দাঁড়িও না, পা ধরে যায়। সে একটা চেয়ার পেয়ে বসল। তারপর সে হাসল। বললে, আমরা কিন্তু অনেক সময়ে ক্ষতি করতে গিয়ে অনেক ভাল করে ফেলি।

ঃ ক্ষতি?

ঃ বাহ্, ক্ষতি নয়? অন্তত ত্রিশজনের লাঞ্চ। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, এই বেলায় এখন তুমি যে কি করবে! হোটেল তো বটেই। কিন্তু এখানে টেলিফোনই বা পাচ্ছি কোথায়!

ঃ দেখি, দেখি; বাকিটুকু বল।

ঃ কি বাকি? ও! যতীন্দ্রর এ পক্ষের স্ত্রী, তাওতো বিশ বছর হল,

বললে, ভালোই করেছে না বুঝে। অন্তত সকলের সামনে এই ঘোষণা হয়ে গেল তুমিই হেড অব দা ফ্যামিলি।····অর্থাৎ অ্যাটর্নি এলে উইল শোনবার রাইটটা প্রথমেই তোমার। এবার সে রিণরিণ করে হাসল। এমন কি তার চল্লিশোর্ধ্ব প্রচুর মাই দুটো কাঁপল। সে বললে, তুমি ফোন করে এস হোটেলে ; বাড়িতেও ফোন কর, অন্তত একজন নিজের চাকর লাগবে হোটেলের বয়রা থাকলেও। দোতলার হলেই।

যতীন্দ্র যখন বেরিয়ে যাচ্ছে সে তাকে 'শোন' বলে থামালে।

যতীন্দ্র তার চেয়ারের কাছে এলে পরামর্শ করার সুরে বললে, যাক সে কথা, তোমাকে বলে দিই ডালা যদি খোলাই হয়, ঘাবড়ে যেয়ো না যেন। বিশ পঁচিশ বছর হোমে থাকার পরে মানুষ তো ভেজিটেবল হয়ে যায়, (না কি ভেজিটেশন ?) তো তাকে আর চেনা যায় কি ? তুমি, অথচ যদি চিনতে দ্বিধা কর সব ব্যাপারটা ভেস্তে যাবে। এতদিন পরে····

যতীন্দ্র বললে, চিনব না কেন ? আমি তো দেখেছিলাম শেষবার····

একটু মুস্কিলই তো। কথাটা সে শেষ করতে পারলে না। তখন সে প্রথম ডাইভোর্স করে বাড়িটা সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাটে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। দেখ, সেই মণিমালা আজ আবার। তখন খুবই টানাটানি তার। নতুন ফ্ল্যাট, নতুন লিমোজিন, এবং তার জন্যও, যার জন্য ডাইভোর্স, প্রচুর টাকা দরকার। অ্যালিমনি তো গলায় ফাঁশ। উকীলদের পিছনে কান্নায় ফোলা চোখ রুমালে ঘষে লাল মণিমালা নামে একজন। সে সময়ে সেকটর টু এক নম্বর পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে (এই ছবিগুলো কেমন একটা গেরুয়া বাদামিতে কিন্তু মনে আসে) সে তাকে লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তার নিজের দিকে আসতে দেখেছিল। শেষবার। আর বুড়োদের স্বভাবই উপদেশ দেয়া, আর সে উপদেশে নিজের চল্লিশ বছরকে বেহদ্দ বোকা মনে হয় কখনও····

যতীন্দ্র বললে, যা বলেছ, ভেস্তে দেয়া চলবে না।

দোতলার একটা ঝুল বারান্দা থেকে লাগোয়া ঘরটায়, যার আলোটা সাদা না হয়ে বরং হাল্কা অ্যাম্বার, ঢুকতেই যতীন্দ্রর প্রথম পক্ষের ছেলের সঙ্গে এ পক্ষের ছেলের দেখা হয়ে গেল।

এ পক্ষের ছেলে বললে ঃ হ্যালো, হ্যালো দেখা যখন হলই একটা কথা বলে নিই।—বাবাকে দেখলেন ?

প্রথম পক্ষের, যে মণিমালার ছেলে যার হাতা গুটোনো নীল শার্ট আর

সাদা ট্রাউজার্স, বললে, হ্যাঁ, মনে হল, হাতের টুইচিং বেড়েছে।

ঃ আর ঘাড় ?

ঃ ঘাড়ও কাঁপছে, তা যাট পেরিয়ে থাকবে।

ঃ কথাটা কি বলব ? আসলে এখন পর্যন্ত আমিই ভেবেছি, মাকে বলিনি। বলার অপেক্ষা রাখেনা এসব ক্ষেত্রে তাঁর হয়ে অন্য কাউকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (সে হাল্কা করতে যেন হাসল) খুবই স্বাভাবিক, খুবই, এসব ব্যাপারে সেন্টিমেন্ট বিক্ষুব্ধ হয়। যাই হোক একসঙ্গে বিশ পঁচিশ বছর সুখ দুঃখের কথা বলা, বুদ্ধিতে স্বীকার করলেও আবেগে মানতে পারা কঠিন বৈকি। মানে আমার মায়ের কথা বলছি—আপনার মনে হয় না ?—এ বছর না হক আসছে শীতে হোমে দেয়ার কথা ভাবছি। কি বলেন ?

যতীন্দ্রর প্রথম পক্ষের মণিমালাজাত বললে, তা আপনাদের সঙ্গেই তো গত পঁচিশ বছর, আপনারা যা বোঝেন।

ঃ অবশ্য মায়েদের সঙ্গে আলাপ করে নেয়া যায়।

ঃ কিন্তু ....

ঃ আসলে, দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে যার দুধ সাদা ট্রাউজার্স আর র-সিল্কের ম্যানিলা শার্ট, বললে, আপনাদের বাড়িটা তবু বড, আমাদের জন্য তো উনি তিন কামরার ফ্ল্যাটই করেছিলেন।

প্রথম পক্ষীয় একটু ভাবলে, একটু হাল্কা করে হাসলে ঃ স্পেসের অভাবইতো আজকাল, তো, আপনি কি এই বাড়িতে আমাদের শেয়ারটাকে আমরা ফোরগো করলে সুবিধা হয় বলছেন ? মানে হোমে যাওয়ার আগে কিছুদিন এখানে স্বাধীনভাবে থাকলেন ?

ছোট ছেলে জিতেন্দ্রর ব্রেকফাস্ট প্রকৃতপক্ষে একটু বাধা পেয়েছিল তার স্ত্রী সুতরাং তাকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চালনা করে করে আবার সেই ব্রেকফাস্টের ঘরে নিয়ে এল। তার গৃহস্থালীর কাজ কত নিপুণ! তার পরিচারিকা, যে নিশ্চয়ই কারো চোখে পড়েনি, দেয়াল ঘেষে যেমন উচিত, টেবিলে বিছানো প্লেটগুলোর দিকে নজর রাখছে। জিতেন্দ্রর স্ত্রী চোখেই পড়ে না এমন করে মাথা নেড়ে তাকে বোঝালে যা করা উচিত তা সে করেছে। পরিচারিকাকে বললে, এবার তুমি ঘুরে ঘুরে দেখ। পরিচারিকা যেমন উচিত, তেমন দেয়ালে মিশে গেল। তখন সে জিতেন্দ্রকে চেয়ারে বসালে। সে মনে মনে হিসাব নিলে। একটু বিশৃঙ্খলা তো হচ্ছেই।

অন্যান্য দিনের মতো ক্যালোরির দশমিকগুলোর হিসাব ঠিক রাখা যায়নি। এখন তো সন্দেহ হচ্ছে অঙ্কটা নশ' পঁচিশ না হাজার পঁচিশ। সে স্থির করলে এখন, নিরাপত্তার কথা ভেবে, বরং তারপরে ওষুধের দিকে যাওয়া ভাল। সে সুদৃশ্য বেতের বোনা নানা রং করা বাস্পারের মধ্যে হাত ও চোখ দিয়ে খুঁজে একটা ছোট, টকটকে লাল আপেল বার করলে, আর একটা ছুরি। অ্যাপল এ ডে···

আপেলটাকে চার ফালা করে, সেটা তো হজমের সুবিধার জন্য স্টিমে ভাপানোই, প্লেটে বিছিয়ে দিয়ে সে হাসিমুখে বললে, ডালা খুললেও মুস্কিল, না খুললেও নিন্দা।

জিতেন্দ্র চামচে এক টুকরো আপেল মুখের দিকে তুলতে শূন্যে হাত রেখেই বললে, কেন? তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে? তার স্ত্রীর মনে পড়ল সেদিন মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার, অর্থাৎ শোওয়ার দিন। বোধহয়, ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করলে সে, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ভালো, আজকের এই ক্যালোরি গোলমালের পরেও সেক্স হার্টের পক্ষে উপকারী থাকবে কিনা, যদিও ডাক্তারের প্রেসক্রিপশানে ওটাকে ভাল বলা আছে।

চিবিয়ে আপেলের ছোট টুকরোটাকে গিলে জিতেন্দ্র বললে, বলছিলে····

ঃ মানে, তুমি কি গত পঁচিশ বছরে একবারও দেখেছ যে চিনতে পারবে?

ঃ অর্থাৎ···ছোট ছেলে নিজের বুকের উপরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বাতাসের পথ করে দিয়ে ছোট, একেবারে সরবে প্রমাণ, একটা তৃপ্তির ঢেকুর তুললে। কে বললে?

ঃ আমার তো মনে হয় ডালার নিচে যা দেখবে, মেনে নেয়া ভাল। কি বলছিলে?

ছোট ছেলে বললে, তোমাকে একটা কথা গোপনে বলে রাখি, কিন্তু গোপন রেখ। অর্থাৎ আমার সেই হসপিট্যালে থাকার সময়ে। পরের দিন পেসমেকার বসাবে। দেখ ওটাকে তখন তুমি খুবই গুরুত্ব দিচ্ছিলে, অবিশ্যি আমিও, এখন তো দেখলুম মাইনর অপারেশনই, আর দেখ ওটাও, মানে শোওয়াও বরং উৎসাহিত করেছে ডাক্তার, যার ফলে হার্টের হঠাৎ অবিশ্বাসী হওয়ার সুযোগ থাকে না। না, না কল্যাণী, এখন সে তোমার মতোই বিশ্বস্তা। না, না, আমি ভয় পেয়েছিলুম, কে বললে? তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ।

ঃ কি খোঁজ নেব, কোন্ কোন্ নার্সকে বিরক্ত করেছ ? বিশেষ সেই ঢ্যাঙা, শুকনো, দাঁত উঁচু, যার লম্বালম্বা পা-ছাড়া আর কিছু ছিল না····

ঃ আরে না, না। কারো দুপায়ের মধ্যে হঠাৎ হাতটাকে উপরে তুললে, বরং ডোণ্ট বি নটি এই চিরাচরিত বলে খুশীমুখে বরং সাইড টেবিলটাকে গুছিয়ে দেয়। তা সেই নার্সই টেবল থেকে ব্রেকফাস্ট ট্রে সরিয়ে নিয়ে গেলে····

ঃ তবু যদি দাঁত বড় না হত, মুখেও মেছেতা না ব্রণের দাগ····

ঃ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরেই রোদ আসা জানালার কাছে বিছানায় শুয়েই, হয়তো বিছানার যে জায়গায় রোদ সেদিকে টেনে দিয়েছিল নার্স, হাল্কা বাদামী পুরনো সুট্ পরা এক বুড়ো হসপিট্যালের বাগানে ছোট সাইকাসোরটার নিচে সিমেণ্টের বেঞ্চে বসে একটা প্রায় পচা এমন বাদামী রং ধরা পেয়ারা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছে।

জিতেন্দ্রর স্ত্রীর গায়ে কাঁটা উঠল। বললে, কি সাংঘাতিক। বলছ সেই, মানে, হোম থেকে পালিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছিল। (সে হাসল ফ্যাকাসে মুখে) কই এতদিন বল নি তো ! মুখ দেখেছিলে ?

ঃ মনে হল চিনেছি।

তার স্ত্রী হাসল এবার, না কি ভয় পেয়ে সারারাত বাবা বাবা বলে মনে মনে ফুঁপিয়ে, সকালে তেমন ভুল দেখলে।

ঃ আচ্ছা····

ঃ কি ?

ঃ লক্ষ্য করো আলোটা যেন কমছে বাড়ছে।

ঃ হতেই পারে। দরজার ওপারে দেখ যেন মিউজিয়ামের ভিড় হাঁটছে।

সেই হাল্কা, খুবই হাল্কা, বোঝা যায় শীতের জন্য নয় অন্য কারণে, হলুদ সোয়েটার আর নীল স্ল্যাকস্, ক্রোম হলুদ স্যান্ডালে ভাসা লাল টকটকে নখ, যুবতী যার ঠোঁট দুটি লাল টকটকে সে এক তেতালার ঘরে পাশের দিকে ফিরে যুবকটিকে বললে, কেমন ভয়ভয় করে, না ?

তার সঙ্গী সেই যুবক, যার সাদা শিল্কের পায়জামা আর বাটিক সিল্কের পাঞ্জাবী যার ছবিটায় আঙ্গুরের পাতা পার্টীকলে, লতা নীলধরা সবুজ, আর আঙ্গুরগুলো সাদা, বললে, তা তো হয়ই, নতুন দেখা পুরনো

বাড়ি, আর তা ছাড়া আলো কেমন বদলায় দেখেছেন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ? আর তা ছাড়া, সে হাসল, চার্মিং শেষ কয়েক ধাপ আপনি দৌড়ে দৌড়ে। আচ্ছা কেউ কি বলেছে ! মানে, পার্ফেকশন আপনার প্যান্টের ফিট। তার গাল যেন আলোকিত হল। যুবতী তাড়াতাড়ি বললে, আমরা নিশ্চয় কোন না কোন ভাবে রিলেটেড।

ঃ তাতো বটেই। দেখুন এঘরে একটা সোফা, কেমন সেকেলে, কিউট। ঠিক যেন লায়ার মাঝখানে বসার জায়গা রেখে দুপাশে ঢেউ খেলে আর্মরেস্ট। বসুন, যদিও বলবেন, এটাকে আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছে তা ভাবা লজিকের দিক থেকে উচিত নয়।

ঃ আপনি ? যুবতী সেই লায়ারের মাঝখানের কুশানে বসে তার লাল মরোক্কোর কাঁধ-ঝোলানো ব্যাগ থেকে সিগারেট প্যাক বার করে যুবকের দিকে এগিয়ে ধরে অফার করলে। সে সিগারেট তুলে নিলে ব্যাগ থেকে লম্বা হোলডার, যা হাতির দাঁতের, বার করে তাতে পরালে। যুবক লাইটারে সেই সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটাও ধরালে। বললে, আমি জানলার এই চৌকাঠে। একটা ফটো নেব !

ঃ ফটো ? ও, হ্যাঁ, তা নিন। কিন্তু যুবতী নাক দিয়ে সরু সরু স্রোতে ধোঁয়া বার করে হোলডারটাকে মুখ থেকে সরালে। তো, আমি, আমি হচ্ছি গিয়ে জিতেন্দ্র মানে ছোট ছেলের মেয়ে। আপনি ? এটা কিন্তু একেবারে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে যে যেন আমরা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পরস্পরের পরিচয় নিচ্ছি। এই প্রথম বোধহয় (সে নিজেই বিস্মিত হল) এক যুবক আর এক যুবতী পৃথিবীর বয়স্কদের সাহায্য পাচ্ছে না এ বিষয়ে।

ঃ আমি, না জানি কে দিবা এনেছে, তোমার চোখে আকাশ, না, না বোধ হয় স্বর্গই। মানে আমি বড়ছেলের প্রথম স্ত্রীর, মণিমালা আমার মা হন, এ পক্ষের ছেলে। সুরঞ্জিত সেন।

ঃ সুরঞ্জিত ? মানে সি.এ. পরীক্ষায় ? (মনের চাপে তার গলা লাল হল) একটু বিব্রত হয়ে হোলডারটাকে ঠোঁটে বাখল।

ঃ আপনার ফটোটা এবার তুলি, অবিশ্যি যে আলো, সামথিং টু রিমেম্বার বাই।

ঃ না, না, তাই বলে তুমি অমন করে আমাকে দেখোনা। কি আশ্চর্য তুমি সুরঞ্জিত ? আমি, আমি রিনি। আলো কিন্তু বদলাচ্ছে !

এদের থেকে নিচে নেমে দোতলার একটা ঘরে বড় মেয়ে সুমতি তার স্বামীকে নিয়ে পৌঁছে বললে, এখানে একটু নির্জন তবু। বাব্বা, যেন খেলার মাঠ। এখানে বসি এস। হোক না সেকালের কায়দায় সিলিং থেকে ঝোলানো এই দোলনা। ছিঁড়বে না বোধহয়।

ঃ হুঁ। যেন প্রথম শ্বশুর বাড়িতে এসেছি। যাক গে, কাজের কথা শোন। আমি লাঞ্চের আগেই অফিসে যাব।

ঃ সেকি, তখন থাকবে না? এলেই যদি....

ঃ দেখব, দেখব। যাকগে মনে কর তোমরা কেউ চিনলে না ডালা খুলে?

ঃ ভেস্তে যাবে আবার? মৃত্যু প্রমাণ হবে না?

ঃ ভেবে দেখ, এতদিনে একটা চান্স।

মেঝেতে অসমান পায়ের চাপ দিয়ে দোলনাটাকে একটু দুলিয়ে দিলে সুমতি ঃ তাই বলে কার একটা ডেড্‌বডিকে বাবা বলে ডাকব? হতে পারে প্যাট্রিমনি, পিতৃধন, তাই বলে?

ঃ বেশ তো, অন্য সাইডটা দেখ। মনে কর ডালা খোলা হল, দেখা গেল সেই বডিটাকে তোমরা তোমাদের পিতৃদেবের বলে স্বীকার করছ না। তাহলে সেটা অন্য কারো। তাহলে তখন প্রশ্ন উঠবে কে বা কারা একটা বডিকে এখানে এমন করে গোপন করতে চাইছিল।

ঃ তার মানে? সুমতি আশঙ্কায় উঠে দাঁড়াল।

ঃ ঠিক যা আশঙ্কা করছ। অর্থাৎ তখন পুলিশে খবর দিতে বাধ্য।

ঃ অর্থাৎ টানাটানি, জেরা, খবরের কাগজে নাম ওঠা।

ঃ কেলেঙ্কারির একশেষ।

ঃ তাই বলে ডালা খুলে যা পাব তাকেই, যদি রাস্তার ভিখারিরও হয়, তার গায়ে হাত দিয়ে কাঁদিব!

সুমতির স্বামী শিকল ধরে নিজের ভারি শরীর টেনে তুলে উঠে দাঁড়াল ঃ চলো, এখন পথ চিনে নামি। আমি তো অন্য উপায় দেখি না।

বারোটা হয়। অবশেষে মণিমালা তার এ পক্ষের ছেলে সুরঞ্জিতের দেখা পেল, আর বাটিক শিল্কের পাঞ্জাবীতে আবার তাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করলে। একটু যে কষ্ট হচ্ছিল তা যেন কলকাতার কোনও কোনও অঞ্চলের বাতাসের মতো যা নিশ্বাসকে পীড়িত করে, যদিও কেন তা ঠিক বোঝে না। মণিমালা দেখলে সুরঞ্জিতের কাঁধ থেকে সরু বাদামী ফিতেতে ঝোলানো একটা বেঁটে পেট মোটা ফ্লাস্ক, এক হাতে গুটি কয়েক কাগজের গ্লাস, অন্য

হাতে একটা বাদামী কাগজের প্যাকেট। মণিমালা বললেঃ বাহ্, আমি তোকেই খুঁজছিলুম। থ্যাঙ্কু। ওটা কি কফি? এদিকে আয়। এ ঘরটাই নির্জন হবে। সুরঞ্জিত হকচকিয়ে গেল। সে তার মায়ের চোখে পড়তে চায়নি। তা হলেও সে মণিমালার দেখানো ঘরটায় গেল। মণিমালা বললেঃ আমার আর তোর দুজনেরই হবে তো?

সুরঞ্জিত আশ্চর্য হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে মনে মনে, আশ্চর্য, উনি কি বুঝতে পারছেন না যে কফিটা ওঁর জন্য নয়? কি করে বলি এটা তোমার জন্য নয়। বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, বাড়তি আছে। তোমাকে দিতে পারব। একটু বেশী বেশী এনেছি। মণিমালা মনে মনে বললে, তা তো বুঝতে পারছি যে কফিটা এনেছ সেই হলুদ সোয়েটারের বাস্টের জন্য। সে ভাবলে, কি করা যায়, এখন এর মধ্যেই, দেখ, বোধ হয় তার কাছে হেরে গেলাম। তাহলে কি বলব যার জন্য এনেছিস তাকে দিগে যা! অবশ্য বলা যায় এ বাড়িতে এখন কফি আর স্ন্যাকস্ এভাবে আনা কি ভাল হল?

সুরঞ্জিত হাসল। রক্তাভ হল তার মুখ। একটা কাগজের গ্লাস মায়ের হাতে দিয়ে বললে, ধরো।

আর মণিমালা সেই গরম কফি পাত্র ধরে নিতে নিতে ভাবল এরই মধ্যে সেই হলুদ বড় ফুলদুটিকে ঠুকরে মধু খাচ্ছে, আর ভেবেই মনে মনে বললে, ছি-ছি। এরকম কেন অনুভব করব? ছেলেরা বড় হলে....সুরঞ্জিত বললে, আচ্ছা, মা, ভাবছিলাম....

মণিমালা বললে, ব্যাপারটা কি জানিস। তোর সবে পঁচিশ হবে আর ওদিকেও দেখ তোর বাবা এতদিনে আবার নতুন করে বাড়িটাতে ডিকর টিকর পাল্টাচ্ছেন। বৈঠকখানার সেই দেয়ালে লতিয়ে যাওয়া ক্যাকটাস, আর লিভিং রুম আর তোর ঘরের মধ্যেকার সেই ব্যালকনিতে ঝোলানো সেই অর্কিড যার সাদা মোমের তৈরি পাপড়ি আর কমলা গর্ভমুণ্ডতে হলুদ পরাগকেশর।

সুরঞ্জিত ভাবলে, কিন্তু কার জন্যে? নতুন? তোমার কি পঁয়তাল্লিশ হয়ে যায় নি? ছি-ছি, নিজের মায়ের সম্বন্ধে মেয়েদের পঁয়তাল্লিশের সেই ব্যাপারটার কথা কেন মনে আসবে।

সে বললে, তা হ'ক না, তা হ'ক না। সে হাসল, বলল, আচ্ছা মা....

ভাবলে, কফিটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এ কি সম্ভব যে বুঝছেন না এই কফি

আর স্ন্যাকস্ ওঁর জন্যে নয়। স্ন্যাকস্ দিচ্ছি না, তাতে তো বোঝা উচিত। জেনে শুনে ভাগ কেড়ে নেয়া কিন্তু কম্‌প্লেকসের ব্যাপার হচ্ছে। ছি-ছি নিজের মায়ের সম্বন্ধে····। বললে : আচ্ছা, মা, একটা প্রস্তাব দেব। দেখ, তোমার ওই আস্ত বাড়িটা। তোমারই তো বাড়ি পঁচিশ বছর ধরে।

: তুমি বলছ, খোকা, ওখানে আমি আর তোমার বাবা গিয়ে থাকতে পারি ? কথা দিয়ে ফেলেছ নাকি ?

: মানে, ওখানে তো আমার দাদা, মিস্টার দত্ত, একাই থাকছেন, একা অতবড় বাড়িটায় ! অনায়াসে পার্টিশন করে দুটো পরিবার····তাছাড়া, মা, যদি মনে কর, এখানে একটা ফ্ল্যাট পেতে পারে দাদা, সে তো এই বংশের।

মণিমালা হারতে হারতে ভাবলেন, তুই বুঝছিস না, ও তো জিতেন্দ্রর মেয়ে, মায়ের মতোই ধুমসী হবে আগামী দশ বছরে। অত টাইট স্ল্যাকস পরার কারণ কমিয়ে দেখানো, আর তোদের অল্পবয়সী চোখে সেটাকেই লোভনীয়, ছি-ছি মা হয়ে এসব····

ছোটমেয়ে মেখলার স্বামী বাঁয়ের অপেক্ষাকৃত নির্জন সিঁড়ি ধরেছিল, অধিকাংশই ডান দিকের দিয়ে ঘুরছে। মেখলা তার মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে পেরে বললে, একটু আস্তে চল, একটা জায়গাই কি আছে পরামর্শ করি, এদিকে দেখ একটা বাজতে চলে। এলেও তো কত দেরি করে।, ওদিকে দেখ গণ্ডায় গণ্ডায় লোক আসছে। বাবার কি একশ'টা বউ ছিল ?

তার স্বামী হেসে বললে : বুনো ওট্, বুনো ওট্। দেখো আলোটা কেমন এঘর থেকে ওঘর, এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা আলোটা পৃথক এমন কি এ ল্যান্ডিং থেকে ও ল্যান্ডিংএও আর তোমাকে যা····

: থাম, আজ ওসব রসিকতা ভাল লাগে না। বরং একটু ভাবো।

: নাও, এইখানে কেউ নেই, কি বলবে বলো। সে লম্বাটে ঝুল বারান্দার রেলিং হেলান দিয়ে দাঁড়াল যার নিচে একতলার বাগানটা চোখে পড়ছে।

মেখলা বললে : আমার তো মনে হয় অ্যাটর্নি কিছু গুবলেট করেছে।

: অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমি গুনে দেখেছি, খুব বেশী হলে পনেরো-জন এসেছি তাও সেকেন্ড জেনারেশন ধরে। একশ ট্যাকশ নয়। আর ফার্স্ট জেনারেশনকে ডিঙিয়ে সেকেন্ড জেনারেশনকে উইল করে সাধারণত কেউ দেয় না।

: থাম। দেখেছ ওই কমলাকে, ওই মণিমালাকে। মণিমালার, তবু তো

বলতে পারে, দাদার দরুন ছেলে আছে। কমলা কে বলো তো ? কি ? না— ছোড়দার শালাজ। ফোন করেছিলে ?

ঃ কোথা থেকে করব ? তুমি কি ভাবছ এখানকার ফোন কানেকশন বিশ বছর আগেই কেটে-টেটে দেয় নি ? এই দেখ এরই মধ্যে আমাদের চারিদিকে আলো বদলে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্সের কৌশল মনে হচ্ছে।

ঃ তাহলে অ্যাটর্নি কোথা থেকে ফোন করলে ?

ঃ সেটাই তো প্রশ্ন, যদি এই সোজা উত্তর না হয় যে তার একটা অফিস আছে যেখানে ফোন থাকা সম্ভব।

ঃ বাহ্, নেই বা তা থাকলেও এখানকার কথা জানছে কি করে ? স্বপ্ন ? এদিকে একটু মন দাও তো, এঞ্জিনীয়ার মশাই।

ঃ দূর, দূর। তা হলে কফিন, কফিনে ফুল এসব কোথা থেকে ?

ঃ তুমি একবার সেন্ট টেরেসার হোমে যাবে ?

ঃ এদিকে উইলটা পড়া হয়ে যাক আর কি !

ঃ ভাল বলেছ।

ঃ তা ছাড়া, কি হবে ? হোমে যারা পঁচিশ বছর তাদের কি আর পৃথক নাম, ধাম, পরিচয় বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকে ? এমন কি পৃথক চেহারাও ? না কি তাদেরই মনে থাকে তারা কে ? (সে হাসল। পাইপ ধরানোর যোগাড় করলে।)

ঃ তা হলে ?

ঃ তুমি, বাপু, ছোটমেয়ে। চুপচাপ উইলটা শুনে যাও। দরকার মতো প্রোবেট নেয়া যাবে।

ঃ মন্দ বলনি। মানে আমাকে হয়তো দুতিন না হক ছ'বছরের শিশু হিসাবে দেখেছেন, তখন তো ভালো নামই থাকে না। ফলে যদি উইলে অসুবিধা হয় কনটেস্ট করা যাবে। প্রমাণ করতে বলা হবে কফিনে কে ?

তার স্বামী বললে ঃ আমার মনে হয় ফাইবার গ্লাসের ডোমটার ভিতরে যন্ত্রপাতি, তা ছাড়া এঘরে ও ঘরের দরজা জানালায় অদৃশ্যপ্রায় ইলেকট্রোড্....

সাহস করে রওনা হয়ে মাঝপথে থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা হল কমলা রায়সিন্হার।

ঃ আচ্ছা, অনিমেষ এই কমলা সম্বন্ধে, রায়সিন্হা তো, তুমি কি পরে জেনেছ ?

বরং অবস্থাটা বলি ঃ যেমন সংবাদটা শুনে তার মা বলেছিল, যাবে ? তা একদিক দিয়ে····আসলে তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন তো। তুমি একবার দেখে থাকবে, আর আঙকল্‌ বলতে। কিন্তু এখানে এসে ? হয়তো চেপে চেপে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো আর একটু জানা যেত। দোতলায় সুমতি, বড় মেয়ে, তাকে দেখেই যেন দুহাতে মুখের অনেকটা আড়াল করে সিগারেট ধরালে। কিন্তু কমলার মনে হল সুমতির একটা চোখ প্রশ্ন করলে, তুমি এখানে কেন ? তারপরই অবশ্য সুমতি হাসল, এক হাতে সিগারেট অন্য হাত বাড়িয়ে বললে, চিনেছি, জিতেন্দ্রর কুটুম্বিনী। কমলা তাকে এড়িয়ে বরং বাঁয়ের দিকে ঘুরল এই বলে, মিউজিয়ামের মতো নয়, এ দিকটা দেখি ; কিন্তু সিঁড়িতে মেখলাকে দেখতে পেলে। মেখলার চোখ দুটি সোনালি-সবুজে। মেখলা না-দেখার ভান করলে, তারপরে একেবারে অবাক হল। তারপরে হেসে এগিয়ে এল, বললে, আরে, আরে, আপনি। সেই বোধহয় পনেরো বিশ বছর আগে তাই না ? সেই পিকনিক না কি ছিল। আপনি তো সেই গুপ্ত মানে জাস্টিস্‌ গুপ্তর মেয়ে। ঠিক ধরেছি, আর এদিকেও বোধহয় ছোড়দার····

ঃ হ্যাঁ। উনি নন্দাই। দেখুন তো কি কাণ্ড ! কেন যে বারবার আমাকে আসতে বললে। কমলা ঝরঝর করে হেসে হীরের আংটিপরা ডান হাত তুলে যেমন অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে দাঁড়ায়, বাঁ হাতের হীরার বালার নিচে কবজি-টাকে ধরলে। খিল খিল করে হেসে বললে ঃ দেখুন তো কাণ্ড ! মুখ শুখিয়ে বললে ঃ তা হলেও মৃতের ইচ্ছাকে মানতেই হয়। কিন্তু দেখতে পেলে সেকালের একটা কাঠে ফুল লতাপাতা খোদাই লিফট ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে কেঁপে কেঁপে নামছে। তখন অপ্রতিভের ভঙ্গিতে হেসে সে বললে, মিউজি-য়াম তো, আগে দেখেই নিই। সে তাড়াতাড়ি লিফটে উঠলে। আর তারপর সেই কফিনের হলে। ছেলেটাও দেখ আজ টকটকে লাল টিশার্ট সাদা ট্রাউজার্স আর কোলহাপুরীতে কেমন সেজেছে। আর সকালেই এত খেয়েছে যে, অবশ্য ও জানতো না এখানে আসতে হবে। কিন্তু গেল কোথায় ? ওই মেয়েটাকেই। যার হলুদ গলাবন্ধ সোয়েটার আর নীল স্ল্যাকস্‌····। সে তো নিজের কানেই শুনেছে সে জিতেন্দ্রর মেয়ে। হয়তো চিত্রকর, কিংবা সাংবাদিক, কিংবা তেমন একজন যে পৃথক ফ্ল্যাটে থাকে একা, হয়তো এয়ার হোস্টেস যে নাকি দারুণ কোন শীতের দেশ থেকে কয়েক ঘণ্টা হয় ফিরেছে। এখন কমলা রায়সিন্‌হার এই অবাক লাগছে সেই বাইশ

তেইশ বছর আগে সে রকম ঘটনা সে কেন ঘটতে দিয়েছিল। এদিকে দেখ জিতেন্দ্র পঞ্চাশ ছুঁতে না ছুঁতে পেশ মেকার নিয়েছে।

বেলা একটা বাজে। যতীন্দ্রর স্ত্রী দোতলার সেই হলটায় দাঁড়াল যেখানে বুফে লাঞ্চ হবে। হোটেল থেকে একটা ছোকরাই এসেছে যে কোথায় খাবার রাখবার টেবিল পাতবে তার ব্যবস্থা করছে এঘর ওঘর থেকে ফারনিচার টেনে এনে। যতীন্দ্রর স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিতে দিতে ভাবলে, দেখ, কাণ্ড। সত্যি রায়সিনহারা এসেছে। বেশ ছেলেটি। তো অন্তত একটা পক্ষ যাদের মনে শেয়ারের কথা উঠছে না। এটাও ভাল দেখাচ্ছে যে মৃতের দূরদূর কুটুম্বদেরও কেউ এসেছিল। এদিকে আর সকলে কোন ঘরটা নেবে ভেবে—আর মণিমালাও দেখ,...যতীন্দ্র আসতেই সে বললে, তোমার কি মনে হয়?—কোন্ অংশ কে পাবে তা উইলেই বলা থাকবে? না নিজেদের ঠিক করতে হবে? দেখা যাক, দেখা যাক, বললে যতীন্দ্র। সে হাসল, বললে আবার, যদি এমন হয় আমাদের ডিঙিয়ে নাতিনাতনীদের দিয়ে গিয়ে থাকে?

ঃ বলো কি? সে তো গোলমেলে। কিন্তু সব নাতিনাতনীর কথা জানবে কি করে?

ঃ ঠিকই তো অনিমেষ, যেমন ধরো মণিমালার বড়ছেলে, মানে, তার কথা জানতো বোধহয়।...যাক, যাক, এদিকটা ঠিক কর আগে।

এতো খুব সোজা কথাই, ভাবলে মিসেস রায়সিনহা, যে এরা কেউ ডাকেনি তাকে। এখানে এটা খুব সহজ কথা ছেলেমেয়েরাও গত পঁচিশ বছর কোন সম্বন্ধ রাখেনি। ফলে তারাও প্রকৃতপক্ষে নিসম্পর্কিতের চাইতে এমন কি বেশী। সুতরাং তারই বা নিজেকে ইনফিরিয়ার মনে করার কি আছে! সে একটু অবাক হয়ে গেল। আরে ছবিটা। তার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে উঠল। সে দেয়ালে একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখে এসেছিল হঠাৎ সেটা একটা মানুষের ছবি হয়ে গেল। সে পিছিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে তাকাল দেয়ালের দিকে তখন আবার ল্যান্ডস্কেপটাকে দেখতে পেলে। সে হাসল। দেখো, ব্যাপারটা সেই পুরনো কায়দার ত্রিডাইমেনশ্যনাল যার ফলে একই ছবি সরে সরে দাঁড়ালে দুরকম দেখা যায়। একেবারে ছেলেমানুষি রুচি।

চারতলার একটা ঘরে সুমিতি আর মেখলার দেখা হয়ে গেল। মেখলা বললে, তোমাকে খুঁজছিলাম দিদি। কোথাও বসলে হত না।

ঃ এখানে বসবি ?

ঃ মন্দ কি। ঘরটাকে একটেরে লাগছে। মেঝেতে ধুলো দেখ। লোক কম হাঁটছে এদিকে। মেখলা এই বলে হাসল। সুমীত একটা চেয়ার পেয়ে বসে বললে, বল্। কিছু ভেবেছিস ?

ঃ শেয়ার টেয়ারের কথা থাক। সে তো উইল শোনার আগে বোঝা যাবে না। তা হলেও একথা ঠিক আমাকে তোমাকে একদিকে থাকতে হবে। নতুবা ছোট বউ আর বড় বউএর লোভ ঠেকানো যাবে না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। আমরা দুজনে মিলে যদি দাদাকে রাজি করাই যে কফিন খুলো না।

ঃ লোকে সন্দেহ করবে না ?, বলতে পারে মৃত্যুই প্রমাণ হয় নি। আর তা প্রমাণ না হলে কোর্টে কেউ বাগরা দিলে ?

ঃ আমরা যদি বলি আমরা দুজনে গোপনে দেখেছি। সে এত বীভৎস যে আমাদের ফিলিংসকে সম্মান করতেই আর খোলা উচিত নয়।

ঃ তোর কি মনে হয় গ্যাংগ্রিনাস্, নাকি, বেশ কয়েকদিনের পুরনো! কিংবা····

ঃ বলো না কি কিংবা····

ঃ যদি কিছুই না থাকে ?

মেখলা বুঝতে চেষ্টা করলে সুমীত তাকে পরীক্ষা করছে কি না। বললো, দেখ, দেখলে তো, তোমারও মনে। তা কি একেবারেই অসম্ভব ? এমন যদি হয় যে অনেকদিন থেকেই কফিনটা সাজানো। আজকের তারিখই ঠিক করা ছিল উইল পড়ার জন্য। মৃত্যু এই সময়ের মধ্যে হয়ে যাবেই এটা ধরে নেয়া ছিল। হোমে পঁচিশ বছর পরে যা অবশিষ্ট থাকে সে নিজেকেও চেনে না, অন্যেরাও তার নাম ভুলে যায় ফলে সেখানে যে মৃত্যু গুলো তা কার কে তার খবর রাখছে বল। সেখানে কিছু ট্রেস হবে না।

ঃ তুই বলছিস সেই পঁচিশ বছর আগে হোমে যাওয়ার আগেই অ্যাটর্নিকে বলে গিয়েছিল আজকের তারিখে উইল পড়তে হবে সকলকে ডেকে ? তা হলে····সুমীতির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

ঃ বলো আমাদের দুজনকে একপক্ষে থাকতে হয় না ? মেখলা কথাটা বলতে গলা নামিয়ে আনলে।

ছ'তলার একটা ঘরে পায়ে পায়ে চলছিল মিসেস রায়সিন্হা। মনে মনে হাসছিল, দেখ সবাই দুদ্দাড় করে বাঁয়ের সিঁড়ি ডাইনের সিঁড়ি বেয়ে

উঠছে। সে কিন্তু লিফট্‌টাকে আর একবার ব্যবহার করলে এই উপরে আসতে। হয়তো কেউ উপর থেকে নিচে নামতে লিফট তুলেছে বোতাম টিপে। তো, এটা কিন্তু খুব কৌতুকের হবে যদি ইন্দ্র পাঁচের এক শেয়ার পেয়ে যায়। ঘরটা বেশ বড়ই। আর অনেক সুইচ যেন দেয়ালে। অত সুইচ দেখে আশ্চর্য মনে হওয়ায় আলো ফ্যান ইত্যাদির পয়েন্টগুলোকে সে মনে মনে গুণলে।

ঠিক এই সময়েই সে ইন্দ্রকে দেখতে পেলে পাশের ঘরে। সে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। বেশ বুড়ো লোকটি, ভ্রূ পর্যন্ত পাকা, অস্বাস্থ্যের হলুদ রঙের ফুলো ফুলো মুখ, চোখের কোলে জলের থলি। ময়লা, ইস্ত্রিলেপটানো, কালচে ধরা নীল জাতের সুট, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে।

ইন্দ্র বললে, তো, মাই ডিয়ার স্যার, আপনি হয়তো এ বাড়ির কেয়ার-টেকার কিংবা অ্যাটর্নি'ই বটেন। আপনি কি কাইণ্ডলি বলবেন এই ছ'নম্বর তলাটাই আমাদের শেয়ারে পড়েছে কিনা ? আরে না, মশাই, বিশ্বাস করুন, এতটুকু। গন্ধ পাচ্ছেন ? তা অন্যদিন আমি ব্রেকফাস্টে, হ্যাঁ মশায় তা করা হয়ে থাকে, বোতলই মাইরি। ইন্দ্র একটা লালে সাদা আর বাদামী ফোঁটা দেয়া রুমাল বার করে মুখ আর ঘাড় মুছল।

মিসেস রায়সিন্‌হা দেখলে ইন্দ্র কথা যত বলছে হাত দিয়ে ইশারা করছে তার বেশি। সে বললে, আ, ইন্দ্র প্লিজ প্লিজ।

ইন্দ্র পিছন ফিরে কমলাকে দেখলে, বললে, কে ? আরে মম্‌! (হাসল) তো, মা, লেম্মি ট্রুডুস্‌। মাদার, যাকে মা বলে। আর ইনি, মামী, আমার ধারণা এ বাড়ির কেয়ারটেকার কিংবা সেই অ্যাটর্নি। সবই ভাল। শুধু কথায় 'ব'-এব মাত্রা একটু বেশি। এ পর্যন্ত শ'দেড়েক 'বু' ছাড়া আর কিছু বলেন নি। তো, স্যার, এবার বলে ফেলুন কি সুবাদে এই অধম, তোমার গে, ওয়ারিশ।

কিন্তু ইন্দ্রর মন অন্যদিকে গেল। সে দেখতে পেলে হাল্কা অ্যাম্বার দেয়ালের গায়ে সাদা একটা প্যানেল ফুটে উঠছে আর বুড়ো সে দিকে ঝুঁকছে। যেন প্যানেলের পিছনে কেউ একটা স্ক্রল ঘোরাচ্ছে আর বারোতলা বাড়িটার বিভিন্ন ঘর ফুটে উঠছে। খুব চাপা হলেও সে সব ঘরের মানুষদের কথা শোনা যাচ্ছে। সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। কথা বলতে গাল ফুলল বাতাসে। বললে, ও, বাব্বা। এ যে দেখছি ক্লোজড্‌

সার্কিট টিভি, আর সাউন্ড বাগিং। দেখ, মম্, কি কল! সি.আই.এ'র উপরে মাইরি। ওকে কেউ দেখছে না, বুড়ো সব দেখছে, কেউ ওর বুবু শুনছে না, ও সবার শলাপরামর্শ শুনে রাখছে। না, স্যার, অশ্রদ্ধা নয়, মাইরি। তা, সার, আমি একটু বে-এক্তিয়ার বটে। তো, আমাদের মডার্ন সাইকাইয়াট্রিস্টরা বলছেন মদে থাকা একটু ভালই, একটা কমপ্লেক্স আছে কিনা। তা, স্যার, কাইন্ডলি বলবেন? মানে আপনার বুবুগুলোকে কমিয়ে....

মিসেস রায়সিন্হা বললেঃ তুই কি বলছিস খোকা? কোথায় কাকে দেখছিস? কোথায় প্যানেল? এটা বোধ হয় কোন থ্রি-ডাইমেনশ্যনাল ছবি।

ঃ আচ্ছা, অনিমেষ, সেটা কি বলবে থ্রি-ডাইমেনশ্যনাল ছবি ছিল, এদিক ওদিক সরে দেখতে গেলে যা বদলে যায়। মানে সামনের ছবিটা সরে গিয়ে যেন পিছন থেকে আর একটা ছবি ভেসে ওঠে। কিংবা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়।

ঃ হয়তো ইলেকট্রনিকসের কৌশল। ছোট, পুরনো, রোজউডের কারুকার্য করা সেই লিফটটা ওঠানামা করছিল। মনে হয় না যে অ্যাটর্নি ইলেক্‌ট্রিক কানেকশন কাবিয়ে নিয়েছিল অন্তত সেদিনের জন্য। ওদিকে ঘরে ঘরে যে রং বদলাচ্ছিল সেও ফাইবার গ্লাস ডোম থেকে চোঁয়ানো মেঘের ছায়া হতে পারে। হয়তো রেকর্ড করা টেপও ছিল এ ঘরে ও ঘরে।

ইন্দ্র মায়ের কথা না শুনে বরং উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনতে লাগল। বললেঃ কে বললেন, স্যার? মানে, আমার মা আপনার আত্মজা, ওয়ান ফিফ্‌থ পাচ্ছে। মাই পশ্। তা কি করে হয়? আমার দিদিমা সে তো গুপ্ত জজের বউ, বাঃ জাস্টিস্ গুপ্ত অব মেনি কমিশনস্। ওহো হে হে হে করে হাসল ইন্দ্র। তা, মশায়, ক্যাপটেন নিমো, বুঝেছি, লজ্জায় ফেললেন। তো, আপনি, দেখছি, পঁয়তাল্লিশ বছর আগেই আমাদের মতো মডার্ন ছিলেন। আরে ভ্যানিশড্!

লিফ্‌ট নামার মত শব্দ হল বটে একটা।

তখন দুটোই হয়। কথা মতো সকলে দোতলার হলে বুফে লাঞ্চে সমবেত হয়েছে।

ঃ আচ্ছা, অনিমেষ, উইলটা কি টেপ রেকর্ড করা। খুব ছোট, শুধু কয়েকটা নাম আর কত অংশ পাবে বলে দেয়া। আসলে ছ'তলার সেই

ঘরটাকে খুঁজে পাওয়াই সমস্যা! নাকি বলতে চাইছ সকালে এক বোতল হুইস্কি ভিতরে যাওয়াও চাই।

আমার অল্পবয়সী বন্ধু অনিমেষ বললে, লিফ্‌টটা যেখানে একতলা ছোঁয় সেখান থেকে কফিনের হলে আসতে বাগানটাকে পার হতে হয়। এক বুড়ো, যার মুখ অস্বাস্থ্যে হলুদ আর ফোলা ফোলা, চোখের তলে জলের থলি, পরনের সুট ইস্ত্রি লেপটানো আর যথেষ্ট পুরনো, লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে সে বাগান পার হয়ে কফিনের ঘরে ঢুকল। অবাক হল যেন কফিনটাকে সেখানে দেখে। পকেট থেকে বাদামী হয়ে যাওয়া এমন পাকা একটা ছোট পেয়ারা বার করলে। সেটাকে খেতে খেতে হল থেকে বাইরে এসে বারান্দায়, বারান্দার থেকে সিঁড়ি বেয়ে বাড়ির সামনের ফুটপাতে নেমে গাড়ির ভিড়ে হকচকিয়ে গেল। রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য তার নিষ্প্রভ চোখে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। তাকে অবশ্যই কেউ লক্ষ্যে আনলে না। একটা দামী গাড়ি তাকে ধাক্কা দেয় আর কি।

অনিমেষ সোজাসুজি তাকাল। তার সামনে স্টেজফ্রণ্টের মতো চওড়া দরজাটা যা দিয়ে গোল গোল থামের ভাব উইংসের মতো, স্কাইএর মতো খিলানের ভাব। বাগানটা পর্যন্ত চোখ চলে যায়। আর দেখতে দেখতে একটা দুটো, তিনটে, পঞ্চাশটা লিলি, সাদা, পাটকিলে, হলদে, এমন কি নীল ফুটে উঠতে লাগল আগুনের মতো। একটা লম্বা ডাঁটে একটা বেগুনি আইরিস ফুটে উঠতে দেখে অনিমেষ বিহ্বল হয়ে গেল।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

জবানমুক্তি ঃ দারিদ্র্যরেখার নিচে

(নিচে একটি উপন্যাসের খসড়া, উপন্যাস একটি জীবনের খসড়া।)

● ওভারল্যাপ

হারাধনের এখন ঠিক ক' ছেলে আমি জানি না। হারাধন যে এতোদিনে বিবাহিত বোনেছে তা নিশ্চয় করে বলা যায় এখন তো নয় বরং দ্যাখা গ্যালো হয়তো সে বিবাহউত্তরে নিরিবিলি বছর পার করতে ভালবাসে কিংবা এখনো বিয়ে চেনেনি তবুও ভবিষ্যতে যদির কথা বিবেচিত হোলে সে 'আমার — ছেলে', এভাবে কাউকে পরিচয় দেবে কিনা আর দিলে এই শূন্যস্থানে কোন্ সংখ্যাটা সম্ভাব্য হবে এসব আদৌ আমি জানিনা, বাস্তবিক জানার কথাও নয়। কেননা বোঝাপড়া ছিল তার সাথে আমার সেই স্কুল সময়কার। ক্লাস ঝাপটে বেরিয়ে পড়ে মাঠেই বোঝাপড়াটা আমাদের গতিময় হোয়ে উঠতো প্রখর জ্যামিতিবোধে, ব্যাক থেকে ওপ্রান্তে উঠে গিয়ে দুর্দান্ত ফরোয়ার্ড হারাধনের সাথে বল দেওয়া-নেওয়ায় লাট খেয়ে যেতো বিপক্ষ দুর্গ, মাঝে মাঝেই বোঝাপড়ার ফসল উঠে আসতো শানানো স্কোরে। হারাধন এখন আমার যোগাযোগে নেই। বলে পা ছোঁয়ানোর বয়স সোয়ার্ভে পার হয়ে গ্যাছে। অথচ এখনো বাকী রয়ে গ্যাছে হারাধনের সাথে আমাদের নিখুঁত বোঝাপড়া, পেনাল্টিবক্সের ভিড়ে মাঝে মাঝেই আমি হারাধনের মাপা থ্রু পেয়ে আর সেই পুরোনো দিনের ধরনে কোমর মোচড়ে ঠিক অব্যর্থ অনিবার্য লাথিতে "লেনিন আমিই"-বুকে দপাল্দিত লেনিন হোয়ে উঠি।

এসব, সেদিনকার যৌথ বোঝাপড়ার হারাধনের অর্ধেক আর আমার অর্ধেক, আমি নিজে, নিজে পাছা ও শিরদাঁড়ায় স্থির থেকে টের পাই, এখনো সম্পূর্ণ। হারাধন একদা ছিলো। নেই এখন। 'রইল বাকী' তবে একের দুই যুক্ত একের দুই।

আসলে হারাধন কোনো না-ব্যাপার, যা নিয়ে সাম্প্রতিক যোগেন যে বিব্রতবোধ করে, তা অই 'রইল বাকী' নিয়েই তো!

● দারিদ্র্যরেখার নিচে যোগেন ঃ a bone symphony

সে দরিদ্র নয়
বরং এতোদূর জেনে সে কখনো কোনোভাবে বোঝেনি
আপনার মাথাপিছু দারিদ্রে কতোদূর ছন্নভন্ন হোয়ে
থাকে শুক্রবারের দ্বীপ অথচ
এক দরিদ্র এই চাহিদায় সে
শান্ত হয়তোবা স্থিতিস্থাপক।

যোগেন স্থাণু। আবাদযোগ্য যাবতীয় পতিত তার সামনে। টাঁড়, চারণযোগ্য যা কিছু, নীট সেচের জমি, খারিফ মরশুম—নিবিড় চাষ প্রকল্পের সামনে সে। যে হাওয়া তাতে রবার বাগিচার ক্ষত ঝরে আসছে, রবি মরশুম তার পারিশ্রমিক পেয়ে গেছে—মেস্তা, শন, কার্পাস, ওট, আল্ফালফা। এখন কোথাকার বুনো আকর্ষ তাকে জড়িয়ে, পিষে ওপরে উঠতে চায়, মাথা নীচু কোবে যোগেন দ্যাখে। ইক্ষুকণার ক্ষয় গলে পড়ে ঠোঁটে। ঘ্রাণের অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা এলাচ। সে অনুসরণ করে।

।। ফার্স্ট সিম্ফনী ।।

ভিশানে ডিটেলস্ না এনে এভাবে বাক্য নির্মাণ, যোগেনের ব্যাপারে একেবারে আকস্মিক বলা চলে না। বরাবরই টেলিগ্রামের ধরনে যোগেন লিখে থাকে। ছোটো ছোটো বাক্যে—কর্তা ঃ কর্ম ঃ ক্রিয়া (SOV) প্যাটার্ন একবারো ঠিক রেখেছে এতোদূর বাহুল্য অবধি খুঁজে পাওয়া যাবে না, নানা কোণে লেখা (কেবল) পোষ্টকার্ড আর ডায়েরীর চালু না থাকা পাতায়? যেনো সত্যিই শব্দ বেড়ে গ্যালে টেলিমাশুলের সাড়ে তিনটাকা থেকে লম্বা লাফ কিংবা সে তার মিনিট তারিখ নিয়ে মহা মজে আছে। অথচ ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে তার মজে ওঠা সময় নিয়ে যোগেন ব্যস্ত না হোলেও মজেই তো থাকতো। কতোবার তাকে বলা হোয়েছে ঃ যোগেন তোকে দেখলেই মনে পড়ে, 'আমের ক্ষেতে স্থান-কাল অর্থহীন'। প্রথম দিকে সে হেসে উঠেছে—কেনো, আমি চিকো কালো কাফ্রী/সোনারোদে আম কাটি মুঠি মুঠি। বস্তুতঃ এসব যখোন সে হাসির পরিপূরকে

রাখতো, সেসব সৈনিক অবস্থান তখোন সদ্য জীয়ানো অতীত, মাঝে মধ্যেই কথার ফাঁকে ন'ড়ে উঠতো, ন'ড়ে উঠতো গামলার জলে খলবল কোরে আধপোষা জীয়ল মাছের ধরন। বনবাদারে-গাঁ-গেরামে 'কমিউনিস্ট রেভ্যুলিউশনারি' (সত্তর দশক গ্যাছে, 'নকশাল' বিশেষণ তাঁদের পছন্দ নয়, বরং বিশেষণের বিশেষণে কি বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া আসে ?) হোয়ে দাপিয়ে ওঠার কালে সে আঁ-আ-আড় কোরে উঠেছিলো কিনা কিংবা পরে বছর কয়েক কেন্দ্রীকতা বনাম গণতন্ত্র নাকি সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘু ব্যাপারে মগজ ঘুলিয়ে উঠে সে বুকে রেলিং চেপে পার্টিকার্ড (নং ৯৭২৫) ব্রীজের তলায় জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলো কিনা, তেমন কোনো প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি, আজো। তখোন যোগেনের সময়কে প্রসঙ্গ কোরে ওঠা যায়নি, বরং সেসময় স্যাভেজ ব্লেড, ব্লেডের ধার, তাতে ঘোড়ার প্রতিচ্ছায়া আবার নামটা স্যাভেজ এবং এযাবৎ ছিলাটান যোগেনকে আমরা একই সঙ্গে মিলিয়ে উঠতে পারতাম না। সহজাত জব্দ জাপটে ধরতো প্রশ্নে। পরে বুঝেছি, হ্যাঁ স্যাভেজই তো।

বলা চলে যখোন থেকে সে আর ৯৭২৫ নয়, ঠিক সে সময়, যোগেনের মাথার ভেতরে সময় পাখা ঝাপটাচ্ছে, যে পরে আলসেয় ঝুপ কোরে বসে।

দিন আসবে। যোগেন অপেক্ষা পোহায়। তার দলিলের জবাবী উচ্চতর কমিটির বৌদ্ধিক প্রস্তাব, আহু কবে যে ? সময় তখনি তার ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে বোলেছিলো 'রে নিষাদ', শোনেনি কি ? শুধু তাই কেনো, সেই ক্ষিপ্র না-স্থির যোগেনের মগজে গুঁজে দিয়েছিলো একটা গোটা বছর তারে মেলে দেওয়া ফকফকে হাওয়ায় সাদা ফতুয়া যেমন। রাস্তাঘাটে যোগেনের সাথে উচ্চতরদের দ্যাখা হয়ই তবে তা ম্যানডেট শ্রবণের জন্যও বৈকী, হাসির শ্রবণের অন্ধ ঘুঁজিতে মুখ গুঁজে রাখা ঐ গোটা বছর, বেপথু যোগেন ও পথিকদের আড়াআড়ি ক্রমে পর্যটনময় হোয়ে উঠলে যোগেনের মনে পড়ে নকশালবাড়ী নিয়ে দ্বিতীয়-ধারার গল্প, তাতে ততো প্রথমধারার মতো আতস অদৃশ্য। (১ম ধারায় নকশাল সন্দেহে পুলিসের গুলি) আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে ফিরে এলে তখনো যোগেনের দিনগোনার পালা। বাঘ আসবে কাগজের। তারো সাথে কিছু বোঝাপড়া থাকে হাজতে—ইনটারোগেশানে। প্রথমে দিন গ্যালে কিছু রহস্য গ'ড়ে ওঠে, রাস্তাঘাটে আই.বি. তাকে স্নেহদৃষ্টিতে রাখলেও কাগজের বাঘ আর আসে

না। অথচ ঘটনাটা, মানে ধারণাটা, মানে ধারণাটা ঠাকুমার মিথের মতোই রক্তে গেঁথে আছে, তবু বন থেকে না হোক্ থানা থেকেও বাঘ আসে না, ক্রমে ব্যাপারটা বিরক্তির পর্যায়ে পেঁছালে সে অচেনা ও.সি.'র উদ্দেশে, সকালে দরজার খিল খুলে, চিৎকার কোরে ওঠে প্রায়ঃ ওহ্, আপনারা এতো দেরী করেন, কেনো বোলুনতো ? কে জানতো জবাবটা ঐ কাগুজে বাঘ নয়, পরে, বছরখানেকে ঘুরে আসবে তারই সংঘকোণ থেকে, একইভাবে।

তা আমি যে কথা বোলছিলাম, এই সময়েই যোগেন দ্যাখে তার অপেক্ষাগুলি অনেক কপালের তলায় প্রাচীন শীতে স্তব্ধ গন্ধকের মতো র'য়ে গ্যাছে। অপেক্ষাগুলি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে এরপরেই যোগেনের সময় মজে ওঠে, বছর কাটতে থাকলে আমাদের সাথে দ্যাখা হোলে এখন কেউ যদি বলে ঃ যোগেন, আমের ক্ষেতে স্থান-কাল অর্থহীন। যোগেন আর হাসে না, আবহমান হোয়ে বোলে ওঠে ঃ কেনো, বেশ আছি। এর আগেবধি যোগেনের সময়কে প্রসঙ্গ কোরে ওঠা যেতো না, তবে আজ যাচ্ছে। অবশ্য মিনিট-তারিখ নিয়ে হামলে পড়া আমাদের—সকাল ঃ সুপারফ্রেশ + আবহবার্তা, সাড়ে সাতটার খবর + পেচ্ছাপ-পায়খানা, আটটায় সেভিং + মালহোত্রা অ্যানড্ পামোলিভকা জবাব নেহি, অরণ্যদেব + খেলারপাতার সাহিত্যপনা, রবীন্দ্রগীত + টাটাসোপ + স্নান, ভাতখাওয়া + পরবর্তী রিজেণ্ট কিং ; দুপুর ঃ হাজিরা + ক্যাসুয়াল লিভ, ফাইল + নিক কার্টার If I am wrong I apologize……ক্রমশঃ ফলোঅন ঃ যেভাবে স্থান-কাল-অর্থময় সময় পিস্তলের দাঁড়ে বোসে পাখা ঝাপটে ওঠে, তাতে যোগেনের সময় নিয়ে প্যাথলজি চলে নাকি। বরং আমাদের নাগাল থাক, যোগেনের সময় ঝুপ কোরে আলসেতে বসবার কালে যে ধুলো ন'ড়ে ওঠে —সেটুকু। কেননা সিম্ফনী সেই শুরু হোলো। প্রথমে বোলেইছি তো —'মাথা নীচু কোরে যোগেন দ্যাখে'।

॥ সেকেণ্ড সিম্ফনী ॥

যোগেন কি নিজে ঐ ন'ড়ে ওঠাটুকু দেখেছিলো ?

প্রতিটি প্রশ্নই এক ধরনের অনুরোধ। কেননা যে অনুমান বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই যুগল অভিজ্ঞতার অংশ, সেবিষয়ে জানার জন্যই বক্তা প্রশ্ন কোরে

থাকে, অর্থাৎ সেই অনুমানকে নিজেরা অভিজ্ঞতায় তুলে নিতে চায়। তবে অনুরোধটা ছিলো আমার নিজেরই দিকে, জিজ্ঞেস করা হয়নি।

তখোনো 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী' পড়েনি যোগেন (তবে কারো মুখে গল্পটা শুনে থাকবে)। একবার হাওয়াই চটি কিনে ফিরে আসতে দোকানের ঝুপসি শোকেসে আট টাকায় হেলে রয়েছে, বাংলায়, দেখেছিল সে এই ভেবে, তবে কোনো একদিন এসে নিয়ে গেলেই হবে। কোনো একদিন এসে তার নিয়ে যাওয়ার আগে অগাস্টের এক বিরোধহীন পাঁচ তারিখ এসে পড়ে। সেরকম ধারাবাহিকতা যোগেনের দিনগুলির মধ্যে তখনো আর ছিলো না। মিনিট তারিখ নিয়ে তখনো পক্ষপাতহীন যোগেনের দিনকাল ধারাবাহিক না হোয়েও অনন্ত কিংবা অনন্ত হোতে গিয়ে ঐ ক্রমশঃ। এরকম পাঁচই আগস্টে সেও ক্রমশঃ হয়, হোতে থাকে।

খানিকটা বৃষ্টি হোয়ে যাওয়ায় রাস্তায় জল এখানে ওখানে। জলছাপ রেখে গ্যাছে ম্যাজিক ধারাবাহিকতায় লোডেড ট্রাক আর টায়ারটেরাকোটায় চোখ যতোদূরে। কতো দূরেই বা আর? যেতে যেতে মাঝে মাঝে আয়েশে চোখ চ'লে যায় বাড়ীর পথে মেয়েদের হস্টেলের গেটে, হয়তো চেনা কেউ, তাহ'লে 'হাই বেবি।' কেন না 'সুভগে' কিংবা 'কি রকম' দুইই অশ্লীল শোনায়, নয়তো কেউ না থাকলে সে একা, প্রায়—একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি/....ওমা হাসি হাসি পরবো ফাঁসি/দেখবে ভারতবাসী—সন্ত্রাসবাদের স্বপক্ষে একমাত্র গান গাইতে গাইতে বাড়ীর দরজায় পৌঁছে যেতে পারে। 'আরেক পয়সা পেলে চলে যাবো' দৃষ্টি মেলে সেদিনও চাইলে বাস্তবিক পেয়ে যায়—আমাকে এক লাইন জ্যাজ। যোগেন লক্ষ করে, উঠোন নয় কাঁচা খড় রঙ ঘাসের লন ভিজে র'য়েছে কিছু আগের ঝাপটায়। যেখানে ঘাস নেই, তাই জিইয়ে র'য়েছে নিবারণহীন জল, তাতে পা মাজছে যে, মাথা ও বোধের সবটুকু আচ্ছন্ন কোরে, তাতে যোগেন নিজে, তার শিরদাঁড়া ও পাছায় স্থিত হোয়ে পড়ে, কিছুটা কাঁপনও—উপলক্ষ্যে কেঁপে ওঠা ফিলামেন্ট। নাহ্ পা মাজেনিতো ও, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ভেজা মাটি (মাটি নয় বালিই বলা যায়) ঘষটাচ্ছে। মাথা নীচু, নবমতম নাকি দশম জন্মদিনের ফ্রক পরে, খালি পা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা পোহাতে ভালোবাসে বোলে। এভাবে জ্বলে ওঠবার আগে নিভৃত গীটারের তারের মতো র'য়ে যাওয়ায়, পিছনের বৃষ্টি ভেজা হস্টেলের দোতলায় লেবু

হলুদ, পিছনে হুহু করা ফ্যাকাশেতে কাৎরে ওঠা স্কাইলাইন, সবই ম্লান হোতে থাকে। তাহ'লে নিজেকে নিয়ে অনার্য স্তবকের ঐ অম্লান মেয়েটি যে দাঁড়িয়ে, যে মুদ্রায়, তাতে ও কি জানে না নোখের টোকায় যে কোনো মুহূর্তেই····। যে আসবে, তাকে চেনে যোগেন। কতোবার দিগ্বিদিকে দেখেছে দু'জনকে একত্রে হুল্লোড়ময়, রিক্সায়-রাস্তায়-মেলায়-সিনেমাহলে আর তাতে স্পষ্ট হোয়ে আসে এই নগ্নতা; ভগবান বুদ্ধের গুম্ফায় প্রস্তর ভিক্ষুণী। অল্প বেশে, অল্প হোয়ে, অল্প নয় এমনই অপেক্ষা যে, সে এসে পাঠ কোরবে তবে—'প্রথম কদমফুল ফুটেছে আ-যোনি।' রিলিফের পোশাকে সে আসবে দেখবে জল বিপদসীমার গেজ অতিক্রমপ্রয়াসী ছোবলে কেঁপে উঠছে, তখনো দাঁতে ত্রাণ চিৎকার (কি কোরে ছাড়াবি মোর মুষ্টি, যতোক্ষণ চিনি নাই তোরে) ঘুরবে ফিরবে। বনের বাঘ জানে সে কেনো মাথা দোলাচ্ছে, অন্ধস্কুলের লনে, ইউনিয়ন ব্যানার নয় পুরুষ্টু পায়ের প্যাতা উঁচু বাতাসে পতপত কোরে ওঠে, আ অই যে পোষ্য নিজেকে মেলে রাখে অবিনশ্বর। আবহমান। পিছনে সূর্য ফুরায়ে চ'লেছে।

ফাঁকা হাঁদা রাস্তায় টায়ারের জলছাপ সিঁথি····স্মৃতিতে ফিরে আসে সে গীর্জা থেকে, ফিরে আসে আরো কোনকিছু নষ্ট বর্গে যা····হাঁটিতে থাকলে ভেতরে, অন্ধকারের ধুলো ঘরে, ধুলোর সিল্ক, সাদা রিবন কাঁপতে থাকে··· লুকোনো হোঁচটে রাস্তায় পড়ে যাই, পড়ে চুরমার হই না, আর যখোন উঠি, হাঁটু কনুইতে কয়েকটা পাঙাশ ক্ষত জেগে আছে····তারা পুরোনো হয় আবার····। খাঁচার একধারে চ'লে এলে পায়চারি করা চিতা দিকপরিবর্তন কোরে থাকে। ওই রাতের ঘুমে টলে উঠে যোগেন অন্যপাশ ঘোরে।

কখনো কার্ফুরঙা আকাশ, হয়তো কখনো তা উথলিয়ে প্রমত্ত সমুদ্র ঢেউ সংখ্যক। একা নৌকায় বৃদ্ধ জেলের উচ্ছ্রিত জীবন। অন্নের নামে ঐ মাছটিকে ডেকে চলে সান্তিয়াগো। ক্রমে দিন যায়, দিন আসেও। অনেক নীরক্ত পাড়ির এযাবৎ উত্তরাধিকার এসে মাছটিকে থামিয়ে রাখে। পিছনে টানে আকাঙ্খায় র'য়ে যাওয়া আমিষাশী বঁড়শির প্রাণ। বিস্ময়ে দ্যাখে ঐ তো শিকারী, পিছনে জয়জয়ন্তীর সূর্য, পরে ভয় পেয়ে দ্যাখে—শিকার। ক্রমে আনন্দে বোঝে সে নিজেকে মেলে দিয়েছে রক্তের প্রভাবে। ঢেউ সংখ্যক সমুদ্র হয়তো কখনো মেলে গিয়ে কার্ফুরঙা আকাশ। তার

তলায় ঐ আবহমান অপেক্ষাবতী। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাথা নীচু কোরে মাটি খুঁটতে থাকা ঐ লোনা যুবতীর প্রাক্‌সামরিকী।

এরপর কোনো একদিন এসে 'ওল্ড ম্যান এনড্ দ্য সী' আর নিয়ে গিয়ে পড়া হোয়ে ওঠেনি যোগেনের।

সপ্তাহে যোগেনের সাকুল্যে একম্-অদ্বিতীয়ম রোববার, আর বাকীগুলি না-রোববার ছিলো এমন নয় কিন্তু দ্যাখা গেছিলো রোববার বরং হোয়ে উঠছিলো না-রোববার আর অন্য ছয় না-রোববারগুলির মধ্যে ধরা যাক যেমন বেস্পতি কখনো মঙ্গলে ঢুকে পড়ছিলো হিস্পানী, ফলে সংকুলান না হওয়া ফেম্বৎবারগুলি ফিন্‌কি দিয়ে খিড়কি পথে নেমে গ্যাছে। এইভাবে অপ্রতিবিধেয় দারিদ্র্যর মধ্যে তার শুক্রবারের দ্বীপ ছন্নভন্ন হয়, হোতে থাকে। তো আগে আমি যে কথা বোলছিলাম তাতে সময়কে জার্ক কোরে এগিয়ে গিয়েছিলাম আবার মাসখানেক পিছিয়ে জুলাই-এ নেমে আসা যেতে পারে। ধরা যাক যেকোনো একটা দিনে যে কেউ যেমন যোগেন, অ-যোগেন কিংবা না-যোগেন যদি পেঁছে যেতে পারে বা বলা ভালো পেঁছালো তাহলে পদার্থবিদ্যার খাতিরেও বলা যায় না সে অর্থাৎ ঐ যোগেন, অ-যোগেন কিংবা না-যোগেন কোনো a বিন্দু থেকে শুরু কোরে b বিন্দুতে পেঁছালো। ঠিক জেনো (zeno)-র সরলরেখা মানে গোলকধাঁধার ধারণাও নয় বরং শুরু করার কাল্পনিক বিন্দুটি যদি না ধ'রে মনে করা গেলো সে অমুক দিনে এখানে অর্থাৎ তমুক b বিন্দুতে পেঁছালো বা পেঁছাবে তাহ'লে আমি যেদিকেই আলো ফেলি দেখি যোগেন/অ-যোগেন/না-যোগেন চ'লেছে বা চ'লে গ্যাছে ঐ তো নফর দাস লেন কিংবা রাখালদাস আঢ্য লেন কিংবা বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট বিকল্পে বৌবাজার ক্রশিং দিয়ে, এভাবে না-লাগা আলোয় আলো ফেলে ফেলে খুঁজে দ্যাখা যাবে গণনাহীন গলি-রাস্তায় যে কেউ তার যে কোনো দিনে পেঁছায় পৌঁছাতে পারে। এরকম হোলে দ্যাখা যায়, দ্যাখা গ্যাছে; একজন যেমন যোগেন কোনো এক দিনে বা b বিন্দুতে পেঁছাতে ধরা যাক পূর্ব/উত্তর দিক থেকে পশ্চিম/দক্ষিণ দিকে যাত্রা কোরতে পারে অসংখ্য রাস্তায়—একথা আংশিক সত্য বরং b যদি একই অবস্থানে থাকে তাহ'লেও দ্যাখা যায়, দ্যাখা যাবে, যোগেন চ'লেছে পশ্চিম/দক্ষিণ থেকে পূর্ব/উত্তরের দিকে আবার পূর্ব/উত্তর থেকে পশ্চিম/দক্ষিণের দিকে তো বটেই।

তো জুলাই-এ নেমে আসার আগে বছর কয়েক জার্ক কোরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র ঐ জুলাই-এ নেমে আসার জন্যও।

গোঙানোটা ততো স্থূল নয়, অবশ্য তা একটানা বুননের ফলে বাসযাত্রী হিসাবে আর প্রশ্ন তোলা যায় না কম্পনাঙ্ক নিয়ে, তবে ছোটার গতিতে বোঝা যাচ্ছে সিওলে (পি. টি.) উষা হার্ডলসে সোনা পেয়ে যাবে। জানলার ধারে যোগেনের গায়ে রোদ জাপটে বসার ফুরসৎ পাচ্ছে না, বাতাসের ঝাপটে পিছল হোয়ে পড়ে। যেতে হাইওয়ের দুধারে সার সার কাঁচ বাবলার ঘন সবুজ সম্মোহ, মাইলের পর মাইল কেঁপে উঠছে। ঈশ্বরের মতো তাতে সাদা সাদা কাঁটা মগ্ন। যোগেন জানলার বাইরে মাথা লটকে চোখ ছোটো করে। চোখে মুখে বাড়ি মারছে হাওয়া। হাওয়ার রাখাল তাড়িয়ে নিয়ে চোলেছে জলতিতিরের ঝাঁক, আসলে এতো বোঝাই যাচ্ছে তিতির-টিটির নয় বাতিল পাতারাই হবে। রাস্তা যেরকম সোজা, বাস বোধহয় গন্তব্যে নয় বিষুব বরাবর প্রান্তে ঢুঁ মারবে। যোগেন, আহ্ যোগেনের ইচ্ছা করে নেমে দাঁড়ায় কাঁচ বাবলার পাশে তারপর যেভাবে মলিনার ঘাড় থেকে চুল সরিয়ে মুখ রাখে, সেদিনও বাতাসে লোনা পলেশতরা খশে পড়ছিলো, সেরকম কাঁচ বাবলার বুকে প্রাণভোরে মুখ ঘষবে।

কবে যেনো বাড়ি ফিরে পিয়নের বন্ধ দরজার ফাঁক উত্‌রে দেওয়া পিকচার-পোষ্টকার্ড থেকে পৌনে চারলাইনের ঠিকানা তুলে নিয়েছিলো তারপর দূর থেকে গড়ানো মার্বেলের মতো শ্লথ হোতে হোতে আজ এই-খানে এসে স্থির যোগেনকে দ্যাখা গেলো। এই তার ঠিকানা, পোর্সেলিন কলোনীর ভেতর যথাতম শোকেস, এমন নিস্পৃহে ঝলমল কোরে ওঠে। অকারণ কিংবা সকারণ যাহোক, বড়ো একটানা কিছু পারে না, কিছু না এবং পারেনি বরাবর এগিয়ে দরজায় টোকা দিতে যেমন এখন। বক্তব্যে, বাক্যে যেমন অনিবার্য না হোলেও এসে পড়ে এক শব্দ-'প্রসঙ্গক্রমে' তেমনি প্রসঙ্গক্রমে যোগেনের সামনে এসে পড়ে পুরোনো। তখনো শকাব্দ পরখ করার যা অচেনা যা অবিশ্বাসপ্রবণ, তাদের পুরোনো চতুরালিতে তার জং ঝ'রছে। অবশেষে যেরকম হয়, যোগেন এক্কার ধরনে হলুদ চিকুর দিয়ে করিডোর পার হয় আর নিজের তরফে দরজায় টোকা।

কে?

—ভেসে আসে, রোদভাঙা হাস্কি গলায়, তা এখনো। কেননা স্বয়ংক্রিয় 'black and white incident is put to rest'-এ চকবন্দী হোয়ে পড়ায় সে উত্তর কোরেছিলো—'আমি'; যেহেতু 'আমি কে?'—প্রতিপ্রশ্নে যোজন আঙ্গুল হারায় আর সাদা ও কালোর সংঘটন বিশ্রাম খুলে ফ্যালে ফের, তখোন আলো পড়ে না-লাগা আলোয়ঃ

এইখানে আমি পূর্বোল্লিখিত 'জুলাই'-এর বিন্দুপরিধিতে এসে দাঁড়ালাম। এখানে অক্ষরেখা বরাবর যোগেনকে পাওয়া যেতে পারে, তার দারিদ্র্যের কিংবা বলা ভালো দারিদ্র্যরেখার নিচে কিংবা ওপরে।

দিনগুলির চলনলয়ের মীমাংসা করা হোচ্ছিল ধৈর্য্যমন্থরতায় আর চিঠি লেখালেখির অক্ষরার্থে 'অপসৃত হ'য়ে বেঁচে আছি' বরং উপেক্ষার ডাকটিকিট ছিঁড়ে বছর-বয়স পরিগ্রহ কোরে যোগেনের যেমন চোলছিলো। তার তো মনে হয় না 'দিন যায়, সন্ধ্যা হবে, সময় রবে না' অথচ রাংতার চোখ অফুরান তুলে রেখেছিলো ঝকঝকে ক্যালেন্ডার থেকে ঘড়ির কোয়ার্জ পর্যন্ত। আর একেকদিন, দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, কিন্তু সময় র'য়ে যেতো ছড়িয়ে পড়ে ওতোপ্রোত ফাঁকায়। এবং এরকম একবার।

ছ-ই অগাস্টে কে একজন আমার দরজায় টোকা মারলঃ

কেউ-না।

এবং এই কেউ-না ভিতরে এসে বসল একটা চেয়ারে।

সময় কাটালো আমার সংগে, কেউ-না।

এই কেউ-না আমাকে কোনো কথা ছাড়াই জিজ্ঞাসাবাদ করল আর আমি উত্তর দিয়ে গেলাম, কিচ্ছু না দেখে, কিছু না ব'লে।

বস্তুতঃ ছ'ই অগাস্টে নয়. জুলাই-এর কোনো সন্ধ্যায় এভাবে মলিনা অনেকখানি আর পরে, তারও পরে নেরুদার কবিতায় 'ঘটনা' পড়ে সে। এবং যেহেতু সে তা পড়ে তখোন বিষয় ও বিষয়ী অভিন্ন। তাই যোগেন হোয়ে ওঠে সে মুহূর্তে আরেক পাবলো আর অনিশ্চয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে সে বুঝে ফ্যালে মরা ঘড়িরও একটা দরজা থাকেই।

এরপর হুড়মুড় না কোরে ধীরে সুস্থে পা বাড়িয়ে জুলাই পেরিয়ে আরো কতকমাস ছাড়িয়ে চোলে গ্যালে হয়তো পরের বছরই হবে নাকি, যোগেনকে দ্যাখা গেলো হীরাবন্দরের রাস্তায়, যে কোণে খানিক ফুটপাথ ঘেঁষে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের থেকে কিঞ্চিদধিক উচ্চতায় দাঁড়িয়ে কোনো ছোটো গাছ, বিপরীতে সিনেমা হল রেখে, আর মার্চের সকাল দশটার

রোদে বাসের জন্য অন্যান্যদের সাথে দাঁড়িয়ে, অন্যান্যদের সাথে দাঁড়িয়ে অনেকখানি, অথচ অন্যদের বাস আসে চোলে যায় আর যোগেন দাঁড়িয়ে থাকে রুটের বাস না পেয়ে, একসময় একা প্রায়। হঠাৎ ঘুঙুরের শব্দ, তো চমকে ঘাড় ঘোরালে—গাছের গায়ে গা ঘসছে ষাঁড় অথচ থেকে থেকেই ঘুঙুরের শব্দের ওঠানামা, উৎস ধরা পড়ে না। পাশাপাশি বাড়ি নেই-যে, তাছাড়া দোকান স্টল, তবুও থেকে থেকেই চিড় খাচ্ছে খরভঙ্গুর রোদে। ক্রমে একসময় ধরা পড়ে ওদিকে সিনেমা হলের সামনে, মেশিনের বৃত্তাবর্তন, যোগেন বোঝেও, ঘুঙুরের সমান শব্দ ফেলে গ্লাস ভোরে ওঠে পান্নায়। পরে বাস ধরে প্রেসে গ্যালেও চোখে লেগে থাকে শব্দের মর্ত্যমুখ। যোগেন বনাম সারা দিন ঃ ২,৭৭৬,৮৯ বর্গ কিলোমিটার / ১৯৭১ শুমারি / প্রধান রপ্তানি পশম-চামড়া মাংস / রি-যো-দে-লা-প্ল্যা-তা / মো-ন্তে-ভি-দে-য়ো / ওট্, আলফালফা, কার্পাস / আনুমানিক আয়ু / দামস্ফীতির হার / কর্মরত জনসংখ্যা / নীট বৈদেশিক ঋণ—এইসব নিখুঁত পরিসংখ্যানের ছিমছাম ঊনকথনে চোখ ডুবিয়ে প্রুফ। আর সন্ধ্যায় একদিন বিশেষ চিঠি পেয়ে মালিকদের বাড়ী গ্যালে, শেষ পর্যন্ত তো দরজায় টোকা দিতেই হয়। এবং সে জানতো আয়না আমাদের যা দেখায় তা তাৎক্ষণিক। প্রতিদিনকার ছবি প্রতিদিনই মুছে যায়। অথচ দরজা খুললে সে যোগেন, যে তার চোখ মলিনাকে পায়না আর যবস্থব সে তাব অন্বেষণ থামিয়ে বুঝতে চায় মলিনা কোথা, কোথায় মলিনা ? আর না পেয়ে ফিরে যায় যোগেন যদিও দরজা খুলেছিলো যে ঐ মলিনাই তো। পরে কোনোদিন চোখ ডুবিয়ে প্রুফ দেখতে দেখতে যোগেন কি শব্দের মর্ত্যমুখ নিয়ে আরো ভেবেছিলো ঃ একটা সচল ঘড়ির কোনো দরজা থাকে না।

পোকার অধ্যবসায়ে সিম্ফনী বর্ধিষ্ণু ভ্রমণে হেঁটে চলে। 'যোগেনের ঠোঁটে গলে পড়ে ইক্ষুকণার ক্ষয়', তার 'ঘ্রাণের অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা এলাচ'।

॥ থার্ড সিম্ফনী ॥

এতো বোঝাই যাচ্ছে যে, শুক্রবারের দ্বীপে দাঁড়ানো যোগেন বারবার শুধু নয় যেকোনো বারই অযথা নিজেকে দরিদ্র নয় কিংবা দরিদ্র আর দারিদ্র্যরেখার নিচে এই আরোহী-অবরোহী অক্ষ ভারসাম্যে মেলে দিতে আপত্তি তুলবে। কেউ অবশ্য মুখের ওপর তাকে বলেনি ঃ শুক্রবার

দিনটা আল্লাহুর, দ্যাখ দ্যাখ যোগেন তোর গায়ে মুখে কাঁচ নীল আলো সাপটে পড়ছে। বাস্তবিক কেউ বলেনি কিন্তু যোগেন জানে তার আপত্তিটা জোরালো, সে তাই পিছনে ফেলে রাখতে পারে ঈশপ-লিজেণ্ডের যে প্রজেকশান চোলেছে ঘর্ঘর শব্দে—

যোগান (supply) নিজেই নিজের চাহিদা সৃষ্টি করে—স্যে-এর 'লঅস অব মার্কেট'-এর ক্লাসিকাল ধারণা, এতোদিন যা অতিবিখ্যাত চোর খুঁজেছিলো লণ্ঠন জ্বালিয়ে অর্থাৎ ডেভিড রিকার্ডো তার দোসর হোলেন। ম্যালথাস শুধু প্রাণীকুলে মৎস্যধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু গড্ডল বিচারে তাঁর দশাও আমরা জেনে যাই কেইনস্-এর রোমহর্ষক ধারাভাষ্যে ঃ—'রিকার্ডোর মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি হওয়া অসম্ভব, এর বিরুদ্ধে ম্যালথাস স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেননি, কিরূপে ও কেনো কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি বা বাড়তি দ্যাখা দেয়। ফলে তিনি বিকল্প কোনো কাঠামো দাঁড় করাতে অক্ষম হোয়েছিলেন ; এবং প্রত্যেকেই যা জানে, পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম যেমন স্পেন গিলে ফেলেছিলো, রিকার্ডোও তেমনি ইংলণ্ডে নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। শহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলেই তাঁর মত কেবলমাত্র গ্রহণ কোরেই ক্ষান্ত হলেন না, বিরোধের অবসান হোলো, অপর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হোলো ; কোনো আলোচনার মধ্যে এটা আর প্রবেশ কোরলো না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধা, যা নিয়ে ম্যালথাস সংগ্রামে অবতীর্ণ হোয়েছিলেন, তা অর্থশাস্ত্র থেকে লুপ্ত হোয়ে গ্যালো।

বাড়িটার চিবুকের ঐ ফালি বাগানে মলিনা তো অনায়াসে শরৎবার্ষিকী পরিকল্পনা উপুর কোরে ফেলতে পারতো। কোথায় কাশ ? শুধু লাগাতার লতাবাহার, পাতাবাহার, ফুলবাহার আর কাঁটাবাহারের অভ্রান্ত আঙ্গিক। যোগেনের এখোনো মনে আছে, মনে থাকে দেখছি। একদা মলিনাই পেশ কোরেছিলো তার জাতির উদ্দেশে ওরফে যোগেনের দিকে—বিয়ে কোরলে সে কি কি পুষবে তার বিশদ তালিকার সম্ভাবনা আঁচ। প্রথম পংক্তিতে নেড়ি বামুনের মতো অবশ্যোই থাকবে সোয়ামী। দ্বিতীয় 'নহ মাতা নহ কন্যা' এই ইমেজ পুষে পালন করা ; তৃতীয় লোমভর্তি কুকুর, চতুর্থ একফালি বাগান থাকলে ভালো নচেৎ ছাদেই মাটি ফেলে প্রতি অনবলীন শরতে এক ঝাঁক কাশ রীতিমতো পোষ মানানো। বরফের মতো জোৎস্না

করলে বোঝা যাবে কাঁশবনে জিঘাংসা কতোখানি। তো কোথায় কাশ! এখন সে কথা থাক, কিছু ক্যালেনডার পার কোরে যোগেন যেভাবে আজ আবার দরজায়, হয়তো নোতুন কোনো ইমপ্রেশনে ছন্ন সান্নিধি।

দরজায় টোকা পর পর। আর জানলা থেকে ঘরের দিকে চিবুক ফেরায়। টোকা বাড়তে থাক। মাঝের ঘর। করিডোর। বৈঠকখানা পেরিয়ে যেতে যেতে শব্দ বাড়ে। ফুলদানীর মতো গলা উঁচু কোরে ছিটকিনিতে মলিনার হাতে ততোক্ষণে দরজার কাঁপুনি ও বুকের শব্দ মিলেমিশে ছন্নভন্ন। আ-আর শব্দের মর্ত্যমুখ আলাদা করা যায় না। দরজা খুললে, দরজার ছায়া এতোদূর যায় যে বুঝতে না পারা অতিথি। তখোন প্রকৃত ভয় করে, আর ছায়ার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা অন্ধকারের চেয়ে গভীর, গাঢ় কোনো মানুষ, কোনো মানুষ না থাকে যদি?

লোকে বলে ঃ আরোহী কোমল নিষাদ এবং অবরোহী কোমল ধৈবত প্রয়োগের মুনশিয়ানা যোগেনের জাত চিনিয়ে দ্যায়। এই যে লোকে এসব বলে, যখোন বলে, বোলে থাকে জিভের এক পুরাতনী আধুনিক আরামে, এতে আমার একটা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু বেরিয়ে আসে, লোকে যারা বলে, রসজ্ঞ, এ স্বীকার কোরে নেওয়া যায়, যা বোললে যোগেনকেও রাঙ্গা হোয়ে উঠতে দ্যাখা গ্যাছে। হতে পারে পাকাপোক্ত বাহানায় মাথা বাঁচানো যোগেন সবসময় চাইতো না, হোতে পারে 'সে অনেক আগেকার' তা ছোটোবেলার কার্ফু রং আকাশ গলে গলে উপছে ওঠা ঘোলা জলে কাগজের ভাসানো নৌকার মতো সেও স্রোতের অন্তর্গত টানে নিশ্চেষ্ট কুটোর ধরনে ব'য়ে যেতে পছন্দ করে। কোথায় পৌঁছাবে ঐ নৌকা, পাশের বাড়ির ঝিমলির কাছে? বড়ো রাস্তার মোড়ে? কোথায় আর পৌঁছাবে ঐ নৌকা। অবশ্যো যোগেন কি কোরে তা জানবে। জাহাজ একবার কালা-পানিতে গ্যালে আর ফেরে না. জাহাজের খবরও যেমন আর পাওয়া যায় না তেমনি সমুদ্রের খবরও জাহাজের কাছে মেলে না। ক্রমশঃ হোতে থাকা যোগেন ক্রমে বোঝে ঃ অর্থ— ×, কীর্তি— ×, স্বচ্ছলতা— ×, বিস্ময়— ×, যশ— ×, লোভ— ×, এমন কি বোধ নয়, রক্তের ভেতরে তবে কি অন্বয় আশ্চর্য হোতে থাকে।

যোগেনের এম্পিরিক্যাল দুনিয়ায় বলা ভালো, সিম্যান্টিকস্ (অর্থ) ও প্র্যাগম্যাটিকস (প্রয়োগ) ছাপিয়ে মাথা উঁচিয়ে থাকে সিনট্যাক্স (অন্বয়)। আমি তো আগেই বোলেছি ঃ 'সে অনুসরণ করে'; দ্যাখা

যাবে এম্পিরিক্যাল দুনিয়াতে দ্যাখা যেতে পারে যোগেন কোনো অর্থোদ্ধার নয়, অর্থ নির্ধারণ নয় বরং আশ্চর্য হোতে থাকা অন্বয়কে অনুসরণ করে, কোরে থাকে। যে অন্বয় মানে বোঝে না, শুধু বোঝে পরমার্থ। একটু এগিয়ে আমরা সিনট্যাক্সকে সবচেয়ে বিমূর্ত বোলে বোসতে পারি কেননা এই স্তরে যোগেনের কোনো তাৎপর্য নেই, যোগেন সম্বন্ধে এই স্তর আমাকে বা তোমাকে কিছুই বোলছে না। কিংবা, বোলছে যে গান জানিনা তার স্বরলিপি। দাবাছকে ঘোড়ার ধরনে আড়াই চালের লাফ মেরে যোগেন সিঁড়িভাঙা শুরু কোরেছিলো হয়তো প্রথম দিকে, কেন না তারপর পিছনের এক আধো তাড়নে বোড়ের ক্ষমতায় এক ধাপ কোরে উঠতে থাকে, তার বাড়ির সিঁড়িপথও তেমনি ছায়া-আলোয় ছন্ন, এক পা, দু' পা কোরে উঠতে উঠতে মাঝে চাতাল এলে যোগেন কি সিঁড়িলাগোয়া রেলিং-এ হাতে ভর দিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে নিচে কিছু দেখেছিলো ? দেখেছিলো যে তলার সিঁড়ি-ভেঙ্গে তারই শৈলীতে প্রথমে আড়াই লাফ, পরে এক পা, দু' পা কোরে যোগেন তাকে অনুসরণ কোরছে ? গ্রাফের ঠিক কোন্ অবিকল জায়গায় সে দরিদ্র নয়, দরিদ্র কিংবা দারিদ্র্যরেখার নিচে বুঝতে পারেনি কি ? যখন, আ অই সে যোগেন দোতলায় চাতালে বাঁ হাতে রেলিং-এ ভর দিয়ে ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে সিঁড়ির আলোছায়ার নিচে দেখছে তাকে অনুসরণ কোরছে যে সে যোগেনই একইভাবে, তখোন না-লাগা আলোয় আলো লাগে ঃ

গবেষণাগারে আলোর তরঙ্গপ্রকৃতি নির্ধারণে যে ঘটনাটি আমাদের বিশেষ-ভাবে নজরে আসে তা হোলো ব্যতিচার (interferency)। ব্যতিচার এমনি একটা ঘটনা যেখানে দুটি উৎস থেকে আসা আলো পরস্পরের ওপরে পড়ে, কোথাও আলোর উজ্জ্বল উপস্থিতি অথবা কোথাও স্বল্প উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রকাশ করে। আলো ও অন্ধকারের এক পর্যায়ক্রমিক সমাবেশের এই যে বৈশিষ্ট্য ব্যতিচারে ঘটে থাকে, তা গবেষণাগারে দৃশ্যমান কোরতে গ্যালে একটি অতি আবশ্যক শর্তপালন কোরতে হয়—শর্তটি হোচ্ছে ঃ উৎস দুটিকে সুসম্বন্ধ (coherent) হোতে হবে ॥

সন্তোষ কুমার ঘোষ

খোলামকুচি

[এক-একটা সময় আসে যখন নিপুণ কুমোরের মতো মাটি ছেনে নিটোল একটা কলসি গড়া কিছুতেই আর হয়ে ওঠে না। ছেঁড়া, ছড়ানো পাপড়ি, এলোমেলো একটু-বা দর্শন, অনুভূতি বা প্রতীতি—তাদের গেঁথে তুলবে কে? হারিয়ে ফেলতেও মায়া, তাই হালফিল এদেরই কিছু কিছু টুকে রাখি। খোলামকুচি তার কয়েকটি। টুকরো লেখাগুলো না গল্প না প্রবন্ধ, কবিতা নয়ই। তারা প্রকরণগত সমস্ত বেড়ার বাইরে। সসংকোচে ছাপতে দিলাম, পাঠযোগ্য কিনা জানি না। যদি হয়, তবে একমাত্র সেই পাঠকদেরই, লেবেঞ্চুসে যাঁদের লোভ নেই—অর্থাৎ মনের বয়সের দিক থেকে যাঁদের সাবালকত্ব সন্দেহের অতীত।—লেখক]

১ কসটিউম জুয়েলারি

—এই ভর সন্ধেয় বেরিয়েছ, গা-ভরা গয়না, তোমার ভয় করছে না?

—গয়নায় ভয় নেই, এসব নকল কসটিউম জুয়েলারি।

—তবু। দিনকাল ভালো নয়, দূরে দূরে বোম পটকার আওয়াজ—শুনছ তো? তা ছাড়া তোমার এই বয়স আর এই জোয়ারে থৈ থৈ শরীরটাও তো গয়না।

—কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই। বাড়ির মানুষটা অফিস থেকে জ্বর নিয়ে ফিরল, এখন বেহুঁশ। ডাক্তার ডাকতেই হবে। এক্ষুনি।

—এত সেজেগুজে? চোখ ধাঁধানো জেল্লা। ডাক্তারের ফীজ বুঝি?

—বিচ্ছিরি কথাগুলো বোলো না, ছিঃ! আমার এই বিপদ! আমাদের আজ এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল, তাই।

—বুঝেছি। এই রাস্তাটা তোমাকে পার করে দিতে পারতাম, ওই তো আর দুটো মোড় ঘুরলেই ফারমেসি। কিন্তু, কিন্তু আর বুঝি সময় নেই।

দেখছ না গলিটার স্যাঁতা-পড়া দেওয়াল ঘেঁষে ভুতুড়ে কতকগুলো ছায়া, তাদেরও পেছনে রবারসোল জুতোর ছপছপ। আওয়াজ করে কে যেন পাইপগানও ছুঁড়ল। পরোয়া নেই, আজকাল ওদের বেজায় সাহস। ওরা গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। চুপ!

চার দিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার হয়ে গেল, ফটফটাফট আওয়াজ, তায় ঝুপঝাপ বৃষ্টি, কিছু দেখতে তো পাচ্ছিলামই না, তার ওপর নাকের ওপর কার যেন বিরাশি সিক্কা ঘুষি। হুঁশ ফিরল এইমাত্তর, এখনও নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, কপালে পুলটিসের পুঁটুলি—থাক।—তুমি ঠিক আছ তো?

—আছি।

—আমার একটা চোখ এখনও বন্ধ, ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, চোখ খোলা থাকলেও পেতাম না। যা অন্ধকার গলিটায়। হয় ওরাই বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, নয় তো লোডশেডিং। যাক, তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি তো, ওরা কিচ্ছু নেয়নি?

—কিচ্ছু না। হাত দুটো মুচড়ে দিয়েছে শুধু।

—ওদের সেয়ানা চোখ-হাত-টাত সব। হা-হা। টর্চের আলোতেই টের পেয়ে থাকবে গয়নাগুলো আসল নয়। খুব বেঁচে গেছ সেই পুণ্যেই।

—সম্ভব।

—কিন্তু তোমার গলা যে ভারি ভারি ঠেকছে, কাঁদছ, না কান্না সামলাচ্চ? মানসম্মান নিটুট, কিচ্ছু তো খোয়া যায়নি। এই! তবু কান্না চাপছ কেন তুমি?

—কান্না চাপছি? কি জানি। না কিচ্ছু খোয়া যায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার, না? মানুষ, না ওরা কালো নিখুঁত নিকষ? ওদের চোখ, ওদের ছোঁয়ার ঘষায় সব ঠিক ঠিক ধরা পড়ে যায়—না? কাঁদছি? না। ভাবছি, আমিও কি কসটিউম জুয়েলারি?

২ থাকাটাই কথা

—আয়নায় আজকাল থেকে থেকে কি দ্যাখ?

—কেন, আমাকে।

– দেখতে পাও?

—একটু ঝাপসা লাগে। চশমার পাওয়ার বদলাতে হবে।

—একটার বদলে দশটা চশমা লাগালেও কিচ্ছু হবে না।

—বলছ কী! হবে না কেন?

—তুমি নেই বলে।

—আমি নেই?

—না। যে ছিল তাকে তুমি হাজার জিনিস, মুখ, মানুষ, ধুলো আলোর মধ্যে বিলিয়ে ফেলেছ।

—তবে? তাহলে কী হবে?

—কী আর! লাখো লাখো নেই-তুমির মধ্যে একজন হয়ে মিশে থাকবে।

—আমাকে পাব না আমি? দেখতেও পাব না!

—পেলেও পেতে পারো। সে ভারি শক্ত কাণ্ড। যদি, যদি আর একটা তোমাকে জন্ম দাও। পারবে, নিজেই নিজের বাপ হতে?

—অ্যাবসারড!

—তাই তো বলছি। আয়নাটা গুঁড়ো করে দাও, অন্তত, ওটার মুখ রাখো ঘুরিয়ে। তারপর একা থাকা তো বড্ড উদাস, তাই মিশে যাও কোটি কোটি 'নেই'-দের ভিড়ে। যেমন ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি, যেমন সমুদ্রের পাড়ে গোনা-গুণতির বাইরে রাশি রাশি চিকমিক বালি। ওদের একটাও কি আলাদা কোনও আমি?

—কি লাভ তাতে!

—লাভ লোকসান নেই। আসল কথা থাকাটা। ওরা আছে।

৩ নরম কোল

—কী খুঁজছ?

—একটা খাতা।

—পাবে না।

—পাব না কেন?

—পোকায় কেটেছে।

—কী সর্বনাশ, ওটাতে আমার সমস্ত জরুরি ব্যাপার নোট করা ছিল যে! সেটা গেল?

—যেতই। পোকা না কাটলেও, হারাত। চাপা পড়ত গুচ্ছের নতুন কাগজের তলায়। কিংবা কেউ চুরি করত।

—আর সেই ফটোটা ?

—সেদিনের ঝড়ে তার ছিঁড়ে, কাচ ভেঙে—মনে নেই ?

—সাংঘাতিক ব্যাপার তো !

—কোন্‌টা ? হারানোটা, না মনে না থাকাটা ?

—দুটোই।

—উঁহু। ভেবে দ্যাখ, ওটা ছিল গ্রুপ ফটো। যাদের, তারা অনেকেই চিরকালের মত চলে গেছে কবে। মানে, মরেছে। কারও কারও সঙ্গে মরেছে নিত্যি ওঠ বোস, দেখাশোনা, সম্পর্ক। দেওয়ালে টাঙানো থাকলে চোখ পড়তই, আর কষ্ট পেতে। আর ঝড়ে ভাঙার ব্যাপারটা যে মনেই নেই, সেটা সাংঘাতিক হবে কেন, সেই তো শান্তি, মানুষের স্বভাব যা নিজের গরজে তৈরি করেছে। আমরা অনেক কিছু ভুলি, ভাগ্যিস। সব মনে থাকলে কি ভয়ানক হত, না ? পাতায় ফেলা ছাইয়ের মতো সব হাওয়ায় কেবলই উড়তে থাকত। নিশ্বাস যেত আটকে।

—তবু তো থাকে। ধরো, ফটোর ওই মুখগুলো। বুকের ভেতরে, একটা ফ্রেমে এখনও কি নেই ?

—মিথ্যে মুখ ওসব। তোমার, ওদের কম বয়সের। যখন রেশারেশি ঘেন্না-টেন্না কিছু ছিল না। দুঃখ কিসের, হারানো জিনিসই তো হারিয়েছে।

—তবু যদি, যেদিন ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম নেই, মুখগুলো মাঝরাতে বুকের ফ্রেম থেকে বেরিয়ে····

—কিচ্ছু নেই তো ভাবনার। চোখের পোড়া পাতার দপদপানি, আর বিছানায় এপাশ ওপাশ। বুকে বাঁধানো ফটো-টটোর সুবিধে কি জানো ? ফ্রেমে কাচ থাকে না, টপটপ পড়ে না রক্তও।

—এর নাম বাঁচা ?

—এরই নাম।

— স্মৃতির ডায়েরি, গ্রুপ ফটোর মুখ, কিচ্ছু থাকে না, হারায়, ভাঙে, চলে যায়, খালি বাঁচাটাই স্থির, স্থায়ী ?

—তাও নয়। ওই বাঁচাটাকেই বয়ে বয়ে টেনে টেনে শ্মশানে কি গোরস্থানে জমা দিয়ে দাও, ব্যাস, খালাস।

—তার মানে স্থির-নিশ্চিত বলে কিছু নেই ?

—আছে। জীবনে ধ্রুব, অবশ্যম্ভাবী একটি মাত্র বস্তু ঃ নাম মৃত্যু।

—বাকি সব ?

—খেলা, অবলীলা। সে-ও মজার, যে মজা আকাশে চোখ রেখে চিৎ সাঁতারে। ভালো, ভালো, যতক্ষণ পারো। পাড়ি দাও, দম যদি না ফুরোয়। ফুরোলেই বা ভয় কী! ডুবতে তো চেষ্টাও চাই না. জলের তলে কাদা, মাটি, শ্যাওলা, পাঁক, সব মিলে নরম নিশ্চিত একটা কোল পেতে সে রেখেছেই।

৪ যেতে, যেতে যেতে

—দৌড়ে দৌড়ে এলে, এখনও হাঁপাচ্ছ, কপালে ঘাম, চুল এলোমেলো, ঘাড়ে ভেঙে পড়েছে, অথচ ট্রেনটা একখুনি ছেড়ে গেল।

—ছেড়ে গেছে ?

—দেখছ না, পেছনের কোচটার টেইল ল্যাম্‌পটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—তুমি তবু দাঁড়িয়ে ?

—বিবি, তোমার জন্যে। দেরি হচ্ছিল তোমার, তবু আশায় আশায়। লেট হলেও গাড়ি তো শেষ অবধি কোনও না কোনও সময়ে আসে!

—তৈরি হতে দেরি হল। তা ছাড়া সকলের চোখ এড়িয়ে—বোঝ তো। মাপ করো।

—মাপ কিসের! ভালই তো লাগছিল। প্রথমে সিগন্যাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘণ্টা, সার্চ লাইটের চোখ ধাঁধানো আলো, তার পরেই প্ল্যাটফরমটা থরথর প্রত্যাশার মুখে যেরকম হয় তেমনই আর কী, ওঠা নামা, ছোটাছুটি, 'এই কুলি, কু-ল-লি'! হাঁকাহাঁকি, চা-গরম, শিঙারা নেবেন বাবু রাজভোগ ? এই ভেনডর, টাটকা কাটলেট আছে কিংবা প্যাকেট টিফিন—যাই হোক ? জীসাস, কদ্দিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা লিলি! আরে তুমি এত মুটিয়ে গেছ শুভ, বাই জোভ! স্টেশনটা গমগম, আহ্লাদে।

—কী বোকা, স্টেশনটা ভেবেছিল বুঝি ট্রেনটা তার।

—ঠিক বলেছ। স্টেশনগুলো ওইরকমই বোকা। গাড়িটা যে ছিল না, এল, খানিক থামল, ফের যাবে, সেসব খেয়ালও করে না।

—হেঁয়ালি ?

—হেঁয়ালি কিসের ! ভেবে দ্যাখো। ওই ট্রেনটাই আগে কতো জায়গায় দাঁড়িয়েছে, ছুঁয়ে এসেছে ব্যাণ্ডেল, বর্ধমান, পানাগড়, দুর্গাপুর। ফের হয়তো দম নেবে আসানসোল, বরাকর, ধানবাদে কি গোমোয়। থামতে থামতে, ছুঁতে ছুঁতে—

—তাতে অবাক হবার কী ! ওই তো নিয়ম, রীতি।

—হ্যাঁ, রীতি। তবে শুধু গাড়িদেরই কি ? এই যে আমার জন্যেই তুমি এলে—

—এলামই তো।

—আমারই কাছে।

—তাই তো।

—অথচ এর আগে তোমার ক'টা স্টেশন গেছে (জংশনও ছিল নাকি ?) আর ক'টায় যাওয়া, থামা, পেঁছনো বাকি, একটুও হিসেব করেছি কি ?

—অসভ্য। এখন তো এসেছি।

—আলবত। এই এখনটাই খাঁটি। যেমন সময়ের বেলায়, তেমনই প্রেমে মেলায়, মেশায়। চিরন্তন-টিরন্তন. ওসব পোশাকি দর্শনের ওয়ার্ডরোবে তুলে রাখো। মুহূর্তগুলোই দরকারি।

—শুধু মুহূর্ত ?

—হ্যাঁ, কয়েকটা জ্বলজ্বলে ছাপা নোট। বুকপকেটে। আমাদের রোজকার বাজার চলে যায় ওই দিয়েই। চলো, যাই।

—এই মুহূর্তটা ? সঙ্গে নেব না ?

—দূর ! নেওয়া যায় না, নিতেই পারবে না। ওটা পড়ে থাক এখানেই।

—কিছু থাকবে না আমাদের হাতে ?'

—পাগলি আর কাকে বলে। মোরামের রাস্তায় নুয়ে পড়ে নুড়ি কুড়িয়ে তুলি না ! দেখবে, তেমনই কত মুহূর্ত পেয়ে যাব, জড়ো করে ফেলব, যতটুকু পারি ততটুকু পথ পাশাপাশি যেতে, যেতে, যেতে।

৫ শেষ খরা

—তোমার যা মেজাজ, শেষবার খাটে দুলতে দুলতে যেতে যেতেও

বারবার গরমে উঃ আঃ করবে নির্ঘাত।

—আর ?

—আর চিতায় শোয়ালেও ওরা যদি খামোখা দেরি করে, তবে ফশ করে দেশলাই জেবলে বলে না বসো, ইশ ফালতু ঘামাচ্ছ, লেট করিয়ে দিচ্ছ। নাও এই আগুন, প্যাঁকাটি মুঠো করে ধরো, তারপর মুখে ঠুসে, দেদার ঘি ছিটিয়ে যা করবার তা সারো। কুইক, কুইক, তাড়াতাড়ি! তুমি যা-না একখানা! বাঁচলেও জ্বালাবে, মরলেও অতিষ্ঠ করে তুলবে সকলকে।

—কেউ কাঁদবে না বলছ তো? তা মন্দ কী। এই খরার বছরে এতখানি চোখের জল বেঁচে যাওয়াই চাট্টিখানি ?

জগন্নাথ ঘোষ

পাথরের চোখ

জ্যৈষ্ঠ মাসটায় কান্ডারী মাহাতর কোন কাজের গতিক থাকে না। আকাশখানা নীলেট ধোঁয়া মেরে থাকার সুবাদে ডাঁহির পাথরে ভাপ। সামনের ভাদু জঙ্গলে পাতাকুড়ানীর পরিশ্রম সার। কান্ডারী আইল্যান্ড থ্রাশের ছায়ায় গামছা বিছোয়। এ আকাশের তামাশা ভারি। ও ভাবে।

মাহাত গাঁয়ের কুষমন্ড কান্ডারী—লেতাইএর কথা। আমাদেরই গাঁয়ের মনিষগুলান মন্ডকূপীর ডাকপিয়ন, পায়রাচালির মেলেরিয়া বাবু আর এক মধুচুম্বনের মাষ্টার। অমন মাহাত গাঁয়ের নামে কেচ্ছা রইটল কুঁড়হিয়া কান্ডারীর জন্য। কোন কাজ কাম করতে ওর শরীরের আড় কাটে না। তায় মাসটা জ্যৈষ্ঠ। দুপুরটায় ডাঁহির পাথরে ঝাঝান্ রোদ। তবু আইল্যান্ড থ্রাশের, ছায়ায় হাওয়ার বিষ খানিক মেরে দেয়। কান্ডারীর মনে খুব সতর্ক হিসাব, সাঁঝ বেলা লাগরে কাঠি পড়লে সুরধ্নী যেতে বলেছে ওর ডেরায়। বলে, চুপু পায়ে আইসবা কান্ডার। মাথার উপর একজোড়া চনক পাখি ধূসর পাতার ফাঁকে বসে গাছের আঁশ তোলে আর শিস দেয় সুঁ-ই-স্‌স্‌স্‌। কান্ডারীর মুখে হাসি চলকে পড়ে। অমন চনকপারা সুরধ্নীর, এক চইখ হাসা পাথর। কিন্তুক সুরধ্নীর গমক ঠমক বেজায় জব্বর—এসব লেতাইদের দৃষ্টিতে। হক কথা, বালিজুড়ি গাঁয়ের অমন তনিমা নিয়ে সুরধ্নী একাই। হঠাৎ কান্ডারী উঠে বসে, তীব্র স্বরে স্বগতোক্তি করে, কান্ডারকে কন শালা পুঁছে নাই। আমি কখন বইলছি বটে উ কাম পাইরবক নাই। কখন বলি নাই। এ ওর এক ব্যামো, অথবা অভিমান ধরা যায়। একজোড়া ক্ষুদে বাঁশপাতি টট্‌ক নদীর পানে উড়ে যায়।

জঙ্গল হাসিলের কাজ শুরু মাঝরাতে আর জঙ্গল কুড়ান বিহানে। কিন্তু আজ বিকাল থেকেই লেতাইদের জারুল থানে মা গোরামের ওগরা পাকাবার ডাক। বালিজুড়ির কাঁচা শিশুদের তাই সাঁঝ নাই, বিহান নাই,

আজ জারুল তলা বটে। জঙ্গলের বাণিজ্যে আজকের মত এগাঁয়ের কারো যেতে ফুরসত মিলে নাই। তবু কান্ডারী ভাবে এই সুযোগে কটা গাছ সাবড়ে দিলে হাতের পয়সা জপে কে! তো ঐ ওর ব্যামো, শালা কাম লাইরব ইমন কন কথা কান্ডার বলে না। লেতাইরা তবু মস্করা ছাড়ে না, শালা নিকম্মার কপালে বাগানের কামও জুটে নাই। জঙ্গলের কাজে সকলেই যায়, শুধু কান্ডারী ভয় পায়। ফরেস্ট গার্ড, বীট বাবুর খাইয়ের ধরতাই পায় না। লেতাইরা কি করে পোষ মানায় সে সব বৃত্তান্ত ওর বোধগম্য নয়। এই তো মহলি পাড়ায় রাস্তার কাজে দুদিনের মত বরাদ্দ হল! ক পইলা আটা আর ছটা করে টাকা এতে পেটের ভুক্ মরে? মাঝে মাঝে দুহাতা লাপ্সি সরকারি খয়রাতি। নেশা বিড়ি দৈনিকের সেসব খরচা ভেন্ন।

বালিজুড়ির পিছন পানে ডাঙ্গা জমি। পাঁচ ক্রোশ ছাড়িয়ে গিয়ে আবছা আনন্দপুর, মাঝে পারাং নদীর অবরোধ। পারাংএ এ সময় পাথুরে মাটির সোনা রং। মাঝে মাঝে হলুদ জল হাঁটু তক। শ্রাবণের ধারা গড়ালে পাড় ভাসে। ঐ সময় গাঁয়ের মহোলি মাহাতর হাতের লাঙ্গলে বড় শান, কাস্তের বুক ঝিক ঝিক। তার আগে সরকারী প্রোগ্রামে যা হয় তাতে কান্ডারীর ডাক নাই বড়। পাঁচজনে খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসে কান্ডারের বড় সুখ বটে, কাজ নাই কম্ম নাই। জনার্দন সুর কাটে, উয়াকে কামে কে লিবেক, গতর লাইড়তে লাইরবে। কান্ডারী আপন হাত দুটো নিয়ে খেলা করে। দড়ির মত শিরায় হাত বোলায়। হাড় সার ঢেঙ্গা গতরে ও পেরে ওঠেনা, ক্ষুদ্র বুকটার মাঝে কেমন হাঁক পাঁক করে। কান্ডারী ফের আকাশের দিকে তাকায়। এ সময়টা পারাং টট্কর হাঁটু জলে কান্ডারী কুড়াজাল খালুই নিন্‌ ঘোরে। এখন যেটুকু সড়ম মাছ, চাঁদকুড়া পায় তার সিকি ভাগ সুরধুনীর ডেঁহরে পোঁছে দেয়—এই রাইখলাম সুরধুনী, বাকি কয়টা হাটে লিব, কান্ডারীর অনুগত হাসি। হাটে বসে বটে। তবে পোয়া দুই পুঁটি মিরিগ বিকোতে বেলা গড়িয়ে যায়। অবশেষে হাটছুট কান্ডারীর বগলে এক বোতল টাটকা মহুয়া। এতসবের মধ্য দিয়ে সুরধুনী ঝাঁটিবন উজিয়ে কান্ডারীর সামনে নিগূঢ় বাসনা নিয়ে এল একদিন। কাঁচিয়াপানা জঙ্গলে সাঁঝেরবেলা ওদের অভিসারের বন্দোবস্তো বাতিল হল শুধু সুরধুনীর একটা চোখ মরা তাই। মাহাত পাড়ার শেষ

ডেরা সুরধুনীর। ওকে এতোদিনে আবাস গড়ে উঠে যেতে হত। বড় মালিকের কৃপা হল তাই রয়ে গেল এখনও।

সুরধুনীর একচোখে নজর। ভিন্ন চোখের মণি সির আমড়ার মত সাদা। ওদের ধারণা এ দেপ্তার অভিশাপ; তিনটা সোয়ামী গিলে সুরধুনী মণ্ডুণ্ডে। ওর না আছে বর্তমান, না কোন ভবিষ্যতের নাড়ি, এমন এক জীবনের প্রতি সুরধুনীর বড় ঘেন্না। জঙ্গল কুড়ানী আর উঞ্ছবৃত্তি এ ভাবেই পেটকে বশে রাখতে হয় ওকে। আর ইদানীং কান্ডারীর যা জোটে অভ্যাসমত সুরধুনীর ডেঁহরে কিছু রেখে যায়। কান্ডারী ওর সোয়ামী নয সেঙ্গাতও নয়। এক বাউন্ডুলে বাউরা। লোকটার মধ্যে পিরীত পয়জার আছে তা কেউ বলে না, ঐ এক ছাঁদ বটে। সারা ভাদুবন ঘুরে বেড়ান, সারা গাঁয়ে টহল পাড়া। ঝিকুট মড়া মানুষটার জীবনটাও এমনতব হজা মজা, সুরধুনীর মন পড়ে কান্ডারীর উপর। তবু লোকটার মধ্যে উগ্রচণ্ডী ভাব নাই, রিলিফের কাজ জোটাতে রাজনীতি কি মেয়ে-লোকের লাস্য এসব ওর কাছে আন্‌খা। তাই গ্রীষ্ম বয়ে যায় ওর শুয়ে বসেই আর সরকারী দান শুনলেই ফাটা থালটা নিয়ে দে ছুট। এ নিয়ে লেতাইদের মধ্যে রং তামাশায় ও রা কাড়ে না।

জ্যৈষ্ঠের রোদে পাথর টং। আড়ষ্ট মানুষ ঘর বাহির হয় না বড়। খয়েরি কুসুম পাতার ছায়ায় ইষ্টিকুটুম রোদের ঝাপট খায়। পলাশের ছায়ায় দগ্ধ কান্ডারীর মনে হুল ফোটে এমন সব দিনে। কাছারী রোড এখান থেকে ক্রোশ দুয়েক। হাঁটতে পারলে ডুভি খানেক জুনুরের লাপ্‌সি ঘাটা কি দুই চইঠি আটার ভাগ বরাদ্দ ছিল। ছিদাম কথায় কথায় বলেছিল, রোদের তাপে মনিষ জমবে নি, গেলেই মিইলবা, কান্ডারীর শরীরে তর নেই, নইলে এমন ফাঁকি পড়ে না। জ্যৈষ্ঠের হাওয়ায় ভাদু বনের রূপ পাল্টায়। শালের ডালে ডালে সবুজ থালা। রেইন ট্রি, সোনালি শিমুলে গুড়ুচী ফুলে রোদের গাঢ় প্রকাশ, বুনোজামের শাখায় কাঁচ সিল্কের পাতা। গাছের তলায় বিছান লাল মোরাম চাদরে বসন্তবৌরির ঠোঁটের টোকায় ঝরে পড়া পুন্নাগ চাঁপা, রঙ্গন। ওদিকে মাঠ-খোয়াইয়ে মহুয়ার

ঝরন অবিরল সাঁঝ-বিহানে। এমন খরতাপে কান্ডারীর মনে হুল ফোটে বড়ো।

জারুল তলায় আঁধার ভাব। বড় মালিক হ্যাজাকে হাওয়া মারে জোর।

হাঁড়িতে ওগরার ভুর ভুর গন্ধ, তাতে দেবীর থানও সুগন্ধী। মদন ভেঁউয়ের সুর ভাদুতক পেঁৗছে গেছে। শিশু বৃদ্ধের আলাপ আচরণে জারুলতলার মা গোরাম ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হতে থাকে। আষাঢ়ের জল মার না খায় তাই এই ব্যবস্থা। এ অঞ্চলে সংবৎসরের ভরসা ঐ মেঘের জল, লাল মোরামে গেঁথে গিয়ে মৃত্তিকার আশীষ পাবে। ধানের মূলে গোরাম ঠাকরুণের শুভদৃষ্টি না পড়লে গাঁয়ের লোকের ডঁরাই। বড় মালিক ডাক পাড়ে, আর-বৎসর ষোল আনা মানসিক হব, আধিমুড়ি পাঁঠা দিব। আষাঢ় শাওনের মেঘে জল দিও মা। বয়স্কদের তদ্গত ভাব আকাশে জল দাও, ভাল রোয়া দাও, পুষাল দাও—এ ভেন্ন আর কিছু চাই না মা। এবারে লাগড়ে চিকন কাঠি পড়ে। গম গম টংকার ভাদুবনে, ডাঙ্গর পাড়ায়। আর এতেই গোরামের থান বেশ খানিক তেতে ওঠে। কচি পায়রার রক্তে ভাসে চট্টান।

কয়েতবেলের গন্ধ পেরিয়ে ঘেঁটু বন। এদিকটা বালিজুড়ির শেষভাগ। আঁধারে দাওয়ায় সুরধুনী উঠে দাঁড়ায়, আইসচু বটে! কান্ডারীর অন্তরাত্মা রোমাঞ্চের ঠিকানা পেয়ে কেমন কেঁপে ওঠে, ডাইকছ ক্যানে? সুরধুনীর ভিতর ঘরে কান্ডারী এই প্রথম। কুপীর আলোয় কান্ডারীর চোখের সামনে সুরধুনীর ছেঁড়া কানি, ভাঙ্গা তোরঙ্গ, ইত্যাদি সম্পত্তি যেন প্রাগ-ঐতিহাসিক দৃশ্যপট। একসময় সুরধুনী ফুঁ দিয়ে কুপী নিভিয়ে দামিনীর মত চকিতে নিজেকে উন্মুক্ত করে তোলে। কান্ডারীর রোমকূপে কেমন শির শির রক্তের খেলা। ও আমোদ পায় সুরধুনীর এমন ব্যবহারে। কান্ডারীর জীবনে নারীর অভিতপ্ত শরীর এই প্রথম। সুরধুনীর অধৃষ্য কামনা কান্ডারীর অঙ্গে, চেতনায় খড়িশের বিষ ছড়িয়ে দেয় যেন। ঐ বিষে নিমজ্জিত ভাঙ্গা বাঁকা কান্ডারীর শরীরে এক

দহন ক্রিয়া ওর সত্তাকে অনিশ্চিত করে তোলে। যে কোন মুহূর্তের তোড়ে ভেসে যাবে এমন ভাবনা এখন কান্ডারীর। সুরধুনীর নষ্ট চোখের পুতুলটায় পঞ্চমীর চাঁদ কাঁপতে থাকে। এই প্রথম সুরধুনীকে কান্ডারীর এক রহস্যময় আধার বলে মনে হয়; যার মধ্যে অনেক প্রাপ্তির ইঙ্গিত, সুধা এবং ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কান্ডারীর দুর্বল শরীর এবারে ভেঙ্গে আসে। সুরধুনী তোমার গতরখানে ঘেঁটু ফুল পারা গন্ধ গন্ধ লাগে, তোমার সাদা চইখখান সোঁদির বটে। আশ্লিষ্ট সুরধুনীর গলায় গুন গুন ভাব। মোর মরদগুলায় মরে নাই, বিশ্বাস কর কান্ডার, উঁয়ারা আমাকে ছাইড়ছে, উঁয়ারদেরকে ডর ছিল, আমার ছ্যানার চইখ পাথর পাথর হয়। আমি ত ডাকিন নই, আমি ত হাওয়া ঘেরি নাই। উঁয়ারা রটন দিইছে কান্ডার। সুরধুনী এক অমর্ত্য সুখে ডুবে যেতে থাকে। কান্ডারীর কাছে এক চরম সুখ, বাঁইচতে আর মন নাই বড়। বাঁইচতে এমন সুখ নাই সুরো। সুরধুনীর গলায় সেই গুন গুন—তুমি বড় চিকন বটে তুমার শক্তি আছে মাইনছি কান্ডার। সুরধুনীর রক্তে চঞ্চলতা। কান্ডার আমাকে একখান ছেইল্যা দাও, ভিখ মাগি কান্ডার এ তুমার খ্যামতা আছে মানি—ওর গলায় ফিসফিস। কান্ডার এই প্রথম শোনে ওর পারঙ্গমের কথা। এই প্রথম এক অনাবৃত রূপ, নারীর শরীরের আঁশ-গন্ধ ওর সারা শরীর প্রলিপ্ত করে। সুরধুনীর উষ্ণ বুক, জঙ্ঘা, পাথর পারা নষ্ট মণিতে কান্ডারীর তপ্ত প্রশ্বাস।

জারুলতলায় মদনভেউএ নব জাতকের সুর হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ভুয়াংএর ঢিং ঢিং আওয়াজ ও ডাঁড় নাচে ঝম্‌কে ওঠে গোরামের থান। গরীব বাউরি মহালী খেড়িয়ার দল থেকে থেকে হেঁকে ওঠে, আকাশ থিইক্যা সুধা ঝরা মা। হিল হিল্যা ধানে ভাঙ্গর মাঠ ভঁরাই দিবি মা। কান্ডারী দৃষ্টি রাখে সুরধুনীর চোখে। হুঁই শোন উঁয়ারা ফসল মাগে। কান্ডারীর ক্লেদাক্ত মুখে চাঁদের পিচ্ছিল আলো। আমিও ফসল মাইগছি কান্ডার। কান্ডারী আশ্লিষ্ট হয়। ফসল দিবেক নাই? সুরধুনীর চোখে নীল ব্যথা। কান্ডারীর মনে অনিশ্চিত ভাবটা মরে নাই, আমি কি পাইরব! লেতাইরা বলে আমার খ্যামতা নাই। কান্ডারীর দাড়ির জটলায় মুক্তার মত স্বেদ বিন্দু। কণ্ঠার গর্তে জলের ধারা জমতে থাকে। সুরো তুমার ছেল্যার চইখ অমন পাথর পাথর হল্যো? সুরধুনী কাঁপে এবারে,

ইকি কথা বটে। তিইন তিইনটা মরদ হুঁই নাম দিইছে"। পাথর পারা হবেক নাই কাণ্ডার, ওকে আবিষ্ট করে তোলে। সুরধুনীর গলায় সেই ফিসফিস, কানা হক কালা হক উঁয়া আমার ছ্যানা বটে। আমার পানে অমন ভালচিস ক্যানে সুরো, কাণ্ডারীর দাড়ির জটলা থেকে ঘামের ঝরন সুরধুনীর নগ্ন বুকে বিন্দু বিন্দু। আকাশনিম পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের রুপালি আলো ভাসিয়ে দেয় সুরধুনীর ছোট্ট ঘরখানাকে। আলোর নরম বিজ কোমল তুলোর মত। তারই মাঝে শরীরের কিছু কিছু গোপন সুখ চাঁদের আলোয় সংঘারাম হয়ে কাণ্ডারীকে বিমোহিত করে। বিধ্বস্ত কাণ্ডারী এক সময় নিপীত হয়। ওর মধ্যে থেকে অভিরত ভাবটা যতই কাটতে থাকে ততই ওর দুর্বল শরীরটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। সুরধুনীর গলায় সেই এক ঘেঁয়ে সুরটা, একখান ছেইল্যা ভিখ মাগি কাণ্ডার। ওদিকে গোরামের থানে তখনও ফসল কামনায় মানুষজন, গোরাম মা জল দে, বাঁঝা জমিনে ফসল দে।

উৎপলকুমার বসু

একদিন, শীতের সকালে

ঐ যে পড়ে আছে অরুণার পেতলের বাঁশি।

খাওয়ার টেবিলের উপরে, কাচের গেলাস ও স্টীলের থালার ফাঁকে ঐ লুকিয়ে থাকা বাঁশিটি ভোরের স্বচ্ছ অন্ধকারে কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। সুরেশ শেষরাত্রে, বসারঘর অতিক্রম করে বাথরুম যাওয়ার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

এক ধরনের নৈসর্গিক আলো, পেন্সিলের মতো সরু একটা আলোর রেখা অনেকটা যেন স্পট লাইট এসে পড়েছে অরুণার বাঁশির উপর।

বাথরুম থেকে ফেরার পথেও ঐ এক দৃশ্য। সুরেশ দাঁড়িয়ে এক মিনিট চারপাশটা দেখে নেয়। শোয়ার ঘরের অনেকটাই নজরে পড়ছে এখান থেকে। আলনায় অরুণার পাট করে রাখা ইউনিফর্ম, সাইডের হুকে টাঙানো টুপি, ক্রশবেল্টের আভাস কিছুটা—অদূরে, খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছে অরুণা। পাশে গীতা শুয়ে, পা দুটো মা-র গায়ের উপর তুলে দিয়েছে, শোয়ার ভঙ্গি এত খারাপ মেয়েটার, আলাদা খাট করে দিতে হবে—এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুরেশ হঠাৎ পেতলের বাঁশিটা আঙুলে তুলে নেয় এবং বুক ভর্তি দম নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ফুঁ দেয় তার ফুটোয়।

সুরেশের ঐ একটা বদ অভ্যেস। বাঁশি দেখলেই ফুঁ দিতে চায়। ছেলেবেলার দোষ।

এবং সে বিদারক বাঁশি শুধু সুরেশের ফ্যামিলিকেই নয়—গান্ধী কলোনীর সুপ্ত, অর্ধসুপ্ত, বেটাছেলে, মেয়েছেলে, বালবাচ্চাকে যেন চমক দিয়ে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

সুরেশ মুচকি হাসে।

ধড়মড় করে খাট থেকে উঠে এসে অরুণা লক্ষ্য করে খাওয়ার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সুরেশ মুচকি মুচকি হাসছে।

'কি হল, ব্যাপারটা কি', অরুণা সুইচ টিপে আলো জ্বালে এবার। গীতাও খাট থেকে নেমে পড়েছে। কাঁদো কাঁদো ভীতু গলায় সেও জিজ্ঞেস

করে 'কি হ'ল মা ? কে হুইসিল বাজালো ?'

'কে আবার ! সব তাতে যার ছেলেমানুষি। তোমার কি কোনোদিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। এই সাত সকালে।'

বাইরে সিঁড়িতে ক্রমশ দু' একজনের পায়ের শব্দ। দরজায় কেন যে কেউ নক করলো না। আশ্চর্য। পাশের ফ্ল্যাটে হামানদিস্তেয় মশলা কোটার পাড় পড়ে। অর্থাৎ, সকাল হ'ল। আর দশটা দিনের মতোই এক স্বাভাবিক সরল দিন আজ।

আটটা নাগাদ নাস্তা। গীতার স্কুলের বাস সাড়ে আটটায়। সুরেশের দশটায়। অরুণার আজ থেকে ট্রেনিং সুরু। সে-ও ঐ দশটায়।

বাইরে যেমন ঠাণ্ডা, তেমন কুয়াশা। ঘরে আলো জ্বালাতে হয়েছে। পারিবারিক একটা সাজ সাজ রব। অন্তত সুরেশ নিয়োগীর আড়াই মানুষের সংসারে আজকের দিনটা আর দশটা দিনের মতো নয়।

আজ হল অরুণার চাকরির প্রথম দিন। বা, চাকরি পূর্ববর্তী ট্রেনিং-এর প্রথম সকাল।

গত দু' তিন মাস ধরে, সে-ই পুজোর সময় থেকেই, একটা চাপা উত্তেজনা—দরখাস্ত, ইন্টারভিউ, তদ্বির। ফলে ছুটিতে দেশে যাওয়া হ'ল না। চাকরি হয়-হয় অবস্থার উত্তেজনা কি কম। আরামবাগের পৈতৃক জমিটুকু বিক্রি করে দিয়ে সাউথ কলোনীর দিকে একটা ছোটোখাটো ফ্ল্যাট কেনার ডিপোজিটটুকু জমা দেওয়া যাবে কিনা—এ-হেন সুদূরপ্রসারী আলোচনাও সম্প্রতি বার দশেক ঘটেছে।

গীতার বাস এল আটটা পঁয়ত্রিশে।

নটায় সুটকেসে জিনিষপত্র ভরে অরুণা তৈরী।

প্রথম কিছুদিন তাকে ঐ পল্টনী পোষাকে পাড়াপ্রতিবেশীর সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে না। ক্যাম্পে গিয়ে বেশ পরিবর্তন। এবং সেখান থেকে ট্রাকে যমুনা ব্যাঙ্কসে, নেহেরু ট্রেনিং সেন্টারে।

'দুটোর মধ্যে ফিরে আসবো আমি', অরুণা বলে।

অর্থাৎ, গীতা স্কুল থেকে ফেরার আগেই।

'তোমার টিফিন কিচেনে ঢাকা দেওয়া আছে। ঠাণ্ডা হলে বাক্সে ভরে নিও।' অরুণার নির্দেশ।

'সন্ধ্যেবেলা গোপালদের বাড়ি যেতে হবে। ওরা একজন কাজের লোক দিতে পারে—সেদিন বলছিল। ফুল টাইম। কোথায় তাকে শুতে দেব

তা-ও জানি না।' অরুণা নিজের মনে কথা বলে।

'কিন্তু তুমি ক্যাম্পে যাবে কি করে?' সুরেশের প্রশ্ন।

'কেন? বাসে।'

'দরকার নেই। প্রথম দিন। অটোতে চলে যাও।'

'ও-সব বাবুয়ানি এ-চাকরিতে নয়। আমাদের টাফ্ হতে হবে।'

'সময় থাকলে স্কুটারেই পৌঁছে দিতাম।'

'যাওয়ার সময়টা খারাপ নয়। ফেরার সময় ঝামেলা। পুরো চাকরি সুরু হলে কি হবে জানি না।'

কি হবে তা আধাবিপ্লবী সুরেশ ভালোভাবেই জানে। সরকারই সব ব্যবস্থা করবেন। বাসের ব্যবস্থা! পিক্ আপ। পুল গাড়ি। মিলিটারী, পুলিস, গোয়েন্দা, সিকিউরিটি—এরা দুধেভাতে থাকবে—এতে আর আশ্চর্য কি।

দরজাটা হাল্কা হাতে টেনে দিয়ে অরুণা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। রাস্তা থেকে, বারান্দার দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়ে। সেখানে সুরেশ দাঁড়িয়ে।

এতক্ষণে সুরেশ হাতে খানিকটা সময় পায়। অন্তত খবরের কাগজটা পড়ার মতো সময়। আজ একটু দেরী করেও অফিস যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কাগজে এমন কিছু নেই যে তা নিয়ে মিনিট দশেকের বেশি সময় কাটানো চলে। অতএব স্নান, দাড়ি কামানো সেরে সে সময় মতোই অফিস যাওয়ার জন্য তৈরী।

তখন ঘড়িতে পৌনে দশ। প্রত্যেকদিন ঠিক এমনটিই তো হয়ে থাকে।

সুরেশ রান্নাঘরে ঢোকে টিফিন বাক্সে রুটি-ভাজি ভরে নেওয়ার জন্য।

ওখানে থালাবাসনের ফাঁকে আবার ঐ পিতলের বাঁশিটি। একটা কৌটো সরাতেই ঐ বাঁশি ছিটকে পড়ে মেঝেতে। তারপর গড়াতে গড়াতে প্রায় নালীর কাছে। চট করে তাকে ধরে ফ্যালে সুরেশ। হাতে তুলে নেয়।

অরুণা ভুল করে ফেলে গেছে। ভোরবেলায় তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। তারপর বোধহয় লুকিয়ে রেখেছিল রান্নাঘরে।

দ্যাখো কাণ্ড!

চাকরির প্রথম দিনেই এই অঘটন। দরকারী আইটেম এটা। অন্য সময় হলে সুরেশ নিশ্চয়ই হাল্কাগোছের একটা ফুঁ দিত ঐ বাঁশিতে। কিন্তু এখন সে ভাবতে বসে তার কর্তব্য কি। অরুণা বেশ ঝামেলায় পড়বে

সেন্টারে গিয়ে। সোনালী সুতোয় বাঁধা ঐ বাঁশি, কথা ছিল, ঝুলবে তার কাঁধ থেকে। কিন্তু, লুকোনো থাকবে পকেটে। জ্যাকেটের উপরের না নীচের, নাকি প্যান্টের পকেটে তা সুরেশ জানে না। অরুণাও জানে না।

ও-সব জানার জন্যেই তো ট্রেনিং।

কিন্তু, পুরো দোষটা কি সুরেশের নয়?

সে যদি সাত সকালে ঐ বিশ্রি ছেলেমানুষিটুকু না করতো। যা হোক, এখন উপায়।

উপায় একটাই। কোনো মতে ঐ বাঁশি অরুণার হাতে পেঁছে দেওয়া। ক্যাম্পে হোক, বা ট্রেনিং সেণ্টারে হোক বা প্যারেড গ্রাউন্ডে হোক।

অতএব, মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে সুরেশ অফিসে ফোন করে দেয় যে আজ তার আসতে দেরী হবে। বেশ কিছুটা দেরী হবে।

*　　*　　*　　*

কুয়াসা কেটে গিয়ে এখন চমৎকার রোদ উঠেছে। বেলা প্রায় এগারোটা। সুরেশের স্কুটার হু হু ক'রে ছুটে চলেছে। শহরের বাইরে গম ক্ষেত, তিসি ক্ষেত। এদিকটায় এখনো তেমন ঘরবাড়ি ওঠে নি। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। আসলে এই রাস্তাটা মিলিটারী অঞ্চলের দিকে গিয়েই শেষ। এটা কোনো হাইওয়ে নয়। অতএব নির্জন। কিছু অন-ডিউটি লরী, ট্রাকের যাতায়াত আছে।

দূরে যমুনার চরা। শাদা দাগের মতো। আরেকটু উপরে একটি হেলিকপ্টার উড়ছে।

এয়ার-বেস আছে কাছাকাছি কোথাও। কিন্তু কোথায় তা সুরেশ ঠিক জানে না।

বস্তুত এই অঞ্চলে কোথায় যে কি আছে তা সুরেশ একেবারেই জানে না। সাধারণ লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বা, হয়ত, জানা উচিত নয়।

সুতরাং পরবর্তী একঘণ্টা তাকে এ-দপ্তর ও-দপ্তর, এ-ঘাঁটি ও-ঘাঁটি ঘুরে বেড়াতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত এটুকু অন্তত জানা গেল যে নতুন রিক্রুটরা অনেক আগেই প্যারেড করার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ড বেশী দূরে নয় অবশ্য। নদীর ধারে।

প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছাকাছি পেঁছতেই সুরেশ যথার্থ বিস্মিত হয়।

এমন সবুজ মাঠ সম্ভব? প্রায় ময়দান। স্কুটার থামানো মাত্র ঘাসের সর সর শব্দ তার কানে আসে। শীতের প্রবল বাতাস বইছে মাঠ জুড়ে। দূরের ঘাসগুলো এতই লম্বা যে তার মধ্যে যেন শুয়ে থাকা যায়।

এদিকে কিছুটা বাবলার জঙ্গল। বড় বড় নিম গাছ। সিসু গাছ কয়েকটা।

একদল সোলজার দিগন্তরেখা বরাবর মার্চ করতে করতে সুরেশের দিকে এগিয়ে আসছে বটে, কিন্তু তারা ছেলে না মেয়ে বোঝা যাচ্ছে না।

ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে আসতেই সুরেশ স্কুটারটাকে দূরে ঘাসের ভিতর শুইয়ে দেয়। প্রায় লুকিয়ে ফ্যালে। নিজেও লুকিয়ে পড়ে একটা বিশাল গুঁড়ির আড়ালে।

তার এ-সব হাস্যকর কাজের যুক্তি পাওয়া কঠিন।

লুকিয়ে লুকিয়ে সুরেশ দ্যাখে ঐ সৈন্যদল মার্চ করতে করতে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ওদের হাতে রাইফেল। সামনে এক খর্বকায় তেজী জেনারেল। সুরেশের রোমাঞ্চ হয়। আতঙ্ক হয়। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে শুয়ে পড়ে সে মাটির উপর। আধশোয়া অবস্থায়, মাথাটা অল্প উঁচু করে সে দ্যাখে যে দলটা অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

অতএব তাকে আরো লুকিয়ে পড়তে হবে। বলের মতো সে ঝোপের উপর গড়াতে থাকে। রোল ক'রে একটা ছোটো মতো গর্তে ঢুকে পড়ে সে। এখানে তাকে কেউ দেখতে পাবে না।

কিন্তু সে-ও কিছু দেখতে পায় না। ভাবে, কান পেতে থাকি। হয়ত শোনা যাবে ভারী বুটের শব্দ। হয়ত কানে আসবে অস্ত্রের ধ্বনি।

কিন্তু আজ চারিদিকে শুধু ঘাস-পাতার ফিসফিসানি। নিমগাছের ঝির ঝির আওয়াজ। এই শীতে ঘেমে উঠেছে সুরেশ। উত্তেজনায় দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে তার। আধকোমর দাঁড়িয়ে উঠে সে দ্যাখে জেনারেলের অ্যাবাউট টার্ন চিৎকার শোনা মাত্র ঐ সৈন্যদল ঘুরে বিপরীত দিকে চলতে সুরু করেছে।

এ এক নতুন ধরনের ষড়যন্ত্র।

সৈন্যদল মার্চ করছে। ঘুরে ঘুরে, রোদ্দুর থেকে ছায়ার মধ্যে মিশে যাচ্ছে তারা। তারা আবার বেরিয়ে আসছে রোদ্দুরে। ডোরাকাটা বাঘের চামড়ার মতো ঐ আলোছায়াময় প্রান্তরে, খোপে খোপে, আলোর বৃত্তে, অন্ধকারের বর্তুলে তারা ঘুরছে। প্রায় নিঃশব্দ তাদের এ-কুচকাওয়াজ।

কেবল জেনারেলের হুঙ্কার, স্ফুট-অস্ফুট গর্জনের মতো, হয়ত বা এখান থেকে শোনা যায়।

সুরেশের ঘড়িতে বেলা প্রায় একটা। অরুণা নিশ্চয়ই এ-মাঠে নেই। তাছাড়া ওর বাড়ি ফেরারও সময় হয়েছে।

সুরেশ উঠে দাঁড়ায়। ধুলো ঝাড়ে।

ঘাসের জঙ্গল থেকে লুকিয়ে রাখা স্কুটারটাকে বের ক'রে ঠেলে তোলে রাস্তার উপর। রাস্তাটা দেখে নেয় ভালো করে। স্টার্ট দেয়।

দ্রুত পালানোর জন্য সে প্রস্তুত।

তারপর পকেট থেকে সুরেশ পেতলের হুইসিল বের ক'রে, একবুক দম নিয়ে, প্রচন্ড ফুঁ দেয় তার ফুটোয়।

চারিদিক যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে। মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়তে থাকে। কোথাও একটা কুকুর ডেকে ওঠে।

আর ঐ সৈন্যদল মাঠের মাঝখানে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ছুটে আসতে থাকে সুরেশের দিকে।

এই তো সুরেশ চেয়েছিল।

ধাবমান তার স্কুটারও লাফিয়ে উঠে পালাতে থাকে শহরের দিকে। অনেকটা দূর এগিয়ে এসে, বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা নুইয়ে সুরেশ ঘাড় ফিরিয়ে দ্যাখে সৈন্যরা পথের উপর উঠে পড়েছে। এলোমেলোভাবে ছুটো-ছুটি করছে। দু' একজন নিচু হয়ে, ঝুঁকে, মাটিতে কি যেন দেখছে।

সুবিমল মিশ্র

লদকালদকি

ইডেনের বাঁশ বনে ঠ্যাং তুলে মুততে মুততে আমাকে আর হেনাকে ঐ অবস্থায় দেখে হোমগার্ডটি,....এভাবে দুজনে কষ্ট করছেন কেন, বাড়ী থেকে বিছানাটা সংগে করে আনলেই তো পারতেন...., [সে কিন্তু ১০ টাকার নোটখানা পেয়ে একবারও আর চোখ তুলে তাকায় নি, এবং আরো দারুণ, টাকাটা ঐ বিস্রস্ত অবস্থায়ই, ডান হাত খানা আদৌ স্থানচ্যুত না করে এবং আমাকেও কোমরটা অন্তত ভদ্রস্থ করার সুযোগটুকু না দিয়ে, বাঁ হাতের দুটো আঙুল ঢুকিয়ে কোনোক্রমে বটুয়া থেকে হেনাই তুলে দিয়েছিল এবং এখনো ভাবলে মনে হয় আশ্চর্য, সত্যিই আশ্চর্য....] সে কিন্তু রোজ রাতে বৌকে,....বার-দুই, মানে লিগেল প্রসটিটিউশান শব্দটির অনুসংগ এভাবেই চলে আসে, যদিও বড় বেশী মোটা দাগে, আর সম্পর্কিত শব্দটি, চরিত্র-ও। এবং, এবং নীচের বর্ণিত ঘটনা তারপরের অংশ

[মুদ্রণ-নির্দেশ ঃ এই লেখায় ভালোবাসা শব্দটি সর্বদাই বিভাজিত শব্দরূপে, ভালো বাসায়, মুদ্রিত হবে]

জানালা দিয়ে রোদ আসে আর হেনা। এসে চা করে দেয়, ঘুমিয়ে থাকলে চুল ধরে টেনে তোলে, ঘরের ভেতর পায়রা ওড়ায়। হেনাকে আমি ভালো বাসি। হেনা তা জানে আর এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। হেনা আমাকে খারাপ বাসে না কেন? আমি জানি না। হেনা আমাকে খারাপ বাসলে তখনো কি এমনি করে চা করে দেবে, চুল ধরে টানাটানি করবে? আমি জানি না। আমি জানি আমি হেনাকে ভালো বাসি। হেনা আমাকে চা করে দেয়, ভাত রেঁধে দেয়, বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকলে চুল ধরে টানাটানি করে।

এখন আমার ভাবা উচিত হেনা আমার বৌ কিনা। দ্বিতীয় ভাবা উচিত হেনা আমার প্রেমিকা কিনা। এইসব ভাবলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়। কারণ হেনাকে আমি ভালো বাসি। সে আমাকে বাসে কিনা জানি না। তবে খারাপ বাসে না। তা তার ব্যবহারে টের পাওয়া যায়। হেনা যখন আমার ঘরে পায়রা ওড়ায় তখন তার চোখ মুখ জ্বল জ্বল করে। সে কোথাও সংকোচ করে না, চাদ্দিকে হুটোপুটি দাপাদাপি। তার আঁচল উড়ে ওঠে, জামা-কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়। আমাকে মাঝে মাঝে বলায়ঃ এই হেনা আস্তে···· আমার ঘরদোর উল্টে যাবে দরজা জানালা ভেঙে যাবে। হেনা কেয়ার করে না। বা করতে চায় না। লাফিয়ে টেবিলের ওপর ওঠে, পায়রার বুক দু হাতে চেপে রেখে জানালার দিকে ছেড়ে দেয়ঃ ফুড়ুৎ যা ফুড়ুৎ যা····। পায়রা যেতে পারে না। কেন না জানালায় শিক। দরজায় পর্দা। সে ফিরে এসে আবার আমার নীল পরীর ওপর বসে। ঘরময় তার পালক ওড়ে। সাদা পালক। হেনা লাফ দিয়ে টেবিল থেকে নেমে নীল পরীর ওপর বসা পায়রা ধরতে যায়। পায়রা উড়ে এসে ঝাপসা হয়ে আসা ঠাকুর্দার ছবিটার ওপর বসে। ছবিটা দোলে। আমি হাঁ হাঁ করে উঠি। কেননা ছবিটা আলগা, পুরনো। পড়ে যেতে পারে। হেনা ভ্রূক্ষেপ করে না।··· ওটা আলগা আছে, ভাঙবে····ভাঙলেই বা—হেনা এই রকম বলে। ঘরের ভেতরে তার আঁচল ওড়ে। রোদে ভাসে। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও করি না। কেন না করে লাভ নেই। ছবিটার ওপর থেকে পায়রা ধরতে গেলে ছবিখানা দারুণ দুলে ওঠে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে ঝনঝন—ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু পড়ে না। হেনা ডানহাতে পায়রাটাকে সাপটিয়ে ধরে বাঁ হাতে শাড়ি শায়া সামলাতে সামলাতে আবার টেবিলের ওপর উঠে পড়ে। উঠে আবার ফুড়ুৎ যা বলে। পায়রা ওড়ায়। এবার পায়রা জানালা থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। এসে আয়নার ওপর চুপটি করে বসে। জ্বল জ্বল চোখে চায়। ঘরময় তার খসে পড়া পালক উড়তে থাকে। কোনটা দোলে নৌকার মত ছলাৎ ছলাৎ, কোনটা ফুরফুরোয়, কাঁপে। এবার ওটাকে ছেড়ে দাও। খুব কাবু হয়ে গেছে। হেনা ছাড়ে না। যতক্ষণ না নিজে নিজে হাঁপিয়ে ওঠে ততক্ষণ এই খেলা চালিয়ে যায়। শেষে তার মুখ লালচে হয়। চুল উড়ে ওঠে। বুক ধস্ ধস্ করে। তখন জানালা খুলে সেদিনের মত পায়রাটাকে সে ছেড়ে দেয়। রোদ থাকলে পায়রাটা রোদের ভেতরে উড়ে ওঠে। হেনা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। আমি সিগারেট ধরাই।

এই রকম আমাদের হেনা। রোজ রোজ আমার ঘরে পায়রা ওড়ায়। ঘরের জিনিস গুছিয়ে রাখে। ঘুমিয়ে থাকলে ডেকে তোলে, না উঠলে চুল ধরে টানে। চা করে আনে। মাঝে মাঝে তার পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে আসে। বলে এর নাম অনুপম। একে আমার খুব ভালো লাগে। দ্যাখো ওর নাকটা কি সুন্দর! আর কি সুন্দর করেই না ও আমাকে চুমু খেতে পারে! বলে ও অনুপমের মুখের সামনে মুখ নামায়। ঠোঁটের সংগে ঠোঁট মিলিয়ে দেয়। তার চোখ জোড়া তখন ভারী মোলায়েম হয়ে যায়। হাত উঠে আসে কাঁধের ওপর। আমি সিগারেট ধরাই। হেনা এক সময় সরে আসে। বলে: ক্যামন চমৎকার না? কোন কোন দিন জ্বর হলে হেনা আমার মাথায় হাত রাখে। জলপটি দেয়। বলে: তুমি তো বার্লি পছন্দ করো না—পাতলা করে একটু কফি করে আনবো? হেনা কত সহজে আমাকে বুঝতে পারে ভেবে আনন্দ হয়। আমি সাদা পায়রার একটা পালক আনতে বলি। হেনা ঘর-খুঁজে নিয়ে আসে। এনে আমার কানের লতিতে বুকের লোমে বগলে পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। খুব আরাম হয় আমার। খুব ভালো লাগছে—দাও দাও আরো দাও। আমি বলি। হেনা দিতে থাকে।

মাসের প্রথমে হেনা এসে টাকা নিয়ে নেয়। টাকা আমার গোনা থাকে। হেনা এসে আবার গোনে। বাঁ হাতে থুতু লাগিয়ে দুবার করে দুদিক থেকে সে টাকা গোনে। তারপর বুকের শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজের ভেতরে খামটা ঢুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে বলে: জানো, তোমার মত ভালো লোক আর হয় না। বাবা কত তোমার সুখ্যাতি করেন। আমার চোখের দিকে তাকায়। সেই তাকানো দেখলে আমার ভেতরটা জ্বলে যায়। মনে হয় হেনার একটা কিছু সর্বনাশ করে চলে যাই। হেনা খুট খুট করে টেবিল সাজায়। বাতাসে তার আঁচল দোলে। সকাল বেলার খসে পড়া পালকগুলো এক জায়গায় জড়ো করে। পুরনো খবরের কাগজ গুছিয়ে রাখে এক কোণে। ছাইদান থেকে ছাই ফেলে দেয়। মুছে চকচকে করে আবার টেবিলে সাজিয়ে রাখে। তখন হেনার পেছল কোমর দেখা যায়। আমার ইচ্ছে হয় আমি এসবের একটা কিছু সর্বনাশ করে চলে যাই। আমি হেনাকে ভালো বাসি। কিন্তু হেনা বাসে কিনা জানি না। তবে খারাপ বাসে না। হেনা টাকা নেয়। শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে সেই টাকা।

এইভাবে দিন কাটে! হেনা রোজ রোজ আমার ঘরে পায়রা ওড়ায়। পায়রা উড়ে গিয়ে নীলপরীর ওপর বসে। হেনা ক্লান্ত হয়ে উঠলে সেদিনের

মত ছেড়ে দেয়। তারপর আবার একবার আমাকে চা করে দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করে। টেবিল গুছিয়ে দেয়। নটার সময় স্নানের জল তৈরী রেখে ডাকে। যাওয়ার সময় টাইয়ের গিঁট ঠিক করে দেয়। বুকে গুঁজে দেয় সদ্য-কাচানো সেনটেড রুমাল। আমি হেনাকে টাকা দিয়ে দিই। হেনা টাকা গুণে নেয়। শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে রাখে। মাঝে মাঝে তার পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে সিনেমায় যায়। এসে ছবির গল্প করে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে আসে। আমার ঘরে বসিয়ে তাকে চা করে দেয়। তার নাকের প্রশংসা করে। ....ও দশ মিনিট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব—বলে। ওকে চুমু খায়। খেতে খেতে হাত তুলে দেয় কাঁধের ওপর। আমি সিগারেট ধরাই। একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলি। আমার কোথাও কিছু একটা সর্বনাশ ঘটাতে ইচ্ছে হয়। হেনার আলগা কোমর—সেখানে বিঘৎমত ফাঁকা জায়গা। টাইট করে শায়া পরার দরুণ তা ফুলে থাকে। পায়রা ওড়াতে থাকলে বুকের আঁচল এলোমেলো হয়ে যায়। নীচু হয়ে কাপ ডিস তুলতে গেলে বুকের বাড়তি অংশ উদ্বৃত্ত হয়ে ওঠে। শাড়ীর চিকের ভেতর থেকে নাভি জ্বল জ্বল করে। ওখানে বুঝি তুমি প্রজাপতি লুকিয়ে রাখো? হেনা শুনে হাসে। দেখতে চাও! নাঃ। কেন? আমি তোমাকে ভালো বাসি। হেনা ভেংচি কাটে। শংকিত চোখে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে থাকে। তারপর একটা সাদা পালক নিয়ে অনেকক্ষণ অন্যমনস্কতায় নাড়ায়। দু-একবার সে তাকায় আমার চোখের দিকে। তারপর চলে যায়।

হেনার কথা মনে পড়লে বিছানায় আজকাল ঘুম হয় না। আলো জেলে সিগারেট ধরাই। হেনা টেবিলে জলের গ্লাস ঢাকা দিয়ে গেছে। নিখুঁত ভাবে সব করে রেখেছে যা করার। ভালো বাসা শব্দটার কথা আমার মনে হয়। ঠাকুর্দার ছবিটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে। নতুন করে বাঁধিয়ে আনতে হবে। কোম্পানীতে গোলমাল হচ্ছে যে-কোনদিন লকআউট হতে পারে। টাকা দিতে না পারলে হেনা কি থাকতে দেবে? গ্লাস তুলে ঢক ঢক করে জল খাই। অদূরে জেলখানার ঘড়িতে রাত দুটোর ঢং ঢং বাজে। একটা টিকটিকি ঠাকুর্দার ছবির ওপরে শিকারের সন্ধানে বসে থাকে। জানালায় দাঁড়ালে অন্ধকার রাত। দিনেরবেলা হলে হেনা এসে পায়রা ওড়াত। ছড়িয়ে দিত সাদা পালক। বন্ধ ঘরের ভেতর পায়রাটা ছটফট করত। হেনা টেবিলের ওপরে উঠে তাকে ওড়াত ঃ ফুড়ুৎ যা....।

ক্লান্ত হলে তার কপালে ঘাম জমত। মুখ চোখ লাল হয়ে যেত। শ্বাস পড়তো অস্বাভাবিক। মাসের প্রথমে হেনাকে টাকা দিতাম। হেনা গুণে গুণে নিত। ভাবতে থাকি। সিগারেট ধরাই। ঘুম আসে না। দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালে হাওয়া হয়। কপালে ফুরফুর চুল উড়তে থাকে। খালি গায়ে অল্প অল্প শীত করে। অদূরে স্টেশন থেকে শান্টিংয়ের শব্দ ভেসে আসে। বাচ্চাটার কান্না কখন থেমে গেছে। পায়ে পায়ে এগোই। এগোতে থাকি। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। উঠোন আর ঘর গুলিয়ে যায়। হাওয়ায় পা কাঁপে। তবু এগোতে থাকি। চোখে কিছু দেখি না। তবু এগোই। দরজার সামনে গিয়ে পড়লে গলগল করে ঘাম হতে থাকে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। হাত-পা নাড়াবার চেষ্টা করি। মনে হয় বহু যুগ থেকে আমার পা এখানে আটকে আছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করি। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। অসহায় আমি হেনার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে যাই। শুধু হাত পা ঝুলে থাকে শরীর বরাবর। অন্ধকারের ভেতর থেকে কোত্থেকে যেন সেই পায়রাটা উড়ে এসে আমার কাঁধের ওপর বসে। দেখি সেই সাদা পায়রা—যেটাকে হেন ওড়াত। আমি কাঁধ নাড়াতে পারি না। পায়রাটা ক্রমশ গলা বেয়ে মাথার দিকে উঠে আসতে থাকে। উঠে মাথার ওপর বসে। আমি নিরুপায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মাথার ওপর হেনার সেই সাদা পায়রা। এই প্রথম বুঝতে পারি পায়রাটার সারা অবয়ব হিংস্রতায় জ্বলজ্বল করছে। ঠুকরে আমার চোখ দুটো যেন উপড়ে নিতে চায়। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে হেনা আমার সামনে দাঁড়ায়। আমাকে দ্যাখে। শরীরে আলতো করে ফেলে রাখা শাড়ি।···· এখন ?····আমি তোমার একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে চাই ! হেনা আমার চোখের দিকে তাকায়। বলে ঃ বেশ তো। তারপর পায়রাটা আমার মাথার ওপর থেকে তুলে নিয়ে ব্লাউজের ভেতরে পুরে নেয়। ঠিক এমনি করে হেনা টাকা পুরে রাখে ওখানটায়। জ্যান্ত পায়রাটা বুকের মধ্যিখানে ছটফট করতে থাকে। ও সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। পায়রাটা একটু আগে অন্ধকারের ভেতর আমার চোখ দুটো ঠুকরে খেতে চেয়েছিল। ও আমার হাত ধরে টানে। চলো, ঘরে চলো। অক্লেশে হাত ধরে টানে। চলো, ঘরে চলো। অক্লেশে হাত ধরে ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। আমাকে খাটের ওপর বসিয়ে ও দরজা বন্ধ করে। কুঁজো থেকে জল

গড়িয়ে ও নিজে খায়, আমার দিকে ধরে ঃ জল—খাবে ? তারপর বড় আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালে। নীল আলোতে ঘরের সবকিছু নীল দেখায়। এমনকি ঠাকুর্দার ফ্যাকাসে ছবিটাও। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হেনা চুল খোলে। পিঠময় ছড়িয়ে পড়ে এলোচুল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখ দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়ানো আমার ভালো বাসার নীল হেনাকে আমি দেখি। আয়নার সামনে থেকে সরে এসে ও আমার কোল ঘেঁসে বসে। আমার চোখের দিকে চায়। আমি ওর কাঁধে হাত রাখি। তারপর কোমরে। প্রথমে কোমর থেকে নাটবল্টু খুলতে থাকি। ম্যাগনেটিক ফ্রেমটায় হাত ঠেকে। ঠিকঠাক সব সাজানো রয়েছে—কন্ডাকটারস, আর্মে-চার কোড। পরপর। কম্যুটেটারে হাত ঠেকতে কোমর থেকে ওটা খুলে আলাদা করে নিই। সতর্কতার সংগে হাত চালাই যাতে অস্থানে হাত না লাগে, বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ না হয়ে যায়। মাঝখানে আমাকে গ্লাভস্ পরে নিতে হয়। রবারের গ্লাভস্। তাতে কাজের রিস্ক অনেক কম। পোল কয়েল, ব্রাস, পোল কোর—একএক করে সমস্ত পার্টসগুলো খুলতে খুলতে আমি বুঝতে পারি নিপুণ লেদ মেসিনে তৈরী এসব যন্ত্রাংশ কী ভারবহনক্ষম আর কী নিখুঁত। এক এক করে পা কোমর বুক পেট গলা মাথার খুলি খুলতে খুলতে আমি বুঝতে পারি কত নিখুঁত কারিগরী জ্ঞানের সাহায্যে এই সেটটি তৈরী হয়েছিল যার যন্ত্রাংশ নিয়মিত কাজ দিয়ে গেছে, দরকারে অদরকারে আমাদের জন্য উৎপাদন করেছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। বুঝতে পেরে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। একটু বেশী পরিশ্রম করতে হয়, আর্মেচার কন্ডাকটার্স্ থেকে বিদ্যুৎ গছিয়ে নেয়া যে কম্যুটেটারের কাজ তা জয়েণ্টগুলো খুলতে খুলতে আমার জানা হয়ে যায়। ভালো কারিগরী জ্ঞান না থাকলে এসব অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে, আমি ভাবি। ক্রমশ বস্তুটির গঠন আমার কাছে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। এত সহজে এইসব লোহা লক্কড়কে নিয়ন্ত্রিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় দেখে আমি অবাক হই। ঠাকুর্দার ছবির ওপর তেমনি মাকড়শাটা বসে থাকে। চোখ তুলতে গেলে আমার চোখে পড়ে যায়! আমি সেদিকে না তাকিয়ে খুব মনযোগ দিয়ে পার্টসগুলো খুলে খুলে বিছানায় সাজিয়ে রাখতে থাকি।

মলয় রায়চৌধুরী

ইমলাহের স্বাদ

জামরুলের জলফিকে শাঁসের আঁচস্নিগ্ধ রঙে আকাশের দুপুর-ফাল্গুন যখন দুর্ধর্ষ হাওয়ার বহুমুখী শব্দে খরগোশের পদচিহ্ন অনুসরণকারী ধাবমান বাদামী নেকড়েদলের হিমতুষারের ওপর যূথবদ্ধ চিৎকার। ক্ষরণ-শক্তিহীন মেয়েদের অসাড় ছত্রাকসন্ততিঃ উদাসীন বিদ্যুৎচমক প্রতিহত হয়ে স্বতস্ফূর্ত কাঁঠালিচাঁপার সবুজ সুগন্ধ ফিরে আসে যখন, তার নিঃসন্তান প্রথম বউ-এর দুধ-বর্জিত স্তনে আমার মুখ দেখে বিরক্ত য়াসিন "—আমা ভোঁসাড়িকে ইন বংগালিয়োঁ কো তুমনে পতা নহী সর আঁখোপে"···

য়াসিন-এর কুকুরছানা বাঁদরবাচ্চা হাঁসমুর্গি ছাগল-ছানাদের সঙ্গে আমি হাঁটতে শিখি। হিটলারের য়োরোপ দখলের ভারসাম্যহীন আনন্দে, আমি য়াসিন-এর বড়িবিবির দেয়া নামে পাড়ায় হয়ে উঠি 'হিটুআ'। নাগাসাকির প্রথম কদম ফুলের খবরে আমার ওই নাম কেড়ে নিয়েছিল য়াসিন, বিড়ির কারিগর, সুপ্রসিদ্ধ কাওয়াল হবার স্বপ্নে সে। তারের জালের ওপরে ওল্টানো বিড়ির রশ্মিগন্ধী বানডিল তাত খায় লুকানো উনুনের। বড়ো বিবি, "ফিরংগি বনেগা হমমরু খোখোআ।"

বাঙালীত্বের খোকা থেকে আমার খোখোআ। খুপরিতে ঝোলানো ব্রিটিশ রাজার তেলচিটে ছবির দিকে তাকিয়ে, ছোটি অ্যাম্মি আমার মুখে তার কালো মাই গুঁজে দিয়েছিল। সেই থেকে আমার জিভে শুঁয়োপোকার ত্বকের আস্তরন। ছোড়দি আমায় দিয়ে যায় দিয়ে আসে নিয়ে যায় নিয়ে আসে। মালগাড়ির সোঁদা খড়ের ওপরে বসে জাবর চিবুতে থাকা গাভিনের গার্হস্থ্য-গম্ভীর আচ্ছন্নতায় ছোটি অ্যাম্মি কেননা সে নিঃসাড় এগিয়ে-আসা ভোরের উদীয়মান সূর্যরশ্মির মধ্যে কেবল সবুজ রঙের বর্ষা ঋতু খুঁজে পায়। জীবনময় সেঁদিয়ে যায় লৌহ রেলপথের আগাম হেঁয়ালি।

দাদা আর মা-এর সঙ্গে বালতি হাতে রাস্তার কল থেকে জল ভরতে

প্রতিদিনের হাতাহাতিতে দাদার পৈতে ছিঁড়ে গিয়ে খরচ বাড়লে, আমাদের বাড়িতে পৈতের রেওয়াজ উঠে যায়। আমার জারজ খুড়তুতো ভাই বুড়ো আর দাদা, রাস্তা থেকে কাগজ কুড়িয়ে পাটের দড়িবাঁধা ফুটবল খেলতে কুলুঙ্গিতে রাখা দেবতাদের ছবি ভেঙে ফেলে একে একে ; তখনই য়াসিন-এর বড় ছেলে হালিম পুলিশে চাকরি পেয়ে একদিন শিখিয়ে যায় চুতিয়া আর ভোঁসড়িওয়ালার ধীমান তফাত। চার বছর বয়সে দেখি দোলের দিন, খড়ের তৈরি লাশের ছয় ফিট লম্বা বাদাবাহার লিঙ্গের শিশ্নপ্রদেশ থেকে ষাঁড় চিৎকারে আচমকা দাড়িসুদ্ধু মুখ বের করে য়াসিন, "বমভোলে।" এবং দোলের পরের দিন হালিম, জ্বলন্ত বিড়ি তার আব্বাকে দেখিয়ে, "ভ্যায়নচো জলতি হুই বিড়ি ঘুঁসেড় দেতা হুঁ যব ইন আজাদিয়োঁ কে দরার-এ গোশ্‌ত মেঁ, ক্যা বতাউঁ, সালে অংগরেজ ভগানে আয়ে হ্যাঁয়, ইসকিমাকা।"

"এক দরিন্দে কো পিটকে বরোব্বর কর দি হমলোগোঁ নে কল।"

য়াসিনের বিড়ির দোকান উঠে যায়। আমার ওলাউঠা হয়ে যায় নর্দমা থেকে তিতকুটে ফানুস তুলে ফোলাবার দরুণ। য়াসিন-এর এবার লাটাই লাট্টু বেলুন লজেনচুষ। রাত্তিরে নারায়ে তকদির ও বজরঙ্গবলীর সুচারু আগুন। নৈশ কারফুর নিথর জ্যোৎস্নায় কান পাতা দায়। মধ্যরাতে চুপিসাড়ে পলায়মান মানুষগবাদির খুরের অসহায় চাপে, ঘাসের হলুদ বেগুনি ফুল বের করে আনে। বেহুঁশ বাতাসে শরতের খোনাস্বর মেঘের বেওয়ারিশ ফুর্তি। কোতোয়ালি নির্ভর শহর সভ্যতা।

য়াসিন ফখরুল কম্মোবিবিদের বাড়িচালায় আগুন ধরিয়ে লল্লু যাদব ঘাম পুঁছতে পুঁছতে "লঅ অব পক্‌তিনিয়াকে ইসতান অব গইল ভঁয়েস পানিয়াকে ছবিলওয়ামে", আবঅ কেকরু মতাড়ি বাঘিন হই" এবং উন্মুক্ত উরুর ওপরে ডান তালুর ঝকমকি-আবিষ্কারক আদরচাপড়। আগুনের কাঁপানো হল্কায় শেকলে বাঁধা য়াসিন-এর ফেলে-যাওয়া বাঁদরীর পেছন থেকে আলতা মেশানো ভাতের ফ্যান আর দুটো একরত্তি বাঁদর হঠাৎ ঝুলতে থাকে ; দুর্নিরীক্ষ্য চালাবাড়ির সশব্দে হুমড়ি খাওয়া। লল্লু : "বনরিয়াকে খইলস্‌ মোমিন্‌ওয়াকে গঁড়বতনিয়া।"

ভোরবেলা উদোম লল্লু ভুঁড়িতে বর্শাফলকসুদ্দু আকাশের দিকে

বিভোর চোখে নর্দমায়, জননেন্দ্রিয় নিশ্চিহ্ন আমূল।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও আমাদের সবাইকে আজীবন মুণ্ডু নাড়ার অসুখ দিয়ে বিহারী মুসলমান হবার জন্যে পদ্মামেঘনার দিকে চলে যায় য়াসিনরা। পলিমাটিতে অশ্বক্ষুরের দাগ দিনশেষে হয়ে ওঠে শ্বাপদের ছায়াপথিক থাবা। বিদেশের নতুন স্বদেশে পেঁছলে, সেখানের লোকেরা তাকে, "হালার পো, রক্ত কণিকায় কেবল লোহা আনছস! কেন, সোনা নাই? চানদি নাই? তাম্বা নাই?" তাইতে য়াসিন-এর ফেলে-আসা দেশে মোহনদাস করমচন্দ ঃ "হে রাম"। গোস্বামী তুলসীদাস-ও, জন্মের পরেই, যখন উল্টো টাঙিয়ে তাঁর পাছায় চাপড় মারা হচ্ছে, "এঃ রাম! পোঁদে হাত দিস বাচ্চা ছেলেদের, লজ্জা করে না?" জলের ওপরে হেঁটে যায় নির্ভার সমুদ্রতিতির। মানুষের অসহায় সৌরবার্ধক্য। ভবিষ্যত কেন যে বিমূর্ত থেকে যায়!

নদীমাতৃক জীবনের পরিচয় পেতে, সাঁতার শিখতে গিয়ে, জেটির ওপর থেকে যখন জলেতে ঝাঁপায় হালিম, লোহার নোঙরের উদগ্র ফলক তার হাড়পাঁজর চুরমার করে নরম গোলাপী হৃৎপিণ্ডে। জলেতে, রক্তের মিশ-খাওয়া। উট এবং খেজুর গাছ এবং মরুপ্রান্তর এবং তাঁবু। মর্স কোড এবং বাইনারি কোড। গভীর রাতে, পেয়ারার কুঁড়ি ফাটার নিটোল শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে রজাকর য়াসিন। আক্রোশের বশীকরণে, প্রৌঢ়ত্বের শেষে, অনন্তের নির্গন্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ যখন প্রাণীজ জ্যোৎস্না উদ্রেক করে, স্ত্রীলোক ও শিশুর রক্তে টাঙ্গির দ্রবণশীল বর্ণময়তা। ঝোপের জংলা গন্ধে সে লুকিয়ে থাকে, লুঙ্গির খুঁটের বুটির শুকনো টুকরো খায়; অলস দুপুরে লোহার ছররা মুখে নিয়ে কুলকুচির শব্দ তোলে পুরুষ-ঘুঘু-পাখী। উড্ডীয়মান নীলিমায় দূরত্বের ভালোলাগা নিয়ে আকাশচারী শকুন, অগুন্তি অগণন অজস্র।

বালক-বাজপাখীরা তাদের নতুন নখ পরখ করে শিশু-কাছিমের তলপেটে।

জয় বাংলা চিৎকার শুনতে পায় য়াসিন। তার হোগলা-দরমার আগুন-ঘেরা বাসা। আগুন দেখতে পাওয়া মানুষের অপরিবর্তনীয় প্রাক্-

ঐতিহাসিক গোঙানিভয়, নষ্টাতঙ্ক ; পুষ্পনাবালক ঃ অসুস্থ জামাকাপড় ঃ শোকের মোকাবিলা করার আসকারাপ্রাপ্ত ক্রোধ।

য়াসিন হারিয়ে যেতে চায়।

গোয়ালন্দের আধোশীত অন্ধকারে ছোটি অ্যম্মির আলুলায়িত চুলের গোছা জড়িয়ে যায় ধাবমান লঞ্চের ঘূরন্ত মোটরে। আর্তনাদের শেষ জাদুসম্মোহনে চুল সুদ্দু সমগ্র মুখশ্রীর প্রবাল সৌন্দর্যে স্তব্ধতরঙ্গ মাঝ-নদীতে উলটে যায় আশ্রয়প্রার্থী লঞ্চ এবং পলায়মান মানবছিন্নাংশ। জলের বেহাল ছলকশব্দ। সোনালী কাঁড়ির মাংসল শরীর।

বিহারের মোতিহারি জেলার সুগউলিতে, চিনির মিল ইন্সপেকশনে গিয়ে, টায়ার লাগানো আখ বোঝাই গরুর গাড়িতে দেখি য়াসিন, রুপোর জরি দিয়ে তৈরি দাড়ি, কুচকুচে জাগুয়ারের চামড়ার গোঁফ, দুই চোখে রোমশ পাথুরিয়া আহ্লাদ। মানুষের দিকে মানুষের চকিত চাউনির ভেতরে রোমক গ্রীক আসিরীয় ব্যাবিলনীয় হিন্দু পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষ ও ধ্বংস-মুহূর্তে যুগপৎ ঃ পলক ফেলে দিয়ে তুলে নেবার আগেই, ৫০০০ বছর ব্যাপী দীর্ঘশ্বাসের পীড়া।

আখ বয়ে নিয়ে যাওয়া আঠারো ফিট চওড়া কনভেয়র বেল্টের কান-ধাঁধানো ধ্বনির তীব্রতায়, য়াসিন-এর কথা কিছু শুনতে পাইনা। গরুর গাড়িগুলো থেকে নামিয়ে দেয়া নধর আখ চলমান কনভেয়র বেল্টের শেষে খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে বিশাল ঝকঝকে ইস্পাতের গিলোটিনের হুঙ্কারে। আমি চেঁচাই "অ্যমা য়াস্‌িন মিঞা ! য়ঁহা ? কব্‌সে ?" এবার কাছে গিয়ে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুনতে পাই, "আরে খোখোয়া, কতো ডাগর হইছস ! হেথায় আসতাসি বহুকাল। শুনো নাই একুশে ফেবরুয়ারি ? সেই তখন থিক্যা।" "অ্যমা চচাজান, য়হ বঙলা আপ কব্‌সে বোলনে লগে ?" "হা-হা, বিয়া করসি বাংগালি মাইয়ারে, চার কোস দূরে গাঁও লালপুর।" "বাকি লোগ সব কহা গয়ে ? বড়ি-ছোটি অ্যম্মি, বচ্চে ?"

গরুর গাড়িতে ডাঁই-করা কলজেরঙা আখের আঁটির ওপর দাঁড়িয়ে, এক

পা তুলে নটরাজের ভঙ্গীতে আকাশ স্পর্শ করে কিছু বলতে গিয়ে, টাল সামলাতে না পেরে, ছুটন্ত কনভেয়র বেল্টের আখের গাদার ওপরে ছিটকে পড়ে য়াসিন। দাঁড়াবার চেষ্টা। দাঁড়ায়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছুটতে থাকে। পড়ে যায়। মুক এগিয়ে যায় যন্ত্রগম্ভীর ধারালো ব্লেডের দিকে। "ভিখারিয়া, বিজলি বন্দ করিহ, এগো কিসান গিরলই" ম্যানেজারের হুঁশ-আগমনী ধাতব চিৎকারে, আমি মিল-এর মেশিন ঘরে দৌড়োই যেখানে ঘুরন্ত পাত্রের মধ্যে আখের তপ্ত তরল মোলায়েম রস দানা বাঁধে। কেলাসিত স্বচ্ছতায় ঝুঁকে পড়ি, মানুষের রক্তের লাল প্রভাযুক্ত শর্করার আশঙ্কায়, উত্তপ্ত প্রায়ান্ধকারে ঘাড় নামিয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর খেয়াল হয় বৃত্তাকার নৈঃশব্দ্য নিসর্গের মতো ঘিরে ধরেছে যন্ত্রের কণ্ঠস্বর। নবজাত প্রজাপতির আধভেজা ডানার মতন নরম চিনি কণা ; যুবতীর স্নান শেষ ঠোঁটের মতন ফিকে ; শিশুর পদতলের রশ্মিগন্ধী বর্ণের চলনমাধুর্য।

উদয়ন ঘোষ

ডিজি ওরফে দোলগোবিন্দ মার্চের শেষ তারিখে টের পেল, তার গায়ে উকুন হয়েছে। তখন ১৯৭০। নর্থ-বেংগল, আন্দামান নিকোবর হয়ে পশ্চিমবংগের সাউথ ও ওয়েষ্টের দুটি বড় মহকুমার এ.ডি.এম. থেকে সবে সে যখন একটি গরীব টারবুলেন্ট ডিস্ট্রিক্টের চার্জ পেল, তখনি এর শুরু —ভাবা যায়? প্রকৃত রাইজের সময় এই ঘটনা তার স্বভাবতই বড় অমঙ্গল লাগে।

বাবারও এমন হয়েছিল, এই গায়ে উকুন। বাবার যে বিধবা বড় বোন, বিয়ের পিঁড়িতেই বলা যায় যার সর্বনাশ হয়েছিল, সেই পিশিমা বলেছিল, এ বড় অমঙ্গল, এই গায়ে উকুন। বাবাকে রোজ গোবর জলে স্নান করতে হয়, এতে নাকি উকুন যায় ও অমঙ্গল গায়ে লাগে না। কিন্তু উকুন তাতে যায়নি. মঙ্গলও কিছু হয়নি। অন্তত বাবা বেঁচে থাকতে তার তো কিছু ভালো হয়নি! শুধু স্কুলে ফুল ফ্রিশিপ ছাড়া, মনে পড়ে না আর কোন সৌভাগ্য তার হয়েছিল কিনা! বাবা মারা যাবার পর, মনে আছে ভালো, শ্মশানে তাঁর নগ্ন শরীরে যখন মধু মাখিয়েছিল দোলগোবিন্দ, তখন সারা গায়ে কালো তিলের মতো অজস্র উকুন সে দেখেছিল। মরদেহে তখনো সব উকুনই বেঁচে। সে মধু মাখাতে গিয়ে টের পেয়েছিল। তাই বলে উকুনেরা গায়ে লেগে লেগেই থাকতে পারেনি। প্রায় বোঝা না যাওয়ার মতো খুব ধীরে চলে বেড়াচ্ছিল। যেন তারা অন্য কোথাও যেতে চায় অন্য কোনোখানে। সে অবশ্য একটা উকুনকেও চলে যেতে দেয়নি। অজস্র জ্যান্ত উকুন সহ বাবা চিতায় পুড়েছিল।

ভেবেছিল, বুঝি অমঙ্গল গেল। গিয়েও ছিল। কেননা তার পরপরই সে পেল বৃত্তি, যা সিডিউল্ড্ কাষ্টরা পায়। তার এই হকের বৃত্তি পর্যন্ত আটকে ছিল তার বাবার জন্য।

ঠিক তার বাবার জন্য ভাবলে বড় ভুল হয়ে যাবে, এই গায়ে উকুনের জন্য যা কিনা গোল ও ছ'পেয়ে হয়। অবশ্য সবাই যে গোল তা নয়,

তার নিজের গায়ের উকুনরা সবাই গেল না। যারা গায়ের লোমের সংগে থাকে তারা অনেকটা চোরকাঁটার মতো। নোখের উপর রেখে নোখ দিয়ে টিপলে এমন আশ্চর্য্য শব্দ হয় যে ভাবা যায় না। মনে হয় শক্ত কিছু ফেটে গেল। যেটুকু রস বা রক্ত নোখে লাগে, তার রং কালো। কালো কেন, আজও জানতে পারেনি ডিজি। বরাবরই তার পড়াশুনোর হবি। এ বিষয়ে পড়ে দেখেছে, এই হিউম্যান প্যারাসাইটের উপর ; না কোথাও লেখা নেই, কেন মানুষের লাল রক্ত উকুনের পেটে গিয়ে কালো হয়ে যায়। অথচ ওরা রক্ত ছাড়া আর কিছু খায় না, একথা সর্বত্র লেখা। এরা আঠার মতো মানুষের গায়ে লেগে থাকে। আর ডিম পাড়ে অজস্র। ডিম পাড়ে গায়ের লোমে। অর্থাৎ ঐ চোরকাঁটার মতো উকুনগুলো, বলা ভালো, ওদের ডিম, যে জন্য অমন শব্দ হয়, অনেকটা ঠুকে ডিম ফাটানোর মতো শব্দ। এরকম শব্দ করে ওদের মারতে প্রায় শত্রু খতম করার আনন্দ হয়। অনেকটা দুষ্ট দমন করার মতো। মোট কথা ভালো লাগে।

কিন্তু তাদের পুরো ধ্বংস করা এককথায় অসম্ভব। পিশিমা বলত, ওরা রাক্ষস। ওদের এক ফোঁটা রক্তে হাজার হাজার রাক্ষস জন্মায়। ওদের রক্ত মানে তো মানুষেরই রক্ত। অর্থাৎ মানুষের রক্ত উকুনের পেটে গিয়ে রাক্ষসের রক্ত হয়ে যায়। মানুষ তাহলে সব পারে। রাক্ষসও হতে পারে আবার রাক্ষস মারতেও পারে। তবে নির্বংশ করা মানুষের কাজ না। অবতারদেরও কাজ না। অবতার তো কম জন্মালো না এই দেশে! কিন্তু তবু দুষ্টেরা থেকে গেছে। রাক্ষসেরাও। পিশিমা বলত, রামের অভিশাপে অতিকায় রাক্ষসেরা ক্ষুদে হয়ে মশা, ছারপোকা ও উকুন হয়েছে। তারা আসলে রাক্ষসেরই জাত। রামাবতার রাক্ষসদের একেবারে নির্বংশ করতে না পেরে এই শাস্তি দিয়েছেন, তারা ক্ষুদে হয়ে পৃথিবীতে থাকবে। কিন্তু এই অভিশাপ, অবতারদের আরও অনেক কাজের মতো, আশীর্বাদ হয়ে গেছে। কেননা ক্ষুদে হয়ে তারা তো বেঁচে বর্তে আছে এবং আড়ালে নিরাপদেই আছে বলা যায়। কেন যে মানুষ তবু অবতার পুজো করে!

দুনিয়ার সবাই করে না, এই যা সান্ত্বনা। যারা করে তারাও আবার মাঝে মধ্যে 'অবতার' শব্দ নিয়ে ঠাট্টাও কিছু কম করে না।

অন্তত তাকে নিয়ে তো করেই। আন্দামান-নিকোবরে, প্রবেশনাল পিরিয়ডে, তার নাম হয়েছিল বামনাবতার। সে নাম আজও তার পেছনে

লেগে আছে। তার অধস্তনেরা আড়ালে আজও বলে, বামনাবতার। কী করে ঐ সাগর পেরিয়ে এই নাম স্থলভূমিতে চলে এল আজো ভেবে পায় না ডিজি। যেখানে গেছে, সেখানেই এ নাম ১ম দিন থেকেই অধস্তনদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে অধস্তনদের অর্গানাইজেশনের তুলনা হয় না। তার যে রাগ হয় না এমন নয়, বরং খুবই রাগ হয় কিন্তু চেপে রাখে! সে ভালোই জানে এ নিয়ে ১৯/২০ হম্বিতম্বিও তাকে আরও অপদস্থ করবে। তার ঐ নাম আসলে ইংরেজি করলে ভালোই দাঁড়ায় কিন্তু। কেননা বামনাবতারের ইংরেজি তো হাই-এ্যাম্বিশন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' থেকেই তো কথাটা এসেছে।

আসা স্বাভাবিক। কেননা সে তো আই.এ.এস.-এ স্ট্যাণ্ড করেছে বস্তুত সিডিউল্ড কাস্টের পুল থেকে, নতুবা কোথায় সে পড়ে থাকত, ভাবলে আঁতকে উঠতে হয়।

কিন্তু আজ তার হাত প্রকৃতই চাঁদে।

স্কুলে কি কম অপমানিত হয়েছে দোলগোবিন্দ এই সিডিউল্ড কাস্ট নিয়ে। পণ্ডিত মশাই তো ভুলেও কখনো তাকে নাম ধরে ডাকতেন না, এই যে শূদ্র, এই ছিল তাঁর সম্বোধন। ক্লাসের বামুন কায়েতরা কখনো টিফিন ভাগ করে তাকে দিয়েছে মনে পড়ে না। অন্তত ১৯৪৭ পর্যন্ত তো দেয়নি! ১৯৪৮-এও না। ১৯৫০-এ দিয়েছে। তাও তারা বাঙ্গাল বামুন-কায়েত। পূর্ববংগ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে যারা পশ্চিমবঙ্গকে বদলে দিয়েছিল। অবশ্য তারা নিজেদের গাঁয়ে কী ছিল কে জানে! অন্তত একজনকে সে ত' ভালোই জানে যে 'সেন' হয়ে এফিডেবিড করে 'সেনদাস' হয়েছিল ও সিডিউল্ড কাস্টের সুযোগ-সুবিধেগুলি পেয়েছিল। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে এর উল্টোটাও হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ১৯৫০-এর আগে? উঃ, ভাবলে এখন গায়ের রক্ত টগবগ করে। তার দোলগোবিন্দ নাম নিয়ে, তার পদবী সাহা নিয়ে কম নাকাল করেছে তারা? শূন্যে ঘুঁসি মেরে তাদের জখম করতে সাধ হয়। একবার পেলে হয় হাতে-নাতে। কিন্তু পাবার আশা নেই, তার হোম-ডিষ্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদে, যে জেলা ১৯৪৭-এর ১৫ আগষ্টে পাকিস্তানে ছিল, যাবার ইচ্ছে নেই কোনদিন। বড় খারাপ জেলা। পাকিস্তানে ৩ দিন থাকা মুসলমান তো আছেই, তাছাড়া আবার আর.এস.পি.'র জেলা। এই পার্টি অযথা লোক জড়ো করে ডি.এম.-দের ভোগায়। যদিও তালুকদার, অন্নদাশংকর রায়ের মতো কেরিয়ার সেখানে

তৈরী হয়েছে, তবু। এখন অবশ্য সেখানে আর.এস.পি.'র প্রতাপ গেছে কিন্তু আরেক ঘুঘু আছে, তার নাম সম্বল সান্যাল। কিছু হলেই দিল্লীর রাজ্যসভায় উঁকিলী মারপ্যাঁচে এমন ইংরেজী ঝাড়বে যে আর তিষ্টোতে হবে না। কাগজে হেডলাইন হয়ে যাবে সে।

এখনো এই ১৯৫০এও ডি.এম. কাগজের হেডলাইন হলে সেক্রেটারিয়েট বা সি.বি.আই. ভালো চোখে দেখে না। সেই ইংরেজ আমল থেকে এই ট্র্যাডিশন চলে আসছে। তবু একবার যদি যাওয়া যেত মুর্শিদাবাদ, অন্তত কাউকে ৩০ দিনের মতো রিলিফ দিতেও, তাহলে দেখে নিত সে, অন্তত কয়েকজনকে সায়েস্তা তো করতই।

এ-সব সে পারে। আর প্যারে বলেই আজ এই টারবুলেন্ট ডিষ্ট্রিক্টের চার্জ পেয়েছে। কেননা এখানেও কয়েকজনকে সায়েস্তা করা দরকার। তারা অবশ্য আরও ভয়ংকর জীব, তাদেরও ডাকনাম আছে, যা নকশাল।

বলা যেতে পারে তার এই সদ্য ডি.এম. হওয়ার ডাকনামও 'অপারেশন নকশাল'।

সি.বি.আই.-এর সুপারিশে সেক্রেটারিয়েট অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক রেকর্ড খুঁটিয়ে দেখে, তাকে এই ভার দিয়েছে।

সে পারবে।

কিন্তু তার কেরিয়ার গড়ার এই সুসময়ে যখন তার আত্মবিশ্বাস প্রায় আকাশছোঁয়া, তখন এই সুসময়ে, হায়, গায়ে কেন উকুন হল?

এটা অবশ্য ঠিক, তার আত্মবিশ্বাস আজন্মই আকাশছোঁয়া। সে যখন স্কুলে পড়ে ক্লাশ সেভেনে, তখন ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। বহরমপুরে তাদের স্কুলের কাছে ঐ মিশনের ছিল বিরাট লাইব্রেরী....যেখান থেকে তার সেই হবি গড়ে ওঠে, যার দৌলতে সে সব পেয়েছে—এস্টাব্লিসমেন্ট, আই.কিউ., বিচক্ষণতা, আরতি তার স্ত্রী, সব, সবই।

অবশ্য এই হবিই আবার পরোক্ষে তাকে ঐ নাম দিয়েছে। যা 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' প্রবাদ বাক্য ছুঁয়ে তাকে দিয়েছে সেই নাম, 'বামনাবতার'।

হ্যাঁ, বই থেকেই, বই থেকেই সে শিখেছে কালচার, শিখেছে কী করে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে হয়। এ ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথ, তারপরেই ডেল কার্নেগি। অবশ্য পারকিনশনও আছেন!

তেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে লেনিন, স্তালিন, মাও, লিন পিয়াও, লু-সুন, হো-চি-মিন, গিয়াপ, চে গুয়েভারা, এনভার হোক্সা, নর্মান বেথুন, আন্তনিও গ্রামচি, আলবের কামু, ব্রেখ্‌ট্‌, জাঁপল সার্ত্রে এমন কি আলবার্তো মোরাভিয়া ও হ্যারল্ড রবিন্সকেও জানাতে হয়। তবে নানা কারণে উইনষ্টন চার্চিল বারট্রেন্ড রাসেলের নাম সে আলাদা ভাবে ভাবতে চায় এবং টয়েনবির নামও। এরা সকলে মিলে তাকে আর্বান করেছে। ভাবা যায় মুর্শিদাবাদের ছেলে শুধু বই পড়ে আর্বান হল ?

শুধু কি তাই ? তার আর্বানিটির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যায় হেরল্ড রবিন্‌সের জোনাস কর্ডের, যার অ্যাম্বিশন ও এলিয়েনেশন দুটোই ইকোয়াল ও অপোজিট হয়ে তাকে যে রি-অ্যাকশন দিয়েছিল, তাতে তার চাঁদে হাত দেওয়া অসম্ভব নয়। যেমন অসম্ভব ছিল না বদ্যির মেয়েকে বিয়ে করা। আরতি তো সেকালে, বলা ভালো যে চাঁদই ছিল এবং তাকে ছোঁয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সে-ই পেরেছিল ছুঁতে।

কেউ তা জানত না বলেই তাকে বামন বলত এবং যখন আরতিকে সে বিয়ে করল ঐ আন্দামানেই, তখন বাধ্য হয়ে অধস্তনেরা তাকে শুধু বামন না বলে বলত বামনাবতার। সেই অবতার, রাম যেমন ছিলেন। রাক্ষস বধের জন্য যার লক্ষ জন্ম। অথচ যে পারেনি রাক্ষসদের নির্বংশ করতে। বিভীষণ থেকে গেল। রাম স্বয়ং তাকে রাখলেন। এর নামই তো হরি যাকে রাখে।

কিন্তু পিশিমার মতে, রোজ একটা করে উকুন মারলে ওরা একদিন নির্বংশ হবেই। বাবা সেইমত রোজ সকালে, কেউ ঘুম থেকে জাগবার আগেই ১টি করে গায়ের উকুন মারতেন। তখন সূর্য উঠত না। পিশিমার স্ট্র্যাটেজি খাটেনি। অবশ্য বলা যায় না, বাবা ধৈর্য ধরতেন কিনা। কেননা রোজ একটাই, তার বেশি না। অথচ প্রত্যহ। একদিন বাদ না। এভাবে কি সম্ভব ?

আজ এই দোলগোবিন্দ বোঝে, এভাবে সম্ভব না। সেও চেষ্টা করেছিল প্রথম প্রথম, টের পেয়ে। শেষ রাত্রে কাকপক্ষি টের পাবার আগে বা

ডাকবার আগে সেও একটাই মারত, রোজ। কিন্তু দিন কয়েক যাবার পর পারা যায়নি। স্নানের পর গা মুছতে সে না মেরে পারেনি গোটা কয়েক। যারা পায়ের হাঁটুর উপরে অজস্র লোমের পাশাপাশি কালো তিলের মতো বেড়াল-তপস্বী হয়ে ছিল টুসটুসে হয়ে....পারেনি না মেরে; বাবাও বোধহয় এমন করে মেরেছে একের বেশি যে জন্য নির্বংশ হয়নি। আমৃত্যু থেকে গেছে তারা। এমন তো হতে পারে মৃত্যুর পরও থেকে গেছে বহুকাল। চিতাতেও পোড়েনি সব। কিছু থেকে গেছে তার অমেয় আঙ্গুলে জড়িয়ে, তারপর আড়ালে থেকে এতদিন সুযোগ খুঁজছিল। এখন তার গায়ে সুযোগ মত জেগে উঠেছে।

সত্যিই কি তাই? সেই কবে বাবার সারা গায়ে মধু মাখাবার সময়। বলা ভালো বাবার সারা লোমে মধু মাখাবার সময়! উঃ, অতো লোম মানুষের শরীরে থাকতে পারে, ভাবা যায় না। গোরিলা বা প্রায় তার কাছাকাছি প্রজাতি এপ-ম্যান থেকে আসা মানুষ কবেই তো সারা গায়ের লোম থেকে উঠে এসেছিল আদি নর্ডিক হয়ে ও আল্প্স পর্বত ডিঙিয়ে তারাই তো সেই জাত, সাহেব হয়ে যারা টেকসাস্ হতে পেরেছিল কলম্বাসের ভুল স্বর্গ আমেরিকায়? আর আমরা? আমরা এই বাঙালীরা, আদি অষ্ট্রিক, অনার্য, ব্রাত্য, ইতরজনেরা? আঃ কেন পারলাম না ঐ কোটি কোটি ব্যাকওয়ার্ড ডার্ক কণ্টিনেণ্টাল লোমরাজি থেকে বেরিয়ে আসতে? কেন? কেন?

ডি জি ওরফে দোলগোবিন্দর বহুদিন পর এইসব ভেবে একধরনের দুঃখী ক্রোধ হল, যা কিনা কিছুদিন হলেই অভিমান করবে। হ্যাঁ অভিমান করবে বই কি! এত পড়ে, এত কিছু শিখে, এত আর্বান হয়ে, এত ভিটামিন, অ্যাণ্টিবায়োটিক খেয়ে, তবু? তারও গায়ে লোম? আঃ অমোঘ সেই 'জিন'কে ডেষ্টিনি কেন বলব না? 'জিন'ই তো সেই ডেষ্টিনি, নতুবা অমন বাপের এই ব্রাইট ছেলে হয়ে কী করে সেও পায় সারা গায়ে এত লোম? আশ্চর্য, আগে বুঝতে পারেনি ডিজি, দোলগোবিন্দও বুঝতে পারেনি, তার অবশ্য বোঝার কথা না, তবু ডিজিও ২৭এ এসেই বুঝেছিল। সেও কত দুঃখের, কেননা সে, ডিজি, তার ২৭ বছরের মাথায় এসে প্রথম প্রমাণ সাইজের ড্রেসিং টেবিল যখন পেল একান্তে একেবারে নিজের করে, তখনি মাত্র সে টের পেয়েছিল তার বাবার সারা গায়ের জান্তব লোমের

'জিন' সেও বহন করছে। সেদিনের কথা কি ভোলা যায়? প্রায়ান্ধকার ঘরে কখন ড্রেসিং টেবিল এসে গেছে, সে না দেখেই স্নানে ঢুকেছিল। তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এসেই দেখেছিল সেই দুনিয়া কাঁপানো চার ফুট বাই দেড় ফুট আয়না, আসল বেলজিয়াম গ্লাস, যার উত্তেজনায় সে কেঁপে উঠে তোয়ালে খুলে জীবনে প্রথম দেখেছিল নিজের ৪ ফুট ১০ ইঞ্চির আপাদ-মস্তক খালি গা। আর তখনি সে বুঝেছিল, যা বোঝার। না পারা যায়নি, নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে অতীতকে মুছে ফেলা যায়নি। হেরিডিটি ছিল, হেরিডিটি আছে। তার বাবার চেহারার অনেক কিছুই সে পেয়েছে। ছোট্ট কপাল, বড় হাঁ, আর লোম। মাঝখানে কপাল ও গলা বাদ দিলে বলা যায় সেই অনাদি স্ট্রিম অব হেয়ার তাকে ঘেরাও করে আছে। যেমন ছিল অতীতে, তার বাবার। কিন্তু আর কোথাও মিল নেই।

বাবা ছিলো নিরক্ষর, কোনোমতে সই করতে পারত নিজের নাম। আর কিছু না। তার ঐ সবেধন সইখানি একমাত্র হাতের লেখা। অনেকটাই ছিল গান্ধিজীর মতো, গান্ধিজী রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের নাম যেভাবে বাংলায় লিখেছিলেন।

বাবা বুঝত শুধু ব্যবসা, সাগরদীঘির সেই মুদির দোকানে তার জীবন কেটেছিল। যে দোকানটার গন্ধ এখনো নাকে লেগে। সে দোকান যাওয়া ছেড়েছিল ক্লাস সেভেনে উঠেই। আর বাড়ি ছেড়েছে আই.এ.এস.-এ স্ট্যান্ড করে। আরতিকে বিয়ে করে অবশ্য বাড়ি যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বাড়ি যাব, বাড়িতে আছেটা কী? মা নেই, বাবা নেই। খালি-পা দুই ভাই আছে কেবল যাদের সংগে কোনদিন তার একরত্তিও ফ্র্যাটারনিটি গড়ে ওঠেনি। তাছাড়া তাদেব বাড়িতে কোন পায়খানা নেই, মাঠ আছে। বাথরুম নেই, পুকুর আছে। দু দুটো রান্নাঘর। অথচ বসার ঘর নেই। আছেটা কী? অন্তত ডিজির সংগে তো কোন মিল নেই। কোনদিন ছিল না। মার কথা তার আর মনে পডে না। বাবার চেয়ে লম্বা এক মেয়েমানুষ, যার থুতনি মনে পড়ে, চোখ মনে পড়ে না। মা নমশূদ্র ছিল। মামার বাড়ির লোকেরা লম্বা ছিপছিপে ফর্সা ছিল, কেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ চেহারা ছিল সবার। মার চেয়ে ফর্সা ও দেখতে সুন্দর ছিল মামারা। আহা, সেই ফর্সা জিন সেও তো পেতে পারত।

বাবার একটি গুণ সে ভালোই পেয়েছে বলা যায়, সেটা ডিসিপ্লিন।

বাবা দিনে একবার মাত্র ঘড়ি দেখে বাকি সময় প্রায় সঠিক টাইম বলতে পারতেন। কিন্তু পড়াশুনোয়, শোনা যায়, তাদের বংশে সে-ই প্রথম ক্লাস সেভেনে উঠেছিল। তার পরের ব্যাপারগুলি তো বংশ দূরে থাক, তার হোম ডিস্ট্রিক্টেও দুর্লভ। বাবা যীশু খৃষ্টের নাম শুনেছেন, লর্ড রিপনের নামও ; কিন্তু শেকস্‌পীয়রের নাম শোনেননি। পড়াশুনার ব্যাপারে বাবার কোথায় যেন এলার্জি ছিল। ক্লাশ সেভেনে ওঠার পর বাবা তাকে বই কিনে দেননি। ক্লাশ এইটে দোলগোবিন্দ পরের বই পড়ে মানুষ হয়েছে। অবশ্য দোকান থেকে কাগজ ইত্যাদি সে ভালোই পেত। বাবার ধারণা ছিল, পড়াশুনো করলে মানুষ তার জাত ব্যবসা, জাতি ও দেশ ভুলে যায়।

সেই বাবার ছেলে হয়ে দোলগোবিন্দ বি.এ.-তে ডিষ্টিংশন পেয়েছিল। অথচ সেই ডিজিরই শেষমেষ গায়ে উকুন হল।

প্রথম মাস তিনেক সে ভালো বোঝেইনি যে তার গায়ে উকুন হয়েছে। তখন খুব চুলকোতো। বগলে শুরু। এখন সারা গায়ে। অসহ্য। দিনে রাতে কখনো কামাই নেই। রাতে বাড়ে। দেখেছে দুপুরে কমে ও বর্ষায় রাত্রিতেও কম থাকে। শীতকালে কষ্ট বেশি। গরম ট্রাউজার্সের ওপর দিয়ে চুলকোতে গিয়ে ছাল উঠে যাবার মতো হয়। অনেক্ষণ জ্বালা থাকে। তখন সুযোগমত বার্নল লাগালে কেন যেন জ্বালার উপশম হয়। আর কিছুতে কিছু হয় না। অনেক করেছে ডিজি। প্রথমদিন টের পেয়ে যদিও সে নার্ভাস হয়েছিল, রাত্রে আরতির কাছাকাছি ডিভানে ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনি, তবু বুঝেছিল, কিছু একটা করতেই হবে অচিরাৎ। নিয়ম মাফিক সেদিন প্রথম রাত্রে আরতির ডিভানে শোবার কথা। শোয়নি। এ নিয়ে ভাগ্যিস আরতির রিজারভেশন আছে। নতুবা অন্য ব্যাপারের মতো এখানে নানা প্রশ্ন উঠলে তার মুস্কিলই হত। কে জানত যে এই ঘটনাই আরতির থেকে তার ডিস্ট্যান্স বাড়াবে! সুরুতে এতটা না বুঝলেও এইটুকু অন্ততে বুঝেছিল, আরতি এই গায়ে উকুন কিছুতেই অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না অন্য অনেক কিছুর মতো, এখানেও ডিজি এটাকে 'টপ সিক্রেট' রাখে। তার গায়ে উকুনের কথা একমাত্র ডঃ পি. সাহা ছাড়া আর কাউকে সে বলেনি। পরে পিশিমাকে অবশ্য বলতে হয়েছিল। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। যাইহোক টের পাওয়ার তিন দিনের মাথায় সে স্থানীয় কলেজের গভর্নিং বডির মিটিঙ অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে একজন টিচার্স রিপ্রেজেনটেটিভকে জিজ্ঞেস করেছিল, ইনসেকটের উপর ভালো বই কী কী আছে। ঘটনাক্রমে

সেই ভদ্রলোক ছিলেন 'জ়ুলজি'র লেকচারার। এমনই হয় ডিজির, এভাবে তার এভেন্যু খুলে যায়। বইগুলো সেদিনই হস্তগত করে নিজ অফিসিয়াল ডেস্‌কে সে রেখেছিল এমনভাবে যে মনে হতে পারে, এসব আইন কানুনের রেফারেন্সের বই।

সেই রাত্রেই আর্টসের ছাত্র ডিজি প্রথম জানতে পারে, উকুন হল মূলত হিউম্যান প্যারাসাইট; তবে অ্যানিম্যাল প্যারাসাইট হিসেবেই তার স্থান নির্দিষ্ট। কুকুরের গায়েও থাকে। মাথার উকুন ও গায়ের উকুনের প্রকৃতিগত তফাৎ না থাকলেও আকৃতিতে তফাৎ আছে। মাথার উকুন অপেক্ষাকৃত লম্বা অনেকটা পিঁপড়ের মতো। তারা তাদের ডিম রক্ষা করার জন্য একধরনের আচ্ছাদন দেয়, যা গায়ের উকুনের দরকার হয়না, যারা দেখতে অনেকটা এঁটুলি পোকার মতো, গোল। এরা কেউ কখনো পেট খালি রাখে না, হুল বসিয়েই থাকে ও ক্রমাগত রক্ত টানে। তাদের এই সর্বদাই পেট ভর্তি রক্ত মজুত করার অভ্যাসই তাদের পেটের মানবিক রক্তকে কালো করে কিনা কে জানে! দেখা যাচ্ছে, মজুত ব্যাপারটাই সর্বত্র কালো; অন্তত এরা ব্ল্যাক-মানি বা ব্ল্যাক মার্কেটের চেয়েও কালো। এরা ফুটন্ত গরম জলেও মরে না। এমন কি স্ট্রং ক্লোরোফিনল বা ডেটলেও বেঁচে থাকতে পারে। পেট্রোলিয়াম লিকার, যেমন কেরোসিন, এদের জব্দ করতে পারে কিন্তু একেবারে মারতে পারে না। এরা এদের প্রায় অমর ডিমগুলিসহ একমাত্র মরে হেক্সাক্লোরাইড্ বা লরেক্সেন্ কন্‌সেন্‌ট্রেটে। তাই এসব জেনে, ডিজি কলকাতায় রাইটার্সের কাজে গিয়ে, নিতান্ত জেন্টলম্যান হয়ে এক দোকানে জিজ্ঞেস করেছিল, হেক্সাক্লোরাইড আছে এমন ওষুধ কি? প্রায় ১০টা বড় ওষুধের দোকানে গরুখোঁজা করে তারপর একটায় জেনেছিল, হেক্সাক্লোরাইড হল লরেক্সেন কন্‌সেন্‌ট্রেট, যা মূলত উকুনের ওষুধ। সে ৬০ মিলিলিটারের একটি ফাইল কিনেছিল। লিটারেচার অনুযায়ী যা করার করেছিল। কাজ হয়নি। কেন যে হল না, এ এক প্রহেলিকা। উপরন্তু তার গায়ে পুড়ে যাবার মতো ফোস্‌কা পড়েছিল।

সে অবশ্য এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে একদিন ভিজিলেন্ট হয়েছিল। সেই দোকানেই গিয়েছিল রাইটার্সে যাবার ছুতোয়। জিজ্ঞেস করেছিল লরেক্সেনে কোন এলার্জি হয় কিনা। ক্যাশে বসা একজন প্রৌঢ়, অনেকটা আইনস্টাইনের মতো দেখতে, বলেছিল, একমাত্র বিশুদ্ধ জল ছাড়া আর সব কিছুতেই এলার্জি হতে পারে। এ ব্যাপারে এ্যান্টি-এলার্জির কী আছে,

জানতে চাইলে ড্রাগণ্টোরের আইনষ্টাইন বলেছিলেন, লরেক্সেনের স্পেসিফিক কোনো এ্যাণ্টি-এ্যালার্জিক ওষুধ নেই। তবে লরেক্সেন গায়ে মাখলে গায়ে সামান্য ইরাপশন থাকলে ইরোশন হতে পারে। এরপর আর কথা বাড়ায় নি। কিন্তু দোকান থেকে বেরুবার মুখে একজন রোগা বুড়ো তাকে গায়ে পড়ে বলেছিল, এই এ্যালার্জি ব্যাপারটা মশাই খুব গোলমেলে। আমার মেয়ের জানেন দুধে এ্যালার্জি। এর কোন মা-বাপ নেই। আসলে যা কিছুই আপনি ব্যবহার করুন বা খান আপনার বডি যদি অ্যাডজাষ্ট করতে না পারে, তাহলে প্রটেষ্ট অর্থাৎ প্রতিবাদ করবে সে, যাকে আপনি ব্যবহার করলেন বা খেলেন। এ্যালার্জি হল প্রতিবাদ।···· প্রথমে খেয়াল করেনি ডিজি কিন্তু লোকটা মৃদু হেসে চলে যাবার পর মনে হয়েছিল, লোকটা অনেকটা হো-চি-মিনের মতো দেখতে। '৫৬ কী '৫৭ সালে সে হো-চি-মিনকে চাক্ষুষ দেখেছিল একবার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। কলকাতার এই হো-চি-মিনের সংগে দেখা তার আবার হয়েছিল সেদিনই ট্রামে। সে উকুন থেকে রেহাই পেতে কলকাতায় যখন কমনম্যান হ'ত তখন ট্রামেই যাতায়াত করত। সেই ট্রামে ঘটনাক্রমে সেই রোগা বুড়োর পাশেই সিট পেয়েছিল। যেন কতকালের চেনা এভাবেই বুড়ো বলেছিল, যদি উকুনের জন্য লরেক্সেন ব্যবহার করেন তাহলে সাবধানে করবেন, বড় কড়া ওষুধ। মাথার চুল উঠে যায়। বরং আপনি হোমিওপ্যাথি করান। ফল ভালো পাবেন। ভবানী-পুরের পি. সাহা আমার স্ত্রীর উকুন জন্মের মত দূর করেছেন। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এই উকুন সবার মাথায় বা গায়ে থাকতে পারে না, যার মাথায় বা গায়ে থাকে তার চরিত্রই হল উকুন ইনভাইট করা। চরিত্র বদলাতে অ্যালোপ্যাথি এখনো সাবালক হয় নি। হোমিওপ্যাথি পারে। একজন আমেরিকানও একদিন ভিয়েৎনামে থাকবে না, এমন হো-বিশ্বাসে ঐ বুড়ো বলেছিল। গিয়েছিল ডিজি। হোমিওপ্যাথিতে যে এত স্মার্টনেস থাকতে পারে, তার কল্পনার বাইরে ছিল। ৩২ টাকা ভিজিট নিয়ে ডঃ পি. সাহা মাত্র দুটি প্রশ্ন তাকে করলেন, এক ডিজি ক্রোধ চেপে রাখতে পারে কিনা এবং প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা মনে পোষণ করে কিনা ; দুই, তার দাঁতের কষ্ট আছে কিনা। জবাবে দুবারই সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লে তিনি তাঁর পাশে বসা, তাঁর অ্যাসিস্টেণ্টই হবে, কী যেন বল্লেন! মনে হল কোড। ভাষা বোঝা গেল না। অথচ ভাষা স্পষ্ট শোনা গেল।

দুরকম ওষুধ সে পেল। একটা জলের মতো, স্পিরিটের গন্ধ আছে,

কিছুটা আইডিন রঙের, তবে সে রঙ খুব ফিকে। দ্বিতীয়টি খাবার, কাগজের মোড়কে ছিমছাম ভাঁজ করা পুরিয়া, তাতে পাউডার। ১৫ দিনের ওষুধ। প্রথমটি গায়ে মাখতে হবে। দিনে দুবার। স্নানের পর ও রাত্রে শোবার আগে। রাত্রে সংগম চলবে না। দ্বিতীয়টি খেতে হবে অন্য কিছু খাবার এক ঘণ্টা আগে বা পরে। দিনে চারবার। কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ও হিং খাওয়া চলবে না।

অনুগত ভৃত্যের মতো সব মেনে চলেছিল ডিজি। কোন কাজ হয়নি। উপরন্তু সেই ডিসট্যান্স্ যা বস্তুত এলিয়েনেশন নয় অথচ দেখালো তাই, যা সুরু হয়ে গিয়েছিল আরতির সঙ্গে।

ভাবা যায়, সেই আরতি? তার সেই নীল বিদেশী জর্জেট, ফরাসী পারফিউম, ইতালীয় কমনীয়তার মধ্যে সেই 'গড ক্রিয়েটেড ওম্যান বাট ডেভিল মেড আরতি', ভাবা যায়? যার শরীর ছুঁতে সূর্যের হাইড্রোজেন ভেঙে হিলিয়ামের সেই অমেয় উত্তাপ! আঃ, ডিজি মরে যাবে তবু ভুলবে না তার শরীর। ৫ ফুট দূরত্বে অন্য এক ডিভানে ১৫ দিন চুপচাপ শুয়ে থাকা, ভাবা যায়? রাত্রে সংগম চলবে না, এই নিষেধাজ্ঞার বলয়ে শনিগ্রহের মতো বন্দী জীবন, আর যাইহোক, কিছুতেই অ্যাডজাস্ট করা যায়না। অথচ করতে হল। পারা যায় না, তবু পারতে হল। ডিজি পারল। তার জন্য রোজ রাত্রে, পরপর ১৫ দিন, ঘুমের বড়ি সাদামাটা কাম্পোজ খেতে হল। সন্ধ্যায় ড্রাই জিন। ক্রমাগত খেলে যার থেকে ইমপোটেন্সি ডেভালাপ করে। ডিজি পেরেছিল। তার পারার কথা না। ১১ বছর বয়সে যে ৩৫ বছরের পিসিমার স্নান দেখত, তাতে কোন মাতৃত্ব বা রেসষ্ট্রিকশন থাকত না। তাতে সারাদিন সারারাত শরীর জ্বলত। উঃ ভাবা যায় সেই কামনার শেকড়-বাকড়! যা তাকে পাথরকুচির পাতার মতো উদ্যত, রসসিক্ত রাখত। রাত্রে ঘুমের ঘোরে মোরাভিয়ার অ্যাডোলেসেন্স ট্যাবু বুকে, মেরুদণ্ডে, তলপেটে সূর্যগ্রহণের কিরীটছটার মতো আনঅ্যাভয়ডেবল জ্বলুনি রাখত। আরতি বলে কথা! যার কাঁধে ও নাভিতে থাকতো রাহু। যার শ্রোণিদেশে সেই দুষ্ট কেতু, যা তাকে আহত করত। তলদেশে লাগত গ্রহণ। যখন মুর্গি নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকত। কুকুর বাচ্চাদের নিয়ে লুকিয়ে থাকত বিবরে।

ভাগ্য ভালো যে আরতির ছিল সেই রিজারভেশন, যার দৌলতে সে কখনো সেক্স নিয়ে উচ্চবাচ্য করত না। এটা তার সিলভানা ম্যাংগানো, মেরিলিন মনরো বা ব্রিজিত বার্দো থেকে শেখা যে সেক্সি মেয়েমানুষ বড়

ফ্রিজিড হয়। আরতিও তাই। তবু ফ্রিজিডিটির লিটারেচার যাই বলুক ও সে যাই হোক, ডিজি দেখেছে সময়ে তারা এলিজাবেথ দা ফার্স্ট বা ক্যাথারিন দা সেকণ্ড হয়। তবু ডিজি পর পর ১৫ দিন, বলা যায়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত হয়েছিল, যাকে লোকে বিবেকানন্দ বলে।

ওরই মধ্যে, ঐ ১৫ দিনে, ডিজি টের পেল, আই.সি.এস. সেন সাহেবের কোলের মেয়ে আরতির গায়েও উকুন হয়েছে। কেননা ঘুমের ভান করে রাত ঠিক দেড়টায় ; কাম্পোজের অ্যাকশন সুরু হবার অমেয় সময়ে, সে ডিজি, টের পেয়েছিল আরতি গা চুলকোচ্ছে। আঃ আরতির ধপধপে মাখনের মতো রেশমী গায়ে ঐ চুলকোনি ৫ ফুট দূরত্বেও তাকে দুঃখের মধ্যেও নিয়ে গিয়েছিল আকৈশোর কামনায়। বহরমপুরের রামকৃষ্ণ মিশনের লাইব্রেরীতে স্বামী বিবেকানন্দের 'মাই মাষ্টার' ও উদ্বোধনের 'আত্মজ্ঞান' যে কামনার গায়ে এক ড্রপও ঠাণ্ডা জল ঢালতে পারেনি।

ঐ ১৫ দিনের একাদশ কী দ্বাদশ দিবসে, রাত দেড়টার পর গা চুলকোতে চুলকোতে সম্ভবত অস্থিরই হয়ে আরতি আধঘণ্টা বাথরুমে কাটিয়ে যখন লরেক্সেনের গন্ধ নিয়ে নিজের ডিভানে বসে সুস্থির টোনে তার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'কী হয়েছে তোমার ?' তখন তার ভয়েসের পায়ের তলায় একমুঠি মাটি না থাকায় ডিজি বাস্তবিক আরতির কষ্ট বুঝেছিল। যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, এভাবে জবাবের দায় এড়িয়ে সে যখন সাইলেণ্ট, তখনি আরতি, সেই মেয়েমানুষ, যার নাম 'অ্যাম আই নট সুপিরিয়র টু ওয়াইন ?' তার মানে তার ড্রাই জিনের পরিমাণ যে বেশ বাড়ছে, তাতে হাই-ব্রাউ ও পেডানটিক কালচার অব্দি ভয় পাচ্ছে। সে তবু কোন উত্তর দেয়নি। যে কারণ ৩০ দিনের জন্য আরতি ঐ ষোড়শ দিবসে কলকাতা গেল। তখনি ঘটল এক ঘটনা।

তাকে সেই সপ্তদশ দিবসে সাঁইথিয়া যেতে হল 'অপারেশন নকশাল'এর ডিউটি দিতে। সেখানে বাস-স্ট্যাণ্ডে, সিউড়ির সিভিল ডিফেন্সের জিপে উঠতে তার পিশিমার সঙ্গে দেখা, তিনি বহরমপুরের বাসে উঠছিলেন।

সেই এমারজেন্সিতে জিপে যখন উঠতে যাবে ডিজি, তখনি তার তলদেশ জুড়ে সেই অসহনীয় চুলকোনি সুরু হল যদিও তখন বেলা ১১টা। তখনি বাবার কথা, গোয়াল ঘরের কথা তার চকিতে মনে হতে বাসে উঠতে যাওয়া পিশিমাকে তার চিনতে মোটে কষ্ট হয়নি। বরং স্মৃতির সঙ্গে স্মৃতি-চিহ্নকে জীবন্ত দেখে সে অবাক না হয়ে পারেনি। তাই প্রোটোকল ছেড়ে

সেই বাসের দিকে এগিয়ে, অনেক কিছু করেও, গায়ের উকুন যেমন থাকার তেমনি থাকায় পিশিমাকে মুহূর্তে চিনে প্রায় ১৩ বছর পর ডেকেছিল, পিশিমা !

—কে দোল ?

—হ্যাঁ আমি দোল। কেমন আছ পিশিমা ? হর (হরগোবিন্দ) গোবিন্দ সকলে ভালো তো ?····বলতেই গোবিন্দর জন্য ডিজির মন কেঁদে উঠল। মনে আছে সেই কবে স্কুল থেকে ফিরে যখন পিশিমার কাছে শুনেছিল, তোর একটা ভাই হয়েছে, তখন বই-খাতা বড় ঘরের বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দৌড়ে গিয়েছিল আমবাগানে। মনে আছে ভালো, তখন আমের মঞ্জরী হয়েছে। সে তরতর করে গাছে উঠে দোল খেয়েছিল খুব, যাকে আনন্দ খাওয়া বলে। সে যে কী আনন্দ এখন বিশ বছর পর তার মনে পড়ল। হর'র জন্মানোর কথা তার মনে নেই। হর ঠিক তার ভাই নয়। হর'র খালি পা, স্কুলে না পড়া, সর্বদা বাবার সঙ্গে দোকানে বসা, জিনিশ ওজন করা, নিপুণতার সঙ্গে কাগজে মশলা ভরে ভারতীয় প্রথায় প্যাক করা, সত্যি বলতে কী ডিজির কাছে বস্তুত তা আপাদমস্তক বিদেশী। বিদেশী তাই বলে সাহেব নয়—উড়িষ্যা, বিহার যেমন বিদেশ অথচ ফরেন না, তেমনি যা অন্তত ভাই-ভাই না। তার এক যুগ পর এই গোবিন্দ হল। এই হওয়া প্রকৃত ভাই হওয়ার মতোই রোমাঞ্চকর ও সুখের। সে যার-পর-নাই আনন্দ পেয়েছিল। অথচ তার কেরিয়ারে সে কখনো গোবিন্দকে ওরকম ভাবে আর কোনোদিন ভেবেছে বলে মনে পড়ে না।

পিশিমা বললেন, তুই তো আর বাড়ি যাস না, চিঠি দিস বছরে একবার হালখাতার দিন, রামনবমীতে, তাও তো বংশের ধারা বজায় রেখে বছরের ঐ দিনে দিস্ কিন্তু খোঁজ রাখিস কি আজ এক বছর হল গোবিন্দ বাড়িতে নেই ? যদুগোড়া থেকে একবার খবর এসেছিল সে বেঁচে আছে। ঐ যে মুখপোড়া নচ্ছারগুলো যাকে তোরা নকশাল বলিস, তারা ধরে নিয়ে গেছে। জীবনে ঢের ছেলেধরা দেখেছি। এই এদের মতো ছেলেধরা ভূ-ভারতে নেই। শুনে ডিজির গায়ের চুলকানি চলে গেল। সে নার্ভাস হয়ে ফিসফিস করে বলল, আমাকে তো কেউ রিপোর্ট করেনি !

পিশিমা তার এই বাক্য বুঝল না। বলল যাস একবার বাড়িতে। দোকান-ঘর পাকা হয়েছে। রান্নাঘর ছাড়া আর সব ঘরও পাকা হয়েছে। ঘরে ঘরে লাইট হয়েছে। যাস একবার।

—তুমি সাঁইথিয়ায় কেন ?

—ভুলে গেছিস, সাঁইথিয়া আমার শ্বশুরবাড়ি। আমার দেওরের অসুখ, দেখতে এসেছিলাম, বাঁচবে না বেশিদিন, আবার কাল আসব। হর'র বৌ-এর বাচ্চা হবে, দাই ঠিক করে চলে আসব।

—কবে, কাল ? কখন আসবে ? কোন গাড়িতে ?

—খাগড়া-ঘাট থেকে যে বাস সকাল সাড়ে নটায় ছাড়ে, এখানে ১২টায় পেঁছোয়।

—ঠিক আছে আমি কাল ১২টায় এখানে থাকব। দেখা করব। আমার কিছু কথা আছে পিশিমা।

পিশিমার আর কোন কথা বলা হল না। পিশিমার বাস ষ্টার্ট নিচ্ছে। ডিজি তৎক্ষণাৎ প্রোটোকল মেনে, নিজের জিপের দিকে এগুলো। কিন্তু মনে কনফিডেনসিয়াল কনসাসনেসে আঠার মতো লেগে রইল গোবিন্দ, যে নাকি নকশাল। হায়, তাকে খুঁজতেই তার অপারেশন।

পরেরদিন সে সবরকম ডেকোরাম ভেঙে বেলা ১২টার আগেই সাঁইথিয়ার রেলষ্টেশনের বাস-স্ট্যাণ্ডে এল। একজনও অর্ডার্লি বা পিয়ন নিল না সংগে। বেলা ১২.৩০টায় পিশিমার বাস এল। বিনা বাক্যব্যয়ে পিশিমাকে সংগে নিয়ে রিক্সা ধরে গেল পিশিমার শ্বশুর বাড়ি। সেখানে তখন কান্নার রোল অর্থাৎ যা হবার তা হয়ে গেছে। পিশিমার সেই দেওর, একমাত্র যে পিশিমার সংগে তার গোত্রান্তরের সম্পর্ক রাখত, সে মারা গেছে।

এই ঘটনার প্রায় ১মাস পর নানারকম যোগাযোগ করে সে পিশিমাকে তার আরতিশূন্য বাংলোয় নিয়ে গিয়ে সব কথা বলেছিল। যা ডঃ পি. সাহাকেও পুরো বলেনি। অবশ্য ততদিনে আরতির যা জানার, জেনেছিল অর্থাৎ তার গায়ের উকুনের কথা সে মুখে কিছু না বললেও জেনেছিল। সেও এক ঘটনা।

যা এই রকম ঃ একদিন রাত্রে সে ঠিক দেড়টায় জলন্ত টর্চের কাছে গা থেকে খুঁটে খুঁটে উকুন মারছিল, যা ছিল তার গভীর রাত্রের টপসিক্রেট ডিউটি। আরতি টের পেয়ে জানতে চেয়েছিল, এসব কী হচ্ছে ? সে আর লুকোতে পারেনি। কেননা টর্চের কাচের গায়ে সেই নোখে চিপে মারা উকুনের মর-দেহ আড়াল করতে পারেনি। যাকে বলে অ্যাংরি ডিসপিউট— অর্থাৎ কেমব্রিজ ডিকশনারিতে যার সিনোনিম কোয়ার্ল তাই হয়েছিল, যাকে লোকে দাম্পত্য কলহ বলে।

—তাহলে তুমিই সোর্স ! আগে বলোনি কেন ? এভাবে আমার সর্বনাশ করতে কে বলেছিল ? আমি তো ভেবেই পাই না, কোত্থেকে এলো এই ডার্টি ইনসেক্ট্ ! মাথার উকুন হলে না হয় কথা ছিল। স্টুডেন্ট লাইফে লা-মার্টেনে ঐ মাথার উকুন এমন কিছু সারপ্রাইজ ছিল না। কিন্তু গায়ে উকুন, আমার জানাই ছিল না মানুষের হয় ! তুমি হিপোক্রিট, সোয়াইন, আমাকে ফ্র্যাংকলি বললে কী হত ? অন্তত সেগ্রিগেট হওয়া যেত। এখন নিজের কেরিয়ার বিল্ড করে ডি. কে. সেন বা তার মেয়েকে কিক করা তো সহজ, কেননা এক্সপ্লয়েট করার যা তা তো করা হয়েই গেছে। সিডিউল্ড কাস্ট শুধু পেপার স্টেটমেন্ট নয়, কালচারাল হেরিটেজ। মুদির ছেলে আর বেশি কী হবে ! জন্মে যারা ইউনিভার্সিটি বা টয়েলেট দেখে নি, তারা এর চেয়ে বেশি কী হবে। বিস্ট্ কোথাকার ! একটা শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করার সময় জানতে না উকুন মুভ করে ? মুভমেন্ট এত বোঝো, নকশাল মুভ-মেন্টের তুমি স্টেট অথরিটি, জানো না, এই বডি-লিশ নকশালদের মতোই স্প্রেড করে ? আমি কী দোষ করেছিলাম যে আমাকে সিডিউল্ড কাস্টের মতো রাস্টিক না করলে চলত না ? ভাবছ আই.এ.এসে বসলেই সব ধুয়ে মুছে যায় ? কোন্ পুল থেকে তুমি স্ট্যান্ড করেছো আমি জানিনা ভাবো ? ভাগ্যিশ তোমার সন্তান পেটে ধরিনি ! আন্দামানে সলিটারি আইল্যান্ডে উইক-এন্ড কাটাবার নাম করে আমাকে বোকা বানানো, স্ট্রেঞ্জ আমি আগে বুঝলে তোমার মতো বামনের হাত চেপে ধরতাম।

এসবে ডিজির মনে হল দুটি কথা, এক ঃ আরতিও জানে তার নিক-নেম বামন ; দুই ঃ আরতি যতই হাই হোক তবু সে মেয়ে বা মেয়েমানুষ, এই সংগেই মনে পড়ল একজন মহিলার সংগে জাঁ পল সার্ত্রের ইন্টারভিউ। সেখানে এই কনক্লুশনে এসেছিলেন উভয়ে যে নারী মাত্রই, কী য়ুরোপে বা ট্রপিক্যালে, কী সোভিয়েট বা এসকিমোদের মধ্যে, নারী মাত্রই শ্লেভ—কর্ত্রী বা দাসীর মধ্যে তফাত শুধু এই, উভয়ে অ্যান্টাগনিস্টিক কনট্রাডিকশনে যায় অথচ জানে না তাদের একই ক্লাশ ক্যারাকটার।

কিন্তু প্রকৃত নিঃসন্তান ক্রীতদাসী তবু থামেনি, জেনারেশন যাবে কোথায় ? না হলে আজও তুমি বাংলায় কথা বলতে গিয়ে, প্রোনাউন আর ভার্বে হাই-লো বোঝো না ! সে ও তিনির গোলমাল করো। ভাগ্যিশ আমার কোনো ইসু নেই ! সেও তো তাই হত তুমি যেমন বাপ কা বেটা !

না হয়নি। যা ছিঁড়ে যাবার, তা রিফু করেও টেঁকানো যায় না।

আরতি এই সব বলে তিন রাত্রিও থাকেনি। দিল্লী গিয়েছিল বাপের কাছে আর ঠিক সেই সময় পিশিমাকে আনল দোলগোবিন্দ।

টানা দু-সপ্তাহ তারপর আরতি চলে যাবার টেনশনে, তার মুখের উপর প্রকাশ্যে তার সন্তান ধারণ না করার সেই অস্পৃশ্য বোধ ছুঁড়ে দেয়ায় ডিজির বড় ডিপ্রেশনে দিন কেটেছিল। অবশ্য পিশিমা কতদিন পর খাইয়েছিল গুড়ের সরবৎ লেবু পাতা দিয়ে। সজনে ফুল ভাজা বেগুনের কুচি দিয়ে। মোচার ঘণ্ট ডালের বড়ি দিয়ে। আখের গুড় দিয়ে ঠাণ্ডা কাঁচা হলুদ রোজ ভোরে। স্নানের আগে বন্ধ ঘরে গায়ে গোবর লেপে এক ঘণ্টা মাদুরে শুয়ে তার অস্বাভাবিক চুলকানি ও অমঙ্গল দূর করেছিল। ভাবা যায় পিশিমার সেই মাতৃত্ব, যাকে বাৎসল্য বলে!

তারই মধ্যে ঘটে গেল ডিজির সেই 'অপারেশন নকশাল'। পিশিমার সিডিউলড মাতৃত্বের পঞ্চদশ দিবসে, মনে আছে স্পষ্ট, সে ফোন পেয়েছিল ডি.আই.বি অফিস থেকে, যার নাম ওয়ান জিরো জিরো স্পিকিং যেখানে তার প্ল্যান মতো পাঠানো তার বর্তমান ডিষ্ট্রিক্টের এক অধ্যাপককে—সি. বি.আই. রিপোর্টে ও পি.এম.-এর অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ ব্যুরোতে যিনি এক্সট্রিমিস্ট থিয়োরেটিশিয়ান বলে রেকর্ডেড। তার সংগে একদিন রাত্রে সাড়ে আটটায় তার ডিনার হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যে বাড়ি বা সদন হবার কথা, সেখানে তাকে ডিরেকটার করে ডিজি তাকে ক্রমে গ্রিপে এনেছিল। সে মেনে নিয়েছিল অধ্যাপকের 'ওরা কাজ করে' ও 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রথম ভাগ; কিন্তু সন্তোষ সেনগুপ্তের 'শ্যামা'কে যুক্ত করতে কিংবা প্রমথ নাথ বিশীর 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর' যোগ করতে বেগ পায়নি। এভাবেই সে ডি.আই. বি.-র রেকর্ডে একজন এক্সট্রিমিষ্ট অধ্যাপককে পুরো নিজের বাগে আনতে সাকসেসফুল হয়েছিল। তার দৌলতে সে, যে ছেলে বনে গেছে, তার হদিশ পেল এবং সি.আর.পি দিয়ে সেই ফরেষ্ট বা তার কাছাকাছি জঙ্গী ফক্স্-হোলের উপর তার সম্ভাব্য ফিউচার কনট্রোল সুরু করল। কিন্তু তৎক্ষণাৎই অ্যাকশন নিল না। কেননা সে চেয়েছিল 'সোসাল কালচারের' মলাটে তাদের জব্দ করতে। যা ডি.আই.বি. ওয়ান জিরো জিরো স্পিকিঙের কোনকালে মাথায় আসত না। যার ধারণা এ ব্যাপারে ইনফরমার বা একস্ট্রিমিস্টদের মধ্যে এজেণ্ট নিয়োগই যথেষ্ট, যা মোটেই যথেষ্ট না যার জন্য সে বলতে

ভোলেনি, আপনার এরিয়ায় কালচারাল অর্গ্যানাইজেশন সেল গড়েছেন ইনফরমেশন নেবার জন্য ?

—আমরা তো ওভাবে ইনফরমেশন গ্যাদার করি না !

—করুন। তিনদিনের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট দিন।

সেই সুবাদে একজন হিস্ট্রির লেকচারারের রিপোর্ট পেয়েছিল। সেই অধ্যাপক যাকে নিয়ে রবীন্দ্র সদন। যাকে নিয়েই ঐ কাণ্ড অর্থাৎ 'ওরা কাজ করে' এবং 'এবার ফিরাও মোরে'র ১ম ভাগ, যার সংগে সন্তোষ সেনগুপ্তের 'শ্যামা' এবং প্র.না.বি'র সেই 'সীমার মাঝে অসীম তুমি/বাজাও আপন সুর/আমার মাঝে তোমার প্রকাশ/ তাই এত মধুর-এর উজ্জ্বল সংযোজন। যার ফলে কান টানলে মাথা আসার মতো সে হাতে পেয়েছিল সেই যুবক, যার অ্যাকশন-নেম 'চাচা', যার সার্টিফিকেট-নেম কাজী সিরাজ-উল্ ইসলাম। যাকে সে হাতেনাতে পেয়ে, বলা যায় নিজের কেরিয়ার বিল্ডের স্বর্গের সিঁড়ি পেয়েছিল।

সেই কাজী সময়মতই এসেছিল। কিন্তু তার আগেই যা করার করে নিয়েছিল ডিজি। সে এক মহাভারত। বলা ভালো উকুনের এ বি সি।

এ।

পিশিমার মতে, শাস্ত্রে গায়ে উকুন দুবার হয়েছিল। একবার ত্রেতা যুগে যদু বংশে। যখন শ্রীকৃষ্ণর মুখ দিয়ে 'গীতা'র উদয় হয়েছিল। যখন যদু বংশে মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ যখন বড় মাছ ছোট মাছগুলিকে প্রথম গিলে খেতে শিখেছিল। যখন যদু বংশের নারী-পুরুষেরা যত্রতত্র যার তার সংগে শয়ন করত। আরেকবার এসেছিল কলিযুগে রাজপুতদের মধ্যে। যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রথম ও শেষবার ধর্মের কারণে মরণপণ লড়েছিল।

বি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে, গায়ে উকুনের খবর ব্যাপকভাবে মানুষ জানতে পেরেছিল প্রথম-ক্রিমীয়ার যুদ্ধের সময়। জানছিল, যখন প্রথম ইউরোপ আফ্রিকাকে চেনে ও সেই ডার্ক-কন্টিনেন্ট থেকে যখন প্রথম বিনা পয়সার শ্রম না নিগ্রো ধরে এনেছিল নিজেদের ইন্ডাষ্ট্রির জন্য। অবশ্য নিগ্রোদের মধ্যে গায়ে লোম কম। তবু মাত্র পিউবিক হেয়ারেই বলা যায় বয়ে এনেছিল গায়ের উকুন ও আমেরিকায় ভালোই ছড়িয়েছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধে। রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও।

অর্থাৎ বলা যায় ইউরোপের উন্নত দেশগুলি, কমিউনিস্টরা যাদের হায়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম ও মনোপলিজমের স্ট্যাটাসে ইম্পিরিয়ালিস্ট বলে, তারাই অনুন্নত দুনিয়া শোধন করতে বা উপনিবেশ গড়তে গরীবের রক্ত জলের দামে কিনে তাই দিয়ে 'শ্রম' বানিয়ে নিজেদের ক্যাপিটাল বাড়িয়ে এই গায়ে উকুনের দুনিয়া জোড়া বিস্তৃতি ঘটায় !

সি।

উকুন প্রসঙ্গে এক ভিয়েৎনাম-যুদ্ধ-ফেরতা মার্কিন যুবকের ডাইরী, যা ছাপা হয়েছিল পি.এল. কাগজে, যা প্রায় এইরকম।

অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিয়ে বা অন্যায়ের পক্ষে ন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমার লাভ হল গায়ে উকুন। কী করে যে গায়ে এল জানিনা। কেননা আমি ১৯ মাস দক্ষিণ ভিয়েৎনামে থেকেও একজনও ভিয়েৎকং গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাকে চাক্ষুষ দেখিনি, মেশা বা নিহত করা তো দূরের কথা। অবশ্য সাইগনে যখন ৩ মাসে ১ দিন আনন্দ করতে আসতাম, তখন অতর্কিতে ধরে আনা গ্রাম্য ভিয়েৎনামী মেয়েমানুষের সঙ্গে অন্তত ১০০ বার শুয়েছি। তাদের প্রত্যেকের গা নির্লোম ও ক্যাম্পে ঢোকার আগে তারা প্রত্যেকেই মাথা, ভ্রূ ও চোখের পাপড়ি ছাড়া আর সব জায়গার চুল কামাতে বাধ্য হত। তবু কী করে যে এল ! মাত্র একবার বিনা যুদ্ধে এক ভিয়েৎ-কং ছাউনি দখল করেছিলাম। সেই ছাউনিতে একজনও ভিয়েৎনামী ছিল না। তাদের পরিত্যক্ত বিছানা যা খড়ের, কিছু পাতা ও মাটি বা পাথরের বাসন-কোসন ছিল। মাত্র একবারই যে করে হোক ঐ ভিয়েৎকং ছাউনি দখল করে আমাদের জয়ের আনন্দ হয়েছিল। আনন্দে আমরা নানারকম মজা করেছিলাম তার মধ্যে অন্যতম হল নিশ্চিন্তে একদিন ঘুমানো, যা অবশ্যই ভিয়েৎকং বিছানায় হয়েছিল। সেই থেকে গায়ে এসেছে কিনা কে জানে ! শুনেছি ভিয়েৎকংদের গায়ে উকুন আছে। আমার বিশ্বাস হয় না। কেননা গায়ে উকুন থাকলে মাথা ঠাণ্ডা করে কোনো কাজই করা যায় না, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়, একা হয়ে যায় মানুষ, বন্দুকের টিপ নষ্ট হয়ে যায়, নিঃশব্দে নড়াচড়া না করে শত্রু খতম করতে কিছুতেই ওৎপেতে থাকা যায় না, অথচ ওরা এসবেই পটু। এই আমার গায়ে উকুন হবার পর যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, একটা চিঠি পর্যন্ত পুরো লিখতে পারি না, কাউকে ভালোবাসতে পর্যন্ত পারি না। পুরো মন দিয়ে মেয়েমানুষ নিয়ে আনন্দ পর্যন্ত করতে পারি না। আমার মনে হয়, সাইগনের কড়া কড়া

ওষুধ খেয়ে যুদ্ধবাজ থাকা মার্কিনী অফিসারদের থেকেই আমার গায়ে উকুন এসেছে। উকুন কিছুতেই ভিয়েৎকংদের গায়ে থাকতে পারে না, তাহলে তাদের এমন অটল ঐক্য থাকত না, তারা এমন চমৎকার প্রতিরোধও করতে পারত না। শুনে একজন তরুণ সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, যারা প্রতিরোধ করতে জানে, তারা এসব কিছুই গায়ে মাখে না। উকুন তো দূরের কথা, তাদের গায়ে সাপ চলে বেড়ালেও তারা মুখ বুজে শত্রু খতম করতে ওৎপেতে বসে থাকবে।

ডিজির সিদ্ধান্ত ঃ গায়ের লোমই উকুনের সাময়িক স্বদেশ হয়। এই লোম কামাতে হবে।

উদ্বাস্তু করতে হবে উকুনদের। যদিও উকুনেরা ইহুদী। লোম হলে আবার ছাউনি ফেলবে। তবু সে আপাতত গায়ের লোম কামাবে।

কামিয়েছিল। যেদিন টেলেক্সে খবর এল, দিল্লী থেকে আরতি ফিরছে। সেদিনই কামিয়েছিল যা দেখে পিশিমা খুবই কেঁদেছিলেন। কেননা লোম কামালে নাকি নিমুনিয়া হয়। বুকে জল জমে।

তার নিজের কোন অসুবিধে হয়নি। কিছু দুর্বল লেগেছিল মাত্র। ঠান্ডা লাগেনি।

ঘটনা এই যে, পিশিমাকে নিয়ে ক'দিন তার ভালোই কেটেছিল। প্রায় ভুলে যাওয়া পুরোনো খাওয়া ও কথা হত। একদিন রাত্রে তার ডানলোপিলো ডিভানে পিশিমাকে শুতে দিয়েছিল ডিজি। নিজে আরতির ডিভানে শুয়েছিল। পিশিমার ঘুম হয়নি। তবে আরাম হয়েছিল। আরেকদিন সে ভয়ে চীৎকার করায় পাশের স্টাডিতে শোয়া পিশিমা ছুটে এসেছিল। সেইদিন থেকে পিশিমা আরতি ও তার ডিভানের মধ্যবর্তী ৫ ফুট স্পেসে মাদুর পেতে শুতো। যতক্ষণ ঘুম আসত না, ততক্ষণ গল্প হত। সাগরদিঘীর গল্প, মার কথা, বাবার ছেলেবেলার কথা, নিজের মুখেভাতের কথা। সে শুনে অবাক হয়েছিল যে, তার ঠাকুর্দা নাকি পৈতে নিয়েছিলেন কী কী প্রায়শ্চিত্ত করে ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে তার শিষ্য মারফৎ দীক্ষা নিয়ে। ডিজি ক্রমেই এসবে দোলগোবিন্দ হয়ে যাচ্ছিল। অধস্তনদের সংগে হেসে কথা বলা সুরু করেছিল। তার কুল খাবার ইচ্ছে জেগেছিল। বেগুনপোড়া মুড়ি খেয়ে আর তথাকথিত ব্রেকফাস্টে জেল্লা

পেত না। সে স্যাণ্ডেল পরা শুরু করেছিল। জন্মবারে দাড়ি কামাতো না। সর্বদা পিস্তল রাখবার প্রয়োজন বুঝত না। একদিন নিচে মাদুরের উপর পিশিমার সংগে শুয়ে খুব সিকিউরিটি পেয়েছিল। মাকে স্বপ্ন দেখেছিল জীবনে প্রথম। সারা বাড়িতে তার মা-বাবার ফোটো নেই অথচ অনেকের এমনকি কেনেডিরও ফোটো আছে ভেবে নিজেকে খুব দীন মনে হয়েছিল। কিন্তু আরতির নিউজ নিয়ে টেলেক্স আসার পর সব আবার যেমনকার তেমন হয়ে গেল। শুধু ঐ সিদ্ধান্তের সূত্রে গায়ের সব লোম কামিয়ে ফেলা ছাড়া ডিজি আবার সেই ডিজিই বনে গেল।

টেলেক্স পেয়েই অফিসে, নিজস্ব চেম্বারে, সে তার পি.এ.-কে ডাকল। পি.এ. ঘরে ঢুকবার আগেই তার অর্ধডিম্বাকৃতি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের খোলা সেলফে রাখা পিস্তল ছুঁয়ে আগেকার মতো গম্ভীর হয়ে গেল।

পি.এ. ঘরে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছিল। পিস্তলে বাঁ হাত রেখেই সে ঝড়ের মত বলেছিল, আমি চার্জ নেবার পর থেকেই আপনাকে বলে আসছি ফাইলগুলি প্রায়োরিটি অনুযায়ী প্যানেল করে আমার কাছে পাঠাবেন। কিন্তু 'ওয়াটার সাপ্লাই'-এর ফাইল টপে রেখেছেন কেন?

—আজ তিনদিন ধরে টাউনে জলের সাপ্লাই নেই, স্যার!

—কে বলেছে, এই তো আমি স্নান করে এলাম, ভালোই প্রেসার ছিল।

—আপনার তো হট লাইন।

—হট লাইন?

—সরি স্যার, আপনার তো সিভিল ডিফেন্সের লাইন, ওতে প্রেসার আছে।

—প্রেসার কোথায় নেই?

—মিউনিসিপাল লাইনে নেই, স্যার।

—কিন্তু এটাকেই আপনি টপ-প্রায়োরিটি দেবেন?

—কী করব স্যার ফোনে তো আমিই ধমক খাই।

—ফোন নামিয়ে রাখলেই পারেন।

—তাহলে আমাকেই তো ভুগতে হবে। ডেপুটেশন এলে এমন টাইম দিতে হয় স্যার যখন আপনি ট্যুরে, আমার তখন মাথার চুল উপড়ে নিতে চায় ওরা।

—কেন, আমার ইয়ার্ডে হানরেড ফরটি ফোর নেই?

—ওরা তো ৫ জনে আসে না, স্যার।

—না আসুক, যে কোন টারবুলেণ্ট গ্যাদারিঙই হানরেড ফরটি ফোরে পড়ে—আপনি কি নতুন এসেছেন ?

—না স্যার !

—তাহলে শুনুন, অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল। ল অ্যাণ্ড অর্ডারের ফাইল শুধু টপে রাখবেন এখন, যতদিন না অন্য অর্ডার পান।

—ঠিক আছে, স্যার !

পিস্তল থেকে হাত ওঠালো ডিজি। ওঠানোর সংগে সংগে দেখল তার পি.এ.র ঠোঁট বোঁজা কিন্তু কাঁপছে। নিশ্চয় বিড় বিড় করছে, ঠোঁট ব্যবহার না করে যা করা যায় অর্থাৎ সেই বামনাবতার করছে। বুঝতে বাকি থাকল না ডিজির। তাই প্রস্থানরত পি.এ.'র পিঠ লক্ষ্য করে সে বলল, আপনার লিভ অ্যাপ্লিকেশন এখন গ্র্যাণ্টেড হবে না। ডিস্ট্রিক্টের ল' অ্যাণ্ড অর্ডারকে এখন টপ প্রায়োরিটি দিতে হবে। যান সি.এম.কে দেয়া নোট আজই ডেসপ্যাচে দিন। আজই বেলা ১টার মধ্যে। যান।

এই হল সেই সাবেকী ডিজি।

টেলেক্সের আরতি এল। আসার সংগে সংগে পিশিমাকে নিয়ে কবওয়েব স্টার্ট করল। এটা যে হবে আগেই ভাবা ছিল কিন্তু এভাবে হবে ভাবেনি। রোজই সে অল্প অল্প ভাবত, পিশিমা যদি থেকেই যায় তাহলে আরতির সংগে কী রকম অ্যাডজাষ্টমেণ্ট হবে। ভেবে পেত না। রোজই ভাবত, পিশিমার সংগে এ নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু সুরু করতে পারত না। কেমন সংকোচ হত। না, পারা যায় না। কেননা একটাই মাত্র পথ আছে। সেটা হল পিশিমার পরিচয় গোপন করা। কেননা পিশিমাকে জীবনে দেখেনি আরতি। আর দশাসই কালো কুচকুচে চেহারা, ছোট ছোট চোখ, উঁচু চোয়াল, প্রায় নিগ্রোলয়েড স্ট্রাকচার—আরতি কিছুতেই পিশিমা বলে সম্মান করতে পারবে না। তার অর্ডারলি, বেয়ারারাই পারে না, আর আরতি তো কোন ছাড় ! এ কখনো হয় ? কিন্তু পিশিমার পরিচয় গোপন করা মানে তো তাকে মেড-সারভেণ্ট করা ! তা কি সম্ভব ? টেলেক্স পেয়েই আরো অনেককিছুর সংগে এ-সবও ভেবেছিল ডিজি।

তাই সেদিন সাত তাড়াতাড়ি বাংলোয় ফিরে সে যখন জানালো আরতি আসছে, তখনি এই প্রসঙ্গে বিনা ভূমিকায় সুরু করল। পিশিমা হেসে, বন্দী ভারতমাতার সেই দুঃখী বরাভয় মুগ্ধ ছবির মতো, যা সে ক্লাস গ্রি-

ফোরে বহুবার দেখেছে সেইরকম বরাভয়ে বললেন, আমার আবার পরিচয়, বলিস তোর দাই-মা। তখনকার মতো আর কথা বাড়ায় নি। কেননা দাই-মাতে কাজ হবে না। ওতে আরো ক্রাইসিস বাড়বে। কেননা দোল-গোবিন্দ, বা তার হেরিডিটি, সে আর যাই হোক, মা-ই হোক আর বাবাই হোক কী দাই-মাই হোক, আরতির পক্ষে কিছুই মেনে নেয়া সম্ভব না। সে শুধু মানে ডিজির ব্রিলিয়ান্সি, মানে আই-কিউ, তার একজিকিউটিভ নো-হাউ, যা তার বাবা ডিকে ফ্রম হেড টু টেল মানতেন। আর মানতেন বলেই আরতির আর ভাববার অবসর ছিল না। কেননা আরতি তার বাবার চেয়ে আর কাউকে জানে না, যিনি তার বাবার চেয়ে ব্রিলিয়াণ্ট। সুতরাং ডিজি ছাড়া তার ফ্যামিলি-ট্রির আর কোন ব্রাঞ্চ মানতে সে রাজি নয়।

একবার কলকাতা থাকাকালীন কীভাবে খবর পেয়ে হর এসেছিল দেখা করতে। এখন মনে হচ্ছে, ওর ছেলের মুখেভাতের নেমন্তন্ন করতে। আরতিকে বৌদি পর্যন্ত ডেকেছিল। আরতি যেহেতু ম্যানার্স জানে তাই মুখে হাসি রেখেছিল কিন্তু ১টা কথা বলেনি। এক কাপ চা খাইয়েছিল দুটি মাত্র ক্লাব-স্ন্যাকস্ দিয়ে। তখন দুপুর ১২টা। দুপুরে ভাত খেতে পর্যন্ত বলে নি। যদিও ডিজি হরকে ভাই-ভাই ভাবে না, তবু তার কোথায় যেন লেগেছিল, বোধ করি নিজের এনটিটিতেই লেগেছিল। সুতরাং পিশিমা যে বাড়তি সমস্যা হয়ে উঠবে এতে আর সন্দেহ কী!

সে রাত্রে দোলগোবিন্দ চান্স নিয়েছিল। এই গায়ে উকুন হবার পর থেকে তার যেসব অধঃপতন হয়েছিল তা তো এই উকুনকে টপসিক্রেট রাখার জন্যই, বস্তুত যা সকলকেই মিথ্যাভাষণ দেয়া। তার তো প্রায়শ্চিত্ত দরকার! সে তাই ভেবেছিল, পিশিমার কাছে আজ ফ্র্যাংক হবে, অন্তত অনেস্ট হবে। হতে পেরেছিল। জীবনে প্রথম সে, অন্তত একদিনের জন্য অনেস্ট হতে পেরেছিল। তার এরকম উটকো অনেস্ট হবার কারণ দুটি। এক তার ভাই গোবিন্দ সম্পর্কে যার কথা সে তুলতেই পারত না, কেননা পিশিমার চোখে জল আসত, তাছাড়া সে যে নকশাল পেটাতেই এই ডিস্ট্রিক্টের চার্জ পেয়েছে, সেটা পিশিমা যদি ইতিমধ্যে জেনে ফেলে, তাহলে গোবিন্দ সম্পর্কে কিছু কথা বলার মধ্যে স্বাভাবিক যে ডেলিকেসি তা তো থাকবেই। তবু সব বাদ দিয়ে গোবিন্দ সম্পর্কে কিছু ক্ষেত্রে সিওর হওয়া দরকার। এই সিওর হতে সে লুকোচুরি খেলবে না এবার।

দুই তার আরতির সংগে পিশিমার ব্যাপারটা। কেননা এই গায়ে উকুন নিয়ে পিশিমাকে হারালে তার নিজের বাংলোয় সে বড় একা, তার কোন সিকিউরিটিই নেই। যে জন্য পিশিমাকে রাখা তার অস্তিত্বের কারণেই দরকার।

সে জানালো। রাত্রে মেঝেতে মাদুরের উপর পিশিমার পাশে, পিশিমাকে মা ভেবে জড়িয়ে ধরে, প্রায় কোলে উঠবার শৈশবে, পিশিমার কাছে নিজেকে পুরো সারেন্ডার করে সে সব বলল।

লক্ষ্য করল, পিশিমা গোবিন্দ সম্পর্কে খুব সতর্ক। বেশি কথা বললই না। খুব ধরলে পিশিমা অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় বলল, তোকে ওর কথা বেশি বলে লাভ কি বল? তুই তো ওদের ঠেঙাতে চাস—তুই কি বাঁচাতে পারবি? তাহলে তো তোর চাকরিই চলে যাবে। তুই ওর কথা ভাবিস না, ওর কথা ভাবার অসংখ্য লোক আছে।

কিন্তু আরতির সঙ্গে পিশিমার রিলেশন প্রসঙ্গে যখন সে জানালো, দাইমা-ও যা পিশিমাও তাই—অসম্মান করতে সে দুজনকেই পারে—তখন তাকে হতচকিত করে পিশিমা যা বলল, তাই সে ভেবেছিল। তা হল, বলিস, আমি তোর কাজের লোক। তোর চেনাজানা কেউ আমাকে জোগাড় করেছে।

সেদিন সারারাতে আর কোন কথা হয়নি। সারারাত সেদিন পিশিমার হাত নিজের বুকের উপর নিয়ে কান্না না পাওয়া পাথর চোখে এক ফোঁটা ঘুমোতে বা জল ফেলতে পারেনি। প্রায় কাঠ হয়ে শুয়ে ছিল।

তবু এত করেও শেষ রক্ষা হল না। আরতি সব শুনে ঠোঁট চেপে কী যে ভাবল দেবতাই জানেন। কিন্তু তিন দিনের মাথায় আরতি ঠোঁট খুলল, অবশ্য পিশিমারই ভুল। যত কথাই হোক, পিশিমা তো পিশিমাই। তাই শোবার ঘরে ঢোকা, তার খাওয়ার সামনে দাঁড়ানো, একবার ভুল করে 'তুই' বলা, ইত্যাদিতে আরতি ডিক্লেয়ার করল এমন হোলটাইমার তার দরকার নেই।

তবু তাড়ানো অত সহজ নয়। ফাইন্যাল কথা বললেই তো সব ফাইন্যাল হয় না। অনেক কিছু টিট্স্‌বিট্স্‌ থাকে। আর তাতেই ৩ দিন কেটে গেল। না কাটলেই বুঝি ভালো হত। কেননা ভিন্ন এক বিপদে পড়ে গেল সে।

আরতি বোধহয় দিল্লীতে থাকাকালীন গায়ের উকুন দূর করেছিল এবং

গোয়েন্দার মতো তার গায়ের উকুন দূর হয়েছে কিনা লক্ষ্য করত। ডিজিও কম যায় না, আরতির কাছে থাপই খুলত না। যদিও চুলকানি যেমন থাকার তেমনি ছিল, কেননা পিশিমা তো আর তাকে ষত্ন করতে পারত না, কিন্তু আরতির সামনে মোটেই চুলকাতো না। অসহ্য হলে স্থানান্তরে যেত। ল অ্যান্ড অর্ডারের ছুতোয় বেশির ভাগ ট্যুরের নাম করে নন-সিডিউল্ড প্রোগ্রাম করত। অন্যথায় অ্যাপয়ণ্টমেণ্টের কথা তুলে চেম্বারে সময় কাটাতো আর মনের সুখে চুলকাতো। সেও কি ডেকোরাম মেনে সর্বদা নিশ্চিন্তে করা যায়? মোটকথা বিপদেই পড়েছিল। এমন সময় একদিন হল কী, মহিলা সমিতির এক কাজে আরতি বিকেলে বেরুলে পিশিমা সুযোগমত তার গায়ে গোবর লেপতে ভরা বিকেলেই তাকে ডেকে আনল। শোবার ঘরে ঐ ৫ ফুট স্পেসে মাদুর পেতে প্রায় নগ্ন ডিজির গায়ে গোবর মাখাবার ক্লাইমেক্সে আরতি এসে হাজির। দেখেশুনে তার আভিজাত্য খসে পড়তে মুহূর্ত সময় নিল না। গোবর লেপা ভালো করে নজর না করে ঐ ঘনিষ্ঠতা নিয়েই যা সব বিশ্রী কথা বলল, তাতে সিডিউলড কাস্ট তো দূরের কথা, কুকুরও কানে আঙুল দেবে। রাত্রের জন্যও অপেক্ষা করল না আরতি। মুহূর্তে ভি.আই.পি. সুটকেশ গুছিয়ে সে প্রথমে রওনা দিল কলকাতা। জানাতে ভুলল না যে সে দিল্লীতেই যাবে ও থাকবে।

২/৪ দিন শান্তি নীরবতার মতো চুপচাপ কাটল, যা মোটেই শান্তির নয়। তারপর সময় সব মানিয়ে নিল। আবার পিশিমা পিশিমা হলেন।

প্রায় সেই সময় আরেক ঘটনা ঘটল। সেই কাজী অর্থাৎ কাজী সিরাজ-উল-ইসলাম বিনা অ্যাপয়ণ্টমেণ্টে চলে এল। যদিও তাকে আসবার কথা আগের থেকে বলা ছিল, তবু এভাবে কখনো কেউ তার কাছে আসে না।

তখন রাত্রি নটা। ভাগ্যিশ ডিউটি হটিয়ে দেয়নি। অবশ্য তাকে হটিয়ে দেয়া অসম্ভব। সে যা করবে বলে ভাবে, তা সে করেই। উপরন্তু সে একটি চিরকুটে নিজের নাম লিখে পাঠিয়ে অপেক্ষা করছিল ও খুবই সহনশীলতা দেখিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডিউটির সংগে ভাব জমিয়ে সে ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলে।

সে-রাত্রে সে তার বাংলোতেই রাত কাটায়। তার সংগেই বসে খায়। বড় সহজ ও সপ্রতিভ, প্রকৃতই সিরিয়াস লাগে তাকে।

বড় কম কথা বলে। তবু দাবার গুটি চালাবার দক্ষতায় যে-কথা দিয়ে

সে সুরু করে কোথায় তার কথার পৃষ্ঠে কথায় কথায় যে তা শেষ হবে সে-সব জেনেশুনেই যেন সে বলা আরম্ভ করে। অর্থাৎ সে, ডিজি যতবার যা-কিছু বলেছে, তার পৃষ্ঠে সে, কাজী, যা বলেছে তা যে আগের থেকেই ভাবা, বোঝা যায়। উপরন্তু চুইঙ্গাম খাবার মুদ্রায় সে তার কথাগুলো প্রথমে কানে শুনে পরে জিভ, দাঁত, তালু, মূর্ধা বা কণ্ঠ দিয়ে যেন দ্বিতীয়বার শুনছে এমন ভাব করে। মোট কথা ডিজি যে পারপাসে তাকে ডেকেছিল, তার গ্রিপ শেষ অব্দি আর ডিজির হাতে থাকেনি। বস্তুত সেদিন ডিজি পুরো পরাজিত হয়েছিল বলা যায়। যেমন,

—তোমার আবৃত্তি ভারি চমৎকার লেগেছে। কার কাছ থেকে শিখেছ ?

—সেভাবে কারুর নাম করা যাবে না। কেননা কবিতার রিদ্‌ম্‌ আসলে পিপল্‌স্‌ রি-অ্যাকশন ! যাকে আপনারা হিউম্যান ইমোশন বলেন। সাধারণ মানুষ কোন্‌ কথায় বা কথার কোন্‌ ভঙ্গিতে কী রকম রি-অ্যাক্ট করে, এটাই দেখার। ধরুন, সাধারণ মানুষকে আপনি উদ্বুদ্ধ করতে চান, তাদের মধ্যে সুখ-দুঃখ-বেদনা-ক্রোধ-সচেতনতা জাগাতে চান, তাদের প্রতিবাদে মুখর করতে চান, যদি পারেন বা সফল হন, তাহলে যে রিদমে পারলেন, সেই রিদম মনে রাখতে হবে। আবৃত্তির সময় কবিতার অর্থ বুঝে, সেই অর্থ ফোটাবার জন্য তা ব্যবহার করাই যা ব্যাপার। বলা যায়, সাধারণ মানুষই আমার গুরু। একেই 'ফ্রম দা মাস টু দা মাস' বলে।

—তবু তুমি সুপার্ব।

— ....

—তোমার তুলনা নেই।

— ....

—আমি সে-জন্যই তোমার সঙ্গে মিট করতে চেয়েছি। আসলে তোমাকে এ ব্যাপারে পার্সোনালি কনগ্রাচুলেট করতে চাই।

— ....

—রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য সুন্দর। এভাবেই তাঁর অ্যাসেস্‌ হওয়া দরকার।

— ....

—রবীন্দ্রনাথ আর্বান, রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন এখনো লিমিটেড, এ

অ্যাসেসমেণ্ট ভালো।

— ....

—অবশ্য এও যে বলেছ, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে কিনা সন্দেহ, কারণ রবীন্দ্রনাথের আর্বানিটি প্রগ্রেসিভ নয়—এটা ভালো বলেছ। দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ হে নগর, এটা গ্রামে না থাকার পিত্তোন্মাদ। এই ষ্টেটমেণ্ট আমার খুব ভালো লেগেছে। কেননা, এখন আর নগর ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কাকে দেব? কেউ নেবে না। তাছাড়া অরণ্য আর ফিরে আসবে না, বড় জোর রিজার্ভড্ ফরেষ্ট ফিরে আসবে। এই উইট খুবই এনজয় করেছি।

— ....

—সবচেয়ে ভালো লেগেছে ন্যাশানালিজম ও ইণ্টারন্যাশানালিজমের অবজেকটিভ কো-রিলেশন খোঁজা। রিয়ালি রবীন্দ্রনাথের ন্যাশানালিজম 'ছোটো ইংরেজ' ও 'বড় ইংরেজে'র প্রশ্নে বড় ধোঁয়াটে, হেজি। এটা ঠিক 'ছোটো ইংরেজ' বলতে যদি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ বোঝাতো বা 'বড় ইংরেজ' বলতে যদি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্রিটিশ ওয়ার্কিং ক্লাশ, তাহলে ধোঁয়া থাকত না। এও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের ইণ্টারন্যাশানালিজম্ আনডাউটেডলি স্পিরিচুয়াল। তার মধ্যে অ্যাণ্টি-ফ্যাসিষ্ট ট্রেণ্ড থাকলেও তা আউট অ্যাণ্ড আউট মেটাফিজিক্যাল। তুমি চমৎকার বলেছ, আন্তর্জাতিকতা ও সার্বজনীনতা এক কথা নয়।

— ....

—তোমার কাছ থেকে দুটি পয়েণ্ট শিখেছি, তার জন্য আমি তোমার কাছে চিরদিন গ্রেটফুল থাকব। ফার্স্ট পয়েণ্ট রবীন্দ্রনাথের ন্যাশানালিজমের সোর্স যে হিন্দু-মেলা, সেটা কমুনাল। আমি জানতামই না, হিন্দু-মেলায় এরকম কথাই উঠত যে 'মেঘ যেমন সকল স্থলে বৃষ্টি দেয় না, সকল কৃষক যেমন জমি কর্ষণ করে না, তেমনি স্বাধীনতাও সকলের জন্য নয়।' কোন দিন খেয়ালই করিনি 'হিন্দুমেলা' নামটাই কমুনাল। তুমি রাইট, এই হিন্দুমেলা দেখেই মুসলিম।···সেকেণ্ড পয়েণ্ট, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত টেণ্ডার ইম্পিরিয়ালিষ্ট ভাবতেন। তোমার এই কথা শুনে আমি তোমার দেয়া রেফারেন্স ভালো করে পড়ে দেখেছি। তুমি কারেক্ট! সত্যি 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ রিয়ালি লিখেছেন, ইংরেজরা অনেক নম্র। কথাটা দাঁড়ায় এই,

শরৎচন্দ্রকে অ্যারেস্ট বা তাঁর উপর টর্চার না করে, শুধু তাঁর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করা রবীন্দ্রনাথের চোখে ইংরেজদের এক ধরনের উদারতা। কী আমি ঠিক বললাম ?

— ....

—একেবারে চুপচাপ আছ, ব্যাপার কী ? কিছু ভাবছ ?

—না আপনার কথা মন দিয়ে শুনছি।

—আমি যে ঐ ফাংশনে 'শ্যামা' ইনট্রোডিউস করলাম বা প্রমথবাবুকে আনালাম, এটা বোধহয় তোমার পছন্দ হয়নি। দেখছিলাম, তুমি তখন বেরিয়ে গেলে। আমি আসলে ভ্যারাইটি চেয়েছিলাম !

—এই ভ্যারাইটি ব্যাপারটাই আসলে রি-অ্যাকশানারি।

—কেন ?

—কারণ সহজ। আমরা যখন কোন প্রোগ্রাম করি তাতো সিলেকটিভই হয় অর্থাৎ আমরা বেছে বেছে এট্রাকটিভ আইটেম সিলেক্ট করি। নিশ্চয়ই এই সিলেকশন ভেবেচিন্তেই হয়। সেই ভাবনা-চিন্তার চরিত্রের ওপরই এক একটা ফাংশনে এক এক রকম প্রোগ্রাম হয়। তবে সর্বদা একটা কথা মনে রাখতে হবে, কোন সাহিত্যই কার্যত সার্বজনীন বা শাশ্বত হতে পারে না, অন্তত যতদিন সমাজে শ্রেণী থাকবে, ততদিন কী করে সাহিত্য সার্বজনীন হতে পারে, কেননা সব মানুষই কোন না কোন শ্রেণীভুক্ত, রবীন্দ্রনাথও তাই ; রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সব শ্রেণীর চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা জানা সম্ভব না। নিজে বলেছেনও 'আমার কবিতা গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী'। ভাবুন সর্বত্রগামী না হলে সাহিত্য কখনো সার্বজনীন হতে পারে ? আরও দেখুন, এ পৃথিবী পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় কিছুই শাশ্বত থাকতে পারে না। অতএব সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, বিবর্তিত মানুষের মন-মেজাজ বুঝে আগেকার সাহিত্যের কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতেই হবে। বর্জন করতে হবে অন্তত শ্যামা, কেননা সেখানে বণিকের প্রতি যে সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, তা এখনকার জনগণ ভালো করে বুঝলে মোটে পছন্দ করবে না।

এখানে ডিজির কয়েকটা কথা বলার ছিল। বলার ছিল, মানুষ যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষের কিছু কিছু ব্যাপার থেকে যাবেই, যা এক কথায় শাশ্বত বা ইটারন্যাল। কিন্তু ডেল কার্নেগির কথা ভেবে সে সেই উপদেশ মানল, কারুর উপর প্রভাব খাটাতে গেলে তার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে।

শ্রোতা হও, কথক হোয়ো না। সে তাই শুনবার জন্যেই আরেক প্রশ্ন করল।

—কিন্তু প্রমথবাবুর কথাগুলো তো ভালই ছিল! রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সত্যিই তো 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' ইত্যাদি আগে বুঝতে হয়। কী, তাই না?

—মোটেই না। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'কে যে-ভাবে উনি ব্যাখ্যা করলেন, আমি বাইরে থেকে শুনেছি, তা এই সময়ের বিচারে মোটেই কালোপযোগী হয়নি। যদি উনি বলতেন, সীমার মাঝে অসীমকে দেখা বা দেখতে পাওয়া আসলে মানুষকে সমাজাশ্রয়ী হতে সাহায্য করে. তাহলে ভালো হত। এই ব্যাখ্যা এখনকার মানুষ ভালো বোঝে, না বুঝলে এই ব্যাখ্যাই এখন বোঝানো দরকার।

এখানেও ডিজি ডেল কার্নেগিকে মেনে শ্রোতাই থাকল, তার্কিক হল না। ফল অচিরাৎ দেখা দিল। কাজী ঘরের চারপাশে তাকিয়ে উঠে বুক-সেল্‌ফগুলির কাছে গেল। বেশ কিছু সময় ধরে বইগুলি দেখল। স্পর্শ করল না। ফিরে পুনরায় বসে বলল, আপনার দেখছি কালেকশন দারুণ। লিন পিয়াও, গিয়াপ অব্দি রেখেছেন। ভালো লাগল। এসব পড়েন তো?

—পড়ি, তবে সব যে ভালো বুঝি তা নয়, তুমি সাহায্য করবে?

—আমি? দেখুন, শুধু পড়ে কিছু বোঝা যায় না। পড়ে জীবনে তা প্রয়োগ করতে হয়; তখনিমাত্র আসল বোঝা হয়।

—ঠিকই, কিন্তু আমার স্কোপ কম।

—মোটেই না। এই শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজে সবার স্কোপই লিমিটেড বা সীমাবদ্ধ। যে যেখানে আছে, সেখানেই প্রয়োগ সুরু করতে হয়। সুরু করলেই সীমাবদ্ধতা ক্রমে কাটে। আপনি একবার সুরু করেছিলেন। '৬৯-এ আপনি একবার রিলিফ দিতে মেদনীপুরের এক গ্রামে ৪৮ ঘণ্টা ছিলেন। সেখানকার প্রাইমারি স্কুলের বাড়িতে ছিলেন। কোন সরকারী কমফর্ট নেন নি। বরং চিঁড়ে গুড় খেয়ে গ্রামের অনাহারী মানুষদের সঙ্গে ২ দিন কাটিয়েছেন। চাটাই-এ শুয়েছেন। সেই গ্রামের হাই-কাষ্ট মধ্যবিত্ত চাষীরা আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আপনি যাননি। তারা ভালো ভালো খাবার পাঠাতে চেয়েছিল। বিছানা পাঠাতে চেয়েছিল। আপনি অ্যাকসেপ্ট করেননি। বরং তথাকথিত লো-কাষ্টদের সঙ্গে বসে আপনাদের রিলিফের চিঁড়ে-গুড় খেয়েছিলেন।

তাদেরই ব্যবস্থা করা চাটাই-এ শুয়েছিলেন। সম্ভবত আপনি তখন ঐ সাব-ডিভিশনের চার্জে ছিলেন। মনে পড়ে?

ডিজি ওরফে দোলগোবিন্দ চমকে গেল। তার মনে পড়ল সব। দূরে কোথায় যেন গরু ডাকল। আমের মঞ্জরীর গন্ধ পেল। পুকুরের জলের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার নিপুণভাবে কামানো গায়ে, বিশেষত তলদেশে এক ধরনের আরাম দিল। স্পষ্ট দিবালোকের মতো সে দেখল সেই গ্রাম। তারই জাত-ভাই, তথাকথিত সব লো-কাস্ট, যারা সরকারী 'সেনসাসে' তারই মতো সিডিউলড কাস্ট, তবে কি গায়ে উকুন ঐ গ্রাম থেকে, তার জাত-ভাইদের গা থেকে এসেছে? তবে কি এই গায়ে উকুন তার ক্লাশ-ক্যারেকটার, তার ক্লাশ-হেরিটেজ? বহুদূর থেকে অদ্ভুত এক শান্তি আসছে, যার কথা মনে পড়ছে। গোবিন্দর জন্য বুক কেমন করছে। বাবার জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে। জীবনে প্রথম তার নিজের জন্মদাতাকে নর্মাল ও কাজের মানুষ মনে হল। সে জামার বোতাম খুলে ফেলল। তার জন্মের লোম, যা সে কামিয়ে ফেলেছে, তারা যেন তার খুবই প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল, তাদের জন্য মন কাঁদিল। একটা হাত চলে যাবার মতো দুঃখ হল তার। সে হাত বোলালো বুকে। না, নেই, তার অমেয় লোমগুলি আর নেই। কিন্তু সে তো মানুষ, এখনো বেঁচে আছে, এখনো ভুল শোধরানো যায়, কেননা আবার তার লোম হবে, আবার তার ঐতিহ্য সারা গায়ে জেগে উঠবে। এই প্রত্যাবর্তনে কোনো দুঃখ নেই।

—তুমি জানলে কী করে?

— ....

—হাউ?

— ....

বুঝল উত্তর পাবে না।

—আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো দেখছি!

— ....

—তোমার একটা মিশন আছে, মনে হয়।

— ....

—কারুর মিশন থাকলে ভালো লাগে। আমার নেই তো, তাই দুঃখ হয়।....এই যে বইগুলো দেখছ ওগুলো বেশিদিন কিনি নি। তবে পড়েছি সব। ওটা আমার হবি। পড়ে ভালো লেগেছে। অনেক কিছু শিখেছি।

খুব সাইন্টিফিক। অবশ্য সব ভালো বুঝিনি। হাউএভার এই লিটারেচার একটা মেথড বা প্রসেসকে পয়েন্ট করে। একটা আউটলুক গড়ে তোলে। বিশেষত এর একটা সোস্যাল সাইন্টিফিক ভ্যালু আছে। অবশ্য এঙ্গেলস যতটা সহজ মার্কস ততটা না। তেমনি মাও যতটা সহজ লেনিন ততটা না। লিন পিয়াওকে সাপোর্ট করা যায় না। ওর থার্ড ওয়ারল্ড থিয়োরি নেহরুর মতো স্টার্ট করে। হো-চি-মিন মনে হয় এ দেশের পক্ষে এ মাস্ট, সবারই পড়া উচিত; বেশ ওরিয়েন্টাল। গিয়াপ অবসোলেট এখন। আর চে গুয়েভারা তো মনে হয় জোনাথোন সুইফট্, ড্যানিয়েল ডিফো, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক ও রবিন হুড ব্যালাডের ককটেল, কী তাই না?

— ....

ডিজির ভয় হল, কাজীই ডেল কার্নেগি হয়ে গেল কিনা।

—চা খাবে?

—খেতে পারি, তবে দুধ ছাড়া হলে ভালো হয়। চা খেলে কিন্তু আমি একটা বিড়ি ধরাবো।

—ও সিওর!

বেল বাজিয়ে চা চাইল ডিজি। বলতে ভুলল না দুটোই লিকার, দুধ ছাড়া। ডেল কার্নেগিকে আপাতত শিকেয় তুলে সে ষ্ট্যানলি গার্ডনার হতে চাইল।

—এই বইগুলো কিনেছিলাম কয়েকটি পোষ্টার পড়ে। মনে আছে সব....বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম....নির্বাচনে মন্ত্রী বদলায়—জনগণের অবস্থা বদলায় না....নকশালবাড়ি থেকে বিপ্লবের দাবানল দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, পড়বে....চীনের পথ আমাদের পথ.... ভিয়েৎনাম-নকশালবাড়ি আমার বাড়ি তোমার বাড়ি....গণফৌজ ছাড়া জনগণের আর কিছু থাকে না....রাষ্ট্র সর্বদাই কোনো না কোন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে থাকে, সবশ্রেণীর রাষ্ট্র বলে কোন কথা নেই....রাষ্ট্র হল এমন একটি যন্ত্র যার দ্বারা একটি শ্রেণী অপরাপর শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করে ও শোষণ করে....হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো ঢাকতে পারে কি কেউ? / আমাদের মেরে ঠেকানো যাবে কি জন-জোয়ারের ঢেউ?....বিপ্লব হল জনগণের উৎসব—এই সব শ্লোগান পড়ে কৌতূহল জাগে। তাই কিনেছি।

—আপনি লোম কামিয়েছেন?

—না, হ্যাঁ, কেন বল তো?

—মনে হচ্ছে। তবে বুকের লোম কামানো ঠিক হয় নি।

—কেন? নিমোনিয়া হবে?

—নিমুনিয়া হবে কিনা জানি না। ওতে মানুষ দুর্বল হয়। প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। স্যামসনের গল্প ভাবুন।

—ঠিকই।

—কেন কামালেন? উকুন হয়েছিল?

—কী করে জানলে? তুমি দেখছি আমার অনেক কিছু জানো।

—একজন হিপিকে দেখেছিলাম।

—হিপিদের উকুন হয়?

—হয় বৈকি! এই দেশে জনগণের ভিতর ২/১ দিন থাকলেই হয়। ও তো ওষুধেই সারে। লরেক্সেন ইউজ করেননি?

—করেছিলাম। এফেক্ট হয়নি।

—রি-অ্যাকশন হয়েছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, আশ্চর্য, তুমি দেখছি সবই জানো!

—গায়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মাখতে পারতেন। রি-অ্যাকশন চলে যেত। আবার লরেক্সেন মাখতেন। লরেক্সেন মাখলে সাতদিন স্নান করতে নেই, সাবান দিতে নেই গায়ে।

—জানতাম না তো!

—ডাক্তারের পরামর্শ নেন নি?

—না।

—সংকোচ?

—ঠিক বলেছ।

—হোমিওপ্যাথী করাতে পারতেন। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারদের কাছে কেউ সংকোচ পায় না। ওঁরা নিজেরাই সংকোচ কাটিয়ে দেন। ওঁরা তো রোগের চিকিৎসা করেন না, রোগীর চিকিৎসা করেন! আসলে ওঁরা মানুষের সাবজেকটিভ চরিত্র বদলে দিতে পারেন। স্ট্যাফিসগ্রাসিয়া ব্যবহার করলে সেরে যেত, উকুন থাকত না।··· আপনি নিশ্চয় রাগ মনে পুষে রাখতে পারেন, আপনার অবশ্যই প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা আছে কিন্তু প্রতিশোধ নেন না। যদিও আপনার মেজাজ খিটখিটে, তবুও আপনার এনডিওরেন্স ওয়ান্ডারফুল। ফেয়ার সেক্সের প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে। এ ব্যাপারে আপনার বাছবিচার নেই। নোংরা মেয়েদের সাথেও

শুনতে আপনার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালো-বাসেন। আপনার অ্যাম্বিশন খুব হাই। কী, ঠিক বললাম?

—আশ্চর্য, সব—সবই ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড কারেক্ট!

না, ডিজিকে সাবধান হতে হবে। ঘুরে ফিরে সে কেবল গ্রিপ হারাচ্ছে। সে একটি সিগারেট ধরালো। সাধারণত সিগারেট সে খায় না। টেনশন হলে খায় কিম্বা সময় কাটাতে। এখন সময় কাটাতে খাচ্ছে। আসলে সিগারেটে তার নেশা নেই। তার নেশা ছিল নস্যিতে। আই.এ.-এসে প্লেস পাবার পর থেকে সে নস্যি গোপনে নেয়। বলা যায়, তখন থেকেই তার কিছু কিছু ব্যাপার টপ সিক্রেট রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা নস্যি দিয়েই একরকম শুরু। সে একটি সিগারেট কাজীকে অফার করে। কাজী জানায়, সিগারেটে তার জমে না, বিড়িতেই অ্যাডিকশন। কিন্তু যাইহোক চায়ের আগে কিছুই সে খাবে না। কিছু বাদে সেই চা এসে যায়। নিতান্তই ডেল কার্নেগির জন্য জীবনে এই প্রথম সে দুধ ছাড়া চা খাচ্ছে, কমিউনিকেশনে এই ব্যাপারটা খুব হেলপ্ করে।

—তোমার মতো আরেকজনের সংগে আমার পরিচয় ছিল। তোমার বয়সী। না, তোমার মতো দেখতে না। তার নাম বোধ করি বিপ্লব ছিল।

বলেই কিছুক্ষণ থামল ডিজি, অবজার্ভ করল। সামান্য চোখের পাতা কাঁপা ছাড়া কাজীর আর কোন রি-অ্যাকশান হল না। আসলে সে পুরো মিথ্যে বলছে। আসানসোলে বিপ্লব নামে একজন এক্স্ট্রীমিষ্ট ছিল। তাকে সে জন্মে দেখেনি।

—আসানসোলে যখন ছিলাম তখন আলাপ।

হাজার হোক মানুষ তো, তাই কাজী তার উত্তেজনা গোপন করতে পারল না। তবে নিমেষেই সামলে নিল।

—সেও তোমার মতোই হোমিওপ্যাথীতে এক্সপার্ট ছিল।

ডিজি বেশ ভয়ে ভয়ে একথা বলল, কেননা কাজী যদি তাকে চেনে ও ভালো করেই চেনে তাহলে হয় অবাক হবে নতুবা তার চালাকি ধরে ফেলবে। কিন্তু না, কাজী রীতিমত শ্রোতা। সাবধানী অথবা ডেল কার্নেগি।

—সে আমাকে খুব হেল্প্ করেছিল। এই পড়াশুনোয়। মাও-এর 'অন প্রোপাগাণ্ডা' সে ভালোই বুঝেছিল। কথা দিয়েছিল একদিন দুর্গাপুর-বেল্টে নিয়ে যাবে। কথা সে রাখতে পারেনি। হয়ত সময়

হয়নি। আসলে সে তারপর থেকে পুরো ইউ.জি.তে অর্থাৎ ফক্স্‌হোলে, মানে আত্মগোপন, করেছিল। খুব ব্রিলিয়াণ্ট ও সিরিয়াস ছিল। আর তার খোঁজ পাই না। পেলে ভালো হত। যদিও আমি গরমেণ্ট সারভেণ্ট, তবু আমার এক্সট্রিমিষ্টদের ভালো লাগে তাদের স্যাক্রিফাইসের তুলনা নেই।

বলেই সে থামল। ততক্ষণে চা ঠাণ্ডা। পুরো নতুন বলে সে গরম গরম খায়নি। তার কিছু ডিলেমা ছিল। যদি মুখ বিস্বাদ হয়! মুখ বিস্বাদ হলে তার কিছু ভালো লাগে না আনইজিনেশ আসে। স্মার্টনেস থাকে না। গ্রিপ চলে যায়। কিন্তু একেবারে না খেলে কমিউনিকেশন হবে না, এই ভেবে সে ঠাণ্ডা করে নিল। এক চুমুক খেয়ে বুঝল ব্যাপারটা মন্দ নয়। একদিন গরম গরম খেয়ে দেখতে হবে। অবশ্য লিমন-টি সে খেয়েছে ২/১ বার কিন্তু তা ছিল আইসকোল্ড। হুইস্কিতে হ্যাংওভার হলে ভালো লাগে। কাজ হয়। এনার্জি আসে। এনার্জি এতেও এল আর তারই দৌলতে সে অবশেষে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল।

—আমার ভাইও এক্সট্রিমিষ্ট।

ওষুধ এতক্ষণে ধরল। কাজী চা শেষ করে বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিয়ে কিছু বেসামাল হয়ে বলল, জানি। আঃ, ধরা দিল, এত তাড়াতাড়ি ধরা দিল? এই জয়ের আনন্দে মনের কোণে কাঁটার মতো বিঁধে রইল ভাই, তার গোবিন্দ।

—আমার এই ভাই খুব ফেবারিট। তার এমন কতগুলি কোয়ালিটি ছিল, তাকে না ভালোবেসে পারা যায় না। কতদিন দেখিনা তাকে!

অস্ত্রটি লক্ষ্যচ্যুত হল না। বিড়িতে দু-চার টান দিয়ে যখন চোখ বুজল তখন আর ডেল কার্নেগি নয়, ষ্ট্যানলি গার্ডনারই সাকসেসফুল হল।

—দেখবেন?

—তুমি চেনো তাকে? গোবিন্দকে?

—আপনাকে নিয়ে যাবো তার কাছে কিন্তু একটা সর্তে। আপনি একলাই আমার হেপাজতে যাবেন। বলা বাহুল্য কাউকে বলবেন না স্ত্রীকেও না। পায়জামা পরে যাবেন। শেষ রাত্রে যাবেন, সংগে কোন অস্ত্র নেবেন না। সেদিন সারাদিন থাকতে হবে। শেষরাত্রে পেঁছে দেব। রাজি?

—রাজি।

—জানবেন গোবিন্দর দাদা বলে নয়—আপনি একদিন মেদিনীপুরে

প্রো-পিপল হয়েছিলেন এটা তার রিওয়ার্ড। আর তাছাড়া আপনার গায়ে উকুন হয়েছিল এতে প্রমাণ হয় আপনি....থাক আর এ বিষয়ে কথা না। শুধু জানুন, এটা ঘটার আগে বা পরে আপনি যদি কোথাও কিছু রিপোর্ট করেন, তাহলে আপনাকে খতম করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। ও.কে. ?

ও.কে.।

একেই বলে ডিজি, যার শেষ মার হল ওস্তাদের মার।

এরপর আর কোন কথা হয়নি। তবে রাত্রে শুয়ে যেন নিশ্চিন্ত না হতে পেরে কাজীর কাছে গিয়েছিল সে। সে অঘোরে ঘুমাচ্ছিল মনে হলেও তার দরজা খোলা ও খুলে কাছে যাওয়ার প্রায় নৈঃশব্দে সে জেগে উঠেছিল।

—আমি শেষরাত্রে মর্নিংওয়াকে যাই। তখন তোমাকে এগিয়ে দেব কোর্ট পর্যন্ত। আর ঐ মর্নিং ওয়াকের ছুতোয় তোমার সংগে সেদিন যাব। রাজী ?

—রাজী।

ডিজি সহসা চলে গেল না। বরং আরো কিছু এগিয়ে খুব ক্লোজলি কাজীর বিছানায় বসল।

—আর কিছু বলবেন ?

—তোমার ঘুম পাচ্ছে ?

—পাচ্ছে, তবু আপনার যদি কিছু বলার থাকে শুনব।

—আমার কিছু ক্লিয়ার হবার ছিল।

—হোন।

—এই যে তোমরা জোতদার খতম করছ কী শ্রেণী-শত্রু মারছ, এটা আমার মনে হয় ভুল হচ্ছে।

— ....

—কেননা মাও বলেছেন, শত্রুকে শারীরিক ভাবে অস্ত্রহীন করাই আমাদের লক্ষ্য, শত্রুকে শারীরিক খতম করা নয়। লক্ষ্য শুধু নিষ্ক্রিয় করা।

—দেখুন এর জবাব দেয়া যায়, আজ দেব না। আপনাকে আরও কিছুদিন দেখব। আপনি আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে আমাদের বেশ কিছু ক্ষতি করেছেন। আমার এ-সব বলার প্রোগ্রাম নেই, তবু নিজের

রিস্‌কে বলছি, আমাদের খবর আছে, আপনি এই জেলায় এসেছেন আমাদের ডেন ভাঙতে। এজন্য আপনি আমাদের অবসারভেশনে আছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সঙ্গে আপনার ভাইকে মিট করিয়ে দেব। এর মধ্যে আমাদের এল.সি.'র কোন যোগ নেই। যদিও আমি এল.সি. ও এ.সি.কে রিপোর্ট করব। যান শুতে যান, আর কোন কথা নেই। আমি আজ পাঁচদিন পর বিছানায় ঘুমুচ্ছি। চারদিন পর ভাত খেলাম। আমি ভালোই জানি আজ আমার উপর কোন ওয়াচ নেই। আমাকে পিসফুলি ঘুমাতে দিন।

ডিজি আর তাকে ডিসটার্ব করেনি। কষ্ট হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন গোবিন্দই ঘুমুচ্ছে। হর-কে সেই কবে এনটারটেন না করার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। অবশ্য সে রাত্রে ডিজির মোটে ঘুম আসে নি। রি-অ্যাকশন হচ্ছিল। এই রি-অ্যাকশন তাকে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে! কিন্তু তার আগেই তার স্টেটের সি.এম. তাকে ডেকে পাঠালো কলকাতায়। ডিজি আবার অরিজিনাল ডিজি হয়ে গেল, যাকে এদেশের মিডল ক্লাস ডি.এম. বলে।

সেখানে তাকে সময় দেয়া হল ৭২ ঘণ্টা, কেননা, ইনসর্ট, একস্‌ট্রিমিস্টরা নাউ ইন অ্যাকশন, দুর্গ গড়েছে তারই ডিস্ট্রিক্টের জঙ্গলে। সেখানে তারা হাসপাতাল, আর্মারি ও কমিউন গড়েছে ও রুটমার্চ করেছে। অপারেশন সাক্‌সেসফুল হলে তাকে অল ইণ্ডিয়া স্কোয়াডের সেক্রেটারিয়েটে প্রমোশন দিয়ে ট্র্যান্সফার করা হবে দিল্লীতে।

আহা, এমন সুসময়ে কেন তার ভাই আছে? সহোদর? প্রিয় ভাই? যাকে সে কতদিন দেখে নি। কিন্তু না, কেরিয়ারের এই অত্যুজ্জ্বল সময়ে সে কেন গোবিন্দর কথা ভাববে? গোবিন্দ কি তার কথা ভেবে দেশের কাজে নেমেছিল? দেশের কাজ কোনটা? তার কাজও কি দেশের কাজ নয়? দেশের কাজ কি ওদেরই একচেটিয়া?

নিজের ডিউটিতে ফিরে তবু ডিজি মাথা ঠিক রাখতে পারল না। ঘরে আরতি নেই। পিশিমাও আর আগের মতো পিশিমা নেই। আরতির কোন নিউজও নেই। সে অভিমান করে ইনফরমেশনও নেয় নি। তার কোন বন্ধুও নেই যে পরামর্শ করবে। ডিকে, আরতির বাবা এখন দিল্লীতে। এতদিনে আরতি নিশ্চয় তাঁর কাছে এবং তাঁকে যা বলার বলেছে। এতক্ষণে ডিকে নিশ্চয় স্টোন। অ্যাণ্ড ব্লাড ক্যান নট বি

অবটেইনড ফ্রম ষ্টোন। অথচ ডিজির এখন নিউ ব্লাড দরকার। কে দেবে? ঐ কাজী? কিন্তু কাজীকে সে পাবে কি? প্রথমে ওয়ান জিরো জিরো তারপর সেই অধ্যাপককে সে ট্রাই করল কিন্তু কেউ তাকে এক রত্তি হেলপ করল না। প্রথমত কাজীর কোন ট্রেস নেই, দ্বিতীয়ত সেই অধ্যাপক ছুটি নিয়ে নাকি পুরী গেছে।

তাহলে সত্যিই এক্সট্রিমিষ্টরা নাউ ইন অ্যাকশন! বেশ তবে তাই হোক। অপারেশন সুরু করা যাক। না, কোনো ইমোশন নয়, আসলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একবার দিল্লীর মাটি তার পায়ের তলায় এলে, সে দেখে নেবে, কাকে বলে কেরিয়ার, আর কাকে বলে তেল-সোনা-কাগজের খনি!

ডিজি ক্রমে ডিজি হতে থাকল। একটি কাম্পোজ খেয়ে প্রেজেণ্ট পাওয়া নবম আশ্চর্য রয়াল স্যালুট, যা প্রকৃত স্কচ হুইস্কি, বিনা সোডা বা জলে ২০০ মিলিলিটারের গ্লাসে ভর্তি করল। ডেসকে গিয়ে অপারেশনের ব্লু-প্রিণ্ট দেখতে দেখতে গ্লাস যখন হাফ অর্থাৎ অর্ধেক ভর্তি না বলে, যাকে বলা উচিত অর্ধেক খালি, তখন সে অন্য কোনোরকম সিমটম ছাড়াই এক মস্ত কিক খেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্লু-প্রিণ্ট রেখে সে সরকারী প্যাডে আরতিকে চিঠি লিখতে বসল বাংলায় জীবনে প্রথম। সেই আরতি, হাউ টেরিবল, যে সিডিউল্ড কাষ্ট সন্তান চায় না। তাই চোখের জলে সে-চিঠি শেষ করে দ্বিতীয়বার পড়ে পর্যন্ত দেখল না। এক নিঃশ্বাসে গ্লাস পুরো ফাঁকা করে সে উঠল। তার চোখ তখন ঝাপসা। চোখের পাতা ভারি। মনে হচ্ছে ডান চোখের পাতাই বেশি ভারি ও ঝাপসা। সে গা করল না। বরং মেজাজে ঘরের সব আলো জ্বালিয়ে দিল। তাতেও সেই কাঙ্খিত আলো এল না যা সে চায়। অযথা ষ্ট্রোল করল, ঘরে, কার্পেটের উপর।

তারপর এক ওমনিপোটেণ্ট চীনেম্যানের সামনে, যে পোকায়-ফাঁসা চেয়ারে বসেছিল, সম্ভবত কালচারাল রেভোলিউশন করবে বলে, যার আঙুলে চিক চিক করছে আরতির সঙ্গে তার এনগেজমেণ্ট রিং; এবং হাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা ঠাণ্ডা গোল পিস্তল, একদা যা উকুন ছিল, যার কমিটেড ছটি পা পিস্তলের ছটি লিভার হয়ে তাকেই তাক করছে। সে ভয় পেয়ে বলতে গেলো, উর্ধশ্বাসে সকলকেই ছুটে যেতে হয়।

কোথাও সোনা পাওয়া যাবে বলে সকলের আগে সকলেই তাই।....এরকমই কিছু একটা বলতে গেল। পারল না। বড় ইরেগুলার ও নন-রিলেটেড হয়ে গেল। সে কোন এক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে দেখা 'ওয়েডিং সুইডিশ ষ্টাইল'-এর সদ্য-বিবাহিত পুরুষের মতো কার্পেটের উপর পড়ে গেল। তার স্ত্রী আরতিকে ভোগ করল সেই চীনেম্যান তার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে। আর আরতিও তার বুকের উপর রাখতে পারল ঐ চীনেম্যানকে কেননা সে সিডিউল্ড কাষ্ট সন্তান চায় না।

ভোরবেলা পিশিমাই তাকে টেনে তুললেন। তখনো মাথা ঝিম ঝিম করছে। ঘরের আলো এতক্ষণে সেই কাঙ্খিত আলো দিচ্ছে যা সে গতরাত্রে চেয়েছিল। সে কোনোমতে নিজেকে টেনে নিয়ে গেল বাথরুমে। গীজার অনই ছিল। সে নির্দিষ্ট ট্যাপ দুটি অ্যাডজাষ্ট করে সাওয়ারের নিচে ঐ জামা-কাপড় সমেত স্নান করতে লাগল। গরম জল মাথায় ও গায়ে পড়ে তাকে যে সিকিউরিটি দিল, সেই সিকিউরিটির কাঁধ ধরে সে জামা কাপড় খুলল ও পুরো নেকেড হয়ে বেসিনের কাছে এল।

আঃ এমন অশৌচ দেখাচ্ছে কেন তার মুখ আয়নায়? এই সুন্দর ধারাস্নানের পর তার মুখের সেই পরিচ্ছন্নতা কৈ? দু-সেকেণ্ডেই বুঝল ডিজি গালে তার ৪৮ ঘণ্টার দাড়ি, কেননা কাল ছিল জন্মবার, কামানো হয়নি। এটা কোনো ব্যাপার না, কামালেই বেরিয়ে আসবে সেই মুখ। যা দেখে প্রথম দর্শনেই ডিকে, আরতির বাবা, বলেছিল ব্রাইট। সে গা মুছে সেই তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে দাড়ি কামাতে সোজাসুজি তাকালো আয়নার দিকে। যেখানে তার স্বাস্থ্যবান ঠোঁটের উপর অনার্য নাক তাকে আরতির কথা ক্ষণিক ভাবালো। চোখ দুটি জ্বলে উঠল। আজ ১৪ বছর হল বিয়ে হয়েছে তবু আজও সে সন্তানের মুখ দেখল না একদিনের তরেও। আরতিরও মা হবার সাধ হল না। কী অমানুষিক! কিন্তু এটা যে আসলে এ দেশের ইটারনাল ক্লাস কনফ্লিক্ট, আগে কখনো বোঝেনি ডিজি। মনে হত, আরতি তার ডিস্ট্রিক্টের চার্জ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। হায়, এসব আগে জানলে কে না স্ব-জাতিকেই বিয়ে করে! ভুল, কাজী, ভুল, তোমাদের সব কিছুই ভুল, এ দেশে ক্লাস-কনফ্লিক্টের চেয়েও ভয়ানক ও প্রিন্সিপাল কনট্রাডিকশন আছে এই কাষ্ট এই কাষ্ট-কনফ্লিক্টে। এই

ভুলের জন্য এত সাইণ্টিফিক হয়েও তুমি গোবিন্দর দাদাকে তোমাদের দুর্গে নিয়ে যেতে চাও। আহা, তুমি কি টের পাও, কাজী, তোমার মধ্যে ক্লাস-কনসাসনেস নয়, কাষ্ট-কনসাসনেস কাজ করছে? আবার বলছি, এই কাষ্ট কনসাসনেসের জন্য তুমি গোবিন্দর দাদাকে তোমাদের দুর্গে নিয়ে যেতে চাও। ভেতরে ভেতরে সে না কেঁদে পারল না। চোখ আবার ঝাপসা হয়ে গেল। আবার তার ডান চোখের ওপরের পাতা ভারি হয়ে গেল। তার গালে তখন 'সুপার-ফোম' ফেনা তার নাককে অযথা জাগিয়ে রাখছে। তার চোখকে অকারণ স্পষ্ট করছে। যার ডান পাতা ভ্রূ থেকে নেমে আসছে ভারি হয়ে। তার কি আঞ্জনি হবে?

চোখ দিয়েই ভালো করে চেয়ে দেখল নিজের ডান চোখ। ওপরের পাপড়িতে কী যেন লেগে! সে সতর্কতার সংগে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীর নোখ দিয়ে সাঁড়াশির স্বভাবে পাপড়ি থেকে তুলে আনল যা, তা আর কিছু না তার বুক-হিম করা সেই উকুন।

না উদ্ধারের আর কোন পথ নেই। যে কোরেই হোক অপারেশন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে, কেননা ইতিমধ্যে ২৪ ঘণ্টা বৃথা পার হয়ে গেছে গোবিন্দর কথা ভেবে। এখন কাজীর সাহায্য ছাড়াই তাকে এগুতে হবে তাদেরই দুর্গে। ম্যাপ প্রস্তুত। হট লাইনে মিলিটারি ডাকা মাত্র ৬০ সেকেণ্ডের ব্যাপার। তারপর সেই প্রোমশন, সেই দিল্লী, যা আর দূরে থাকবে না, তার কাছে এসে যাবে। তার গায়ের উকুন তখনই প্রকৃত নির্বংশ হবে, জাতে উঠে যাবে দোলগোবিন্দ ওরফে ডিজি।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাপরিনির্বাণ

'তা সৌভাগ্যের বই কি। এমন মৃত্যু সৌভাগ্যের নয়?'

যদিও তারাপদর দুই ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে, তিন মেয়ে ডাক ছেড়ে, দুই বৌমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এবং নাতি-নাতনীদের কেউ কেউ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুম মেরে গেছে কেউ মা-মাসীদের সুরে সুর মেলাচ্ছে, বস্তুত বাড়িটা দস্তুরমত একটা মড়াকান্নায় ছটফট করছে, তবু, খানিকটা চাপা স্বরে হলেও স্বস্তি-পাওয়া গলায় কথাটা বলল ভুবন।

যোগেশ জবাব দেয় না। তবে ভুবনের দিকে একবার তাকাল।

চাউনিতেই ভুবন উৎসাহ পায়। মৃত্যুটা কেন সৌভাগ্যের বুঝিয়ে বলতে থাকে। গলার স্বর আরও নামিয়ে।

তারাপদর নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে যোগেশ শুনে যায়। শুনতে শুনতে কারণ খোঁজে। তারাপদর এই আচমকা-মরে-যাওয়ায় ভুবনের খুশীর কারণ।

ভুবন তারাপদর বয়সী। তার মানে বছর ষাটেক। কিন্তু তারাপদর মত শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্য নয়। ভুবনের বউ আছে, পাঁচ বছর হোল সে বাতে শয্যাশায়ী। ভুবনের তিনটে আইবুড়ো মেয়ে আছে, দেখতে কুৎসিত, লেখাপড়া শেখেনি। এবং ভুবনের ছেলে নেই। না, ছিল। বছর কয়েক আগে গাড়ি চাপায় মবেছে। সে ছেলের একটা বউ, পাঁচটা বাচ্ছা। সংসার টানতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ভুবন। সকালে টিউশানি, দুপুরে চাকরি এবং সন্ধ্যায় পার্ট টাইম করেও মাসের পনের তারিখ থেকে এর ওর কাছে হাত পাততে হয় ভুবনের।

মরতে তো সবাইকে একদিন হবেই, বুঝলে। ভুবন যেন একটা নতুন তত্ত্ব বলছে এবং বছর দশেকের একটা শিশুকে বোঝাচ্ছে—যোগেশ কি হঠাৎ হেসে ফেলবে?

কিন্তু এইভাবে মরা! আহা, ভাবতেও আনন্দ।

আনন্দের কোন ছাপ দেখা যায় না ভুবনের মুখে।

আসলে এই আনন্দটা হিংসে, যোগেশ জানে। তারাপদকে হিংসে করছে ভুবন। জ্যান্ত তারাপদকে করত, মরা তারাপদকেও করছে। তবে ভুবন কি আশা করেছিল রীটায়ার করার পর তারাপদর অবস্থা হবে তারই মতো? রীটায়ার করার দু বছরের মধ্যেই।

হবে, কারণ, যদিও তারাপদর জোয়ান জোয়ান ব্যাটা আছে, কিন্তু দুই ব্যাটারই চাকরি বাইরে, একজন আমেদাবাদ না কোথায় আর একজন বক্তিয়ারপুর হবে। দুজনের যা মাইনে নিজেদেরই খাওয়া-পরা চালানো দুষ্কর। বাবাকে পয়সা পাঠাবার প্রশ্নই ওঠে না। তিন তিন মেয়ের মধ্যে দুটি মেয়ে যদিও চাকরি করে, কিন্তু সেটা যায় যার যার স্বামীর সংসারে। সুতরাং সে-চাকরিতে তারাপদর কোন লাভ নেই। তারাপদর বউও নেই যে যোগেশের বউয়ের মত লুকিয়ে ঘুটে বিক্রি করে ঠোঙা বানিয়ে সংসারে দুটো পয়সা আনবে।

তবু দেখ, রীটায়ার করার পরও দিব্যি দুবেলা খাওয়া-দাওয়া করে দিন কাটায় তারাপদ। তিন তিনটে বছর কাটিয়ে দিল। ষাট বছরে যেন তার যৌবন শুরু হল। কি নিশ্চিন্ত।

বুঝলে ভাই, তুমি মানো চাই না মানো, ভাগ্য। ভাগ্য ছাড়া গতি নেই।

যোগেশের বুঝি সেদিনের কথা মনে পড়েছে—স্ট্র্যান্ড রোডে যেদিন হোঁচট খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। জ্ঞান হবার পর মনে হয়েছিল এই ধাক্কায় সে মরেও যেতে পারত। একবারে রাস্তায় মরা। অমন একটা ঘোর সংসারী মানুষ; সংসারের জন্য প্রাণপাত করছে এমন মানুষের মৃত্যু হবে কিনা পথে-ঘাটে ভিখিরীর মত! মরার সময় বউয়ের ছোঁয়া মেয়ের হাতের জলটুকু পর্যন্ত পাবে না? কে জানে, মরার কদিন পরে বাসায় খবর আসত! হাসপাতালের লাশঘর থেকে তার পচাগলা লাশটা হয়ত····

যোগেশের কথা শুনতে শুনতে ভুবন আতঙ্কে বারবার খাবি খাচ্ছিল; —যোগেশের মনে পড়ে। মনে পড়ে, তারাপদকে প্রশ্ন করেছিল, তোমার ভয় হয় না মুখুজ্জে?

ভয়? কেন? তারাপদ অবাক হয়েছিল।

একা যাও। ছেলেমেয়ে সব দূরে দূরে।

উপায় কি। তাছাড়া, আমি এখন হুট করে মরব না। আমার স্বাস্থ্য দেখছ?

সে তো ঘি দুধ, মাছ মাংস—

ভুল করছ ভুবন, ঘি আমি খাই না। সহ্য করতে পারি না। আধসের দুধ খাই বটে, হ্যাঁ, মাছও দু-টুকরো রোজ খাই, মাংস কুকারে হপ্তায় একদিন।

তবে!

তারাপদ জবাব দেয়নি। ভুবনকে একথার জবাব দিয়ে লাভ নেই পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর দুধ খাওয়া, মাছ খাওয়া, মাঝে মাঝে মাংস খাওয়া যোগেশের কাছে বিলাসিতার শামিল। যে যোগেশকে মাসের শেষ দিকে গুষ্টি সমেত একবেলা খেয়ে থাকতে হয়। একটা বাড়ি আছে তারাপদর, বাড়ি মানে কাঠা দুয়েক জায়গার উপর পাঁচ ইঞ্চির গাঁথনির উপর টালির ছাদের ঘর আড়াই খানা—এও যোগেশের কাছে বড় লোভনীয়! যোগেশকে যে চল্লিশ টাকা করে মাসে ভাড়া গুনতে হয়।

ভুবন চলে গেলে তারাপদ বলেছিল, দিনকাল রকম দেখছ তো ডাক্তার! একটা মানুষ যদি সারাটা জীবন পরিশ্রম করে শেষ বয়সে বসে বসে খায়, নিজের একটা মাথা গোঁজার আস্তানা বানায়—লোকের চোখ টাটায়। ভাগ্যিশ আমার চাকরিতে ঘুষ নেওয়ার উপায় ছিল না বা ব্যবসা-ট্যাবসা করতাম না—তাহলে নির্ঘাৎ ধরে নিত—

কিন্তু এভাবে কদ্দিন কাটাবে? বসে খেলে রাজার ঐশ্বর্য্যও—

কী করব? ছেলেদের কাছে টাকা চাইব? কোত্থেকে দেবে?

তুমি গিয়ে একজনের সঙ্গে থাকতে পারো।

পারি। আমার টাকাটা দিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু ধরো, টাকাটা ফুরিয়ে গেল তবু আমি মরলাম না। তখন তো একটা বোঝাই হয়ে উঠব।

বাবার প্রতি ছেলের কর্তব্য—

কর্তব্য দুরকম ডাক্তার। বাপের প্রতি যেমন ছেলের কর্তব্য আছে, ছেলের প্রতিও তেমনি বাপের কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য কি আমি পালন করতে পেরেছি! কাউকে ম্যাট্রিকের বেশী পড়াতে পারিনি। ছেলের জন্ম দেওয়াই আমাদের মতো বাপের উচিত হয়নি।

সেদিন যোগেশ তর্ক করেছিল। তারাপদকে গোঁয়ার, খাপছাড়া কত কী বলেছিল।

আজ, এখন সেজন্য আপসোস করে। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আলতো

ভাবে নিজের পকেটে একবার চাপ দেয়। ভয়ে ভয়ে তারাপদর মুখের দিকে তাকায়। মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বুঝি সুন্দর কোন স্বপ্ন দেখছে। তাই মুখ অমন হাসি হাসি।

কেন হাসি হাসি? তারাপদ কি জানত? তার বিছানার চারপাশে তার দুই ছেলে তিন মেয়ে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র করবে—কেউ কিছুই টের না পেয়ে। যোয়ান যোয়ান মানুষগুলিকে এভাবে সে বোকা বানিয়ে রেখে যাবে।

যোগেশ বলে তারাপদর আজ জন্মদিন ছিল, না?

কথার জবাব না শুনেই ভুবন ঘরের মধ্যে চলে যায়। খাটিয়া এসে গেছে, শেষবারের মত তারাপদকে দেখবে, তারাপদকে ঘর থেকে বার করাবার ব্যবস্থা করবে। ভুবনকে তারাপদর ছেলে-মেয়েরা জ্যেঠা বলে ডাকে না—এসব ভুবনের করতে হবে বই কি।

জন্মদিন! খাটিয়া নামিয়ে ছেলেরা বাড়তি দড়ি বেঁধে বেঁধে সেটাকে মজবুত করছে। তারাপদর লাশটার কথা ভেবে যেন হাসাহাসি করছে। জন্মদিন! গলির রাস্তায় পানের দোকানটায় বেশ ভীড়। ওর একটা খদ্দের গেল—দুবেলা গুঁড়ো সুপুরির দুটো মিঠেপানের খদ্দের। মাংস খাওয়ার রাতে একটা সোডা খাওয়ার খদ্দের। জন্মদিন! মানু, তারাপদর ঘর দোর ঝাঁট দিত, বাসন মাজত, কুকারে রান্না বসিয়ে দিত যে ঠিকে ঝি সেই মানু যেন হাত পা নেড়ে কী বোঝাচ্ছে সাধনের বাড়ির জানলায় মুখ রাখা গিন্নিটাকে। জন্মদিনে মৃত্যুর কথা? এমন চমৎকার যোগাযোগের কথা? নাকি সে যে কত কাছের মানুষ, তাই? নতুন চাকরির চেষ্টায় আছে! জন্মদিন!

আচ্ছা একটা জন্মদিন করলে কেমন হয় বল তো ডাক্তার।

বলছি। তার আগে বলো তুমি সেটা কি করলে?

কোথায় যেন রাখলাম—

কোথায় রাখলে? জানো ওটা কী মারাত্মক—

তাই তো খুব সাবধানে লুকিয়ে রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না। ও তুমি ভেব না, আমি ফেরৎ দেব। নেহাত একটা কৌতূহল ছিল, চিরজীবন শুধু নামই শুনে এলাম—

পকেটের ওপরে হাত রাখে যোগেশ। ওপর থেকেই পকেটটা মুঠো করে ধরে। এপাশ-ওপাশ তাকায়। বাড়ি চলে যাবে? বাড়ি গিয়ে, নিজের

চেম্বারে ঢুকে দেশলাই জ্বালিয়ে—

থাক। এখনও লাশ বের করেনি। কোথা থেকে কী হয় বলা যায় কিছু! লাশ তো আগে ছাই হোক।

ও ডাক্তার! ঘর থেকে ভুবন ডাকে, একবার ভেতরে এসো না। আর দেরী করা ঠিক না—

হ্যাঁ কাকাবাবু, দশটা বেজে গেল—এখান থেকে বাঁশতলা কম করে দেড় ঘণ্টার ওপর। রোদ চড়ে গেলে—

লোকজন সঙ্গে নিয়ে যোগেশ ঘরে ঢোকে। তাদের দেখা মাত্র এয়সা কান্নার রোল পড়ে যায়, তিন মেয়ে একসাথে বাপের বুকের ওপর পড়ে বাবাকে আঁকড়ে এমন দাপাদাপি শুরু করে যে ভড়কে পিছু হটে যায়।

কিন্তু যোগেশ পিছু হটলেও ভুবন কাজের লোক।

ভুবনের বউ আর বৌমা যোগেশের বউ আর নাতনি এতক্ষণ ঘরের এক-কোণে চুপচাপ চোখের জল ঝরাচ্ছিল, চোখ মুছতে মুছতে তারাও এগিয়ে আসে, ভাঙা ভাঙা গলায় সান্ত্বনা দেয়, আর শক্ত শক্ত হাতে তারাপদর ছেলের দুই বৌকে, তিন মেয়েকে, নাতি-নাতনীদের সামলায়।

ভুবন বলে, জামাইদের খবর দেওয়া হয়েছে ?

নন্তু জবাব দেয়, হারু সকালেই চলে গেছে। বলে দিয়েছি একেবারে শ্মশানে যেতে।

বেশ করেছ। বল হরি—

হরিবোলের চোটে কানে তালা লেগে যায় যোগেশের। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয় হরিবোলের সুরটা ধরিয়ে দিয়ে ভালোই করেছে ভুবন—নইলে মরাকান্নায় কান ফেটে যেত।

ধরাধরি করে তারাপদকে ঘরের বাইরে আনে নন্তুরা, তারপর চ্যাংদোলা করে উঠোনে নাবায়। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশও নামে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা রওনা হয়ে যাবে। নইলে রোদ উঠে যাবে। একটা মড়া মানুষের জন্যে ছোকরাগুলোর বড় কষ্ট হবে। নিরর্থক কষ্ট।

নিরর্থক যে, আজ না হোক কাল বুঝতে পারবে। যেমন বুঝতে পারবে, তারাপদর দুই ছেলে আর তিন মেয়ে। নইলে নমাসে ছমাসে যারা চিঠি লেখে, নিজের সংসার নিয়েই মশগুল—জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাবা আসতে বলা মাত্র দুদ্দাড় করে দুই ছেলে যত রাজ্যি ভেঙ্গে দৌড়ে আসে! মেয়েরা অবধি সদলবলে এসে জমায়েত হয়!

কেমন, দেখছো তো, ডাক্তার, সবাই এল কিনা—

দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল যোগেশ। তারাপদর ছেলেমেয়েরা যে বাপকে এত ভালবাসত কে জানত।

তুমি বলেছিলে মেয়েরা আসবে না। অন্তত বড় মেয়ে কখনই—আরে বাবা, আইন হয়েছে না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন—

একদিনও তুমি কি ওদের বলেছ যে বাড়ীটা বাঁধা, কালীতলার সেই জায়গাটা বেচে দিয়েছ, পোস্টাপিসেও তোমার এক আধলা নেই—

বলব। বলব। মুচকি মুচকি হেসেছিল তারাপদ। সময় হলেই বলব।

থাক। জন্মদিন করার মানেটা এতক্ষণে বুঝেছিল যোগেশ। তবে ভালোই করেছে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে দু' ছেলে তিন মেয়েকে কাছে পেয়েছে, এখন সকলের কাছে বলুক—যে কটি টাকা তার সম্বল আছে দিন পনেরোর বেশী চলবে না। দিনকাল যা পড়েছে, এই বয়সে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। অতএব বুড়ো বাপকে ভদ্রভাবে বাঁচিয়ে রাখার একটা ব্যবস্থা দুই ভাই তিন বোনে মিলে করুক। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন যখন হয়েছে তখন বোনেদেরও ভাইদের সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ নেওয়া উচিত বইকি।

জানো, বড় মেয়ে পরামর্শ দিচ্ছিল, কালীতলার জায়গায় একটা বাড়ি ফাঁদতে, দোতলা ফ্ল্যাট সিস্টেম বাড়ি। বাড়ি ভাড়ায় নাকি আজকাল মোটা আয়। ছোট ছেলে বলছিল পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে সার্টিফিকেট কিনতে—মোটা সুদ। বড় ছেলে তার মেয়েটাকে আমার কাছে রাখতে চায়, বাবাকে সেবাযত্ন করবে আর যদি ভাল পাত্রটাত্র জুটে যায়—হা হা করে হেসেছিল তারাপদ। বাপের জন্যে দুই ছেলে তিন মেয়ের দরদের তালিকা দিতে দিতে।

বড় খারাপ লেগেছিল হাসিটা যোগেশের। নিজের ছেলেমেয়েদের কেউ এই চোখে দেখতে পারে? দেখা উচিত?

ওদের কথায় আমি অবাক হইনা। আমি জানি। তোমার মত সারাজীবন তো আমি রোগী দেখিনি; মানুষ দেখেছি। দেখেছি মানুষ কী পরিবেশের গুঁতোয় বদলায়। মানুষ কী ভাবে অমানুষ হয়ে যায়।

ওদের কথা শুনে তুমি কী বলো?

হাসি!

এখনও হাসছে তারাপদ। খাটিয়ায় তার মুখখানা কাৎ হয়ে পড়লেও

হাসিটা বজায় থাকে। ছেলেমেয়েরা যে এখন মড়াকান্না কাঁদবে তারাপদ আগে থেকেই জানতো। তাই মুখে হাসি ফুটিয়ে নিয়ে মরে গেছে।

তারাপদর ছেলেমেয়ের জন্যে দুঃখ হয় যোগেশের। ভুবনের। ভুবনের বৌ ও মার। তার বউ ও মেয়ের। ওর মত সেও কি এখন ওদের গিয়ে সান্ত্বনা দেবে। ওরা হাজার চেষ্টা করেও কান্না থামাতে পারছে না। কিন্তু, যোগেশ এক লহমায় পারে। শুধু ওদের কান্না থামানো নয়—নন্তুদের মহোৎসাহে খাটে কাঁধ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি করাও। যোগেশ যদি এখন চীৎকার করে বলে—

সর্বনাশ! কান্না থামিয়ে ছেলেমেয়েরা যদি ঘরে গিয়ে ঢোকে? লাশসুদ্ধ খাটিয়া ফেলে রেখে নন্তুরা যদি চলে যায়—উপায়? বেওয়ারীশ মরা তখন নির্ঘাৎ পুলিশের হাতে গিয়ে পড়বে। তারপর—

নাও, নাও। আর দেরি করো না। হন হন করে উঠোনে নেমে যায় যোগেশ। শেষবারের মত তারাপদর মুখখানা দেখে নেয়। দেখে নিশ্চিন্ত হয়।

যোগেশও শ্মশানে গিয়েছিল। তারাপদ ছাই না হওয়া পর্য্যন্ত ঠায়-দাঁড়িয়ে থেকে চিতা পাহারা দিয়েছে।

তারপর বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা দিয়ে সেই চিরকুটটা ছিঁড়ে ফেলে দিল।

তারাপদর নাতির ডাকে সকালে ছুটে গিয়েছিল তারাপদকে ওই অবস্থায় দেখতে আর তখনই অলক্ষ্যে যোগেশ পেয়ে যায় চিরকুটটা····

যে চিরকুটে লেখা ছিল—"বাঁচিয়া থাকার সখ নাই বলিয়া আমি পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়া আত্মহত্যা করিলাম। ইহার জন্য আমি দায়ী নই।"

অতীন্দ্রিয় পাঠক

সময় নিয়ে খেলা

সারাদিনে নবেন্দুর অনেক সময়। তুলনায় কাজ ও কাজের বিচিত্র কম। প্রতি কাজে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী সময় সে বরাদ্দ করে। এই অতিরিক্ত বরাদ্দ করেও অধিকাংশ দিন উদ্বৃত্ত থাকে আরো অনেক সময়। এই উদ্বৃত্তের ভেতরে নিজেকে রেখে সময়ের আন্দোলন সে অনুভব করে।

নবেন্দুর মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে অপচয়, সময়ের মূল্য এতে কমে যাচ্ছে কিনা। অনেকে বলাবলি করে, নবেন্দুর সময়ের কোনো দাম নেই। কিন্তু সময়ের দাম অর্থে কী! সময় থাকে বোধের ভেতরে, কখনো মনে হয় সময় পেরিয়ে যাচ্ছি আবার কখনো সময় এগিয়ে যায়, কোনো দাম দিতে হয় না এর জন্যে। কোনো কোনো কাজ এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া যায় এইমাত্র। বরং কোনো কাজে না জড়িয়ে নিজেকে স্বচ্ছন্দ এই সময়ের স্রোতে ভাসিয়ে রাখলে, এর আন্দোলনে সময়ের ছড়িয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে, এর কোনো বিনিময়মূল্য হয় না।

সময়ের দাম বিষয়ে এই কারণে ও বিশেষ গুরুত্ব দেয় না, সময়ের কোনো অভাব নেই ওর, তবু এর থেকে কিছু অংশ এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে হয়ত বরাদ্দ করতে পারে, কিন্তু যারা বলাবলি করে তাদের সময়ের খুব অভাব তাই এ নিয়ে আর এগোনো হয় না, কোনো মীমাংসা হয় না।

আসলে নবেন্দু সময়ের সংগে কাজ জুড়ে দিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে। এই কাজে সময় তার মোড়ক খুলে ছড়িয়ে যায় এবং কোনো কাজের গতিবিধি বা উদ্দেশ্য এসবের অর্থ নেই নবেন্দুর কাছে। সমস্ত দিনে সরল ও যৌগিক মিলিয়ে কিছু কাজ ও করে। সরল কাজের এই রকম উদাহরণ একটা নেয়া যাক, যেমন ঘুমনো। ডাক্তার বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, আট ঘণ্টা দিনে ঘুমোবেন। অর্থাৎ আট ঘণ্টা সময়ের বিনিময়-মূল্য হবে একদিনের ঘুম, কিন্তু এর কি অর্থ! ঘুমনো কাজটা আপাত-সহজ মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সহজ নয়। এর ভেতরে অন্য সব কাজের প্রতি বিরক্তি ধরা থাকে, স্বপ্ন দ্যাখার মত রহস্যময় ব্যাপার ঘটে, চিত হয়ে

শুয়ে এপাশ ওপাশ করে মনের স্থিতাবস্থাগুলি পাল্টে দেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এদের সংগে সময়ের কী সম্পর্ক! বিরক্তি বা স্থিতাবস্থা বদলানো এটা সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয়, মনের নানা রহস্যময় আচরণে বিভিন্ন মাত্রায় এরা থাকে এবং মাত্রা বদল করবে এটা আগে থেকে বোঝা যায় না। স্বপ্নের আচরণ আরো অদ্ভুত। পনের মিনিট সময়কে হয়ত তিনদিনে বদলে দিতে পারে, সময় তখন অন্য মাত্রায়। বিনিময়মূল্য তবে কিভাবে ধার্য হতে পারে! পাশাপাশি আর একটা উদাহরণ নেয়া যাক, একটি যৌগিক কাজ, যেমন বাথরুমে যাওয়া। পরপর কতগুলি কাজ এবং মোট সময় বরাদ্দ হয়ত এক ঘণ্টা। ধরা যাক, প্রথম কাজ আরম্ভ হল দাঁত মাজা। ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে দাঁতে ঘষতে ঘষতে পেস্টের গন্ধে অতসীর কথা মনে পড়ল। ও বলেছিল, কলগেট দিয়ে না মেজে বিনাকা ফ্লুরাইড দিয়ে মাজতে, কারণ দাঁতের এনামেল ঠিক থাকে। বলেই হেসে ওর দাঁতের এনামেল দেখিয়েছিল। এরপর ক্রমে দাঁত চোখ কপাল চুল গলা এসব একে একে এসে সময় আর তার সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এখানে সময় কীভাবে তার বিনিময়ের মান ঠিক রাখবে! চিন্তা ভাবনা গতি, তার সংগে যে সময়সম্পর্ক, বাথরুমের সময় বরাদ্দের সংগে কীভাবে তার সংগতি থাকা সম্ভব। হয়ত দাঁত ধুয়েই ঘরে ফিরে আসতে হবে এবং এ্যালবাম খুলে অতসীর ছবি, অতসীর চিঠি এবং এইসব কাজের সংগে কোন সময়ের বিনিময়মূল্য সে ঠিক করতে পারে! বাথরুমের বাকি কাজগুলি কখন হবে, কোন সময়ে, তা নিয়ে নবেন্দুর তখন কোনো মাথাব্যথার কারণ নেই। নবেন্দু ভেবে পায় না সময়ের এই নিরপেক্ষ নিরিখকে কেন অযথা অন্যান্য কাজকর্মের সংগে জুড়ে দেবার চেষ্টা হয়।

অতসী মাঝে মাঝে চলে আসে নবেন্দুর কাছে।

হাতব্যাগ টেবিলে রেখে তার ভেতর থেকে ছোট রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছে। কুঁজো থেকে গ্লাসে জল ভরে জিজ্ঞেস করে, খাবে?

গ্লাসে জল খেয়ে গ্লাসটা টেবিলে রাখে, চেয়ারে বসে।

সময় পেলেই তোমার কাছে চলে আসি। এখানে এলে বিশ্রাম হয় একটু।

এত কাজ তোমার কেন বলতো? তিনদিনে মাত্র এটুকু সময় বাঁচে!

কী করব বল। আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। তোমার মত তো—

নবেন্দুর কাজ এখন অতসীকে দ্যাখা। এর জন্যে সময়ের কোনো নির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই। কিন্তু অতসী উসখুস করে, ওর আরো কাজ পড়ে আছে।

নবেন্দু কিছুই বলে না। শুধু দ্যাখে আর হাসে। কোনো শব্দ হয় না। সময়ের স্বচ্ছ স্রোতের মধ্যে মিশে থাকে।

অতসীর কপালের একপাশটা সামান্য উঁচু। চুলের সিঁথিটা মাঝামাঝি নয়; টিপটাও মাঝখানে পরতে পারেনি। শাড়িতে সবুজের ছোপ আছে তাই সবুজ ব্লাউজ আর সবুজ টিপ। বাঁদিকের ভ্রূতে চুল বেশী ঘন। নবেন্দু নিশ্চিত যে অতসীর চোখ দুটো সমান অক্ষে নয়, কিন্তু রাগলে, আন্তরিক হলে বা লজ্জা পেলে চোখ ঠিক ঠিক ভাষায় কথা বলে। দেখতে দেখতে ওর মুখের বিচিত্র ফুটে উঠছে ক্রমশঃ। কপালের বাঁ পাশে আর ডানগালের নিচের দিকে ছোট কাটার দাগ। বাঁ গালে তিলটা স্পষ্ট কিন্তু নিচের ঠোঁটের তিল অস্পষ্ট। মুখ বেশ ফর্সা কিন্তু চিবুক আর নীচের ঠোঁট, এর মাঝামাঝি জায়গাটা সামান্য কালচে। ঠোঁটে হালকা গোলাপী রঙ। অতসীর দাঁতগুলি সুন্দর, হাসলে মুখের আদল পাল্টে যায়। সময়ের যেন মাত্রা বদল হয়। তখন গলায় তিনটে ছোট ছোট ভাঁজ পড়ে। একটু কালচে ঐ জায়গাটা। গলা থেকে হাতের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া অংশটা খুব ফর্সা দ্যাখাচ্ছে, একটু লালচে।

কী দ্যাখ বলতো, আমার অস্বস্তি হয়। চা খাবে?

অতসী চা করতে চলে যায়। কিন্তু চা খাওয়া এখন নবেন্দুর কাজের কোনো অংশ নয়, কোনো প্রস্তুতি নেবার নেই। অতএব অতসীর মুখটা নিয়ে আরো গড়তে বসে।

নবেন্দুর সামনে এখন চায়ের কাপ। তার সামনে এখন অতসীর মুখ। এতক্ষণে গড়ে নেওয়া অতসীর মুখটা এখন সে সামনে অতসীর মুখে বসাতে থাকছে।

নতুন কলেজের চাকরিটা নিলে না কেন?

বাসে করে যেতে হত, অতিরিক্ত আর একটা কাজ। এর চেয়ে হেঁটে এখানেই ভাল।

ভবিষ্যতের কথা তুমি ভাবো না?

ভবিষ্যত এমনিই আসে, ভাবাভাবির কী আছে। সময়ের সংগে আমার কাজের কোনো সম্পর্ক যখন নেই, কাজ আর সময়ের বাঁধাবাঁধির দরকার কী।

কী যে বল বুঝতে পারি না। একটু সহজ করে বল।

নবেন্দু হাসে। হাসিতে সময় পার হতে থাকে।

বাড়ি থেকে একদম বেরোও না কেন বল তো?

কেন জানি না, খুব ভয় হয়, যদি সময় হারিয়ে যায়।

তুমি না সত্যি—

অতসী নবেন্দুর পাশে এসে বসে।

কোথাও বেড়াতেও তো যেতে পার।

ভিড় আমার ভাল লাগে না। সমুদ্রে পাহাড়ে গিয়েছি, এই ঘরের মতই ঘরে বসে যেমন সময়টা স্বচ্ছ হয়ে আসে, সমুদ্রের ঢেউয়ে বা পাহাড়ের উঁচু নিচুতেও একই রকম স্বচ্ছ হয়। তবে আর পরিশ্রমে কী দরকার, ঘরেই ভাল আছি।

তুমি সত্যিই আশ্চর্য। আমার সময় হয়ে গেল, চলি।

তুমি অদ্ভুত কথা বল দেখছি। সময় আবার হবে কি?

যাক গে, তোমার সাথে কথা বলা অসম্ভব। চলি, আবার আসব।

নবেন্দু হাসে, অতসীর চলে যাওয়া দ্যাখে।

নবেন্দুর ছোটবেলার বন্ধু মনীশ। বারো বছর পর কানাডা থেকে ফিরেছে। নানা ধরনের ব্যবসা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। ওর হাতে একেবারে সময় নেই। জীবন খুব একটা বড় হয় না, তার ওপর অনিশ্চিত। ওর মধ্যে কাজে লাগানোর মত সময় সামান্য কিছু অংশ মাত্র। অথচ অনেক কাজ করতে হবে। এত কাজ এবং তাদের জন্য সময় বরাদ্দ করা সব মিলিয়ে একটা দুঃসাধ্য কাণ্ড। মনীশ যে উপায় ঠিক করেছে, কাজের তুলনায় সময়ের বিনিময়মূল্য যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ খুব কম সময়ের বরাদ্দে দুটো বা তিনটে কাজ শেষ করে ফেলা। এ সত্ত্বেও কিছু কিছু কাজের জন্যে সময় বরাদ্দ একেবারে করা যাচ্ছে না এটা অস্বস্তির। যেমন নবেন্দুর সঙ্গে দ্যাখা করা কর্তব্য অথচ তার চেয়েও বেশী জরুরি অনেক কাজ আছে। নবেন্দুকে একটা চিঠি দিয়েছিল কিন্তু উত্তর দেয়নি। ওটা চূড়ান্ত অলস, মনীশের ব্যস্ততা ওর বোঝা উচিত।

ঘুম থেকে উঠে মনীশ দেখতে পায় সময় ওর সংগে পাল্লা দিয়েছে। তখনি ওর প্রতিযোগিতা সুরু। নানা ছকে, নানা ভাবে মুঠির ভেতরে আনার চেষ্টা করেও দিনের শেষে মনে হয় সময়ের সংগে কিছুতে পেরে উঠছে না। অতএব পরের দিনের জন্যে আগাম ছক, সকাল থেকে সুরু

করে আবার ব্যর্থ, ওইভাবে ব্যর্থতায় ব্যর্থতায় তার অনেক কাজ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, সময়ের বিনিময়মূল্য এমন বেড়ে গেছে মনীশের সীমায় আর রাখা যাচ্ছে না।

অবশ্য এর কিছু ব্যতিক্রম আছে। অতসী যখন কাছে থাকে সময়ের হিসেব মনীশ করে না! তার কী মূল্য হবে, নির্ধারণ করার ভার অতসীর ওপর ছেড়ে দেয়। হয়ত পরে এর জন্যে আফসোস হবে কিন্তু চলায় কথায় হাসিতে সময়কে আশ্চর্য অন্তরীণ করে রাখে অতসী। সময় নিয়ে তার আশ্চর্য খেলা তখন। একদিন মনীশ ভাবল, অতসীর গ্রাস করা এই সময় যখন তার স্বাধীন ব্যবহারের অধীন নয়, বরং এর থেকে কিছুটা চুরি করে নবেন্দুর জন্যে খরচ করতে পারে।

একদিন অতসীকে গাড়িতে সংগে নিয়ে দোকান থেকে দামী শাড়ি কিনে দিল। অতসীর সুন্দর হাসি ও মৃদু প্রতিবাদে মনীশ লক্ষ্য করল, সময় সম্পর্কে অতসী কিছুটা অন্যমনস্ক। সুযোগে মনীশ বলল, চল তোমাকে বাড়ি পেঁাছে দিই। আমাকে একটু মাসীর বাড়ি যেতে হবে, খুব অসুস্থ। অতসী সময় ধরে রাখতে পারল না। মনীশ ওকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে সোজা নবেন্দুর বাড়ি এল।

নবেন্দুর ঘর খোলাই থাকে। মনীশ সরাসরি ঢুকল।

কিরে! একইরকম রয়ে গেলি তুই, আশ্চর্য। বালিশে কনুই, হাতে মাথা, কাত হয়ে শুয়ে থাকা। কী এত ভাবিস বল তো। এদিকে তিনটে ব্যবসা আমাকে সামলাতে হয়, পিসীমার সংসার দেখতে হয়। মাঝে মধ্যে একটা মেয়ের সংগে দ্যাখাট্যাখাও হয়। তবু দ্যাখ, সময় করে এলাম। তুই স্রেফ শুয়ে কাটাচ্ছিস। একদিন বাড়ি গেলি না। চিঠির উত্তরটাও দিলি না।

তুই-ও বদলাসনি মনীশ।

তার মানে? আমি এইরকম ছিলাম?

আমার ক্রমশ কাজ কমছে, যেমন তোর ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের তো বরাবরই এইরকম।

বসে বসে কথাই তৈরী করছিস। তোর এখানে চা পাওয়া যাবে না জানি, বেরুবি একটু? দশ মিনিটের বেশী সময় নয়।

কী হবে বেরিয়ে, তোর সময় কম, বোস একটু গল্প করি। কেমন আছিস?

এ খবর আমার বাড়ি গিয়ে নিতে হবে। তুই যাবি কিনা বল।

আর ঐ যে মেয়েটা যার সংগে দ্যাখাট্যাখা হয় তার কী খবর।

একদিন আলাপ করিয়ে দেব। খুব স্মার্ট। খুব ঘুরতে ভালবাসে। এর মধ্যে নর্থ ইণ্ডিয়া একটা ট্রিপ হয়ে গেছে। এবার সাউথ ইণ্ডিয়ার প্রোগ্রাম করছি।

বাঃ, তোর কাজের গতি বাড়ছে কেন বোঝা গেল। তবে এই কাজটি আমি করতে পারি অর্থাৎ তোর ঐ মেয়েটির সংগে আলাপ করা।

কবে আসবি বল, ভিক্টোরিয়ায় চলে আয় আগামী রোববার বিকেল চারটেয়।

ঠিক আছে।

চলি এবার, আমার সময় শেষ।

আমার সময় এবার সুরু।

আর একদিন দ্যাখা হবার কথা ছিল সন্ধ্যে ছ'টায়। মনীশ ছ'টায় পেঁছিল, অতসী ছ'টা পনেরো। মনীশ জানে, অতসী দেরী করবে তবু মনীশ দেরী করে না। সময়ের এই ক্ষতিটুকু তার হিসেবে ধরা থাকে। ওদের দ্যাখা হতে সময় মূল্যবান হয়ে ওঠে।

শোন ব্যবস্থা সব হয়েছে। খোঁজখবর, টিকিট সব। পরশু বিকেলবেলায় ট্রেন। বাড়িতে বলেছ তো? ফিরতে সব মিলিয়ে কুড়ি দিন। তোমার জামাকাপড় যা নেবার নেবে, আমি কাল দুটো শাড়ি সারপ্রাইজ দেব। ওখানে কোথায় কোথায় কী কী কিনব প্ল্যান করে রেখেছি। আমাদের মুভমেণ্ট কিন্তু খুব স্পীডি হবে, তৈরী তো। কোনো আলসেমী নয় কোথাও। বাড়িতে কী বলল? কিছু ভেবেছ? ম্যানেজ হয়েছে তো ঠিক মত।

এত উত্তর একসঙ্গে দেয়া যায় না। সব গুলিয়ে গেছে। টোটাল উত্তর, আমি তৈরী। তোমার গতি আমায় তো ভাবতে দেয় না। আমাকে মুভ করতেই হয়।

করতেই হয়।

এই তো চমৎকার মেয়ে। আমাদের ট্যুর হবে একটা টোটাল মুভমেণ্ট। আর শোন, কাল বিকাল চারটেয় ভিক্টোরিয়ায় চলে এসো। আমার অপোজিটকে দ্যাখাব। এ টোটাল ব্লক, তবে ইণ্টারেস্টিং। ওকে কথা দেয়া আছে। এসো কিন্তু। নাও, কথা শেষ। এবার আমরা স্পীড নেব। প্রথমে খাওয়া, তারপর সিনেমা, তারপর বাবুঘাট, তারপর তোমার বাড়ি, আমি বিচ্ছিন্ন, আমি আমার বাড়ির দিকে। হ্যারি আপ।

ওরা দ্রুত হল। সময় ওদের পেছনে তাড়া করল।

বিকেল চারটের কাছাকাছি। রোদ এখনো বেশ আছে। নবেন্দু ধীরে ধীরে হাঁটছে। কিন্তু আগে এসে পড়েছে। এদিকে আসা হয় না অনেকদিন, ভেবেছিল বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামে ঢুকবে। কিন্তু ভয় হল, ঘুরতে ঘুরতে যদি সময় বেশী খরচ হয়। সম্ভবত এই প্রথম সময় সম্পর্কে ও হিসেবী হল। মনীশের প্রতি ওর দুর্বলতা আছে, ওর সংগে একটাই মিল, সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি করা।

গেট পেরিয়ে যাচ্ছে নবেন্দু। কতদিন পরে এসেছে। বেশ ভাল লাগছে। আগের মতই সব। কত ছেলেমেয়ে। অতসীর সংগে আগে কতবার এসেছে, ঐ মাঠটায় বসেছে, বাদাম খেয়েছে। এখন প্রায় চারটে বাজে। পশ্চিম দিকটায় মনীশের থাকার কথা, এগনো যাক। ঐ যে মেয়েটা ডানদিক থেকে আসছে, অনেকটা অতসীর মত দেখতে। আরে, অতসীই মনে হচ্ছে। আশ্চর্য, অতসী এখানে। কী আর করবে বেচারা। আমায় দেখে নিশ্চয়ই রাগ করবে। কতবার বলেছে ও সংগে আসতে, আলসেমী করে আসি নি। ঐ যে মনীশও আসছে ডানদিক থেকে। ভালই হল অতসীর সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়া যাবে।

যেন ওদের দেখতে পায়নি এমন হাঁটতে হাঁটতে নবেন্দুর মনে হচ্ছে অতসীর কাছাকাছি এসে গেছি। মনীশ আমাকে দেখতে পেয়েছে, কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। ওর সেই মেয়েটিকে দেখছি না তো। যাই হোক, অতসীর সংগে আলাপ করিয়ে দিই।

এই যে অতসী, এই আমার বন্ধু নবেন্দু, আমার অপোজিট। যার কথা তোমায় বলেছিলাম। মনীশই প্রথম কথা বলে উঠল।

মনীশের কথায় একটু চমকে নবেন্দু চোখ তুলে দেখল, অতসীই তো। পাশে আগ্রহে ভর রেখে দাঁড়িয়ে আছে মনীশ!

নবেন্দু অতসীর দিকে দেখল। স্পষ্ট। অতসীর মুখে গলায় কোনো ভাঁজ নেই, গালে দাগ নেই, নিচের ঠোঁটে তিল নেই। ওর দুটো মুখ এখন। পাথরের মত দৃঢ় এবং স্থির একটা মুখ, চোখের মণিদুটো স্থির স্পষ্ট তাকিয়ে আছে নবেন্দুর দিকে। আর একটা মুখ মনীশের দিকে। নবেন্দু শব্দহীন হাসছে, অতসীকে ছাপিয়ে ওর সামনে এখন সমস্ত মাঠ জুড়ে সময় খেলা করছে। নবেন্দু দেখলে, মনীশের দুরন্ত সময় অতসীর পাথর শরীরে স্তব্ধ হয়ে আছে॥

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

কালিম্পঙের স্মৃতি

কালিম্পঙের টিকিট মাসখানেক আগেই কেটে রেখেছিল অমিয়। যেতে-কর্তে সেই ৫ জন। এদিকে ১৮ আর ২০ মে থেকে মা আর মেয়ের স্কুলের গরমের ছুটি পড়ে গেছে—বন্দনা ও বুবলি সেই থেকে হাই তুলছে। এর মধ্যে শনিবার সেকেণ্ড স্যাটার্ডে পড়ে গেল। এই সুযোগে দুদিনের জন্যে সে সপরিবারে, মেজবৌদির ওখানে, সল্ট লেকে চলে এসেছিল। দাদা মারা গেছেন বছর দুই। সুযোগ পেলেই অমিয় ওখানে যায়। বেশ বাইরে-বাইরেও লাগে।

সকালবেলা বি ডি মার্কেটে সিগারেট কিনতে গেছে, হঠাৎ গেটের ধারে প্রভাসদার সঙ্গে প্রায় দু' যুগ পরে দেখা।

'আরে-এ অমিয়, তুমি এখানে?' প্রভাসদা অমিয়কে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্লাস্টিকের জালি-কাটা ব্যাগের একাংশে বাজার সামান্য হলেও তাতে লিচু ও বাগদা চিংড়ি, অমিয় লক্ষ্য করল। বেশ অনেকক্ষণ কথা বলবেন বলে, যেন বোঝা, ব্যাগটা মাটিতে রেখে, সে দেখল, প্রভাসদা সেই চির পুরাতন উইল্‌স ফিল্টারের প্যাকেট খুলে একটি ধরাচ্ছেন ও যথাপূর্ব তার দিকে একটি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে অমিয়রও পূর্ববৎ হাত-টাত কচলানো শেষ, সেও ২২ বছর আগের মতই, যখন তার বয়স বছর-২৫, প্রায় করজোড়ে সিগারেটটি গ্রহণ করছে দ্যাখে।

'আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, বুঝলে?' প্রভাসদা বললেন।

গত ২২ বছরের মধ্যে প্রভাসদার সঙ্গে যে এই প্রথম দেখা, তা না। ২২ বছর আগে কলেজ স্ট্রীটের একটা ঠেকে তখন সন্ধের ঝোঁকে মাঝে-মাঝেই আড্ডা হত, আজকের নামকরা অনেকেই ওঁর আখড়ায় যেত। অমিয়ও লিখতে-টিখতে শুরু করেছে, সেও যেত। তখন প্রভাসদার খান-তিনেক

বই বেরিয়ে গেছে। উনি সবে একটি বিখ্যাত সাহিত্যপত্রের সহ-সম্পাদক হয়েছেন।

পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক। মাসে দুটি করে গল্প ছাপা হত সেই পত্রিকায় আর সেই দুটিমাত্র বাঁট ঘিরে ছাগ শিশুদের লাফ-ঝাঁপ, এবং শিশুগণ, মাত্র দিনকয় গিয়ে বুঝতে পেরেছিল অমিয়, ঐ বাঁটদুটি মুখ-স্থ করার শিল্পে তার চেয়ে ঢের বেশি কলানিপুণ—এমন কি এ-ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি সমঝোতাও হয়ে আছে যে কে, কখন, বছরে ক'বার ঐ বাঁটদ্বয়ে মুখ দেবে। অমিয় তবু আশা ছাড়েনি, যেত।

কিন্তু প্রভাসদার চতুর্থ বইটি ('ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার') সকলেই উপহৃত হল, শুধু সে পেল না দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়ে অমিয় রণে ভঙ্গ দেয়। সে যে লেখাই ছেড়ে দেয় এমন নয়, বলা যেতে পারে দুগ্ধ বিনা, ঘাস-পাতা খেয়েই তাকে এত-বড়টা হতে হয়। অর্থাৎ, নন-কমার্শিয়াল ছোট-খাট কাগজেই সে গত দুই যুগ ধরে লেখালিখি করে যায়, এবং করে গেলে যা হয়, পাঠকদের লেখক না হয়ে সে শেষ পর্যন্ত তথাকথিত লেখকদের লেখকে পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ, ধাপার।

অবশ্য ২২ বছর আগে যে শেষ যোগাযোগ তা নয়, তারপরেও মাঝে-মাঝে দেখা হয়েছে। 'এই তুমি কাল ও কীভাবে যাচ্ছিলে বাসে, ও রকম ঝুলতে ঝুলতে যায় ?' স-পারিষদ নিজের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডের সামনে দাঁড়িয়ে, তাকে দাঁড় করিয়ে এই সেদিনও উনি আন্তরিক-ভাবে জানতে চেয়েছেন 'পড়ে যাবে যে।' পারিষদবৃন্দ সবাই যে পুরনো, তা না, অমিয় অনেকদিন পরে লক্ষ্য করেছিল, অনেকেই খসে গেছে, অনেককেই সে চেনে না।

'তুমি এখন কী লিখছ অমিয় বা কোথায় থাকছ ?' এ কথা কোনোদিন ভুলেও জানতে চান নি।

আজ ২২ বছর পরে মুখ থেকে উইল্‌স ফিল্টারের ধোঁয়া সস্নেহে সরিয়ে প্রভাসদা বললেন, 'আমি, জানো তো, একটা অটোবায়োগ্রাফি লিখছি মাসিক বুধাদিত্যে। নেক্সট চ্যাপ্টারটা ভাবছি তোমাকে নিয়ে লিখব। অভিজিৎ, সুভাশিস এদের নিয়ে লেখা হয়ে গেছে। তোমার একটা ফোটোগ্রাফ চাই। যদি তুমি নেক্সট রবিবার, না-না, তার পরের রবিবার

আমার বাড়িতে আসো ছবিটা নিয়ে, তাহলে একটু চেক-আপ করে নিতাম লেখাটা আর কি, মানে, মেমারি থেকে তো সবটা····তুমি কি····'

প্রভাসদা সুইমিং পুলের কাছে বাড়ি করেছেন অমিয় শুনেছে। মেয়েদের বিয়ে-সাদি দিয়ে, বাড়ি-গাড়ি করে, উনি এখন সেই সব ছাগ-শিশুদের নিয়ে আত্মজীবনী লিখছেন বুধাদিত্যে, সে তাও জানে। যে, দুগ্ধদাত্রী হিসেবে ওঁকে কত-না আত্ম-মোক্ষণ করতে হয়েছে। কেন না, আর-পাঁচটা সাহিত্যিকের মত উনি তো শুধু লিখে যান নি. একটি আখড়ার বাবাজীও ছিলেন।

প্রভাসদাকে কিন্তু ঠিক আগের মতই বিশ্বাসযোগ্য দেখাচ্ছে··· ২২ বছর আগেই তো ওঁর ঝুলপি-টুলপি সব পাকতে শুরু করেছিল, থাকতেন শালকিয়ার শ্রীরাম ঢ্যাং লেনে—এখন ঝুলপিসহ চুল, মায় ভ্রু-ট্রুও ঘন কালো। অবশ্য ওঁর পিউবিক হেয়ারের অবস্থা ঠিক কী তা বলা কঠিন। মোটকথা, যুবাবয়সী সেই তোবড়ানো-চোয়াল প্রৌঢ়ের পরিবর্তে অমিয়র সামনে এক পরাক্রান্ত প্রৌঢ়ের যৌবন দাঁড়িয়ে।

তুলনায় অমিয়র চুলটুল রীতিমত পাকতে শুরু করেছে। বিগত ২২ বছরে তার একটি করে বই বেরিয়েছে আর একটি করে দাঁত পড়েছে। ভাগ্যিস, তার গ্রন্থ-সংখ্যা ৩টির বেশি নয়।

'কিন্তু প্রভাসদা' অমিয় বলল, 'আমি তো নেক্সট উইকে থাকছি না।'

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'এই একটু····বাইরে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাচ্ছ'র উত্তরে অমিয় যদি সোজাসুজি বলে দিত 'কালিম্পঙে', তাহলে ব্যাপারটা ঐখানে চুকে যেত ! সে এমনিই জায়গাটার নাম বলেনি।

কিন্তু প্রভাসদা যখন শঙ্কিত মুখে ফের প্রশ্ন করলেন, 'বাইরে ?···· কোথায় ?····' তখনই অমিয়র মাথায় খেলে গেল, আরে, বাইরে বলতে তো ছোট আর বড় এই দু-রকমের বাইরে হয়, তাই না ?

'এই একটু আমেরিকা যাচ্ছি।' অমিয় ধাঁ করে বলে বসল এবং 'কবে' জানতে চাইবার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'টুয়েণ্টিএইটথ মে। এয়ার ইণ্ডিয়ার রাতের ফ্লাইটে।'

অমিয় দেখল, রুমাল দিয়ে এক পোঁচ বুলিয়েই প্রভাসদা মুখ থেকে আতঙ্কটা বিলকুল মুছে ফেললেন। তবে বাজারের ঝুড়িটা ধীরে তুলে নিলেন মাটি থেকে।

অমিয় যাদের সঙ্গে লেখালেখি শুরু করে তাদের মধ্যে অনেকেই একটি বিশেষ সূত্রে আমেরিকা গেছে। অন্তত তিনজনকে সে সী অফ করতে এয়ারপোর্টে গেছে। ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সবই তার জানা। প্রভাসদা আরও কৌতূহল প্রকাশ করলে সে কী ভাবে যাচ্ছে, কারা নিয়ে যাচ্ছে, কোন ইউনিভার্সিটি, কোন প্রোজেক্ট সবই গড়গড় করে বলতে পারত।

সে বেশ হকচকিয়ে গেল ওঁর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে (আফটার অল, দিল্লিই এখনো ওঁর পক্ষে দূর অস্ত্—অর্থাৎ আকাদেমি) যখন উনি গলা পর্দা দুই নামিয়ে জানতে চাইলেন, 'একা যাচ্ছ ?'

সে কী ! অমিয় ভাবল, বন্দনাকেও নিয়ে যাওয়া যেতে পারে নাকি ! এটাও বিশ্বাসযোগ্য ? আ-হ্যাঁ, অভিজিৎ তাও গিয়েছিল বটে।

সে তাড়াতাড়ি বলল, 'না-না, বন্দনাও যাচ্ছে। দু বছরের গ্রান্ট। মেয়েকে রেখে যাচ্ছি।'

প্লাস্টিকের থলির একাংশে লিচু ও বাগদা চিংড়ি হাতে সেকেন্ড হ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডের দিকে যেতে যেতে প্রভাসদা বললেন, 'তাহলে তো… আচ্ছা তাহলে আমার যদ্দূর যা মনে পড়ে তোমার সম্পর্কে, লিখে দেব, অ্যাঁ ? তবে তোমার একটা ছবি….'

'ছবি আমি আমেরিকা থেকে একটা পাঠিয়ে দেব'খন প্রভাসদা। বুধাদিত্যের ঠিকানায়। অবশ্য রঙীন হতে পারে ছবিটা। আপনাদের পত্রিকায় রঙীন ছবি ছাপা হয় তো ?'

'রঙীন ? তা হাঁ, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করে নেওয়া যাবে। আচ্ছা চলি।'

প্রভাসদা গাড়ির সামনে। অমিয় এতক্ষণ সঙ্গেই আসছিল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিল।

অপসৃয়মান বারো-ভাতারি হেরাল্ডের দিকে তাকিয়ে অমিয় মনে মনে প্রভাস মল্লিকের উদ্দেশে বলে গেল, 'দেখুন প্রভাসদা, যদিও বসা গেল না

নেক্সট উইকে, যদিও ছবি দিতে পারলাম না, তবু, আমেরিকা থেকে সস্ত্রীক ফিরে এসে যদি দেখি আপনি লিখেছেন যে, আমার গোয়ালে যারা আসত তার মধ্যে অমিয়পদ চৌধুরীই ছিল একমাত্র, যে কখনো আমার সঙ্গে সে-ভাবে মেশেনি যাতে সে আমার বাঁটে বছরে দু থেকে চারবার মুখ দিতে পারে—বাঁটের আশা ছেড়ে বরং সে চলে গিয়েছিল অনন্ত ঘাস-জমির দিকে—তাহলেই আমার সম্পর্কে প্রায় সবটাই আপনার মনে পড়েছে আমি ভাবব, আর আমি খুশিও হব খুব।'

৭২ খানা বই লিখে প্রভাস মল্লিক এখনো দিল্লি যেতে পারেন নি; আর আমাদের অমিয়পদ মাত্র তিনখানা বই লিখে চলল আমেরিকায়।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

আলো-অন্ধকারে একদিন

আস্থায়ী ॥

প্রথমে আলো জ্বালাই ছিল। চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরেও ঘুম এলোনা যখন, আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, দোষ ঘুমের কিছু নয়। হলে, হয়ত বা আলোর, ভ্রমবশত এমন কিছু একটা ভেবে, অবশেষে অন্ধকার করে ফেলি ঘর। ঘুম যেন সাক্ষাত যম, তবু আসে না। সন্তর্পণে নারী স্পর্শ বাঁচিয়ে আমি পাশ ফিরে শুই। যেন, যা হবার হয়ে গ্যাছে।

সত্যি বলতে কি, আমি যে তাকে কোনো বিশেষ অর্থে ভালোবাসি না, শুধু একথা আরও একবার ঊষাকে, যে কিছু ভুলতে পারে না—সেই ভুলো-মন ঊষাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে, অমন নিষ্ঠুর ভাবে সেদিন আমাকে পাশ ফিরতে হয়েছিল, ফিরতেই হয়েছিল, দোতলা শেফালী লজের অন্ধকার বিছানায়।

আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকা ঊষার পক্ষে বেশীক্ষণ সম্ভব নয়, অন্তত সেদিন ছিল না, কেন যেন, ঐভাবে শুয়ে একথা দ্রুত বিশ্বাস হয়ে আসে। আর সম্পূর্ণ সেই বিশ্বাসেই, আমি যেন হৃদয়বিহীন কোনো ঈশ্বর কিংবা শয়তান, তার জন্যে, একটি বাঁধনহারা মহিলার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি, করতেই থাকি, কেউটের মতো কালো অন্ধকারে, না করে উপায় ছিল না। যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদির কাছে আকস্মিক মুক্তি যেমন, অতটা না হলেও, আমার কাছে তখন একটি নারী, শরীরসহ একটি নারী এবং রাতজোড়া নিবিড় নিশ্চিন্ত ঘুম, দুটোই ছিল একই রকম জরুরী।

আমার ঘাড়ের কাছে, ঠিক যেখানে বকলেসের দাগ, ঊষার থর্থরে নিশ্বাস এসে পড়ে। শুনতে পাই, ঘুণপোকার একটানা শব্দ। কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে জানালার ফ্রেম। ঊষার নিশ্বাস আরও কাছে আসে। মৃদু ভাপ

লাগে। ভয় ভয় করে। অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে চারপাশ। মাইল মাইল ব্যাপী বন-বিভাগের অন্ধকার শাল জঙ্গল। আর স্পষ্ট বোঝা যায়, এই অসহ রাত্তির খুব সহজে ভোর হবার নয়।

একসময়, নীরবতা সহ্য হয় না ঊষার। আর তা না হলে যা হয়, সহসা শার্টের ওপর দিয়েই সজোরে সে আমার কোমরে খামচে ধরে। পোষা কাবলী বেড়াল যেন, থাবায় এতো লোম, সত্যি, নোখ আর দেখাই যায় না। শুধু গোঁফে গোঁফ ঘষে, আমার মাথার কাছে, আমার অবুঝ দেহের কাছে সে বলে ওঠে—এতো অন্ধকারে আমি মরে গেলেও ঘুমোতে পারবো না।

শুনেছি, প্রকৃত ভালোবাসার কাছে আলো ও অন্ধকার, দুই-ই নাকি সমান। পাশ ফিরে শুয়ে, আমি বলি, বুদ্ধি খরচ করে ঊষাকে বলি, তাহলে বরং বাথরুমের আলোটা জেবলে, দরজা ভেজিয়ে না দিয়ে, অল্প ফাঁক করে দিই, কেমন। তাতে আলোও হবে, অন্ধকারও হবে।

ঊষার মতামত নিয়ে, খাট থেকে উঠে আমি তাই করে দেখি, কি আশ্চর্য যেমনটা চাইছিলুম, এ যে ঠিক তাই! এ আলোয় শরীর দেখা যায়, মুখ দেখা যায় না। এ' অন্ধকারে ভালোবাসাহীন যৌনতা করা যায়, যৌনতা না করে তেমন ভালোবাসা যায় না। এই আলো অন্ধকারে চমৎকার খুন করা যায়, শুধু কোনো কাজ করা যায় না। অবশ্য এসব কথা আমি বলি না। চুপচাপ ফিরে আসি। আমার মাথার চুলে খান তিনেক আঙুল ডুবিয়ে, সামান্য বিলি কেটে, সে বলে, আচ্ছা আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে?

—বলো

—ঠিক কি কারণে আমায় বিয়ে করতে চাইছো না?

—এতো আমি আগেও অনেকবার বলেছি

—ওভাবে নয়, আরও সোজাসুজি বলো

—তোমাকে আমার ভয় করে

—তার মানে!

—ঠিক তোমাকে নয়, আসলে তোমাকে বিয়ে করা, প্রতিদিন তোমার গল্প শোনা, তোমার সঙ্গে কথা বলা, একই বিছানায় শোয়া, একই বাথরুম ইউজ করার কথা ভাবলে, আমি তো আগেও অন্য ভাবে বলেছি, আমার সাফোকেটিং লাগে। এর পরেও যদি আমরা এক সঙ্গে থাকি, আমি নিশ্চিত, আমাদের হাতাহাতি হবে, রক্তারক্তি হয়ে যাবে রোজ রোজ।

—কক্ষনো হবে না আমাকে তুমি কিছুই বোঝোনি। গগনের সঙ্গে মোটে

একবার হয়েছিল, তাও সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ও আমাকে বাধ্য করেছিল। প্রথম চড়টা যদি আমাকে না মারতো…। কথা শেষ না করে, আমার হাতটা ঊষা বুকের মধ্যে টেনে নেয়। আঙুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে আমার পাঞ্জা শক্ত করে ধরে, একটু ঘুরিয়ে বলতে থাকে, কিন্তু তুমি অন্য রকম। তোমার সঙ্গে থাকলে কখনো হবে না। তুমি আমায় জানোনা অনুপম, আমি অসম্ভব সহ্য করতে পারি। বিশ্বাস করো…

—কিছু মনে কোরো না, আমার পক্ষে সত্যিই, সম্ভব নয়

—কেন, আমায় দেখতে ভালো না বলে ?

—না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়

—তবে ! আমার বয়েস তোমার চে' সামান্য বড় বলে ?

—একদমই না

—তবে কি আমার ভার্জিনিটি নেই বলে !

—ওটাও কোনো কারণ নয়

—হ্যাঁ, না হওয়াই উচিত। তুমি, তোমার কথা শুনলে বা লেখা পড়লে মনে হয়, যথেষ্ট কনসাস। তাই তোমাকে বলতেও কখনো দ্বিধা করিনি। গগনকে আমি তখন সত্যিই ভালোবাসতুম। ওর জন্যে কত সহ্য করেছি, অনু তুমি ভাবতে পারবে না। সবাই জানতো আমাদের বিয়ে হবে। দীর্ঘ চারপাঁচ বছর ধরে ওকে মানিয়ে নেবার সব চেষ্টাই আমি করেছি। কিন্তু আর পারা গেল না। মিথ্যে কথা বলা ছিল গগনের প্রধান দোষ। মদটা অবশ্য আমার পাল্লায় পড়ে অনেক কমিয়ে দিয়েছিলো। আর আশ্চর্য, তারপর থেকেই ওর মিথ্যে বলার প্রবণতা সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। নিজেকে সিগনিফিক্যান্ট করার জন্যে, বিশেষ একজন বলে প্রমাণিত করার জন্যে সারাক্ষণই বোকার মতো মিথ্যে বলতো। আদ্দেকদিন অফিসে যেতো না। কবিতাটাও আর শেষ দিকে লিখতে পারতো না। একটা লাইন লিখে হাজারবার কাটা ছেঁড়া করতো। পারতো না। কে জানে, পারতো না বলেই হয়ত সে মিথ্যে কথা এতো বলতো ! এ ব্যাপারে সে আমার অজ্ঞ মাকেও বেহাই দ্যায়নি। আমার কান্না পেতো। গ্রাজুয়্যালী, শুধু আমাকে নয়, নিজেকেও মিথ্যে বলা শুরু করেছিল গগন। ওর সঙ্গে আর কিছুদিন থাকলে, বিশ্বাস করো আমি পাগোল হয়ে যেতুম। অবশ্য স্বীকার করবো গগনও আমাকে ভালোবাসতো। তোমার মতো নির্মম নয়। একদিন দুপুর-বেলা ওর হস্টেলে গিয়ে দেখি, ঘুমোচ্ছে। ওকে না ডেকে বইএর র‍্যাকটা

ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে চোখে পড়ে যায়, একদম নিচের দিকে বইয়ের পেছনে ডেলা পাকানো একটা ছাই রঙের কর্ডের প্যাণ্ট। সামনের দিকে দু' এক জায়গায় কালচে স্পট্। আমার মনেই ছিলো না। জেগে উঠে গগন বললো, ওসব রক্তের দাগ। প্রথমদিন আমার খুব ব্লিডিং হয়েছিল। ছেলে মানুষের মতো সেই প্যাণ্টটা না কেচে, ভাবতে পারো, ওই ভাবে তুলে রেখেছে! অথচ দাদার বন্ধু শ্যামলদার সঙ্গে আমি নকশাল পিরিয়ডে একই ঘরে রাত কাটিয়েছি',—ঊষা, না বললে যেন আধো অশুদ্ধ হয়ে যাবে তার নিজস্ব মহাভারত, কলকল করে বলতে থাকে, 'কখনো আঙুলও ছুঁইনি। ইচ্ছেই করেনি। ভালো না বেসে উঠতে পারলে, বিশ্বাস করো, অন্য একজনের সঙ্গে বিছানায় যাওয়া তো দূরের কথা, স্পর্শ করার কথাও আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার ঘেন্না করে। ভীড় বাসে যেতে আমার এততো স্যাবি লাগে, কি বলবো! একদিন তো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। পেছন ফিরে দেখি, আমি ভাবতেই পারিনি, পলির সেজো কাকা....

—এটা সম্ভবত আমি আগেও শুনেছি, ঊষা কিছু বলার আগে আমি দ্রুত বলে উঠি, তুমি যা বলতে চাইছো, আমার ধারণা আমি বুঝতে পেরেছি।

—তবে কেন আমায় গ্রহণ করতে পারবে না অনু, এই কথা বলে, ঊষা ভূতগ্রস্থের মতো মুঠো করে ধরে আমার শার্টের কলার। এক এক করে, সবুজ ডাল থেকে হেঁচকা টান মেরে ফুল যেভাবে ছেঁড়া হয়, সে একাই পট্‌পট্ করে খুলে ফেলতে থাকে সমস্ত বোতাম। আর আমার আবরণহীন প্রতিটি লোমকূপ ঘিরে জেগে ওঠে অন্য এক হরষ।

মুখ নিচু করে দেখি, তার গোড়ালী ছেড়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে এসেছে তাঁতের শাড়ির পাড়। নূপুর পরে থাকলে এখন ঠিক দেখা যেত। হয়ত বা বেজেও উঠতো একবার। সহসাই ইচ্ছা হয়, ঊষার পায়ে পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কখনো নূপুর পরেছো?

আমাকে কোনোরকম স্কোপ না দিয়ে, প্রাসঙ্গিকতা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তৎপর ঊষা আবারো খেই ধরে বলতে থাকে, আমি যাকে ভালোবাসি, আমার সব কথাই তাকে বলা প্রয়োজন মনে করি। বিজনের কথা তো তোমাকে বলেইছি। ওর সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত সম্পর্ক। করতে বললে ও হয়ত আমাকে কালই বিয়ে করতে রাজী। ওর বাড়ির লোকেদেরও কোনো আপত্তি নেই। ভালো ছাত্রী হিসেবে বিজনের মায়ের আমাকে

এমনিতেই পছন্দ। তাছাড়া, একটা কলেজে, নিদেন পক্ষে একটা স্কুলে চাকরী আমি কয়েক মাসের মধ্যেই পেয়ে যাবো। জানো, বিজন আমাকে কখনো এক্সপ্লয়েট করেনি। কোনো দিন সেভাবে স্পর্শও করে নি। একদিন শুধু ঘাড়ের কাছে হাত রেখেছিল। ওকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না। বিজন আমাকে অনেকটাই বোঝে। শুধু মাঝে মধ্যে ব্রথেলে যাওয়াটাই যা ওর একমাত্র আপত্তিকর ব্যাপার। বিয়ের পর, আমার মনে হয়, ও যাবে না। কিন্তু তোমার মধ্যে যে একটা শান্তভাব আছে, বিজনের নেই। এক একদিন বিজনকে এতো উদভ্রান্ত লাগে, ঠিক নির্ভর করা যায় না। আচ্ছা অনু— একটা পা সামান্য ভাঁজ করে আমার পায়ের ওপর তুলে দিয়ে ঊষা সম্রাজ্ঞীর মতো বলতে থাকে, তুমি তো বলো, বিয়ে করার জন্যে ভালোবাসা দরকার হয় না। ভালোবাসা ছাড়াও তুমি বিয়ে করতে পারো। তাহলে আমাকে করতে আপত্তিটা কোথায়?

—ঠিক কথা, ভালোবাসা ছাড়াই আমি কোনো একজনকে বিয়ে করতে পারি। হয়ত করবোও। কিন্তু তোমার সঙ্গে হয় না, সম্ভব নয়।

—কেন নয়? মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় একহাত দূরে ছিটকে সরে যায় ঊষা। এলোমেলো শাড়িটা বুকে জড়িয়ে, যেন লুটিয়ে পড়া আঁচলের আগুন ছোঁ মেরে উঠে এসেছে পিঠের ওপর, চর্চর করে পুড়ে যাচ্ছে খোলা চুল, সে অস্বাভাবিক জোরে বলে ওঠে, আমি মার্কসিস্ট বলে?

—তোমার কি ধারণা, ঊষার বাম স্তনের সামান্য ওপরে হাত রেখে আমি তাকে না বলে পারিনা, তুমি সত্যিই একজন মার্কসিস্ট!

—না, সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চয়ই নয়। তবে হওয়ার চেষ্টা করি। কম্যুনিস্ট না হয়ে আমাদের কোনো মুক্তি নেই। আমাদের হতেই হবে। যখন কলেজ লাইফে এক্টিভ্লি নকশাল করতাম, আমি একা নয়, আমরা সবাই একথা বিশ্বাস করতাম আমি আজও করি। আমি জানি, আমার চিন্তা ধারায় তখন কিছু ত্রুটি ছিল। এখনো কিছু আছে। তবু, মার্কসিজম ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

—সে তোমাকে দেখলেই অনেকটা বোঝা যায়। বিশেষ করে তুমি যখন তোমাদের কমরেড ভবেশদার কথা বলো····

—অনু তুমি তেমন করে মার্কস পড়োনি বলে এভাবে মক্ করতে পারছো। মার্কস তাঁর 'অন রিলিজিয়ন' বলে একটা কালেকশনে এক জায়-গায় স্পষ্ট বলেছেন····

—প্লীজ্, ঊষার মুখের ওপর আমি চোখ রেখে বলি, আমাকে শুনিওনা। মার্কস কি বলেছেন, তোমাদের কাছ থেকে, আই মিন, স্বদেশী মার্কস ভক্তদের কাছ থেকে আমি আর নতুন কিছু শুনতে চাই না। আজ অব্দি যা শুনেছি, মনে হয়েছে, মার্কস না জানলেও চলে।

—এটা তোমার খুব ভুল ধারণা। আনসাইন্‌টিফিক। আমাদের দেশের যা সোসিও-ইকনমিক স্ট্রাকচার, সেখানে মার্কসিজ্‌ম্ ছাড়া····

সোসিওইকনমিক স্ট্রাক্‌চার নিয়ে, তোমাকে আগেও বলেছি, ঊষা তোমাদের কমরেড ভবেশদার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করো। দয়াকরে, আমার সঙ্গে আর নাই বা করলে!

—একজন সেন্‌সিবল লোকের মুখে একথা একেবারেই মানায় না। অনু তুমি কি বলতে চাও, কোনো সার্বিক আন্দোলন ছাড়াই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টানো সম্ভব?

—আমি ভবেশদার কথা বলছিলুম

—আমি কিন্তু সার্বিক আন্দোলনের ব্যাপারটা সিরিয়াসলি বলতে চাইছি।

—তাহলে, একটা ছোট হাই প্রায় গোপন করে আমি বলি, বলো।

—দ্যাখো অনু, আমাদের যা সমাজ····

—ঊষা, তুমি তো জানোই, ঘুম আর এভাবে আসবেনা জেনে গিয়ে বলতে থাকি, সমাজ কিংবা কোনো সঙ্ঘর প্রতি, সে যাদেরই হোক, আমার কোনো বিশ্বাস নেই। মানুষকে দ্রুত নষ্ট করে দেওয়া ছাড়া, আমি জানি না, সমাজের আর কিই বা করার আছে! আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, সমাজ কত স্মুথলি একটা মানুষকে পঙ্গু করে দ্যায়। না হলে, লক্ষ লক্ষ উপযুক্ত লাথির ঘায়ে কবে হাঁ হয়ে ফেঁসে যাবার কথা ছিল এই শুয়োরের বাচ্চা সমাজের তলপেট। কই গ্যাছে! অ্যাঁ! ঊষা, আমি আবার বলছি, সমাজ আমাকে কোনো অর্থেই টানে না। যদি কেউ টেনে থাকে, সে হলো, বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তি মানুষ। জানি, এবার তুমি বলবে, আমি ফিউ-ডালিজমে ভুগছি। বলো! বললে, সামান্য অশ্লীলতার জন্যে আগে ভাগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি নিশ্চিত বলবো, আমার একগাছা পিউবিক হেয়ারও ছেঁড়া যাবে না। বিদ্রোহ, ঊষা, আমি যত দূর জানি, কোনো পুস্তকে থাকে না। মানুষের মধ্যেও থাকে না। জন্মায়। একটু তলিয়ে দেখলে, দেখবে, কেবলই অপমৃত্যু চেতনা এসে জন্ম দিয়ে গ্যাছে পৃথিবীর সমস্ত

বিদ্রোহের। আজও দেবে। নীল চাষের দিন আর আমার মধ্যে নেই। এখন বিদ্রোহ বলতে প্রথম আমি বুঝি, নিজের বিরুদ্ধে। নিজেরই জীবন যাপনের সমূহ শর্তের বিরুদ্ধে। কিংবা ঊষা, আমি হয়ত কিছুই বুঝি না। আজকাল আমি কেন যেন, সহজে কিছু বিশ্বাস করে উঠতে পারিনা। আমি নিজেই আমার অসুখ। জানো, মাঝে মাঝে নিজেকেও অবিশ্বাস হয়। অথচ, তুমি বিশ্বাস করো, আমি সব বিশ্বাস করতে চাই। ঈশ্বর আকাশ শয়তান সমাজ সিফিলিস শ্রীচৈতন্য বিপ্লব স্ট্রেপটোমাইসিন্ সালফেট মার্কস কনডোম বৃষ্টি ভি.ডি ও, ভালোবাসা, এ' বিশ্বের প্রতিটি খুন ও ক্ষমা, রূপ থেকে অহরহ যে রূপান্তর, আমি সমস্তকিছু বিশ্বাস করতে চাই। বিশ্বাস না করলে, ঊষা, আমি নুড়ি পাথরের মত অচল হয়ে যাবো, ঊষা, স্রেফ মরে যাবো আমি আর কোনদিনও সহজ হবো না ঊষা সরল হবো না ঊষা আমি আর কখনো····

—এ্যাই, তুমি কি পাগোল হয়ে গেলে! আমার মুখের ওপর সহসা হাত চাপা দিয়ে, কৌটোর ঢাক্না যে ভাবে বন্ধ করা হয়, ঊষা ভীষণ ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

এতোই ইন্‌ভলভড্ হয়ে পড়বো, পড়ার আগে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ঊষার বগলের কাছে মুখ গুঁজে মনে হয়, এ পণ্ডশ্রম আমার না করলেও চলতো। আমার কোনো দায়িত্ব নেই। ঘৃণা করার কিংবা ভালো-বাসার, কিছুরই কোনো দায়িত্ব নেই আমার। এসব জানার পরেও, কে জানে কেন, প্রায়শই এমন ছোট খাটো ভুল করে ফেলি আবার!

আমাকে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে, গলার স্বর পালটে, ঊষা বেশ খেলিয়ে বলে ওঠে, তোমাকে উত্তেজিত হয়ে পড়তে দেখলে আমার খুউব ভাল্লাগে। আমি আরও ভালোবেসে ফেলি। আচ্ছা অনু, এসব তোমার ভান নয়তো!

—এভাবে বলা যাবেনা ঊষা, আমি ছোট ঢোঁক গিলে বলি, এটা আরেকটু ভেবে দেখার। তুমিও একটু ভাবো না।

—দুঃর, এত শক্ত শক্ত কথা আর ভাল্লাগছে না। এ্যাই, আমাকে একটু আদর করতো, এই বলে, মরা কেঁচোর মতো আমার দুটো ঠোঁট ঊষা তার ঈষৎ নোনতা জিভের উলটো পিঠ দিয়ে চেটে দ্যায়। তারপর সরাসরি আমার প্যাণ্টের জিপারে হাত রেখে, টান মেরে খুলে, যে ভাবে এর আগে কোনো

মহিলা বলেনি বালিকাপ্রতিম ঊষা বলে ওঠে, একি-ই-ই, তুমি রাত্তিরেও জাঙ্গিয়া পরে শোও !

মৃত্যুর আগের দিন, ওটিতে নিয়ে যাবার কিছু আগে, পল্লবের বাবার কোমর থেকে, অচৈতন্য কোমর থেকে, একটি যুবতী নার্সকে, নীল ডুরে পাৎলুন, ঊষা যেভাবে আমার প্যাণ্ট, ঠিক ওইভাবেই টেনে খুলে ফেলতে, আমি স্বচক্ষে দেখি। দেখে মনে হয়েছিল আর বাঁচবে না।

কোথায় যেন বাংলায় পড়েছিলুম, লেখক যথেষ্ট আধুনিক করে লিখেছেন, আলয়ের দরজায় খিল তুলে দিয়ে প্রায় বাহু সংলগ্ন একটি সাবেকী বেশ্যাকে প্রথম চুম্বন করার আগে, বিচলিত নায়ক রিয়েলাইজ করে, করা যায় না। ভালোবাসাহীন কোনো ঠোঁটে চুম্বন, কিংবা প্রতিচুম্বন, কিছুই করা যায় না। এবং ইম্‌মরাল নয় বলে, যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি, গোটা গল্পে সে তা একবারও করেনি।

অন্য কোনো কারণে সে যদি বিরত থাকতো, আজ, এভাবে আমার কিছু বলারই ছিল না। ঝক্‌ঝকে দাঁতের ফাঁকে, যখন হাসছিলো, কুচো সুতোর মতো লেগে থাকা রক্ত দেখার পরেও আমি শান্তাকে, একটি অজ্ঞাতকুলশীল বেশ্যা রমণীকে তবু প্রবল চুমু খেয়েছি, হে ভগবান, আমার কি হবে! আমি কি তবে পাষাণ! না কি শুধুই বাহাদুর!

ফরচুনেটলি আমার পায়োরিয়া হয়নি। সেদিনই শান্তা বলেছিল, হবেই —এমন কোনো কথা নেই। তবে যদি হবার হয়, দুটো দাঁতের ফাঁকে জিভ লাগিয়ে মাঝে মাঝে চুষে দেখবেন, নোনতা লাগছে। না হলে, ভয়ের কিছু নয়।

বিগত চার পাঁচ বছরে, মিথ্যে বলবো কেন, শান্তার মুখ আমি সম্পূর্ণ ভুলেছি। কিন্তু শান্তাকে ভুলিনি। বসার পর, সেই একই বিছানায় একদা সহপাঠিনীর মতো মুখোমুখি বসে, যেমনটা সে আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল, কতোবার আমি অবিকল সেই ভাবে চুষে দেখেছি, নোনতা লাগেনি। আজও লাগেনা।

সব শুনে, মাস সাতেক আগে, ঊষা আমায় প্রথমে বলেছিল, তা লাগবে কেন। তুমি তো আস্ত শয়তান। তারপর মিনিট দুয়েক আমার মুখের দিকে আর না তাকিয়ে, আধখাওয়া কফির কাপে চামচ নাড়তে-নাড়তে,

নাড়তে-নাড়তে, অবশেষে জিপসী গণৎকারের ঢঙে বলে ওঠে, 'দেখো একদিন ঠিক নোন্‌তো লাগবে।' মনে পড়ে, সেদিন শাড়ি নয়, বাঘডুরে হাউস কোট পরেছিল উষা।

অতিরিক্ত চুম্বনকালীন আমি টের পাই, শায়ার দড়িতে নিজের ফেলা গিঁট, আমার কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই, দিব্যি উষা নিজেই খুলে ফেলে। আর, না দেখার ভান করে আমি দেখি, আমার তিরিশ বছর তিন মাসের জীবনে এই প্রথম একজন নারী, ব্যবসার খাতির ছাড়াই, ভাঁজ করা হাঁটু খুলে, আমাকে আহ্বান করে। যেন উষা নয়, শয়তান ডাকছে। যেন ঈশ্বরী ডাকছে। যেন আলো, যেন অন্ধকার, যেন আলোঅন্ধকার নিয়তির মতো ডাকছে আমাকে। আর ব্যবহৃত হবে বলে, শুধু একবার ভীষণভাবে ব্যবহৃত হবে বলে, আমার মাথা নিরুপায় ভাবে খালি করে, তৈরী হয়ে ওঠে অবুঝ শরীর। কাঁপানো, ইলেকট্রিক বাল্বের ছেঁড়া ফিলামেণ্ট যেমন, আমার অনমনীয় দণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে। ব্যথা করে।

একটা দোহারা চিতার মতো, আমার ধারণা, সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল তখন। আমি পারিনি। ওকে, উষাকে অমন কাটা গাছের গুঁড়ির মতো নিশ্চুপ শুয়ে থাকতে দেখে, আমার আবারো সহসা মনে হয়, কাল সকালে ও নির্ঘাৎ কাঁদবে। একবার আমার দিকে আর হোটেলের জানলা দিয়ে একবার দূরের দিকে তাকিয়ে, নিশ্চিত কেঁদে উঠবে একবার। সকালের রোদ্দুর যত গাঢ় হবে, দিশাহারা উষা বলতে থাকবে, হঠাৎ করে সারা রাত্তিরের জন্যে এভাবে চলে আসাটা আমারই ভুল। আসলে একটা শায়া, একটা শাড়ি কিংবা ব্লাউজ নয়, ভুল করে আমি পুরুষের কাছে, বড় ভুল করে আমি শয়তানের কাছে ভালবাসা চেয়েছি। তোমার কোনো দোষ নেই, অনু, যা কিছু দোষ, যা কিছু ভুল, সব আমার একার। তোমার আর কি!

মার্কসিজমের কথা বলার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি, উষা যে কমরেড সুলভ টোনে কথা বলে, হঠাৎই অনেকটা সেই ভাবে বলে ওঠে, আচ্ছা অনু, আমার সঙ্গে শুতে তোমার কি ঘেন্না করছে! আই মিন, আপত্তি আছে? যদি থাকে, তুমি ফ্র্যাঙ্কলি বলতে পারো। আমি কারোর ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না।

—না না, তোমাকে আমার ভালোই লাগে

—কি কারণে ভালো লাগে একটু খুলে বলবে ?

—তুমি বিধ্বস্ত একজন বলে

—এছাড়া অন্য কিছু কারণ নেই ?

—হ্যাঁ, কেন থাকবে না ! প্রথমত তুমি একজন মেয়ে। তাছাড়া তুমি মিথ্যে কথা কম বলার চেষ্টা করো। শাড়ি গয়না ডিগ্রী ছাড়াও অন্য কিছু ভাবো। এখনো অন্যান্য পড়াশোনা করো। ভালোবাসার জন্যে এখনো, এই বয়েসেও যথেষ্ট বেপরোয়া ভাবে ছুটে বেড়াও, কাঁদো, কষ্ট পাও। এসব আমার ভালোই লাগে।

—আমার বিশ্বাস হয় না

—আচ্ছা ঊষা, যদি বলি, তোমাকে খুব সহজে এক্সপ্লয়েট করা যায় বলে এতো ভালো লাগে, তুমি কি তাও আমাকে অবিশ্বাস করবে !

—আমি জানি না। কিছু জানি না।

॥ অন্তরা ॥

শারীরিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার। পুনরায় ঊষার নিবিড় সান্নিধ্যে গিয়ে, দ্বিতীয়বার, মিনিট দুয়েকের মধ্যেই, প্রথম বারের মতো তৈরী হয়ে নিই, যেন আমি দক্ষতার সন্তান। শ্রম ছাড়া যেন এ' পৃথিবীতে আমার কিছু করার নেই। তারপর দু'চোখ পাথরের মতো বুজে, আর কিছু ভাবতে পারি না আমি আশরীর লিপ্ত হয়ে যাই।

জাত গোখরোর খোলা ফণা যেমন, আন্দোলিত আমার দুটো কাঁধ একসময় ঊষা সজোরে আঁকড়ে ধরে। যেন আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব তার ঐ দু' হাতের মুঠোয়, মমতাময়ী স্কুল মিসের কায়দায় সে বলে ওঠে, অনু, কষ্ট হলে বরং একটু রেস্ট নিয়ে নাও। না হলে কিন্তু বেশীক্ষণ ···। এ্যাই জানো, আমার বাবার বুক তোমার চেয়েও আরও অনেক চওড়া ছিল। তোমার কত গো, থারটি ফোর, না থারটি-ই-ই·······

এরকম একটা সময়, অনভ্যাস বশে পিছলে গিয়ে আমি অন্ধের মতো, জন্মান্ধের মতো কাতর বলে উঠি আমি, তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না, ঊষা, তুমি কোথায় !

ছেলেবেলায় দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে জেগে ওঠার পর, কখনো বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়া মাথা আমার মা যেভাবে, অত্যন্ত যত্ন সহকারে ঊষা

আমাকে পুনস্থাপন করে বলে, এই তো আমি, অনু, তুমি আরও কাছে আসতে পারছো না কেন, অনু, গগন তো আরও অনে-এ-কটা পারতো !

শুধু গগন নয়, আমি মনে মনে বলে উঠি, রেস্ট নিয়ে যাঁরা আরও অনেকটা পারেন, তাঁদের জন্যে শ্রদ্ধা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। যাঁরা ওই ভাবে অনেকটা পেরেছিলেন, যাঁরা পারছেন, সত্যি, ঊষা, তাঁদের কেউ নই, আমি কেবলই তাদের একজন, যারা অনেকটাই পারে নি। রেস্ট কাকে বলে, যারা আদৌ উপভোগ করে নি কখনো, করবে না বলে নয়, সময় পায় নি।

ওকি, তুমি ছুরি, এমন একের পর এক, ধারালো, ঝক্‌ঝকে সব ছুরি কোথায় পেলে, ঊষা। এই দ্যাখো, কেমন শশার মতো হিম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার সন্ত্রস্ত পুরুষাঙ্গ, ঊষা, প্লীজ, তুমি ছুরি সরাও। আজ, অন্তত একবার তুমি আমায় এই ভুবন জোড়া অসম প্রতিযোগিতার বাইরে নিয়ে চলো। তোমার সর্বস্ব হারিয়ে একবার তুমি একাকী হও। আশরীর মুগ্ধ করে দাও আমায়। লোপাট করে দাও আমার বিবেচনা বোধ। আমার গলার বক্‌লেস। ছিঁড়ে মুড়ে তছ নছ করে দাও আত্মসর্বস্ব লাটিমের সুতো। হারাবার ভয়ে, শুধু তোমাকে হারাবার ভয়ে, সহসা দ্বিখণ্ডিত সাপের লেজ যেমন, আমাকে কুঁকড়ে পাক খেয়ে যেতে দাও ভেতরে ভেতরে। না হলে, তুমিই বলো, গগনের মতো অতটা আমি কি করে পারবো, ঊষা, সে কি সম্ভব !

ঊষা, তুমি সেই ভাবে আনন্দের কথা, ঠিক সেই ভাবে দুঃখের কথা বলে ওঠো আজ, শুনে, আমার যেন সত্যি সত্যিই মনে হয়, ও দুটো তোমার শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাপার। আর তা না পারলে দয়া করে তুমি আমাকে ঠকাও। তঞ্চক হয়ে যাও, ঊষা, প্রতারণা করো। কাঁদো। ধ্বংস হয়ে যাও। আর নিমজ্জমান তোমার দুটো পা আঁকড়ে ধরে আমিও সানন্দে ধ্বংসের গভীরে চলে যাবো। যেতে যেতে, বড় জোর তোমার নূপুরহারা পায়ের গোছ দেখে বলে উঠবো, আজ আর কোনো কথা তুমি আমাকে বলো না।

॥ সঞ্চারী ॥

মিথ্যে বলবো কেন, মাঝে মাঝে নিজের ছোট খাটো সাফল্যে আমি বেশ

পুলকিত বোধ করি। গগনের মতো না হোক, আমি যে একেবারেই পারি নি, তা নয়। সঠিক মুহূর্তে, উষা যেমনটা বলে দিয়েছিল, সেফ্‌টি সরে আসতে আমার কোনো ভুল হয় নি। চকিতে ভিজে হাত মুঠো করে, যেন নিপুণ সাপ ধরা, আমি উঠে বসি। এবং ফুলকাটা বেডসীট বাঁচিয়ে, বাঁ হাতে মশারী ফাঁক করে খাট থেকে নেমে আসি। সেদিন সামান্য কুঁজো হয়ে আমার ঐ নেমে আসা দেখলে, আমি জানি, অনিবার্য ভাবে আপনার মনে হতো, কক্ষনো এই প্রথম নয়। যে এর আগেও, এইভাবে, হাজার বার নেমে এসেছি আমি। হাজার হাজার বার নেমে আসতে হয়েছে আমাকে। তারপর, লাগোয়া বাথরুমের অত্যুজ্জ্বল বেসিনের ট্যাপের নিচে মুঠো খুলে, রক্তাক্ত মুঠো খুলে দেখতে হয়েছে, জল ঝরছে। কত সহজে, ধুয়ে মুছে, এক থেকে আবারো অন্য এক শূন্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে আমার সজাগ করতল।

॥ আভোগ ॥

মনে পড়ে, সেদিন আমাদের অ্যাটাচড বাথরুমের আলো জ্বালা ছিল সারারাত। দরজা ছিল অল্প ফাঁক করা। আর উত্তরের জানলার সার্সির কাঁচ সামান্য ভাঙা ছিল, ভোর রাতে সজল শাল জঙ্গলের দিক থেকে ফুরফুর করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসেছিল চমৎকার।

বরুণ চৌধুরী

ভাই ভাই ভাই

শুধু শুধু বিচ্ছিরি বেলা হয়ে গেল। কে আর এত বেলায় অফিস যায়। একদিন ছিল যখন এরকম দু-একটা ফাউ ছুটির লোভে দুজনেরই কত ছোঁক ছোঁক। তখন কিছুই শুধু শুধু মনে হতো না। কালীপুজোর দিন তিনেক পরেই হবে। কলকাতার সন্ধেগুলো তখনও কিছু কিছু ফেরারি কালীপটকার দাপটে চমকে ওঠে। বারুদের সঙ্গে বাতাস ভারী। থুরথুরে শীতার্ত অন্ধকার ফুটপাথে দম টানে। কাছে দূরে ঠাকুর ভাসানের হল্লা, কাঁসর। বেলা বাড়লেও রোদে তাত নেই। বেমক্কা উত্তুরে বাতাসে টেরি নষ্ট। আলোয় হলুদ পাতিনেবুর ফুর্তি। এমন দিনেও কলকাতাকে গাল পাড়ার মত বাঙালির অভাব নেই। তারা নিশ্চয়ই এ্যামেরিকান শ্যাম্পুর কাটতি বাড়াতে প্রচুর ভারতীয় উকুন এক্সপোর্ট করে। তারপর কলকাতায় ফেরার আর তেমন ফুরসুৎ পায় না। এমনই একটি মুড়মুড়ে সকালে ভিক্টোরিয়ার মাঠে অরবিন্দকে দময়ন্তীর প্রশ্ন,

—তোমার কাছে পুলিশ হাত করার লোক আছে?

তিরিশ ডিগ্রি ঘাড় কাৎ করে অরবিন্দ জানায়,

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ।

দামাল বাতাসে দময়ন্তীর গলায় অস্থির আলোছায়া,

—তিনি কিনি জানতে পারি?

এবার বড় পোষমানা গলায় অরবিন্দ উত্তর দেয়,

—পুলিশের তাবৎ হোমড়া চোমড়া যাদের কব্জায় এমন অন্তত তিন-জনকে আমি বিলক্ষণ চিনি। তাদের দুজন পুরুষ আর বাকিটি একজন কুচকুচে কালো জাঁদরেল মহিলা।

পায়ের নিচে দু-চারটে ঝরাপাতায় কাদা। শাড়ির মনে নোংরা লাগার ভয়। পরিষ্কার রাস্তায় পা-দিতে উদগ্রীব দময়ন্তী অধৈর্য গলায় জানতে চায় তারা কে। রাস্তায় ওঠার তখনও দু-তিন পা বাকি হঠাৎ পায়ের চটি ছুঁড়ে অরবিন্দ ইংরেজ আমলের একটা মেহগনির গুঁড়িতে এমন ভাবে গা

ছেড়ে দিল যেন সারা শহর চষে়ে তেত্রিশ সপ্তা পর এইমাত্র একটা মনোমত ফুরফুরে ফ্ল্যাট পেল। এবার ধীরে সুস্থে এমন তিনজনের নাম বলল যাদের হাতে সত্যিই বহু কেষ্ট বিষ্টুর টিকি বাঁধা। —প্রথম রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় জন সাইবাবা এবং তৃতীয় সেই ঘুটঘুটে মহিলাটি স্বয়ং মা-কালী। এঁদের যে কোনো একজনকে হাত করলেই কেল্লা ফতে।

সামনেই পরিষ্কার রাস্তা অথচ ওখানে উঠতে না পেরে তিতিবিরক্ত দময়ন্তী বলে, 'জানতাম তুমি ঐধরনের হাজেবাজে একটা কিছু বলবে। কিন্তু বেছে বেছে কালীর ওপর তোমার এত রাগ কেন, উনি মেয়েমানুষ বলে?' অরবিন্দ হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে যায়। নিস্তেজ গলায় বলে, 'শোনো আমরা কিন্তু নিজেদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এমন আবোল-তাবোল প্রশ্নের উত্তর মুস্কিল। মা-কালীর সঙ্গে আমার ব্যাপারটা একান্ত ব্যক্তিগত আর বেশ কিছুটা দুঃখ-কষ্টের। নাইবা শুনলে।' 'কেন, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কোনো অধিকার নেই বুঝি?' 'নাঃ, তা কেন। আসলে প্যানপ্যানানি কার আর ভাল লাগে। সবাই মজলিসি মানুষ পছন্দ করে। দুঃখের কচকচি থাকলে সিনেমা হলে চামচিকি ওড়ে, রগরগে প্রেম না থাকলে গল্প উপন্যাস জমে না। এই জন্যেই প্রসঙ্গটা চেপে যেতে চেয়েছিলাম। যখন ছাড়বে না তখন বলেই ফেলি।

'সেটাও ছিল এমনি কালীপুজোর কলকাতা।

চারদিকে প্রচণ্ড বোমা-দোদমার শব্দে আমার বাবা মৃত্যুশয্যায়, ছটফট করছেন। শেষ দিন-তিনেক কোনো জ্ঞান নেই। পুরো কোমা। ঐ নিরেট আচ্ছন্নতার মধ্যেও একটার পর একটা পিলে ফাটা আওয়াজে বাবার কানের চামড়া থ্যাঁতলান আবশোলার মত কাঁপছে। ঠোঁট বেঁকে ভুরু কুঁচকে সে এক কিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। গলির ওপর বাবার মাথার কাছে জানলাটা অন্তত ছেড়ে করতে পারে [হঠাৎ একটা খিস্তির সর্দি আটকে যায় অরবিন্দর গলায়। সে গলা ঝাড়ার চেষ্টা করে। পরক্ষণেই দুটো মিলিয়ে বিড়বিড় করে—বাবার শেষ ঘুমের অন্ধকার করিডরটা শান্তিময় হোক এটা কোন হারামির বাচ্চা না চায়! মুখে বলে,] সব উঠতি মস্তান। কিছু বললেই যাতা আওয়াজ দেবে। আট বছর কেটে গেল এখনো বাবার সেই ঠোঁট বেঁকা কষের লালার দলাপাকানো মুখটা ভাসে। তখন যাকে নিয়ে এত বোমাবাজী সেই ঘুটঘুটে মহিলার ওপরেই ঝালটা পড়ে। এটাই আমার ব্যক্তিগত এলিজি। ছাড়ো, তুমি কিন্তু এখনো

বললে না যে পুলিশকে হাত করতে চাও কেন।'

মাথা না তুলে দময়ন্তী সটান উত্তর দেয়,

'তোমাকে খুন করে যাতে জেল না হয় সেই জন্যে।'

বসছে না দময়ন্তী। হয়ত বসবেও না। শুকনো পাতার রাজত্বে এলোমেলো ঘুরছে, গুনগুনোচ্ছে। খর বাতাসে অজস্র কঙ্কাল পাতার ছায়ানাচ। তার মধ্যে বহুদূরের এক দময়ন্তীর মুখ দেখতে পায় অরবিন্দ।

২

এম. ডি.র ঘরেই রবি পোদ্দার। সরাসরি অনুরোধ রাখলেন যে মেয়েটিকে একটু দেখলে উনি খুশি হবেন। এটা যে অনুরোধ না সেটা খুবই স্পষ্ট। অন্য সবাইকে টপকে, হাঁটু ভেঙ্গে ঘাড়গুঁজে কনুইয়ের নুনছাল তুলে মেয়েটির তোয়াজ চাই। এরপর স্বয়ং দময়ন্তী যেদিন অরবিন্দর সামনের চেয়ারে বসল সেদিনই প্রথম অরবিন্দ নিজের দিকে তাকিয়ে সিঁটিয়ে গেল। দামী ঝকঝকে জাপানী ক্যামেরার চোখে দময়ন্তী তার দিকে তাকিয়ে। ওর কচি পেঁয়াজকলি নাক। কপালের প্রশস্ত হাইওয়েতে নির্জন' সবুজ টিপ। অরবিন্দর রেকসিন ছেঁড়া চেয়ার। ঘোলাটে মোটা কাঁচের গেলাসে মাছি। চায়ের কাপ থেকে টেবিল ভর্তি ছুলির দাগ। ভাঙা প্লাস্টিকের কৌটায় কিছু মনমরা আলপিন। নোংরা দড়িবাঁধা বয়স্ক ফাইল থেকে চোখ তোলে অরবিন্দ। সেই জাপানী ক্যামেরার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে জীবনে প্রথম অনুভব করে তার চাকরিটা পতপতে। অবশ্য চাকরি যত সুখেরই হোক, সবই তো সেই গুবরে পোকার জীবন। উল্টে শুইয়ে দিলে কোনদিন সোজা হওয়া যায় না। বাপ-মা দু-দুটো পড়ুয়া ভাই—কাঁধে ঝক্কি কম না। কিন্তু নিজের এমন জগাখিচুড়ি অন্ধকার আগে কেন যে চোখে পড়ে নি। খানিকটা নিশ্চয়ই কাঁচা বয়সের জোর যা মানুষকে সমস্ত বেয়াড়া ঢেউ তুচ্ছ করতে সাহায্য করে। আগে আগে মেয়ে দেখলেই মনে হতো ঐ পথে খানিক হাঁটলেই বালিকা নদীর দেখা পাওয়া যাবে—তীর জোড়া সবুজ সংসারী ছায়া। একদিন দময়ন্তীও নিশ্চয়ই অরবিন্দকে খুঁজে ছিল। সেই চিরকিশোরের ছবি।

বুটে কাঁচা বয়সের কাদা, পকেট ছেঁড়া জার্সির আড়ালে মস্ত ছাতি, স্বাস্থ্যকর ঘামের ফোঁটায় সারা কলকাতা জিতে নেবার স্পর্ধা। কিন্তু কোথায় কি। পুরনো ছবিতে যেভাবে লোনা লাগে, কৈশোরের নাক-থুতনি ধ্বসে যায়, চোখের তারা সরে যায়, একদিন সেভাবেই স্বপ্ন সাধ....। দুজনেরই নিশ্চিন্দিপুর লোক্যাল সেসব মাঠকাদার সবুজ স্টেশন পেছনে ছেড়ে এসেছে। মাত্র আঠাশেই অরবিন্দ দেখল দময়ন্তীর চেয়ারে বসে আছে লেডিস ফোল্ডিং ছাতা হাতে নিতান্ত স্যাঁতস্যাঁতে এক মহিলা। আর মাত্র ছাব্বিশেই দময়ন্তী দেখল, আরো বিশবছর পরের এক বয়স্ক তরুণকে চাপা অম্বলে যার দাঁত ক্ষয়ে গেছে, গাল তুবড়ে পানিফল। নিজেদের বিশ বছরের পুরনো এই গেরস্ত ছবি দেখে ওরা কি শিউরে উঠলো ? বোঝা যায় না। অরবিন্দর ছোট্ট অস্থায়ী দীর্ঘশ্বাস শুধু জানাল স্বাভাবিক সুখী যুবক বলতে যা বোঝায় অনেক দিন থেকেই সে হয়ত আর তা নয়। যদিও অরবিন্দর তাজা ঝরঝরে শরীরটা এখনো দিব্যি লিকলিকে চাবির চেনে দময়ন্তীর সারা দেহে পাক দিতে পারে।

৩

অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে ভুজাওয়ালার উনুনটার পাশে দময়ন্তী দাঁড়িয়ে। তোলা উনুনের ফিকে আঁচে তখন বালির ওপর গরম প্রতীক্ষা। অরবিন্দর স্কুটার দেরি করবেই। দময়ন্তী অভিমানে চোখ কুঁচকে জিভ কাটবে। গ্লাভসমোড়া ভাল্লুকের থাবায় জামা ভিজে। আসার সময় দময়ন্তীরই দেরি। মাকে নিয়ে ঝামেলা। বুড়োদের যা হয়। হাজারটা অনুযোগ, বুকের মধ্যে ছেঁড়া কাগজের পাহাড়। ঠিক বেরুবার মুখেই পাশের ঘরে তক্তপোষ থেকে বুড়ির নাগাড়ে কুঁইকুঁই। চুন খয়ের নেই. ইসবগুল ফুরিয়ে গেছে। ইসবগুল না খেলে মোটে পায়খানা হয় না। নারকোল তেল ঢু ঢু, চাঁদিতে তেল না পড়লে মাথা ঝাঁঝাঁ করে। হিটারে তার গেছে, সতরঞ্চি ছিঁড়ে ধুলধাবড়ি। ওফ্, ছুটন্ত বাসে রেজকি খোঁজার ঝকমারি যদি অথর্ব বুড়োরা বুঝত। কোথায় হিটার কয়েল আর কোথায় সতরঞ্চি। স্রেফ টিকে থাকতেই কালঘাম ছুটে যায়। চুলের মত সরু সরু ট্রানজিসটারে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা এক একটা দিন। তার একটি চুল ছিঁড়লে রোজকার রেডিও বাজবে না। অথচ মাথায় চিরুনি ছোঁয়ালেই

হুসহুস চুল উঠে একদা রাত্তিরের আয়নায় কান্না পায় দময়ন্তীর।

আর কবছর আগেও দময়ন্তীর চোখে কেউ এক মিনিটের মেঘ দেখে নি। ওর লম্বা ঘাড় গলায় অরবিন্দর লোলুপ দৃষ্টি। অনেক মেয়েরই লম্বা গলা, কিন্তু খাঁজে কালো ময়লার ছোপ। এ মেয়েটির গলা কিন্তু শীতের কচি গাজর! শুধু নুনের অপেক্ষা। স্কুটারের পিঠে বাঁধা দময়ন্তী সমেত ট্র্যাফিকলাইটে থামে অরবিন্দ। পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'নুন দিয়ে কচি গলা-ভাঙা কেমন জানো?'

'ভাল কিছু দেখলেই খেতে ইচ্ছে হয়?'

'আমার একটু খাই খাই রোগ। তোমাদের রবি পোদ্দারের মিনমিনে ভদ্রতা আমার একদম আসে না। তোমার লম্বা গলা দেখে রবিদা হয়ত বলতেন, আহা এমন গলা শুধু বাটনহোলের গোলাপ কুঁড়ির মত শুঁকতে হয়। এমন ন্যাকামি আমার বয়সে আসেনা।'

একটা কুইন সাইজ হাই তুলতে গিয়ে থমকে যায় দময়ন্তী। পাশেই মিনির জানলায় সরু গোঁফওলা একজোড়া হ্যাংলা চোখ। ফুলো ঠোঁটের লিপস্টিক-লাল গলিপথে একটা লোভী বোলতা। হাইটাকে দময়ন্তী অরবিন্দর পিঠেই টিপে মারে। ওর ঘাড়ে গোলাপী নোখ ফুটিয়ে তাড়া লাগায়। 'এই চলো আলো কখন সবুজ হয়ে গেছে, এবার পেছন থেকে ডবলডেকার গুঁতোবে।' আসলে দময়ন্তী চাইছিল রবি পোদ্দারের খানাখন্দ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। হ্যান্ডেলে দেড় প্যাঁচ, রয়েল টার্টুর ছুট। পেছনে পড়ে থাকে রবি পোদ্দার-মোড়। অরবিন্দ স্কুটারের নাম দিয়েছে পৃথিরাজের ঘোড়া, পিঠে স্বয়ং সংযুক্তা।

৪

আগে আগে দেরি হলেও পাঁচটার মধ্যে একটা ফোন ঠিকই আসত। দেরির জন্যে কাচুমাচু অরবিন্দ। সংযুক্তাকে উদ্ধার করতে রোজই হাজির ডালহাউসির পৃথিরাজ। কিন্তু সেই থেকেই রবি পোদ্দারকে নিয়ে বিশ্রী সব গিঁটপড়া শুরু। অরবিন্দ জট খুলতে পারে নি, শুধু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তখন থেকেই দময়ন্তীর জগদ্দল প্রতীক্ষা।

ফোন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুলে ফোস্কা, অরবিন্দর সাড়া নেই। দৈবাৎ সাড়া পেলেও অসম্ভব বাতিনেভা গলা। দময়ন্তী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই

অরবিন্দ যাতা উল্টো-পাল্টা ভাবতে শুরু করেছে। তার প্রায়ই কেমন মনে হয় দময়ন্তীর মত স্মার্ট মেয়েরা নিজেদের কেরিয়ারের ধান্দাতেই উন্মুখ। উঁচু ডালের পাখি ধরার তাল। যাদের ভড়ং বেশি, চেলাচামুণ্ড পরিবৃত, পেছনে বিজ্ঞাপনের গনগনে ধ্বনি সেখানেই এমন মেয়ে হামলে পড়ে। ইচ্ছা থাকলেও আজকাল আর তোমার কাছে আসতে মন সরে না দময়ন্তী। অনেক স্বাক্ষরহীন বেনামী চুমুর স্মৃতি আমার বুকে জমা। বকেয়া বাড়ি-ভাড়ার সঙ্গে জমা আরো কত ভালোবাসার ঋণ। তোমার ভালোবাসার পশম জড়িয়ে থাকে আমার পাঁজরের শীত। তোমারি পছন্দে কেনা আমার চশমার ফ্রেম। তুমি ছাড়া আমি দূরদৃষ্টিহীন। কিন্তু আমাদের দুজনের খরাবন্যার একান্ত ফ্ল্যাটে আমি কোনোদিনই তৃতীয় ব্যক্তি চাই না, চাই না বাইরের কোন কর্কশ হাত। পরপর তিন দিন বিকেলে ফোন করেছিলাম তোমায়। তোমার এতো নির্জীব গলা জীবনে কখনও শুনিনি। বাসি ভাতের থেকে ঠাণ্ডা। দুবারই জানালে ফ্রি নেই। রবিদা'র সঙ্গে কি সব নাটক, গানের আসর, ছবির প্রদর্শনী। শেষবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম কাকে যেন শিখিয়ে দিলে সীটে নেই বলতে। কত সহজে ভেঙে ফেলা যায় পুরোনো দালান-বাড়ি, নাটমঞ্চ। অথচ মানুষ ভাবে ঘরবাড়ি মানেই চিরকালের। নিঃশব্দ কুয়াশার মত আমি মিলিয়ে যাব তোমার রানওয়ে থেকে। তুমি খুশিমত উড়ে যেতে পার যত উঁচুতে খুসি। হয়ত আর ফোনেও পাবে না আমায়।

ডালহাউসির সংযুক্তা উদ্ধারে আর আসবে না পৃথ্বিরাজের ঘোড়া। অস্থির হবে মন। কয়েকটা দিন ছটফট করবে, কয়েক মাস রক্তে চিনচিন করবে প্রতীক্ষা। তারপর যেভাবে পাতা ঝরে, মোবিল পোড়ে, মাথা থেকে স্টিলহেলমেট খসে যায়, সেভাবেই একদিন আমাদের ভালোবাসা ঝরে যাবে। সমস্ত দুঃখ শোকই একদিন গা-সওয়া হয়ে যায়। আমি ঠিকানা বদল করব অথচ নতুন ফ্ল্যাটের ঠিকানা কেউ খুঁজে পাবে না। নিভে যাবে টেবিলল্যাম্প। ভালবাসার ডেড লেটার অফিসে জমা থাকবে তোমার স্মৃতি, চিঠি, অভিমান। আমি কোনো দিনই রবি পোদ্দার হতে চাই না। তার জন্যে নিশ্চয়ই ঘাম লাগে, রক্ত—এমন কি হয়ত খানিকটা প্রতিভাও লাগে। কিন্তু প্রতিভা বেশি দিন না। প্রথম দিকটায় দারুণ ঝকঝকে। পরে বয়েসের মরচে ধরে, নানা গাফিলতি। ক্রমশ কখন থেকে যে কমে আসে দীপ্তি, শিখা শুধু কালি, তা টেরই পাওয়া যায় না। রবি পোদ্দারের মত আমিও একটা

বড় ফার্মে এঁকেই পেট চালাই। নামী শিল্পী না হলেও ব্যাপারটা একটু আধটু বুঝি। শিল্পের মাল্টিস্টোরিড কাঠামোয় গোলমাল অনেক। ওখানেও হিংসের জটিল অন্ধকার, ব্যর্থতার লোডশেডিং। লম্বা কমিটি মিটিং। দীর্ঘকাল ওপরে ওঠার সব লিফট বন্ধ। হাজার মাথা ফাটালেও আমি আর ওপরে উঠতে পারব না। কিন্তু তার জন্যে কারুর বিরুদ্ধে আমার হিংসে নেই। নিজের কাছেও কোনো আক্ষেপ নেই। আমি আমার নিজস্ব বিশ্বাস এবং ক্ষুদ্র হাত নিয়ে বিরলে বেঁচে থাকতে চাই। জোট বাঁধায় বিশ্বাস করি না।

এদেশে জোট বাঁধায় শুধু ভোট জোটে। ব্যক্তিগত মুনাফা আর ঢাক-পেটা ছাড়া অন্য কিছুই সম্ভব নয়। দলগতভাবে আমরা চিরকালই অপটু। এসব কারণেই আমি রবি পোদ্দারের দলে ভিড়ি না। মেকদার মানুষ কিংবা সর্বশক্তিমান ভগবানের বদলে আমি ধলভূমগড়ের নিঃসঙ্গ চাওলা খুঁজে বেড়াই। না পেলে জানব আমার তরে রাতি ॥

৫

খর বাতাস আর ট্রাফিকের শব্দে অরবিন্দর একটি কথাও শুনতে পায়না দময়ন্তী। তার নিজেরও অনেক কথা ছিল। সেসব অজস্র কথার তোড়ে চাপা পড়ে যায় অরবিন্দর কণ্ঠস্বর। তুমি আমার কিছুই জান না অরবিন্দ। জান না কত জ্বলে পুড়ে আজ আমি খাক হয়ে গেছি। কত কষ্টে তিলে তিলে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি তোমার থেকে। দিনের পর দিন তোমার জন্যে অফিস ছুটির পর প্রতীক্ষা। প্রতিটি মুহূর্তে ভেবেছি এই বুঝি তোমার ফোন এলো। অসহ্য লোডশেডিং। ঝলসান অন্ধকার। উৎকট গরমে শরীরটা কুকারে সেদ্ধ একতাল মাংস। আমার এই শরীর যাতে তুমি শীতের কচি গাজরের মত দাঁত বসাতে চাও। এই শরীর যাতে তুমি তাজা কেকবিস্কুটের গন্ধ খোঁজ। হায়রে, কোনো বন্ধ বাড়ির মিটশেফে ফেলে যাওয়া আধখানা পাঁউরুটির কান্না শুনেছ কখনও? অফিসের জানালায় অশ্বত্থগাছটা রক্তশূন্য হলুদ চোখে ধুঁকছে। চারিদিকে হাজার জেনারেটারের বিকট কানফাটানো আওয়াজ। ডিজেল পোড়া ধোঁয়ায় দম আটকে আসে। সারাদিন কথা বেচে, নানা মানুষের মন যোগাতে কি যে ক্লান্তি। তারপর একজনের জন্যে প্রতীক্ষায় জ্বলন্ত এক একটা মিনিট।

মনে হয় মাথা ছিঁড়ে যাবে। এই সময় বাসে চাপার কথা ভাবলে জিভ শুকিয়ে আসে। রক্তের ভেতরেই যেন ডিজেল পুড়ছে। ভুজাওলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয় সেও কেমন যেন টিটকিরিমেশা চোখে তাকাচ্ছে—পাশে ফটফটি বাবুটি নেই।

অনেক আগেই অনুভব করেছি তোমার ভালবাসায় একদিকে যেমন দুরন্ত টান, অন্যদিকে তেমনি কোথায় যেন হাফ-ব্রেক। তোমার রবারের মত শরীর, পাতলা চিবুকে শিশুর দুধতোলা হাসি—এসব দিয়ে তুমি আমায় লোভ দেখাবে, ক্রমাগত কাছে টানবে অথচ আশ্রয় দেবে না কোনদিন। তোমার বাঁশির একটু শব্দেই আমি যেভাবে মুগ্ধ ফণা দোলাই, সেটাই তোমার তৃপ্তি, বিরাট আত্ম-সুখ। তোমার নেশায় তিলে তিলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছি। সাংঘাতিকভাবে নির্ভর করতে চেয়েছি তোমাকে। মায়ের এটা-সেটা, নিজের টুকিটাকি, যাওয়া-আসার স্কুটার—সবকিছুর জন্যে রোজ প্রতিমুহূর্তে তুমি। দিনে দিনে তোমাতে এতবেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এত পাগলের মত জড়িয়ে পড়েছিলাম, যে একদিন তোমাকে হারালে চোখে অন্ধকার দেখতাম। হয়ত এটাই তুমি চেয়েছিলে। ভেতর থেকে অতিসন্তর্পণে ভিৎ আলগা করা। অন্যদিকে একটা ভোঁতা নিষ্ঠুর বুদ্ধি দিয়ে তুমি এটাও জানতে যে আমাকে আর বেশি এগুতে দেওয়া মানে আমি ঘাড়ে পড়তে পারি। সুতরাং তুমি এমন একটা মাঝপথে থামিয়ে রাখলে, ঝুলিয়ে রাখলে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় যাতে কোনো দিনই আমার ভার নিতে না হয়। কিন্তু তোমার সব সতর্কতা সত্ত্বেও হয়ত একটা সামান্য ব্যাপার খেয়াল করনি। মেয়েরা পুরুষের এসব ফিনফিনে খাঁচা খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পায়। অনেক সময় সব বুঝেও চোখ বুজে থাকে। বাবার এরকম একটি চোট্ট চালাকি আমি ষোলয় পা দিয়েই বুঝেছিলাম। আমার বিয়ে নিয়ে বাবা মায়ের প্রায়ই খিটিমিটি। মাকে বাবা বোঝাতেন, অফিসের ঘোষালবাবুর হাতে নাকি বনেদি পাত্রের ছড়াছড়ি। তবে এখুনি বিয়ে-থার হুজুগ ঢুকলে মেয়ের লেখাপড়া মাথায় উঠবে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে যত ভালই বিয়ে দাও, মেয়ে নিজের পায়ে না দাঁড়ালে স্বস্তি নেই। বয়সের তুলনায় আমার বাড়-বেশি ভরাট চেহারার দিকে আলগোছে তাকিয়ে মা প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস চাপতেন। এরপর একদিন আমি নিজে নিজেই জেনে গেলাম টাকা খরচের ভয়ে আমার বিয়ের ব্যাপারটা বাবা মোটেই আমল দিতে চান না! ফলে বাবার অক্ষমতায় বিয়ে আমার কোনো

দিনই হবে না। অথচ এই বাবাই ছিলেন জীবনের সব কিছু। অন্ধকারে চেনা সিঁড়ির মত চোখ বুঁজে নির্ভর করতাম তাঁর ওপর।

আজ কতদিন বাবা নেই— ভালবাসা মাপা ফিতেটা কিন্তু রয়েই গেছে। তাতে একদিন জেনে গেলাম তোমার মন নেই। ভালবাসার স্বপ্নে বারবার একটি কণিষ্কের ছবি ফুটে উঠতো, স্কুটারের পিঠে মুণ্ডুহীন খেলোয়াড়ের ভঙ্গীতে সে বার বার আমার পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছে। যদিও তোমার পাশ কাটাবার কায়দা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর মত। তুমি নিজেই একদিন বলেছিলে ভালবাসাকেই তুমি মাথার মুকুট করতে চাও। মেয়েদের তুমি নিছক দরকারী এ্যাসট্রে হিসাবে দেখতে চাও না। মেয়েরা নাকি তার অনেক ঊর্ধে (!)। মাঝে মাঝে সব রকম দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে বেশ কিছু দিন ডুব মারতে। আবার যেদিন হঠাৎ উদয় হতে সেদিন একটু অস্বাভাবিক দরদী। মনে মনে হাসতাম। দু একটি উঁচু ডালের বন্ধু, দময়ন্তী নামে একটি বিচ্যুত লতা—এদের মধ্যেই তোমার ঘোরাফেরা। শিককাবাবের শিকটা মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে দেখে নিতে আস যে প্রত্যেকটা মাংসের টুকরো ঠিকঠাক ঝলসাচ্ছে কিনা। তবে মনে মনে তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারতাম না। তোমার প্রেমে যখন আমি হাবুডুবু খাচ্ছি, হারিয়ে গেছি কতদূর, তখন যথেষ্ট গভীরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তুমি আমায় কোনো সন্তান উপহার দাওনি। বদলে একটা দামী ডট্পেন উপহার দিয়েছ। এটাই আমাদের ভালবাসাবাসির নেট লাভ এবং এটাই তোমার সুবুদ্ধির সব থেকে বড় স্মারক চিহ্ন। আর আটবছর পরেও যখন তোমার দেওয়া ডটপেনে নিজের ফুটফুটে সই দেখি তখন বার বার মনে হয় নিজের আট বছরের অবৈধ সন্তানের মুখ দেখার থেকে তা ঢের ভাল। এটা তোমার কম বুদ্ধির পরিচয় না। কিন্তু মেয়েদের অন্য একটা মুস্কিল আছে। 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও' ওসব সংলাপে ভগবানের সঙ্গে চমৎকার টেবল্-টক্ চলে, কিন্তু রক্ত-মাংসের প্রেমে পার্টটাইম চাকরিবাকরি অচল। অরবিন্দ একমাত্র তুমিই হয়ত আমায় কিছুটা ভালবাসতে চেয়েছিলে, পেরেছিলে কিনা আজও জানি না। যখন তুমি আমায় দামী ঠাণ্ডা ধপধপে অন্ধকার হোটেল-রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে প্রথম প্রথম গা-কর্কর করত। তোমার আমার মাঝখানে কেটলি ভরা সুগন্ধী উষ্ণতায় কথা সরত না। ছুঁতে আঙুলের চামড়া কুঁচকে যেত। পরে জানলাম সবই অফিসের একসপেন্স একাউণ্টে; প্রতিটি ভাউচার তুমি সযত্নে ব্রিফকেসে ঢোকাও।

কিন্তু নিছক একসপেন্স একাউণ্টে কতদিন মহত্ত্ব টেঁকে জানতে লোভ হতো। তোমার স্লিম, ট্রিম ব্রিফকেশটার মুখে স্টেনলেস্ স্টিলের চাবি। মুখ বন্ধ।

তোমার আরেকটা ভুল আমি ইচ্ছে করেই ভাঙিনি। আমি মাঝে মাঝে রবিদার কাছে যেতাম স্রেফ থিয়েটারের কার্ড ম্যানেজ করতে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের জন্য আমি পাগল। রবিদার কাছে আমার অমন বহু ছেলেবেলার আদর আবদার। রবিদাকে তুমি কতটুকু চেনো জানি না। আমি ওকে সেই রুক্ষ বেকার দিনগুলো থেকে চিনি যখন ভরপেট লাঞ্চ বলতে চারমিনার আর চিনেবাদাম। একগাল দাড়ি নিয়ে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসত। একা একা আনমনা ঠোঁট কামড়াত। খেয়াল হলে সেই ঝলমলে হাসি যেন পাতলা গেলাসে আইসক্রিম সোডার ফেনা। প্রচণ্ড খিদে আর আত্মবিশ্বাসই তখন রবিদার একমাত্র পুঁজি। হঠাৎ দেখা হলে ঠাট্টা করতেন। বলতেন, সূর্য থেকে দূরে সরে গেলে নিজেই শীত পাবে, সূর্যের কিছুই যাবে আসবে না। আমাকে ঘিরে প্রচুর চাঁদ-তারা। ফালতু অভিমান নিয়ে দূরে থাকলে তুমি নিজেই ঠকবে দময়ন্তী। আমি কোন-দিনই কাউকে যেচে ডাকি না। কোনো ঠাকুরদেবতাকেও না। বলেই সেই হাসি। আইসক্রিম সোডার ফেনা। বললেন, দাক্ষিণাত্যে মন্দিরের নক্সার কাজে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। ওখান থেকে ভারতবর্ষের সব থেকে বড়লোক দেবতা তিরুপতির মন্দির। তেল ঘি ধূপধুনো আর লালচাঁপার দমবন্ধ অন্ধকারে সেদিন ঐ সর্বশক্তিমান দেবতার কাছে কি চেয়েছিলাম জানো দময়ন্তী? কোনো হাতি বাঁধা রাজপ্রাসাদ না, জিনাতের কোমর না, একফোঁটা কহিনুর ধোয়া জল না। ছেলের চাকরি মেয়ের সুপাত্র—সেসব কিচ্ছু না। আমার ছেলেবেলায় হারিয়ে যাওয়া একটা খাতা ফেরত পাওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। খাতাটায় কি ছিল জান? চিনু নামে একটি বালিকাকে তার সদ্য ওঠা বুক দেখাতে বলেছিলাম। চিনু দু আঙুলের সেফটিফিনে বুক আড়াল দিয়ে আমায় জিভ ভেঙিয়েছিল। সেই ছবিটা ছিল আমার জীবনে কার্টুন তৈরীর প্রথম চেষ্টা। অরবিন্দ, আমি রবিদার হয়ে ভোট ক্যানভাসে বেরুই নি। তার তোয়াক্কাও করেন না রবিদা। হাজার দোষ থাকলেও লোকটার একটা মজা আছে। হাতপাতা ব্যাপারটা একদম বোঝেন না, হাজার ঠেকায় পড়লেও কারুর কাছে হাত পাতেন না। এমন মানুষ তো এখন স্মল পক্স জীবাণুর থেকেও দুষ্প্রাপ্য। এটাই ভীষণ

টানত। তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু আসলে রবিদার কাছে যাওয়ার সময়ই পেতাম না। প্রায়ই তোমাকে মিথ্যে বানিয়ে বলতাম। বোঝবার চেষ্টা করতাম তোমার রোঁয়া একটুও ফোলে কিনা। কিন্তু দেখতাম তুমি পাঁচমাথার মোড়ে ব্রোঞ্জের ঘোড়া হয়ে গেছ। তোমার কেশর আর হাওয়ায় ওড়ে না। তবু তোমারই জন্য কেন যে শবরীর প্রতীক্ষা। হয়ত হাতে হাত রাখার মত পাশে কেউ নেই বলেই। আমি ভাঙা গলায় সারাদিন কাঁদতাম আর বলতাম, আমাদের দেখা হতেই হবে অরবিন্দ। কত কথা বাকি। কথা থেমে গেলে, দেখা বন্ধ হলে, দুজনের মধ্যে ভুল অন্ধকার বাড়বে। অনেক ভুল বোঝাবুঝি। মিথ্যে রাগ, বানানো অভিমানে উল্টো দাঁড় টেনে দুজনে দুজনের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাব। দেখা হলে কেউ কারুকে সেভাবে চিনতেও পারব না। শেষ যেদিন তুমি ফোন করলে আমি মনে সেদিন প্রায় স্থির ছিলাম যে দেখা হলে অনেক কথা হবে, হয়ত এবার সত্যিই ধরা দেবে তুমি। মাকেও মোটামুটি আভাস দিয়েছিলাম। বললাম ফিরতে দেরি হবে। সেদিনের যে তারিখ আজ আর নিশ্চয়ই মনে নেই তোমার। কারণ শেষ পর্যন্ত তুমি সেদিন এলেই না! একা একা বাসস্টপে বুকের ভেতর পর্যন্ত শীত ধরছিল। স্টপে একভিড় জটলার মধ্যে আমি একটা পাতাঝরা গাছের মত একা। তখনও শীত যায় নি, তারওপর টিপটিপে বৃষ্টি। গঙ্গাসাগর মেলার দিন দুয়েক পর। হু-হু উত্তুরে হাওয়ার দাপটে কলকাতার দাঁতে-দাঁত। স্পষ্ট মনে আছে সেটা ছিল মাঘ মাসের একটা শনিবার। বেরুবার সময় মেঘলা আকাশ দেখে মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল। মা অন্ধ হাতে মাথাটা থপাথপ চাপড়ে দিলেন। খনার বচন আওড়ালেন, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্যি দেশ। মাথাটা গেছে। কোথায় মাঘের শেষ তার নেই ঠিক। শনিবারটা আমার টিউশানির দিন।

পড়াতাম ঝুরুকে। ছোটবোন কুহু আর বছর পাঁচেকের ভাইটাও ওখানেই সারাক্ষণ ঘুরঘুর করত। ওদের বাবা রামজীবনবাবু যেমন বৌ-ন্যাওটা তেমনি ঘোর গেরস্ত। সংসারের যাবতীয় হ্যাপা সামাল দিতে তার জুড়ি নেই। মাথায় চুলের ঘাটতি, গায়ে কিন্তু লোমের জঙ্গলে শেয়াল লোকায়। গলায় সব সময় এমন একটা আশ্বাস যা শুনলেই বৌদি গলে জল। অনেক ভিয়েন তুলেছে—এমন হালুইকরের গলাতেই এ ধরনের আশ্বাস থাকে। রোগাটে চেহারা কিন্তু বৌ-তোয়াজী ভুঁড়িটি যাবে

কোথায়। ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে কুকুরভেজা হিম শরীরে দরজা ঠেলতে রামজীবন বাবুই দরজা খুলে দিলেন। আঃ, চারদিক বন্ধছন্দ ভেতরটা কি গরম। একটু যেন বেশি চুপচাপ। দরজাটা ভেজিয়ে দিতেই হুহু হাওয়ায় বৃষ্টির গোঙানি চুপ। আঃ, কি যে আরাম। 'ঝুরু ওরা বাড়ি নেই?' 'ইস, তুমি ভিজে একেবারে একসা—।'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। আমি আজ—।'

'আরে বসো, একটু চা খাও। আলনা থেকে অনিমার একটা শুকনো শাড়ি জড়িয়ে নেবে নাকি।' বাসে বাদুড়ঝোলা ভিড়ে ফেরার কথা ভাবতে গায়ে জ্বর আসছে! সেই বৃষ্টি-কাদা জঞ্জাল ঠাণ্ডা হাওয়া আর একতাল ভিজে মানুষের গাদাগাদি। হাঁটু বেয়ে অসহ্য ক্লান্তির মূলে গা-ভারী। চোখ বুজেই শুনতে পাচ্ছি পাশের ঘরে চায়ের টুংটাং জলতরঙ্গ। 'ঝুরু কুহুরা কেউ নেই বুঝি?' 'ওরা বিকেলে পাকপাড়ায় মামাবাড়ি গেছে।' বাবার বয়সী মানুষটা চা বানাবে আর আমি বসে বসে খাব? চবচবে ভিজে শরীরটা লোহার ট্রাঙ্কের থেকেও ভারী। কোনোক্রমে টেনে হিঁচড়ে সেটাকে পাশের ঘরে দাঁড় করাতেই রামজীবনবাবু হুমড়ি খেয়ে লোমশ-হাতে জাপটে ধরলেন। আচমকা উন্মাদ আক্রমণে বেটাল শরীরটা মাটিতে পড়ে গেল। লোকটার বয়স্ক পাকাপোক্ত চওড়া বুকে হাতে বোনা ক্যাটক্যাটে মোটা সোয়েটার। পশমের গরম থেকে ন্যাপথালিনের উগ্র গন্ধে সমস্ত বোধ অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এমন শীতে ন্যাপথালিন ঝেড়ে বৌদি হাতেবোনা জামাটা হয়ত নিজেই পরিয়ে দিয়েছিলেন। মাটিতে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে বেশ খানিক ধস্তাধস্তি—আনাড়ি ধরনের বাধা দেবার চেষ্টা। মুরগির পিঁজরেতে জবাইয়ের ঠিক আগে আর একটি বেকুব সন্ধ্যের ডানাঝটপট। প্রথম হ্যাঁচকাতেই ধূলিসাৎ। সব জারিজুরি নিষ্ফল। চোখের ওপর এত ভারী এক অনাত্মীয় অন্ধকার যা বৃষ্টির থেকে দুর্বোধ্য, ক্ষয়কারী। দময়ন্তীর শরীরের তলায় ঝুরু-কুহু-তনুর একগাদা ছাড়া ইজের জামা। ওদের ইস্কুল-পেনসিল-ঝগড়া-ঝালমুড়ি এবং চোখ-রগড়ানো কান্নার কাঁপাকাঁপা সাইরেন বাজছে সেই ছাড়া জামাকাপড়গুলো থেকে। কালো রোমশ আকাশের ভারী তলপেট থেকে আদিম বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি···। গঙ্গাসাগর মেলার স্নান সারা, যাত্রীরা ঘরে ফেরে। ধন্য রাজার পুণ্যদেশ। ঝুরু-কুহুরা মামার বাড়ি গেছে। তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই!

ভিক্টোরিয়ার মাঠে তখন দূর সাঁওতাল পরগনার বলবান রোদ। কত চেনা দুটি দেহের লুটোপুটিতে অভ্যস্থ এই অরবিন্দ দময়ন্তী জুটি। ওদের অবুঝ ওড়া উড়ি আর কিন্তু সে নির্জনতা খোঁজে না। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে আর সে শিরশিরে আগুন কই। দুজনের মধ্যে অনেক বোবা পাতার দুস্তর ব্যবধান। মাঘের সেই শনিবারে কত বৃষ্টি-কাদা ভেঙে যে দময়ন্তী ঘরে ফিরল, সে অরবিন্দ নামে কোনো লোককে আর যেন তেমন চেনে না। অরবিন্দ, তুমি বা তোমার স্লিম মুখটেপা ব্রিফকেস কেউই আর আমার পক্ষে কোনো খবর না।

রোজ সকালে নিজেকে বড় ব্যবহৃত মনে হয়। মনে হয় সবাই আমায় ব্যবহার করবে অথচ কেউ কোনো দিন ভালবাসবে না। কল্পনা করেছিলাম নতুন ফ্ল্যাট পেলে একদিন নিশ্চয়ই তুমি আমায় নিয়ে যাবে। মাকেও সেদিন জানিয়েছিলাম তুমি আসবে। ফিরতে দেরি হবে আমার। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে উল্লাসের রং-ছিটিয়ে খোলা ট্রাকে একটা পিকনিক-পার্টি চলে গেল। অরবিন্দর স্কুটারের আরামী সিট থেকে একটা বিমনা গিরগিটি অজস্র ঝরাপাতার আড়ালে চকিতে উধাও! কালীপুজো হয়ে গেছে তিনদিন আগে, তবু এখনও দু-একটা ভাসান, বাজি-পটকার জের। হ্যাঁ, ফিরতে দেরি হলো ঠিকই। ভিজে ঢোল, রং-চটা এ এক অন্য দময়ন্তী। তার শরীরের নোনা স্রোত বেয়ে দু-চোখে টলমলে লবণ-সমুদ্র। অন্ধকার তক্তপোষ থেকে মা জানতে চাইলেন সব ঠিক আছে কিনা। এ নিস্তারহীন আঁধারে কে কাকে সান্ত্বনা দেয়। ভিজে আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর লুকিয়ে দময়ন্তী কেবল ছোট্ট ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ, সব ঠিক আছে। মায়ের হাসি অন্ধকারে তেমন বোঝা যায় না।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সহোদর

হাঁড়িচাঁচা খাল সাঁড়াশির মতন গঞ্জটাকে কষে চেপে ধরেছে—তাই খালের গা বরাবর গঞ্জ। তাছাড়া ফি বুধবার হাট আছে। চামচ-ভর-বাজার। জয়নগর-মজিলপুর দুটো গাঁ খেয়ে কুল পায় না। আর খাবারই না কতরকম। শাক সবজির পাহাড়, মাছের আটচালা। গাঁ ভর্তি বাবু কছমের লোকজন। শ্রী-ই আলাদা। হঠাৎ কোত্থেকে যে কী হোল। শিয়ালদা থেকে বরাবর ইস্পাত বিছানো হলো মাইল বত্তিরিশ দক্ষিণমুখো, তামাম গাঁ উঠে এলো ইস্টিশনে—ইস্টিশন থেকে সোজা, নাকের সোজা খাস কলকাতা। আঁধার থাকতে-থাকতে সেই দুরন্ত সবজির পাহাড় আর মাছের আটচালাও ফাঁকা। বাবু কছমের লোকজন হপ্তায় ফেরে—তাও সিকি ভাগ, বাদ বাকি সব জালের বাদুড়—

আজ ভালো মনে নেই। একরত্তি বয়সে বাপ-মা হারিয়ে আশীর্ব্বাদ — কী ভাবে যেন এই এলাকায় ভেসে এসেছিলো সেই সুদূর ছাপরা জেলার গণ্ডগ্রাম থেকে। কী ভাবে এসেছিলো? পুরোটা মনে নেই, অল্পস্বল্প আছে। আজ সেই অল্পস্বল্প স্মৃতিতেও ক্ষয় লেগেছে। বয়েসও তো কম হোল না! চার কুড়ির কাছাকাছি। আশীর্ব্বাদ হাওড়ায় পা দেয়—তারপর কোন্ গোল দারের লরি চেপে সিধে এই গঞ্জ এলাকা। সেই থেকে আড়ত, আড়ত থেকে এদিক ওদিক ঘুরে আবার আড়ত, আড়ত থেকে হাঁড়িচাঁচা খালের চালানি নৌকো, নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে ধোপার কাজ। গাঁয়ের আশীর্ব্বাদ ধোপা।

কোনোদিনই আপনার বলতে কেউ নেই। আপনার বলতে কেউ থাকারই বা কী দরকার। ভাবে আশীর্ব্বাদ। বাবুদের ছাড়া-কাপড় সময় মতো পেলেই হলো। রেলের বিলে জল থাকলেই হলো। হাত দুটোয়

জরা না ধরলেই হলো। আপনার বলতে কেউ থাকারই বা কী দরকার? নিজে তো আছেই। রোগ-অসুখও নেই। কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত ইস্তিরি করে। আবার ভোর থাকতে উঠে রেলের বিলে চলে যায়। হাঁই হাঁই শব্দ করতে-করতে সূর্য মাথায় উঠলে পর হাত থামে। বাড়ি এসে দুমুঠো চাল ফুটিয়ে খেতে বসতে সেই সূর্য পশ্চিমের পাকুড় গাছটার খোলের ভেতর ঢোকে। আর খুঁজে পায় না আশীর্ব্বাদ—একসময় আগুন ধরে ওদিকপানের আকাশে। আশীর্ব্বাদ গাঁজার কলকেটায় প্রাণভরে টান মারে গুটিকয়। তারপর কাঁধে কাপড়ের গাঁটরি ফেলে পাড়ায় পাড়ায় চক্কর।

আশীর্ব্বাদের কাজ চোখ বুজে নেওয়া যায়। হিসেব পত্তর না রাখলেও কীভাবে মনে রাখে লোকটা ঠিকঠাক। ছেঁড়া-ফাড়া নেই। কাপড়ে গাঁথা চোরকাঁটা বা পাঁথি নেই। সব নিপুণভাবে বেছে তারপর ইস্তিরি করে। মাপা হাত নীলের, কারুর কিছু বলার জো নেই।

সেই আশীর্ব্বাদেরও একদিন হঠাৎ বয়স হলো। হঠাৎ বললুম এই কারণে যে, বয়েস একদিন আচমকা এমনভাবে আসে। একদিনেই মানুষকে ভেঙে দেয়। কোমরে মারে লাঠি। আশীর্ব্বাদেরও একদিন বয়েস হলো। খাটাখাটুনি তেমন আর করতে পারে না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এর বাড়ির কাপড়, তার বাড়ি দিয়ে আসে। চোখের জোর নেই বলেই, কাপড়ের খোল ভর্তি চোরকাঁটা। সেই নীলেব মাপা হাত আজ আর নেই। শাদা কাপড় তো পরাই যায় না। প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে দুদিনেই—কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটলেই গ্রামের ছেলে-ছোকরা বলে ওঠে, তোমায় আশীর্ব্বাদে পেয়েছে!

পসারও কমেছে। নিজে তো তেমন খাটতে পারে না—নতুন ধোপা এসেছে বহু। গঞ্জের ওপরই দুটো সাইনবোর্ড মারা দোকান। স্টীম না ফীমও এসে গেলো বলে। আশীর্ব্বাদ মনে মনে ভাবে—দিনও শেষ হয়ে আসছে, আর কতদিন! নতুনবাবু সব হপ্তায় ফিরছে—তাদের পোশাক-আসাকই বা কী রকম। কেচেই রোদ্দুরে দিলেই হলো—ইস্তিরি লাগবে না। তাজ্জব কথা! আশীর্ব্বাদ জীবনেই শোনেনি। তাও আবার হয়

নাকি কখনো? দরকার নেই বাবু ঐসব খেরেস্তানি এলাক-পোশাকে হাত দিয়ে।

আজকাল সব সময়ই আবোল-তাবোল চিন্তা করে আশীর্ব্বাদ। গাঁজারও মাত্রা বেড়েছে। গাঁজায় দম দিয়ে দাওয়ায় আনমনে বসে থাকে। দীর্ঘ আর ভারী নিঃশ্বাস ফেলে মাঝেমধ্যে। কী যেন করা হয়নি জীবনে, যা করার আজ আর সময় নেই। এখন শুধুই কাছে-দূরে তাকিয়ে থাকা। আপনার বলতে কেউ যদি থাকতো আজ। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে রোগ-অসুখও দরজা ধাক্কা দেয়। কাজকর্ম বন্ধ থাকে মাসের মধ্যে কম করেও বিশ বাইশটি দিন। সেই কটা দিন আধ-পেটা, সিকি-পেটা —কোনোদিন আবার আঁজলা ভরা জলই মাত্র।

দূরে দাওয়ার এক কোণে শুধু দুটো মায়াভরা চোখ দ্যাখে আশীর্ব্বাদ-কে। সে চোখ পবনের। আশীর্ব্বাদই আদর করে ওর নাম রেখেছিলো পবন। পবন মানে হাওয়া—হাওয়ার মতন দ্রুত আশীর্ব্বাদ আর তার কাপড়ের বোঝা বয়ে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে দৌড়ে বেড়াতো। পবনেরও কেউ নেই। একা একা গঞ্জের হাটে বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো একদিন। আশীর্ব্বাদের দেখেও পছন্দ হয়েছিলো। কতই বা বয়েস তার তখন? আশীর্ব্বাদই বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিলো।

আজ হপ্তা খানেক হলো বিছানা নিয়েছে আশীর্ব্বাদ। উঠতে-হাঁটতে পারছে না। অথৈ জ্বর। জ্বর আর তার সঙ্গে কাশি। এক একবার কাশে আর পবন মুখ তুলে চায় দরজার ওপার থেকে। তার টানা টানা চোখ সজল। আশীর্ব্বাদেরও কান্না পায়—কেউ যদি অবলা প্রাণীটাকে ছেড়েও দিতো! কদিন তো দাঁতে কুটোটা পর্যন্ত কাটেনি। ও ঠিকই জানে, টের পেয়েছে আশীর্ব্বাদের পেটেও পড়েনি কিছু। প্রথম কটা দিন তবু গড়িয়ে গড়িয়ে জলটা খেতে পারতো—এ ক-দিন আবার তাও বন্ধ। চোখ বুজিয়ে মৃত্যু ছাড়া সামনে আর কিছুই দেখতে পায় না আশীর্ব্বাদ। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে পবন। এপারে আশীর্ব্বাদ। অস্ফুটে কী যেন বললোও সে। হয়তো বললো—তুই এভাবে দাঁড়িয়ে মরবি কেন। দাঁড় ছিঁড়ে পালা। তোর তো আর আমার মতন অবস্থা

নয়। দড়ি ছিঁড়তে পারলেই চোখের সামনে ঘাসে ভরা সবুজ মাঠ পাবি। সেই মাঠে অনন্তকাল ভেসে বেড়া। আজ থেকে তোকে ছুটি দিলুম।

আসলে নিজেই ছুটি পেলো আশীর্বাদ। দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো পবন। তার চোখে বৃষ্টিপাত হচ্ছে তখন।

পরদিন, যে সারা হপ্তাতেও একবার আকস্মিকভাবে আসেনি, সে, এসে দাঁড়ালো আশীর্বাদের দোরগোড়ায়। এসে দেখলো, দাওয়ার কানাচে ঝুঁকে শেষবারের মতো শুয়ে পড়েছে পবন টান টান হয়ে—প্রাণহীন, কানাচে একটিমাত্র ঘাসের সবুজ-হলুদে মেশা ব্লেড, তার দিকে জিব বাড়াতে গিয়ে সম্পূর্ণ জিবটাই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

সুরজিৎ সেন

বিপন্নতার জন্য

এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে আত্মহত্যা সমাধান নয় কোনো ; অনুমান মাত্র। শেষ বিকেলের আলোয় তার ছায়া বড় হয়, লেপ্‌টে যায় মেডিকেল কলেজের থামে, সে রণো, দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যাশিত শবদেহের প্রতীক্ষায়। তা যুবতীর। নীচে, তারও আগে বেশ কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে যেতে হবে, পাতা রয়েছে শূন্যখাট ফুল দিয়ে সাজানো চমৎকার, ধূপও। ঘিরে আছে শোকে পাওয়া মানুষ ; এবং শোক পাবেই, মানুষ বটে।

"আমার স্কুলের চাকরীটা হয়ে গেছে, এম.এ-টা দিয়েই জয়েন করব" এই কথা বলে মেয়েটি কোল্ডড্রিংকস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আশেপাশে শিগেলামুক্ত জল পাওয়া যাবে না এই আশঙ্কায়। রণোও রাজী। এরপর তারা হগ মার্কেটে ঝুটিলাল কাকাতুয়া দর করতে চলে গিয়েছিলো। ফেরার পথে ট্রাম রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই শহরের সন্ধ্যে হওয়া দেখতে দেখতে তাদের আলোচনা যা বরাবর আকাঙ্ক্ষিত ; ভোরবেলা কোলাঘাট যাবার কথা, বট্যানিকাল গার্ডেনের সব গাছের নাম পড়ে ফেলবার কথা, আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল বা রিভলবার কোন্‌টা কেনা উচিৎ ; এইভাবে ক্রমাগত ভুল করে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা। সে সময় "মার-মার" বলে চেনরডছুরি সমেত ছুটে গিয়েছিল কয়েকটি যুবক, মুহূর্তে হুটোপাটী শুরু, আক্রান্ত হ'ল অম্লিতাভচুল দীর্ঘদেহী এক যুবক। বার দুয়েক সোজা (কজনই বা মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়াতে পেরেছে ?) হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে 'মাগো' বলে সপাটে আছড়ে পড়ে রাস্তায়। মানে ঠিক 'মাগো' এই শব্দ উচ্চারিত হয়েছিলো কিনা শোনা যায়নি। তবে হলেই ঠিক মানাতো। যেমন, আমরা ভয়ে 'বাবাগো' আর যন্ত্রণায় 'মাগো' —এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ করি। এইভাবে আমরা বাবা এবং মাকে ভয় আর যন্ত্রণায় ভাগ করে নিয়েছি। বেমানান কোনো কিছুইতো সহ্য করা হয়নি, যারা বৌ-টৌ খুন করে আমরা তো তাদের পোষাক দিয়েছি। এমন কি মৃত্যু—তাতেও রুচি ও সংস্কৃতির ছাপ থেকে যায়। এ ব্যাপারে আরও

যন্ত্র নেওয়া হচ্ছে! হত্যাকাণ্ড দেখে তারা সভয়ে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। তখনো তারা ভীত। ভয় তাদের ঘিরে ধরছে।

গল্প শুরু হতে পারত অন্য জায়গায়। হয়েও গিয়েছিলো প্রায়। হল না। ফলতঃ এরপর যা কিছু—গল্পের বাইরেই রয়ে গেল। সাংবাদিক তো হন্যে হয়ে story খোঁজে, লোকে খাবে। বাঃ চাষীভাইয়েরা এবং মজদুরমণ্ডলী ছাড়া, সাংবাদিকরাও আপামর শহরবাসীর খাবার জুগিয়ে যাচ্ছে? এদের মধ্যে অধ্যাপক কেরানী অফিসার দালাল ঠিকাদার ব্যবসায়ী চোর বেশ্যা সমকামী রেপিস্ট মার্কসবাদী অস্তিত্ববাদী পরাবাস্তববাদী নৈরাজ্যবাদী কবি সাহিত্যিক ভিখারী গুণ্ডা খুনী বৌদ্ধ ব্রাহ্ম বৈষ্ণব বাফুন ·········কতরকম। আবার এদের পারমুটেশন কম্বিনেশন—যেমন মার্কসীয় অস্তিত্ববাদী, অ্যাঁ তাহলে·! সব শুনে সংবাদপত্রভোজীদের জন্য মেয়েটি একটি সন্ধ্যে ক্ষতিস্বীকার করে। টেপ্‌রেকর্ডার চালু:

—বাড়ী কোথায় ছিল?

—যশোর।

—গ্রামের নাম?

—সাগরদাঁড়ী।

—নদীর নাম?

—কপোতাক্ষ।

গল্প এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিলো। কিন্তু, "মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম জানা আছে?"—এই প্রশ্নই গল্পের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। "শুনেছি নামী লোক, খুব মদ খেতেন। আমার ছবি তুলবেন না?" ক্যামেরাম্যান ফলস্‌ ক্লিক্‌ মারে। হঠাৎ ফ্ল্যাশের ঝলকানি লেগে তার মুখ ঝলমল করে ওঠে। উপভোগ্য প্রতারণা। সেই একই গল্প। দেশ ছেড়ে চলে আসা—ভগ্ন পরিবার—রিফ্যুজিক্যাম্প—অত্যাচার—আড়কাঠি—লাট খেতে খেতে—বেলফুল চাই বেলফুল (অনেকটা রবিবাবুর 'ডাকঘর'এ যেমন: দইওয়ালা—দই-দই ভালো দই। সুরটা মনে পড়ছে? ঐ ছাব্বিশ খণ্ডের বাইরে কবে যে যাবো।) নির্ভীক ঝলক হেঁটে যায় পুঁজরক্তথুতুময় প্রাচীন দেহলীর মধ্যে দিয়ে লাইনবন্দী শোকার্ত আত্মাদের ভীড় ঠেলে। পিছনে সুঘ্রাণ। ব্যাটারী ডাউন হয়ে যাওয়ায় টেপ্‌ থেমে যায়। গল্প ভেঙে যায়। এরপরই রণো আঁতকে উঠে পালিয়ে আসে। সে স্পষ্ট দেখেছে, না মদ খায়নি, টেবিলের উপর রাখা ছিলো

'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' এই শিরোনাম সম্বলিত কৃশকায় একটি বুকলেট। এখানে কারা পড়ে ঐ সব? কেনই বা পড়ে? হো-হো এরা সব পড়ে ফেলল হো-হো-হো। L7A সরশুনা-হাওড়া লাস্ট বাসের প্যাসেঞ্জারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই হাসি। যা রণোর। হঠাৎ চুপ। শুধু কণ্ডাক্টারের উদ্দেশে "হাওড়া একটা"। রাজভবনের সামনে দিয়ে হু হু করে ছুটে যায় L7A সরশুনা থেকে হাওড়ার দিকে।

গত শীতে ভুবনডাঙার মাঠে খুব গান এলো। গান তো কেউ না কেউ কখনো না কখনো গেয়ে যাচ্ছে স্নান ঘরে, উল বুনতে বুনতে, খুন্তি নাড়তে নাড়তে, লোকাল ট্রেনের দরজায়। রুবি দত্ত শাল জড়িয়ে নেয়, রমেন বাসু ও বাকীরা গোল হয়ে, রণো একটু দূরে, বসে। গান শুরু হয়ে যায়—এসো এসো আমার ঘরে এসো / আমার ঘরে / বাহির হয়ে এসো……এসো ঢুকে পড়ো বাঁধ ভাঙা হু হু নোনাজল, ভিতশুদ্ধ কাঁপিয়ে দাও, উপড়ে ফেল বনস্থলী, চুরমার করে দাও এইসব মেকী নান্দনিকতা, ভাসিয়ে দাও সভ্যতার লাম্পট্য। নাভীমূলে তাকানোর সময় অশ্রুপাতের আয়োজনে সব জেনে নাও, জানিয়ে দাও। হিম পড়তে গান থামে। বেশ সন্ধ্যে। পাশেই সার্কাসের তাঁবু। চলো কিছুক্ষণ অন্তত। প্রায় ফাঁকা গ্যালারী। হ্যাজাক জলা গরীব সার্কাস, দর্শকরাও। অপুষ্টিতে ভোগা দুটি অর্দ্ধ উলঙ্গ মেয়ে মুখে রং মেখে নাচতে থাকে, ড্রামের তালে। দর্শকদের উল্লাস আসে। রিং মাস্টার, চোখ দুটি ঢোকা, হাড় বের করা চেহারা, চাবুক—যা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, সহ দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়। পরের খেলা শুরু করতে পারে না। পায়ের কাছে বসে থাকা বৃদ্ধ আফিমপ্রাপ্ত বাঘটিও প্রায় তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। বাজনা ও নাচের লয় বাড়তে থাকে, দর্শকদের উল্লাসও। রমেন বাসুরা বেরিয়ে আসে। তাঁবুর পিছনে গায়ে জামা মাত্র বালক উনুন ধরাচ্ছে এই শীতে। রণো এই প্রথম সার্কাস দেখে দুঃখ পেল। দুঃখের সার্কাস। আবার গান রমেন বাসুর কোয়ার্টারে। বাইরে খুব জ্যোৎস্না। যাকে বলে বাঘ জ্যোৎস্না। যে জ্যোৎস্নায় বাঘ বেরোয় তাকে বাঘ জ্যোৎস্না বলে—এ রকম বলা যায় আমাদের জীবনযাপনে বাঘের অবকাশ কোথায়। বাঘ আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তবু ঐ মানুষ-মানুষীরা চেয়েছিল—আসুক অন্তত একবার এসে দাঁড়াক ঐ ডোরাকাটা গতিময় বন্যতা। না হয় একটু আঁচড়, রক্ত, মৃত্যুভয়। অয়নের গীটার চঞ্চল হয়, গম্ভীর গলায় জনু

চেন্ভার you fill up my senses/like a night in forest/like a walk in the rain....আরও গান—ধরতে পারলে মনোবেড়ি আমি দিতাম পাখীর পায়—এইসব উল্লোল সঙ্গীতে গেলাস ভাঙে, বুককেসে মাংসের ঝোল, অসাবধানে পর্দায় আগুন লাগে এবং তা নেভানো হয়। আধপোড়া পর্দার পাশেই রুবি দত্ত, আশঙ্কা প্রকাশ "চুলে আগুন লেগে গেলে!" "হুঁঃ, এইজন্যেই ত বয়কাট্" রুবি দত্তর প্রত্যয়ীস্বর, সঙ্গীতে এম. এ.। অতঃপর রমেন বাসু গেয়ে ওঠে—আমার আঁধার ভালো / আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে। "Darkness-টা তাহলে accept করলেন?" বাসুর প্রতি রণো বিজয়ীর ভঙ্গীতে। "এ বলে কি? তোমার বয়স কত হল হে! অ্যাঁ?" সবিস্ময়ে রণোর দিকে তাকিয়ে থাকে অধ্যাপক রমেন বাসু, ৫০শ। রণো ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডের 1 নম্বরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর উদ্দেশে।

১৫ বছর হ'ল বাতাস বারুদগন্ধহীন, যেহেতু ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল ও শান্তিকামী দেশ। বাঁ ট্যাকে আধুলি গুঁজে নিঃসাড়ে হেঁটে যাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। বস্তি ঘরের দাওয়ায় বসে তার দিকে ফ্যাল্ফ্যাল্ চেয়ে আছে দুখাইয়ের বাপ; চটকলের বদলী শ্রমিক, এখন কাজ হারিয়ে বেকার। দুখাইয়ের মা বাবুর বাড়ীর ঠিকে ঝি। আর দুখাই প্রায় উলঙ্গ বালক এখন বাস স্ট্যাণ্ডের মোড়ে চায়ের দোকানে কাপ-ডিশ ধুচ্ছে। এ দেশের ২১০ লক্ষ শিশু শ্রমিকের একজন। এই হল ভারতবর্ষ—দারিদ্র আর অজ্ঞানতার দগদগে ঘা, মাছির মত শোষকদের খাদ্য হিসাবে—ব্যস, ঐ পর্যন্তই। এরপর অশ্রুময় অন্ধকার। আমাদের রাশিয়া নেই। আমেরিকা নেই। ডলার নেই। কেজিবি নেই। স্তালিন নেই। মাও নেই। চে গুয়েভারা নেই। টিনটিন নেই। বেতাল নেই। ডায়না নেই। ডেনকালির জঙ্গল, পিগমী ব্যাণ্ডের এ-ই-স-ব কিছু নেই। "কি হবে এসব? আমি বুঝি না।" মেয়েটি বেঁকে বসে। "ঠিক আছে, বুঝতে হবে না" রণোর আশ্বাস। কবিতা হেগেল মার্কস মজুরী মুনাফা অ্যালিয়েনেশন ভ্যানগঁঘ পিকাসো সেজান কামু সার্ত্র মাও সামন্ততন্ত্র নকশালবাড়ী লুকাচ ফ্যানন মার্কুস দুয়েন্দে নাদার ঋত্বিক রুবিককিউব শব্দজব্দ—এদের একটিও না বোঝার জন্য তোমাকে সম্বর্ধনা দেব আমরা। "কবে তুমি আসিবে বলো তো?" খোলাখুলি প্রশ্ন রাখে রণো। পতনের আগে চূড়ান্ত উত্থান হয় মেয়েটির "শুধু এই? এই জন্যেই ভোরবেলা পিছু ডেকেছিলে?

পোষ্টার হাতে হেঁটে গিয়েছিলে দেওয়ালের দিকে ? ত্রিশিরা কাঁচ ধরেছিলে রোদে ?" (আলট্রা লাভ্ থেকে ইন্‌ফ্রা লিবিডো—এই ভুল পরিভ্রমণ।) বলতে বলতে দেওয়াল থেকে নামিয়ে আনে শঙ্কর মাছের চাবুক, গতবছর পুরী থেকে তাদের পারিবারিক সমুদ্রস্মৃতি। "চাবকে ঠিক করে দিতে হয়" কশা হাতে উদ্যত নারী। ভোররাতে সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে সারি সারি জেলে নৌকো। ভুলগর্তে ফিরে আসছে হাজার হাজার উদ্ধত লাল কাঁকড়া। "হ্যাঁ মাঝে মাঝে তাই করা দরকার" এই কথার সামনে মেয়েটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, ধবল অ্যাম্বুলেন্স টহল দিয়ে ফেরে আর্তের সন্ধানে। অই নারীর তাবৎ কান্নার বিরুদ্ধে রণো হেঁটে যায় লেনিন সরণী দিয়ে এস্‌প্ল্যানেড ইষ্টের দিকে। মিছিলটা বেশ বড়ো হয়েছে। কেউ স্লোগান দিচ্ছে চারপাশ কাঁপিয়ে। রণোও গলা মেলায়। মিছিল। চলতে। থাকে। এস্‌প্ল্যানেড ইষ্টের। জমায়েতের। দিকে। আবার। কবে। মিছিল। হবে। সেটা। ঠিক। করার। জন্য।

"খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করা দরকার—দু এক দিনের মধ্যেই…" পুরু কাঁচের পিছনে ডাক্তারের চোখ ফেটে যায়নি, যেন যে কোন সময়ে যাবে।

ডাক্তার যা বলেনা তা হোলো, তা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচবে না। ডাক্তারের দৃষ্টির এই সরলার্থ রণো পেয়েছিলো। "আজকেই ভর্তি হয়ে যাও।" এই বলে তাকে হাসপাতালে রেখে আসা হয়। তুমি বাঁচবে না। এভাবে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে গুলি করে মারা উচিৎ তোমাকে। না হয় মৃত্যুর প্রাক্‌মুহূর্তে সমবেত 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাওয়া হবে—'জাগো অনশনবন্দী ওঠো রে'—দারুণ, অন্তত জমকালো একটি মৃত্যু। স্মৃতিচারণ হবে না। রণো পরাজয়কে মেনে নেয়। এও তো এক প্রাপ্তি যার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি বিজয়ী। পরাজয়ের উৎসব মঞ্চে দাঁড়িয়ে রণো বলে ওঠে "পৃথিবীর তাবৎ বিজিতরা উঠে দাঁড়াও, তুলে ধরো তোমাদের পরাজয়ের পানপাত্র।" এরপর যা মানাতো হাতের শিরা কেটে ফেলা, আগেই বলা হয়েছে যা অনুমানমাত্র, ছেলেটি তাই করতে গিয়েছিলো, পারেনি। বেমানান হয়ে গেল। এই চিরকালীন রিলে রেস—একটি মৃত্যু বিজয়দণ্ড তুলে দিচ্ছে জীবনের হাতে এবং জীবন তা ফিরিয়ে দিচ্ছে পরবর্তী মৃত্যুকে। আলো থাকায় রণোর ছায়া এখনও পড়ছে থামে, তবে

তা সূর্যের নয়, নিয়নের। শববাহকেরা রওনা হয়ে যায়। রণো অন্যদিকে। আত্মহত্যা আর উন্মত্ততা এ দুয়ের মাঝে সমদূরত্ব বজায় রেখে লেনিন সরণী দিয়ে প্রাণপণে হেঁটে যায় পরাজিত যুবা, রণো।

উপসংহারে অভ্যস্ত মানুষ, যারা ভাবছে সব সময় কিছু না কিছু শুরু বা শেষ হচ্ছে। সিনেমা যেমন। অথচ ওই ভাবে কিছু শেষ হয় না। হয় না শুরুও। যাহোক····উপসংহারে রাখা হোলো খরা, মৃত্যু, খিদে, বন্দুক। এত সবের পরেও রাতশেষের প্রত্যাশিত লাল সূর্যটিকে ওঠানো গেল না। দ্বিপ্রহরে ওন্দায় দেখা—বাঁকুড়া পুড়ে যাচ্ছে ধু ধু। খরায়। মাটি ফেটে চৌচির। নঙরখানায় নারী-পুরুষের হুড়োহুড়ি। এরই আড়ালে কালো কালো মানুষের ভাবনা নীতিশীল হয়। শ্রেণী হিংসার ঘুম ভাঙে। গড়ের মাঠে শেষরাতে জীপের দাঁত ঘষটানি। তাকে হেঁটে যেতে বলা হয়েছিলো। সে বুঝেছিলো এইভাবে মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাওয়া বরং দৌড়েছিল কি? ৫ই আগষ্ট ১৯৫০। বাতাসে বুলেটের সিস্। একটু পরে গঙ্গার পারে লাফিয়ে ওঠে সূর্য। নরম রোদে দৃশ্যমান হয় আততায়ী জীপ্, টুপিপরা কয়েকটা মানুষের মাথা, আইনি বন্দুক, ধূমায়িত চায়ের ভাঁড়, হাতে তৃপ্তির সিগারেট, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার রম্যপ্রস্তুতি চলতে থাকে। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় মৃত্যু চেয়েছিলো। মৃত্যুই যাদের বাঁচিয়ে রাখে বহুকাল। গৌরবময়। উপসংহার : তাও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। এরপর যা বাকী থাকে তা হোলো : দুখাই হে, তবু তোমার কথা লিখতে হয়।

সুবিমল বসাক

গোপন আঁতাত

কোন্ মুহূর্ত থেকে খারাপ লাগতে সুরু করে, আমি সঠিক জানি না, তবে নিশ্চিত, এই খারাপ লাগা ব্যাপারটা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। খারাপ লাগা বা ভালো লাগা ব্যাপারটাই এমন, যা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জমে, তারপর অনেকখানি হেঁটে একদা আবিষ্কৃত হয়—গোটা আকাশ জুড়ে কালো কিংবা লাল মেঘ। কোন এক অংশে সামান্য বিন্দুর মত ফুটে উঠেছিল সেই মেঘ, লাল কিংবা কালো, ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করে দ্রুত বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে—টের পাই গোটা শরীরময় দূষিত চর্মরোগের যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা মাথার ভেতর ছাপিয়ে ওঠে, চোখ করকর করে, মাথার দু পাশে আঙুল টিপে ধরি—বুঝে উঠতে পারিনা কেন এরকম হয়। আমার যাবতীয় তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে পড়ে, বুকের ওপর চেপে বসে বিশাল পাথর—দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় মাথার দু পাশ টনটন করে, ঘেমে ওঠে হাতের রেখাবহুল তালু। চুলের গোড়া ভিজে ভিজে লাগে। জুতোর ভেতরে পা, সর্বক্ষণ দপ্‌দপ্ করে। আমি যে দিকে তাকাই—দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে, আগুনের রক্তলেলিহান শিখা আমার চোখের মণিকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়। এটা ঠিক, এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থা একদিনে গঠিত হয়নি, চারাগাছ থেকে মহীরুহে পরিণত হওয়ার মত শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়েছে। শার্টের এক কোণে সামান্য একটা ফুটো, আমার অলক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছিল কোন্ মুহূর্তে, চোখে পড়ারও নয়, সেই ফুটোই কখন আমার অজান্তে সুতো ফেঁসে ক্রমশঃ পরিধি ছড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে, বড়, আরো বড়, আরো আরো বড়—এখন সেই ফুটো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। ফুটোর দিকে চেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে পড়ে, সিগারেটের স্বাদে জিভ ভারি লাগে, ঘোলাটে চোখে ঠেকে একঘেয়েমি, একঘেয়েমি থেকে অস্বস্তি, অস্বস্তি থেকে অসহ্যতা····আমার মাথার ভেতরে ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে।

দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা মাংসের টুকরো, এই রকম, সেই ফুটো

আমার চোখের সামনে ঘুরে ফিরে হাজির হতে থাকে। ফুটো বড় হয়, হতে থাকে, একসময় ফুটো এত বড় আকার নিয়ে ফেলে, যার ভেতর দিয়ে সহজে আমার মাথা গলে যেতে পারে। আমি দু হাতে মাথা নাড়া দিই, তবুও সহজ অবলীলায় মাথা গলে যায়, তারপর শরীর—কোনমতেই বাধা দেয়া যায় না, মাথা ঠিক রেখেও পারি না! চোখ পাথরের মত ঘোলাটে হয়ে পড়ে, ঝলসে ওঠে না সচল বৈদ্যুতিক মণি, লাফিয়ে ওঠে না বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলি। বিরক্তি ও একঘেয়েমি—আমার মগজে অস্বস্তিভাব জুড়ে থাকে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জানলার ধারে বসে থাকি, মেঘ চিরে তীব্র রোদের ঝলক বেরিয়ে এলে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে তীব্র জোরে নিশ্বাস টেনে টেনে বুক ভরিয়ে তুলতে··· এমন সময় সুচন্দ্রাদের বাড়ীতে রেডিও বেজে ওঠে কর্কশ শব্দে, ফুল স্পীডে ছড়িয়ে দেয় চটকদার হিন্দী গান,—সঙ্গে সঙ্গে জানলা গলিয়ে মেঝের উপর এসে পড়ে নীল কাগজ ভর্তি সাদা ভারি খাম। ঠাণ্ডা বাতাস বাইরে খেলা করে, তবুও আমার মাথা গরম হয়ে পড়ে। চুলের গোড়া ভিজে জবজবে। চেয়ে থাকি সেই খামের দিকে নিরেট চোখে, একবারও ইচ্ছে হয় না গিয়ে তুলে আনি, ক্ষিপ্র হাতে ছিঁড়ে বের করি কাগজে বেলফুলের সৌরভ, ডাসি-সূর্যের আলো, মডা ডিজনিল্যাণ্ড। এই নয় যে, সুচন্দ্রাকে আমার ভালো লাগে না, তাকে আমার ভালো লাগে, হয়তো তার প্রতি আমার দুর্বল মনোভাবও তৈরী। অফিস যাতায়াতের সময় মুখস্থ, সদর দরজায় তার আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো, ফেরার সময় সিঁড়ির রহস্যময় অন্ধকারে তার চুমু খাওয়া আমাকে রীতিমত উত্তেজিত করে, নাড়া দেয়। তাকে আমার ভালো লাগে, আলাপ হওয়ার পর তার কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করেছিল, সেই মুগ্ধতা, ধাপে ধাপে তার দুই ভাষাবহুল চোখ, নরম ঠোঁটের স্মিত হাসি, চিরুণী হাতে খোলা দীর্ঘকেশ নাড়াচাড়া, ঈষৎ সরানো আঁচলের পাশে উদ্ভাসিত লোভনীয় স্তন—এই সব একাকার হয়ে পড়ে। তিন চারদিন একসঙ্গে হাঁটাহাঁটি, রেস্তোরাঁর কেবিনে বসে তার শরীর স্পর্শ, এই সবের মাঝে আমার মুগ্ধতা, এবং দরজা হাট হয়ে খুলে যাবার পর ঐ পথে আমি হেঁটে গিয়েছি কতদূর—তার শরীর, হাঁটা চলা, কথা বলার ভঙ্গিমা, গ্রীবার বাঁকা ভাব, ঘাসের উপর দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপে হেঁটে যাওয়া—এইসব নাড়া দিয়েছিল। অথচো, একদা অকারণেই আমার খারাপ

লাগে তার হাসি, একই ধরনের দেখে এসেছি যা এযাবৎ, তার সিঁড়ির পাশে প্রতীক্ষা বা যাবার মুখে থাম গুজে দেয়া—আমার বিশ্রী বোধ হয়েছিল তার হাসি, হয়তো সেই মুহূর্তেই সিগারেটের আগুনের ফুলকি আমার সার্টের ওপর এসে পড়েছিল, ঘুণাক্ষরে জানা যায়নি যে ফুটো সৃষ্ট হয়ে গেছে কখন। পরদিন, অফিস যাবার মুখে তাকে সিঁড়ির দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, দাঁড়ানোর পরিচিত ভঙ্গিমাটাই বিশ্রী লাগে…তার পরদিন জানলার ওপারে হাসি—আমার শরীর রি-রি করে।…তারপরদিন সেই হাসি, এবং আমি লক্ষ্য করি তার ঠোঁট পুরু, দাঁত অসমান ও অমসৃণ, গালে অসংখ্য ফুস্কুরীর দাগ, ঠোঁট নাড়ার কদর্য ভঙ্গিমা…তারপরদিন দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে বেঢপ প্রতীক্ষা করা—আমি তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই। বিরক্তিতে আমার শরীর গুলিয়ে ওঠে। এক বিশ্রী মনোভাব গড়ে ওঠে অসচেতন ভাবেই, উত্তরোত্তর, আমার মনের ভেতর জ্বরের মত চেপে থাকে।

রাস্তায় নেবেও আমি অস্থির থাকি। মাথার ভেতর রক্তের উথালি পুথালি জাগে, একধরনের ছ্যান-ছ্যান ভাব ছেয়ে থাকে। সর্ব বিষয়ে এক অনিচ্ছুক ভাব চেপে থাকে, এতদূর, আমার আর কিছুই ভালো লাগে না। সুচন্দ্রার ওই রকম দাঁড়িয়ে থাকা, হাসি, ইশারা, এসব পেরিয়ে, সেই রাস্তা ধরে ষ্টেশানে আশা, একই রাস্তা—আবহমান কাল থেকে চলে আসছে যেন, দু পাশে সারি সারি নানাবিধ দোকান, বাসের ঘর্ঘর শব্দ, রিক্সার টুনটুন, টেম্পোর হৈ চৈ, বাজারের মুখে ভিড় চিৎকার—বাড়ীর ছাদ, কার্নিশের গায়ে বাঁধা তারে ঝুলন্ত ব্লাউজ ব্রেসিয়ার ভেজা সাড়ি বাসি চাদর—ভয়ঙ্কর একঘেয়ে লাগে। চোখ এপাশ-ওপাশ করি, না, বুকের মাঝে কোন জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না। ষ্টেশানেও সেই একই ভিড়, একই ধরনের আলোচনা ও উত্তেজনা, কাগজে রাজনীতি, শার্ট-প্যাণ্ট, সাড়ি-ব্লাউজ, ঘামে প্যাচ প্যাচ গা-গতর, পাউডারের গন্ধ, চ্যাপ চ্যাপ শব্দে পান খাওয়া, একই মুখের ওলট পালট—এইসব দেখে চোখ ক্লান্ত, মেজাজ ভোঁতা হয়ে পড়ে। বুকের ভেতরে ঠেলে আসে বমিবমি ভাব, গলায় চোঁয়া ঢেকুরে মেজাজ আরও খারাপ করে দেয়। জল খেয়েও আমার মুখের বিস্বাদ ভাবটুকু যায় না। পিঠ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ে, সরসর করে, একটা মাছি অনবরত বিরতিহীন আমার মুখে গালে ঘাড়ে এসে বসে, হাত নাড়ালে উড়ে যায়, আবার এসে বসে, হাত নাড়ি, উড়ে এসে বসে—ঘিন ঘিন করে মেজাজ।

অফিসে ঢুকেও সেই একই অবস্থা। চেয়ারে চেয়ারে মুণ্ডু ঝোলানো শার্ট-প্যাণ্ট, সাড়ি-ব্লাউজ। বড় বাবু মেজ বাবু সেজ বাবু....কখগঘ.... অ্যাকাউণ্টস্....এস্টাব্লিশমেণ্ট....ক্লিং কিং ইয়েস স্যার....পে কমিশনে ইণ্টারিম রিলীফ আট টাকা ছোটমেয়ের ফ্যারেক্সের খরচ....মেডিক্যাল বিল, টাইপরাইটারের খটখট, সিনেমা, ফাইল, গা চুলকোনি, টিফিন, চা, মানুষ শাবক....সেই একই ভঙ্গিমা, একই চেহারা, একটু ওলট পালট—হায়, আমি এ থেকে পরিত্রাণ পাইনা কিছুতেই। অলক্ষ্যে একটা জাল চারপাশ ঘিরে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে, এ থেকে নিস্তার নেই। অথচ, আমার ভেতরে ক্রমশঃ খোঁচা মারতে থাকে অসহ্যতা, যন্ত্রণায় আমি অস্থির, বিচলিত, আমার চোখ কান নাক ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে একসময় স্তিমিত হয়ে পড়ে। ক্যালাস হয়ে ঝিমিয়ে পড়ি, কোন কিছুতে উৎসাহ বোধ করি না, ঘষা পয়সার মত চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে-ঘোলাটে। এই ভাবে, কিছুদিন থাকলে আমি নিশ্চিত ভোঁতা হয়ে পড়বো, একটা নিরেট মাথা নিয়ে আমার দিন-যাপন ঘটলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই একঘেয়েমি থেকে বিরক্তি, তারপর অস্বস্তি, অস্বস্তি থেকে অসহ্যতা, গোটা চেতনা জুড়ে ছ্যান-ছ্যান ভাব—অসুবিধে এই যে, কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। কেন, কি, কেউই ব্যাপারটা বোঝে না, অথচো আমার ব্যবহারে, আমার কথাবার্তায় ওরা বিস্মিত হয়, আহত হয়, অপমানিতও বোধ করে মাঝে মাঝে। মণিকাকে আমি এই রকমই হঠাৎ আঘাত দিয়েছিলাম, অপমানিতও বোধ করেছিল ও কিছুটা।

মণিকার সঙ্গে আমার মোটামুটি একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল, মাস দশেক ওর সঙ্গে সন্ধ্যে-দুপুর-রাত্রি কাটিয়েছি এক সঙ্গে। যা বোঝার, সবই যথাযথ বুঝেছিল মণিকা, কোন বাধা ছিল না, দু রাত্রি বাইরে হোটেলের বন্ধ কামরায় এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়েছি। নারী শরীরের স্পর্শানুভূতি সেই প্রথম, ভয়ানক উত্তেজিত আমি, কোন রকমের মেঘ ছিল না তখন। আমার শরীরের তলায় সুখগ্রহণকারিণী মণিকা, ওর রহস্যময় চোখ—রহস্যময়তর হয়ে আমার চোখের সামনে—সহসা, ওই চোখ আরও বড় হয়ে ওঠে, ওর মুখ বড় হতে থাকে—বড় হতে থাকে—বিরাট হাঁ করে আমাকে গিলে ধরতে চায়। ভয়াক্রান্ত আমি তুলে দাঁড়াতে, বস্তুতঃ, দেখতে পাই আমার শরীর ছোট হয়ে এসেছে। আতঙ্কে আমার শরীরের সমস্ত উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। হতচকিত, আমি দাঁড়িয়ে।

মণিকার শরীরে আমি দৃষ্টি ফেরাই, ফুটে ওঠে একজোড়া চোখ। অন্যদিকে মুখ ফেরাই, সেখানেও দেখা দেয় একজোড়া চোখ, যেদিকেই ফেরাই না কেন, সেখানেই চামড়া ভেদ করে মুহূর্তে জেগে ওঠে চোখ। ওর ঐ নগ্ন শরীরের প্রতিটি অংশে এরকম সংখ্যাতীত চোখ ফুটে উঠতে থাকে, এবং সে চোখের তীব্র দৃষ্টি, এক ঝাঁক তীক্ষ্ণ ছুঁচ আমার চামড়ায় বিঁধতে থাকে। একযোগে ঐ চোখ সমষ্টি আঘাত করতে থাকে, আমার প্রতিটি ব্যাপার খতিয়ে দেখতে চায়। অন্তঃস্থল পর্যন্ত সেঁধিয়ে যায় সেই দৃষ্টি, ফলে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। ভয়ে আমার উত্তেজনা জল হয়ে পড়ে, পরিবর্তে বিশ্রী ভাবনা চাগাড় দিতে থাকে। ঐ চোখের আবির্ভাবে হঠাৎ আমার সন্দেহ জাগে—ওর ভালবাসা ; আমি উঠে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় কামনা-কাতর মণিকাকে ফেলে বেরিয়ে আসি একা।

এরপর থেকেই আমার খারাপ লাগতে শুরু করে, একটু একটু, ক্রমশঃ জমাট বাঁধে দানা। সামান্যতম অপছন্দের ব্যাপারগুলিও বিশাল পর্দা জুড়ে নেয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও মনের ভিতর বিরামহীন ঘুরপাক খায়। ফলে, প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি কেমন যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, নইলে, কেন ওর হাসি, কথা, ভঙ্গিমা সবই অসহ্য হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ায় ; টিফিনে একদা মণিকাকে বিরাট মুখ-ব্যাদান করে একটা গোটা সিঙাড়া খেতে দেখেছিলুম, সেই সঙ্গে বাঁ-হাতের বাহুমাঝে গোছা-গোছা মাদুলী, ওর ওপর আমার মন রি-রি করে উঠেছিল। হঠাৎ, আমার গোটা শরীর পাক দিয়ে উঠেছিল, কোন রকমে বমি সামলে আমি বাথরুমের দিকে ছুটে গিয়েছিলুম। সেদিন বিকেলে, অফিস থেকে বেরিয়ে মণিকার সঙ্গে দেখা করার কথা, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই আমি চলে গিয়েছিলুম। মণিকা অভিমান করেছিল, স্বাভাবিক, কণ্ঠস্বর ভেজা ভারি হয়ে পড়েছিল, কিন্তু মণিকাকে আমি বোঝাতে পারিনি কেন দেখা করিনি। মণিকা বুঝবে না, অন্য ধারণা করে কণ্ঠস্বর ভারি করবে শুধুশুধু

শুকতলা ভেদ করে বেরিয়ে আসা পেরেক আমার পায়ের মধ্যে ফুটতে থাকে সর্বক্ষণ। ঘুরে ফিরে সেই পেরেকের দিকে মন। মণিকা সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে না, চোখে চোখ পড়লে সেই একই ভাষা ; চকচকে ঠোঁট ; মনে হয় গালের ত্বক আরও পুরু, নাক বেঁকে গেছে, কণ্ঠস্বরও কেমন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। শেয়ালদার ঐ জনারণ্য ভিড়ে চোখ জ্বালা করে. মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা তীব্র অসহ্য রোদে গায়ের

চামড়া চির চির করে। মণিকা ছায়ায় আশ্রয় নেয়, আমায় ডাকে। অথচো, তখন কেন জানি আমার ঐ রোদে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, আকস্মিক এই রোদে গোটা চেহারাটাই পালটে যায়, সব কিছু নতুন-নতুন। হঠাৎ, মেঘ করে ওঠে, মুহূর্তে পরিচিত পরিবেশটা রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়, রোদ সরে গিয়ে ছায়া, তারপর কালো মেঘ, একটু বাদে গাঢ় অন্ধকার করে ঝমঝম বৃষ্টিপাত। কয়েক মুহূর্তে চোখের সামনে রঙের খেলা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজতে শুরু করি, মণিকা গাড়ীবারান্দা থেকে ডাকাডাকি করে, তারপর অধৈর্য হয়ে ছুটে এসে আমার হাত ধরে টানে। এক ঝটকায় আমি ওর হাত ছাড়িয়ে দিই। হত-বিস্ময়ে মণিকা জিজ্ঞেস করে—'কি ব্যাপার ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছো যে ! ওদিকে শো আরম্ভ হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে বেশ শক্ত গলায় ধমকে দিই—'তোমার যাবার ইচ্ছে হলে যাও, বিরক্ত করো না।' আমার অস্বাভাবিকতায় মণিকা থমকে দাঁড়ায়, আশে-পাশে দোকান থেকে অনেকের চোখে মুখে কৌতূহল। মণিকা মুখ কালো করে ভিড়ে মিশে যায়। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করেছিল মণিকা, আমার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা সে গড়ে তুলেছে এই ঘটনায়। আমি কিন্তু ওর ভুল ভাঙ্গাইনি।

এ কেবল সুচন্দ্রা বা মণিকার সম্পর্কে নয়, আমার পুরুষ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে. অমোঘ নিয়তির মতই—আমি, অন্ততঃ তাদের মতে প্রচণ্ড অসামাজিক হয়ে উঠেছি। এই যেমন, কিছুদিন আগে শহরে হঠাৎ-ই গোলমাল ঘটে গেল, কোন সূচনা না দিয়ে যেমন হয়ে থাকে হঠাৎ-হঠাৎ। মুহূর্তে রাজপথে বিশৃঙ্খলতা, লোকজন পথচারী ঊর্দ্ধশ্বাসে যে যেদিকে পারলো ঢুকে পড়লো নিরাপদ আশ্রয়ে। তারপর যথারীতি কালো-ভ্যান, গলির ভেতর থেকে সোডার বোতল, পেটো, ধোঁয়া, আর্তনাদ, টিয়ার গ্যাস, ফেণ্টুন, আতঙ্কিত চোখ-মুখ এবং ভয় ভয় ভয়। অফিসের হলঘর থেকে বোমার আওয়াজ শুনে আমরা সকলেই স্কাইস্ক্র্যাপারের ছাদে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। দশতলা ছাদ থেকে নীচে দৃষ্টি ফেলে সবই ছোট মনে হচ্ছিল, সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর, চারদিক থেকে ভেসে আসা বোমার আওয়াজ, আর্তনাদ, আতঙ্কিত চোখ-মুখ, ফিসফিসে কণ্ঠস্বর—মনে হয়েছিল এই সভ্যতাও কত ছোট। এসপ্লানেডের গুমটিও একেবারে ফাঁকা, কোন মানুষজন নেই—কেবল গাছের মাথায় কাকচিলের অবিশ্রান্ত চিৎকার ও ওড়াওড়ি। কালো ভ্যান

মাঝে মাঝে সরাৎ-সরাৎ করে ছায়া ঝল্‌সিয়ে চলে যায়। শীতের দুপুরের রোদ ফাঁকা রাস্তায়, ময়দানে, মনুমেণ্টের পাদদেশে বাধাহীন লুটোপুটি খায়! কয়েক মুহূর্ত ছাদে সকলের চোখে মুখে ভয়মিশ্রিত আতঙ্কের ছায়া উপচে পড়ে। তারই মাঝে মহিলাদের হাতের কাঁটা দ্রুত চলতে থাকে, প্যাটার্নের নেয়া-দেয়া চলে, স্বামী-পুত্রের খবরাখবরও। এই সময় দূরে, দক্ষিণ থেকে একটা ট্রামকে ছুটে আসতে দেখা যায়, দ্রুত গতিতে, আরোহী শূন্য। পেছনে আগুনের লাল শিখার লক্‌লকে অনুসরণ। অনেকটা ওপরে উঠে লাল শিখা কালো ধোঁয়ায় পরিবর্তিত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ে যায়। কালোধোঁয়ার কুণ্ডলী জ্বলন্ত ট্রামের পেছনে এগোতে থাকে। দু হাতে ভিড় ঠেলে আমি গিয়ে দাঁড়াই রেলিংএর ধারে, স্পষ্ট দেখতে পাই, জ্বলন্ত ট্রাম বাঁক নিয়ে গুমটি এলাকায় ঢুকে পড়ে। অগ্নি-দগ্ধ যন্ত্রণায় যেমন ছোটাছুটি করে, ট্রামটিও এক লাইন থেকে আরেক লাইনে, তারপর অন্য লাইনে—কেবলি ঘুরপাক খেতে থাকে! কড়াৎ কড়াৎ করে শব্দ ফেটে পড়ে, ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে জ্বলন্ত কাঠ, ধাতু-পাত। দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে। রেলিং ধরে থাকা আমার রগবহুল হাত দুটো শক্ত কঠিন হয়ে পড়ে, চোখ আরো জোরালো অস্থির কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

রমেন এই সময় আমার কানের কাছে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে—'অফিসের অনেকেই কেটে পড়েছে, ক্যাণ্টিনে চিকেন কাটলেট্‌ জমে পাহাড়—পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রী করে দিচ্ছে লসে—চলো, কয়েকটা পেঁদিয়ে আসি।'

'তুমি যাও।' আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বলি।

ট্রামটা থেমে পড়েছে, দমকলকর্মীরা তাদের ভারি হোসপাইপ দিয়ে তীব্র বেগে জল ছুড়তে শুরু করেছে।

'আরে, ওসব দেখার কি আছে, বরং কয়েকটা কাটলেট সঙ্গে নিয়ে শিয়ালদা'র দিকে এগনো যাক! ···ট্রেন ঠিক চলছে ত?' আমার কাঁধে হাত দিতেই, কেন জানি না, রাগে আমি ফেটে পড়ি। চোয়াল শক্ত করে, প্রায় পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠি—"ইয়ার্কি' মারা হচ্ছে, অ্যাঁ, ইয়ার্কি?' আশপাশ থেকে অনেকে দৌড়ে আসে, ঘিরে ধরে একপাল বিহ্বল চোখ। রমেন কিছুটা সরে অনুকম্পা মেশানো গলায় বলে—'তোমার মত লোক দেখিনি, সাধারণ ভদ্রতাবোধও তুমি শেখোনি।' তারপর সোজা চলে যায়। আমি দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ খুটে ফেলে দিই। তারপর দূরে দৃষ্টি ফেলতে দেখি, সব শেষ! আগুনের লেলিহান জিভ চুপ্‌সে নিভে গেছে, ট্রামটা

খাঁচা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক্সরে প্লেটের মত। গা থেকে জল ঝরে পড়ছে, রমেনের উপরে রাগ ধরে প্রচণ্ড।

বাইরে তখন ১৪৪ ধারা বলবৎ, ছাদ থেকে দেখতে পাই, দু হাত তুলে ফুটপাথ ঘেঁষে চলেছে ভয়ার্ত, আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ। আমি চেয়ে দেখতে থাকি এই অ-গতানুগতিক দৃশ্য। আধপোড়া ট্রাম, ফাঁকা পথ, দু-একটা কালো ভ্যান, ঠন্ ঠন্ শব্দে হঠাৎ সচকিত দমকলবাহিনী, সংখ্যালঘু জনসাধারণের উদ্বাহু হয়ে যাওয়া—যতক্ষণ না পশ্চিম আকাশ লাল-মেরুন-কালো হয়ে পড়ে, আমি দাঁড়িয়ে থাকি।

রমেনের সঙ্গে সম্পর্ক আর আমার সহজ হয়ে ওঠেনি। আমি ওকে বোঝাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি। কেন যে আমার সেই মুহূর্তে অমন হয়েছিল, কেনই বা রমেনের ঐ কথায় আমি ক্ষেপে উঠেছিলুম, আমার কাছে ট্রাম পোড়া, নির্জন গুমটি, চিলেদের অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি, ঐসব দৃশ্য কেন আলোড়িত করল? আমি বোঝাতে গিয়ে রমেন এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করেছিল আমার প্রতি, তাতে নিশ্চিত সন্দেহ ফুটে উঠেছিল। রমেন বুঝতে পারেনি। বরং আমার কথা অবিশ্বাস করে ওর কাঁধ থেকে ভালোবাসার হাত নামিয়ে দিয়েছে। রমেন, আমার সহকর্মী, তিন বছরের পরিচিত—সেও প্রতি কথায় আমাকে খোঁচা মারে। আমি এর জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু রমেনের ঐ ভঙ্গি, মুখ বেঁকিয়ে কথা বলা, কাঁধ শ্রাগ করা—এও ক্রমশঃ আমার কাছে পুরনো ঠেকছে। রমেনের কাছে এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য নয়, কোন অর্থই নেই—অথচো, আমার কাছে একটা নতুন অর্থ ধরা দেয়। আসলে, তখন বুকের ভেতর চুপ্‌সে থাকা বেলুন ক্রমশঃ ফুলতে শুরু করেছে—মনে হয়েছিল, আমার কিছু পাবার আছে। অথচো, এইসব ব্যাপারে কি ধরনের বিষবৎ ফল দাঁড়ায়—তারও তাপ লেগেছে। হাতের চামড়া পুড়ে গেছে, তবুও সরিয়ে নিতে পারিনি, সরিয়ে নেবার কথা মনে হয় নি।

এইভাবে ব্যাপারগুলি উঠে এসেছে। আমার ব্যক্তিগত ঘরে ২০/২৫ দিনে একনাগাড়ে থাকলে দম ফেঁসে আসতে থাকে, অসহ্য ঠেকে, মনে হয় মাথার উপর একটা কালো মাকড়শা দ্রুত বিরাট জাল তৈরী করে আমায় জড়িয়ে ধরছে। চোখ বার বার কিরকির করতে থাকে। আমি উত্তর দিকে দেয়াল-ঘেষা চৌকী সরিয়ে দক্ষিণ দিকে রাখি, ডান কোণ থেকে বুক-শেলফ সরিয়ে বাঁ কোণে রাখি, মাঝখান থেকে পড়ার টেবিল সরিয়ে চৌকীর

গা ঘেঁষে রাখি, দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেণ্ডার, ছবি পটাপট স্থান-পরিবর্তন করে দিই, চৌকীর মুখোমুখি টাঙ্গিয়ে দিই বি. আর. পানেশরের কোলাজ —যেখানে এতদিন ছিল কেরালার প্রাকৃতিক দৃশ্য, জানালার মাথায় রাখি গণেশ পাইনের আঁকা কলকাতা-৭১ ছবিটি। এইভাবে কিছুদিন কেটে যায়। শার্ট-প্যাণ্ট ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবী পরি, রঙিন বস্ত্র ছেড়ে সাদা একরঙা বস্ত্র পরি, বাথরুমে সাওয়ারের তলায় গলা খুলে দিই, চুল বেয়ে হ্যালো শ্যাম্পু গা-এ গড়িয়ে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে নীতুর মাকে বলি, 'আজ শুধু সেদ্দ চাপাও—সেদ্দ খাবো। আলু, পটল, ডিম, ঢ্যাঁড়স, পেঁপে'—নীতুর মা সেইভাবে রান্না করে। আমার নির্দেশমত একেকদিন —একেক ধরনের। তিনদিন ক্রমাগত বৃষ্টি পড়লে, মেঘলা আকাশে চেয়ে থাকতে ভালো লাগে। তীব্র জোরে আমি ভিজে বাতাস বুকে টেনে নিই। জানলার ওপারে সুচন্দ্রা শিকে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। তার নাকের ডগায় বৃষ্টির ফোঁটা। আমার বুক ফুলে ওঠে। একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকি, কেউ যেন বুকের লোমগুচ্ছে পালকের হালকা পরশ বুলিয়ে দিতে থাকে। সুচন্দ্রা জিভ বের করে নাড়ায়, ঠোঁট ছুঁচোলো করে হাত দিয়ে ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দিলে আমার বিশ্রী লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আমার গা গুলিয়ে ওঠে, বিরক্তিতে ভরে ওঠে মন। কানের পাশে দপদপানি শুরু হয়, আমি বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে ঝাঁঝালো রোদ জানালা বেয়ে মেজে, চৌকীতে, দেয়ালে, আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে খেলা করতে থাকলে—অনেকক্ষণ বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকি। জানলার ওধারে ঝকঝকে আকাশ, নীল ও সাদা মেঘের বেড়ানো দেখি। রেলিং-এর মাথায় একটা কাক কা-কা করে ডাকে, সেই ডাক আমায় নিয়ে যায় মণিকাদের বাসায়। আমি পাশ ফিরে কোলবালিশ জড়িয়ে চোখ বুজে ফেলি আবেশে। মণিকা বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরে ঢুকেছে, বন্ধ দরজার ওপারে ওর হাঁটা-চলা, সাড়ির খসখস শব্দ পাই। আমার কৌতূহল চরমে এসে থামে। কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা খুলে যেতেই আমি 'অ্যাঞ্জেল ফেস' দেখতে পাই। চাঁপা রঙের হালকা ভয়েলের সাড়ি জড়ানো, সেই রঙের ব্লাউজ—মণিকা দাঁড়িয়ে আছে দেবীর মত। ওর উজ্জ্বল মুখশ্রী, কপালে সাদা আরাধনা-টিপ, ফর্সা নিটোল পা, মুক্তোর মত দু এক ফোঁটা জলবিন্দু ভাসছে—শরতের গোলাপের মত মনে হয়। ইচ্ছে করে, হাঁটু মুড়ে বসে তার ঐ সুন্দর পায়ের পাতায় চুমু খাই,

তারপর দাঁড়িয়ে ওর ভেজা এলো চুলের ফাঁকে মুখ গুঁজে দিই।....কিন্তু, অফিসে গিয়ে মণিকার পরণে জংলা সাড়ি, ক্যাটকেটে রঙের ব্লাউজ দেখে সমগ্র মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। ওর দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে না আমার। ইচ্ছে করে না আর।

ব্যাপারগুলি উঠে আসে এইভাবে। মাথার ভিতর একটা যন্ত্রণা সব সময় টিপ্‌টিপ্‌ করতে থাকে। চোখের সামনে অন্ধকার, কানের কাছে এক গর্জনকারী পাম্পের অনবরত আওয়াজ। ঘর ভরে ওঠে ধোঁয়ায়, দরজা জানলা দেয়াল অনেকসময় ঠাহর করা যায় না। দু হাতে কপাল টিপে উঠে যাই ছাদে, মুক্ত আকাশের তলায় শুয়ে থাকি কিছুসময়। তারপর, ছুটে যাই খোলা মাঠে। ব্যবহৃত পোশাকের মত ফেলে দিই পরিচিত মুখ, চেহারা, পরিবেশ, এই পথ ছেড়ে অন্যপথে হাঁটি, বাড়ীঘর দরজা, মানুষ-মানুষী, পথ, আঘাত করতে থাকে ক্রমাগত, সূর্যের আলো খোঁচা মারে, বাতাস এসে চুল উলটে দেয়, অসহ্য হলে অন্যপথ ধরি, কিছুদূর এগোই। আবার ঐ একই চেহারা, একই ভঙ্গিমা, একই ক্লান্তি, একই বিতৃষ্ণা, একই মেলাংকলিয়া, একঘেয়েমি, একই বিষণ্ণতা, অন্য পথ ধরি...... আবার অন্যপথ .... আবার অন্যপথ ....। মাথায় যন্ত্রণা চেপে বসলে দিশেহারা হয়ে পড়ি, মনে হয় সর্বক্ষণ মগজে রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে। চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ি ময়দানে, সবুজ ঘাসের উপর নগ্ন পায়ে হেঁটে বেড়াই, একটা শিরশিরানি গা বেয়ে গোটা শরীরটাকে নাড়া দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি বসে পড়ি সেখানেই—ভিক্টোরিয়ার দিকে মুখ করে,........ কিছুক্ষণ বাদে আবার মুখ ঘুরিয়ে বসতে হয়, ঐ বিশাল ইমারত, ইমারতের পেছনে আকাশ, সীমারেখা, মাঠ, লোকজন, পথচারী, বিশাল বপুধারিণী মাড়োয়ারী মহিলা, শিশুদের কাকলি, দালালদের দর-দাম, ঝালমুড়িওলা—আমি শরীর এলিয়ে দিই ঘাসের ওপর। সামনে আকাশ, নীল পর্দা ছিঁড়ে চোখের মত বেরিয়ে আসা দু-একটা তারা, মাধ্যাকর্ষণহীন ভাসমান মেঘ। একনাগাড়ে চেয়ে থাকতে থাকতে কালো হয়ে আসে চোখ পর্দা জুড়ে নেমে আসে কালো ঘুম, আঃ....ঘুম! এই ঘুম যদি মৃত্যু ওব্দি টেনে নেয়........ আঃ........ শান্তি! মৃত্যুর পরপারে বিরাজ করে চির শান্তি! আঃ! মেঘের কড়কড়াৎ, বিদ্যুৎ এর চমক, চীৎকার ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে যায় হঠাৎ। জেগে উঠে শুনতে পাই তীব্র শব্দ কোলাহল চোখ খুলতেই অন্ধকার। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার! আহ্‌! ভেজা

শরীরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসি বাসায়, সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে আমি উষ্ণতা আনার চেষ্টা করি। পরদিন ঘুম ভাঙ্গে বেলা করে, গায়ে-হাতে-পায়ে তীব্র ব্যথা, মাথা একেবারে ভারি—তুলতে পারি না, গোটা শরীর পুড়ে যাচ্ছে গরমে। ঘোলাটে চোখে দেখি, মাথার পাশে বসে সুচন্দ্রা কপালে ভিজেপট্টি পালটে দেয়, চুলের ফাঁকে আঙ্গুলের বিলি কাটে, মৃদু স্বরে অভিমান-কণ্ঠে বকুনি দেয়। আমি সুচন্দ্রার একটা হাত মুঠোর ভেতর চেপে পাশ ফিরে শুই, তার হাতের ওপরে পড়ে টপ্‌টপ্‌ উষ্ণ অশ্রুবিন্দু!

সেরে ওঠার পর কিছুদিন দুর্বল বোধ হয়, সুচন্দ্রার খবরদারী বেড়ে যায় দিন-দিন, ওষুধ খাওয়ানো, পথ্য দেয়া, কাপড় জামা গুছানো, বিছানার চাদর পালটে দেয়া..........। সুস্থ হয়ে যাবার পরে আবার আমি টের পাই মগজে রক্তক্ষরণ। সুচন্দ্রাকে ক্রমশঃ অসহ্য ঠেকতে শুরু করে, তার ঘড়ি দেখে কাজ করা, দেখাশোনা—আমার ক্রমশঃ বিরক্ত লাগতে শুরু করে।

কোন কোন দিন যন্ত্রণা বেশী বোধ হলে আর স্থির থাকতে পারি না, পথে-বেপথে বেরিয়েও উপশম হয় না। সোজা খালাসীটোলায় চলে যাই, একটা কোণ দেখে বসে পড়ি। অনিলকে ডেকে এক বোতল পাইণ্ট আনাই, গেলাসে ঢেলে চুক্‌চুক্‌ করে পান করি। যতক্ষণ না নেশা চেপে ধরে, ততক্ষণ চলতে থাকে আমার খাওয়া। ততক্ষণ ধরে, টের পাই কপালের দপদপানি। মাথা ভারি হয়ে এলে বুঝতে পারি ঠিক, আরও শক্ত করে আমি ঘাড় সোজা রাখি। চোখের সামনে এক পর্দা সরে গিয়ে বেরিয়ে আসে অন্য পৃথিবী। পৃথিবীর মুখ ফাঁক করে খুলে যায়, উঁকি মারে ঝিনুকের মত চাঁদ, আমার শরীর থেকে কালো সাপ পিঠ বেয়ে নেমে যায় হিস্‌হিসিয়ে, কানের গর্ত দিয়ে বেরোতে থাকে রহস্যময় নীল চাপা আভা। ঝম্‌ঝম্‌ করতাল বেজে চলে, চোখ ফেটে বেরোয় জোরালো আলো। আশে-পাশে শুকরের উল্লাস। প্রসব যন্ত্রণার তীব্র কোলাহল। নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি উঠে চলে আসি, আমার পা কাঁপে—তবুও এতটুকু বেচাল হয় না। ঘাড় যথাসম্ভব শক্ত রেখে আমি হেঁটে চলি একা একা।

একদিন, এই রকমই—সকাল বেলায় সূর্যের প্রথম রোদে আমার চামড়া চর চির করতে থাকে, জানলার বাইরে বহমান বাতাস তীব্র ঝাঁঝালো

ওষুধের মত মাথার ভেতর খেলা করে, আমার দম ফেঁসে আসতে থাকে—শার্ট কাঁধে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ি পথে। পথের দু পাশে সেই চেনা-পুরনো দোকান, নামতা পড়া একের পর এক সাইনবোর্ড, বাজারের থলে হাতে মানুষ, লাইট পোষ্টের গায়ে গোপন রোগের বিজ্ঞাপন—আঃ, আমার চোখের সামনে নাচানাচি করতে শুরু করে, মাথার ভিতর ঘুরপাক খায়, কুড়কুড় একটা পোকা নড়তে থাকে। আহ্। একের পর এক, ক্রমমান ছবি, মানুষ গিজগিজে ভিড় দোকান, বাস, রিক্সা, সায়া, ব্রা, লিপষ্টিক, কণ্ঠস্বর, ভ্যানিটি ব্যাগ, নর্দমার ধারে পড়ে থাকা উদাসীন ফরাসী স্বক, প্রসূতি সদনের দিকে রিক্সায় যন্ত্রণাকাতর মহিলা, পান মুখে দেয়া অফিস বাবু—সব ঘুরতে থাকে একজোটে, ঘুরতে ঘুরতে আমার চোখে এসে দাঁড়ায় অপ্রাকৃতিক অবস্থায়। রবারের নলের মত চর্চর করে বড় হয়, আরও বড়, একেবারে বুকের উপর চেপে বসতে চায়। মাথা মনে হয়, আস্ত-নিরেট, আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি, পাগলের মত ছোটাছুটি করি সারাদিন, চামড়া ফুঁড়ে গোটা শরীরে গজিয়ে ওঠে বন মানুষের মত লোম, ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে পড়ে, আহ্, অস্বস্তি প্যাচপ্যাচ করতে থাকে। একসময় আবিষ্কার করি নিজেকে দাঁড়িয়ে আছি ষ্টেশানে, ঘোড়ার পেচ্ছাবের তীব্র দুর্গন্ধ আমার মাথায় আচ্ছন্নতা কাটাবার ভূমিকা নেয়।

অকস্মাৎ তীব্র শব্দ করে ট্রেনের হুইসিল বেজে ওঠে। একবার, দু'বার। আমার চেতনার গোড়া ধরে টান দেয়। এক দৌড়ে আমি চলে আসি প্লাটফর্মে, চলন্ত গাড়ীর হ্যান্ডেল ধরে লাফিয়ে উঠে পড়ি কামরায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করি, একবার দুবার, নিভে যায় বাতাসের তোড়ে। আর চেষ্টা না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। একরাশ বাতাস আমার মাথার চুল উলাবুলো করতে থাকে, জোরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই, তবুও দম আটকে আসে চোখেমুখে, মাত্রাতিরিক্ত বাতাস ঠেসে ধরে। গাড়ীর ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ কানের পাশে আলোড়ন তোলে, পেছন ফিরে আর কিছু দেখা যায় না, অন্ধকার, অতীত কালো গভীরতায় ডুবে। ফাঁকা জায়গা দেখে আমি বাঙ্কের ওপর এসে শুয়ে পড়ি, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে শরীর কাঁপতে থাকে। মাঝরাতে দু একবার ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু, ভিজে গেছে গ্রীবার অংশ, তন্দ্রার মাঝে, আধো জাগরণে চোখে পড়ে জানলা দিয়ে গড়িয়ে পড়া এক চিলতে জ্যোৎস্না, কাঁপে তির তির, অপরিচিত সৌরভ, বুনো ঘাস

পাতার, জলাভূমিজাত ভিজে বাতাস নাকে এসে লাগে কভুবা।

ঘুম ভাঙ্গে শেষ রাতে, সেই মুহূর্তে নাকে এসে ধরা দেয় ভিজে মিষ্টি গন্ধ। আড়মোড়া ভেঙ্গে অমনি উঠে পড়ি সঙ্গে সঙ্গে। গোটা শরীর দারুণ ঝরঝরে মনে হয়, জানলার ধারে বসতেই এক ঝলক তাজা বাতাস আমার চোখ মুখ ভরিয়ে দেয়। দূরে, পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাষ, মেঘের মত জুড়ে থাকা গোটা আকাশে, তারই পেছন থেকে ক্রমশঃ কাটতে থাকে অন্ধকার। আমার গা শিরশির করে, শরীর কাঁপিয়ে আমি উষ্ণ রাখার চেষ্টা করি তাপক্রম। গাড়ী একটা ছোট ষ্টেশানে দাঁড়াতেই, আমি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নেমে পড়ি সেখানে, পায়ের তলায় বিছানো মোরম মর্মর শব্দ তোলে। চটি খুলে ফেলে দিই দূরে, দিয়ে মোরমের উপর হাঁটতে শুরু করি, পায়ের তলা থেকে একটা অদ্ভুত অপরিচিত অনুভূতি বেয়ে ওঠে পিঠে, মগজে। আঃ। আমার মাথায় এখন কোন যন্ত্রণা নেই, কুড়কুড় করে খাওয়া পোকার অস্তিত্ব নেই। কানের কাছে, অজানা অসংখ্য ধরনের পাখীর বিচিত্র কলকাকলি, চোখের সামনে বিশাল খোলা আকাশ, মেঘ, এখনও দু-চারটে উজ্জ্বল তারকারাজি, বিশাল শালগাছ, ক্ষেত, মাঠ, মোষ, বাতাসে ঢেউ খেলানো ঘাসের শিস্, কৃষক বালক, টেলিগ্রাফের তার। ট্রেন চলে যেতেই, হুর রে···রে···বলে আমি মোরমের রাস্তা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ি কাঁচা পথে, দৌড়ে যাই মাঠে, ধানক্ষেতে, দৌড়তে থাকি আলের ওপর দিয়ে। নয়ানজুলির মাঝে পা সেঁধিয়ে যায় মাঝে মাঝে। দৌড়ুতে থাকি সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে পেছনে—স্বেচ্ছাচারের মত। পা ভিজে যায় তরতাজা শিশির বিন্দুতে, ঘাসের শিস জুড়ে থাকে লোমের মত। বাতাসে আমার মাথার চুল বিশৃঙ্খল ওড়াওড়ি করে, দু হাতেও বাগ মানে না। আমি দু হাতে খুলে ফেলি আমার গা থেকে জামা, ছুঁড়ে ফেলি, ম্যাজিক কার্পেটের মত উড়ে যায়, উড়ে যেতে থাকে বাতাসে চেপে ঐ পাহাড়ের দিকে, ছোট হতে থাকে দৃষ্টি থেকে, ক্রমশঃ বিন্দুতে থামে। তারপর খুলে ফেলি গেঞ্জী, প্যাণ্ট, আণ্ডারপ্যাণ্ট—বাতাসের স্তরে দোল খেতে খেতে ভেসে বেড়ায়। আমি আর দেখি না, মাঠের ওপর দৌড়াই, থামি, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিই, ধান-শিষের মাথায় হাত বুলোই—ধানের শিষ দোল খায়, মাথা তুলে চায় ঘাস—সচকিত। দুরন্ত, দুর্দম, বাধাহীন আমি ছুটোছুটি করতে থাকি—ধান ভরা মাঠে, চষা ক্ষেতে। আমার দৌড়ের সঙ্গে বেজে ওঠে ঘুঙুর—ছুন্ ছুন্ ছুন্—নেচে বেড়াই এপাশ-ওপাশ।

জমাট কুয়াশা চাপ-চাপ বেরিয়ে আসে ক্ষেত থেকে, ফাটে, ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে থেমে পড়ি। দু হাত প্রসারিত করে আমি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকি। মাটীর ভিতর কিসের কানাকানি—জাগরণের পালা, বিস্ময়ে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফেরার পথে দেখতে পাই শীর্ণ নদী। দৌড়ে, এগিয়ে গিয়ে জলের ভেতর হাত ডুবিয়ে দিই, কি বিষণ্ণ বোধ হয়, মনে পড়ে কোন বন্দিনী রাজকন্যার কথা, ভালবাসাকাঙ্খী নারীর কথা, দু হাতের উষ্ণ-অন্তরঙ্গ স্পর্শে নিম্নে যেতে চাই অলৌকিক কোন রহস্যময়তায়। কালো জল, জলের ওপর কাঁপে কচি রোদ ইলিশের আঁশ। আমার বুকের থলে বড় হয়ে ওঠে।

দু পাশে সারি সারি শাল গাছ চলে যায় অনেক দূরে। গাছের জাফরি কেটে সূর্যের আলো মাটিতে, বাত্যাসের ধাক্কায় ঝালর দেয়া চিক কাঁপতে থাকে। চিৎ হয়ে নিরুদ্বেগ শুয়ে থাকি গাছের তলায়। চোখের ওপরে ভেসে বেড়ায় সাদা নীল মেঘ, একদৃষ্টে চেয়ে থাকি সেদিকে। মগডালের মাথায় দেখতে পাই প্রেমিক চিল পুরুষের ছলছলে চোখ, সহসা চেতনা চমকে দিয়ে অজানা পাখী ডেকে ওঠে—ট র্ র্ র্ র্ ট ট ট র্ র্ র্ র্ ট ট····। ছোট্ট ডানা দুটি ছড়িয়ে উড়ে যায় পাখী, আমিও চলি তার সঙ্গে। সারাদিন শুয়ে থাকি এইভাবে, চোখ ক্লান্ত হয় না, মন ভারি হয় না, শ্রান্তি অনুভব হয় না কিছুতে, এমন কি মাথার ভেতরে যে একটা নিরন্তর যন্ত্রণা অনুভূত হত—তার কোন অস্তিত্ব পাই না। শুয়ে থাকি, গাছের ফাঁক থেকে কমলালেবু-রোদ হলুদ হয়, সিঁদুরে হয়ে মিশে যায় নীলের সঙ্গে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে ঝরা শুকনো পাতা শব্দ তোলে, গায়ে মাখিয়ে দেয় ধুলো, শুনতে পাই সরাৎ করে বেরিয়ে যায় গিরগিটি। ঘাসের ওপর শুয়ে থাকি, ঘাসের মত। অখণ্ডলালিত, স্বেচ্ছায় বেড়ে ওঠা ঘাস, ঘাসের শিস আমায় জড়িয়ে ধরে, দু'হাতের তালুতে চেপে ধরে আমার মাথা, বিলি কাটতে থাকে মায়ের আঙুল। একটা বুনো গন্ধ। মাঝে মাঝে বাতাস বয়ে গেলে আমার কানে ফিস ফিস করে কথা বলে। গোপন ও অন্তরঙ্গ, আমি কান পেতে শুনি। কত কিছু পাবার আছে, কত জিনিষ গ্রহণ করার আছে। মাঠের পর মাঠ, ক্ষেত ভেঙ্গে, পাহাড়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, ঘাসের ওপর নগ্ন পা ফেলে আমি নেচে-নেচে বেড়াই। এসে দাঁড়াই ঝর্ণার উৎসমুখে—চ্ছল্ চ্ছলাৎ চ্ছল্ চ্ছলাৎ ঝর্ণার জল তরতর করে এগোয় নিম্নমুখী, সমতলে এসে পাক খায়, গোল-

গোল ঘূর্ণি। চেয়ে থাকি সেদিকে একদৃষ্টে, কুয়াশা নেমে আসে চারপাশ ঘিরে রহস্যময়ী নারীর মত। ম্লান আলোয় দেখি জলের চিকচিক্ আভাষ, বিষণ্ণ, অভিমানী চোখের মত। স্থির থাকতে না পেরে লাফিয়ে পড়ি জলে, দু হাতে আমায় জাপটে ধরে শীতলতা। জলে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকি পাড় ঘেঁষে, চুপচাপ। ছপ্ছপ্ করে ঢেউ এসে ভাঙ্গে শরীরে, শিরশিরানি তোলে। ম্লান আঁধারে, তরুশ্রেণী ফাঁকে পেঁচা ডেকে ওঠে, ওঠে চাঁদ, মুহূর্তে চারদিকে ঠা-ঠা হাসি, ঝপ্ঝপ্ তালি বাজে একযোগে। ভোর হয়ে গেছে—ভুল করে কিছু কাক সহসাই ডেকে ওঠে, তারপর চুপ। আলোকিত হয়ে ওঠে চারদিক, এই পৃথিবী, এই নদী, এই ক্ষেত, এই মাঠ, গাছের মাথায় চিকচিক্, ঝর্ণার জলে অভ্রের টুকরো। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখি হলুদ চাঁদ, কালো দাগ, ভেসে বেড়ানো মেঘ, ঘাসের শিস, কালোজলের কাঁচভাঙ্গা চমক···· শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি, মাটীর গন্ধে জলের গন্ধে জ্যোৎস্নার গন্ধে ভরে যায় চারদিক। আমার চোখের সামনে পুরনো ছাতাধরা পৃথিবীর পর্দা খসে পড়ে, বেরিয়ে আসে আনকোরা কচি মুখ। বুকের বাঁ দিক টাটিয়ে ওঠে বেদনায়। আশ্চর্য, এখন আর কোন নারীর মুখ ভাসে না, সুচন্দ্রা বা মণিকা, কারুর কথা মনে পড়ে না, কোন দৃশ্য চোখে এখন জ্বালা ধরায় না····কারুর নিষ্ঠুর নির্মম অবহেলা বা উপেক্ষা········এখন শান্ত বাতাস ········কানের কাছে মিহি বাঁশীর শব্দ। আমি নত হয়ে পড়ি। গায়ে চিমটি কেটে দেখি, সবই যথাযথ, চেতনা ঝলসে ওঠে। ওহ্, আমার ঠোঁটে এখন কোন আধ-জ্বলন্ত সিগারেট নেই, চোখের সামনে পাকানো ধোঁয়ার সুতো উঠে যাওয়া, দাঁতের ফাঁকে কাঁচা মাংসের টুকরো, বা, পায়ের তলায় হাড় বেঁধানো অস্তিত্ব····না, কিছু নেই। শীতল বাতাস আমার মাথার ভেতর খেলা করে ভালবাসায়, ভাল লাগায়, চোখ জেগে থাকে অক্লান্ত, নিস্পন্দ, বিহ্বল, দেখতে পাই বাধাহীন উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে চক্চক্ করে সাপের গা—আলের পাশ ঘেষে চলে যায় দূরে। চারদিক কাঁঠালি চাঁপার সুবাতাসে ভরে ওঠে।

পরিতৃপ্ত ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজেকে অদ্ভুত ঝরঝরে মনে হয়। সূর্যের লাল আলো গায়ে মেখে দীর্ঘ ছায়া সঙ্গে করে একদল সাঁওতাল নারীপুরুষ আসে। তাদের কাঁধে বাঁশে ঝোলানো মৃত হরিণ, কৃতকার্যে শিকারীর আনন্দ-উল্লাস ঠা-ঠা শব্দে ফেটে পড়ে। আগুন ধরানো হয়

পাতা জড়ো করে, আমিও জড়ো হই সেখানে। তারা আমায় তুলে নেয় তাদের মাঝে। গোল-গোল করে আগুনের চারপাশে আমরা নাচতে শুরু করি। হরিণের মাংস খাওয়া হবে আজ। মাদলের শব্দ বেজে ওঠে, বাঁশীর শব্দ, হাতে হাত জড়াজড়ি করে, কোমরে হাত রেখে আমরা নেচে চলি, অন্ধকারে উজ্জ্বল আগুনের আলো এসে পড়ে তামাটে চোখে মুখে, চকচক করে কালো ত্বক, গভীর চোখ, মহুয়ার মদ আসে, ঢকঢক করে গিলে খাই, চন্‌মন্‌ করে ওঠে শরীর, ঘাস ও কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ ফুটে বেরোয়, পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দল বেঁধে বসে পড়ি, পোড়া মাংসের ছাল ছাড়িয়ে নিতে মাংসের সুঘ্রাণ পাই। আঃ। মাংস খাওয়া হবে আজ··· ·····মাংস খাওয়া হবে········মাংস খাওয়া হলো।····

নেশা পাৎলা হতে, দেখতে পাই মাথার ওপর হলুদ চাঁদ। আমি টলতে টলতে উঠে আসি মাঠের দিকে। টের পাই, আমার শরীরের রোমকূপ দিয়ে ঘাম ছুটে বেরোয়, চোখের একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা····আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম। আমার ইন্দ্রিয় জেগে দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে। পরিশ্রান্ত যোদ্ধার মত টলতে-টলতে ইঁদারার পাশে এসে দাঁড়াই। ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখি, চাঁদ ভাসে ঐ ইঁদারায়, কাঁপে তির-তির। আরেকটু ঝুঁকে শব্দ করি কু—কু—কু—, প্রতিধ্বনিত শব্দ বেজে ওঠে গমগম করে, ইঁদারা বেয়ে ওপরে ওঠে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে মাঠে, প্রান্তরে, প্রান্তসীমানায়।···· অকস্মাৎ কড়কড়াৎ শব্দে চমকে উঠি, চেয়ে দেখি হলুদ চাঁদকে ক্রমশঃ খেয়ে ফেলছে রাহু মেঘ। মুহূর্তে, দিগন্ত ডুবে যায় কালো পর্দায়, ইস্পাতের মত ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ····তারপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি কিছুক্ষণ, পরমুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করার পর দু হাত তুলে নেমে পড়ি। ভিজে যায় সর্বাঙ্গ, মুছে যায় ঘাম, আমি ঘুরে-ঘুরে ভিজতে থাকি। বৃষ্টি। আঃ মুখ খুলে জল ঠোঁটে জমাতে চেষ্টা করি। ভেজা নরম মাটী আমার পা জোড়া আঁকড়ে ধরে, শক্তভাবে, টানতে থাকে তলার দিকে, নীচে টেনে নিয়ে যেতে চায়। জড়িয়ে ধরে চারপাশ ঘিরে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। পৃথিবীর এই আকর্ষণ আমি বুঝি, ঝুঁকে ডান হাতে খাবলে তুলে নিই মাটী, গোটা শরীরে মাটী ছোঁয়া বুলিয়ে দ্যায়। চমকে ওঠে বিদ্যুৎ ঘন ঘন, তুমুল বৃষ্টিপাত, চোখে মুখে চুঁয়ে পড়ে ভেজালবিহীন জল ফোঁটা। আঃ আঃ।

ঘুমের ভেতরেই শরীরের ত্বক চিড়চিড় করে ওঠে, চোখের পাতার ওপর সূর্যের তীব্র আলো ছুঁচের মত ফোটাতে থাকে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে, শুনতে পাই কানের পাশে প্রতিশোধকামী নিষ্ঠুর কুকুরের গর্‌র্‌র্‌র্ শব্দ। চোখ খুলতেই এক ঝলক বর্শা ছেঁকে ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ। পাশ ফিরে দেখি, দূরে পাহাড়, পাহাড়ের ওপারে চলমান মেঘ, কম্বোডিয়ার মানচিত্র কখনও বা ল্যাটিন আমেরিকা, তার তলায় ধান ক্ষেত। অস্থির চোখ আমার ঘোরাঘুরি করে, গাছের ছায়া ছোট হয়ে আসে, পাখীর কর্কশ ডাক, রাখালিয়ার বাঁশী—একযোগে আমার চোখ কানকে পীড়া দিতে শুরু করে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়। পাশ ফিরতেই আবার চোখের মণি কর্কর করে ওঠে, পাতা বুজে আসে। সামনেই কালো পর্দা নড়াচড়া করতে থাকে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসে, শরীর নাড়া দিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পাই, শিরদাঁড়া বেয়ে হিমস্রোত নেমে যায়।

দিন যতই বাড়তে থাকে—একটা অস্বস্তিকর ভাব ছেয়ে ধরে তীব্রভাবে। জিভ বিস্বাদ ঠেকে, গলার কাছে উঠে আসতে থাকে একটা বমি-বমি ভাব—বুঝি এইমাত্র বমি করে ভাসিয়ে দেবো, পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি মুচড়ে আসে, গলার টক ভাব গোটা শরীরে ছেয়ে যায়। দাঁতের ফাঁকে টের পাই মাংসের সুতো, মাথা কেমন ভারি ভারি বোধ হয়, কপালের দু পাশে দপ্‌দপ্ করে রগ। ঠিক বুঝতে পারি, মাথার ভেতর নড়ে উঠেছে পোকা। ঐ ক্ষেত-মাঠ, ধানের শিষ নড়ে বাতাসে, রাখাল বালক, গাছ, গাছের পাতা ভেদ করে সূর্যকিরণ, মেঠো পথ, গিরিশ্রেণী, স্রোতধারা, ছ্ছল ছ্ছল শব্দ—সব একজোট হয়ে আমার চোখের সামনে ঘুরঘুর করে নাচতে থাকে। কানের কাছে তীব্র কোলাহল। আমি আর সহ্য করতে পারি না। আহ্, বাতাস যেন সাপের চাবুক মারতে থাকে আমার গায়ে। দু হাতে কপাল টিপে ধরি শক্ত, আঙুলের নখ বেড়ে যায়, চুল বেড়ে যায়, গজিয়ে ওঠে সমগ্র শরীরে লোম, চোয়াল পাথরের মত হয়ে পড়ে—আর আমি খস্‌খস্ করে গা-গতর চুলকোতে শুরু করি। মাথা থেকে ঝরে পড়ে সবুজ ফ্যাঙাশ্। অসহ্য তাড়নায় আমি দৌড়তে শুরু করে দিই, লাল চোখ, মগজের ভেতর চর্চর চর্চর করে বেড়ে যাওয়া অপ্রিয় ভাব, বিরক্তিতে ঘেমে ওঠে শরীর, অস্বস্তি ও একঘেয়েমি। পেছনে শতাব্দীর চিৎকার তাড়া করে। আমি দৌড়াতে থাকি। নিরাময়হীন অসুখ আমার

শরীরে আরো শক্তভাবে চেপে ধরে, পায়ের তলায় ছোট ছোট নুড়ি বিঁধতে থাকে, আমি দৌড়ুতে থাকি····। চোখের সামনে সব ঘোলাটে মনে হয়, একাকার হয়ে পড়ে সমগ্র দৃশ্য-পরিদৃশ্য, ক্রমশঃ আমার মাথা নিরেট হয়ে আসে। আমি দৌড়ুতে থাকি····। মাটী ছেড়ে লাল মোরমে পা ঠেকাতেই হোঁচট খাই। ট্রেনের হুইশিলের তীব্র শব্দে আমার চেতনা নাড়া দিয়ে ওঠে, সর্বাঙ্গে কালো পর্দা ঢাকা ট্রেন আমায় তুলে নেয় দু হাতে, পেছনে-পেছনে প্রাচীন মাঠ-ক্ষেত, বাতাসের বাঁশী, গাছপালা, মেঘ আকাশ, পাহাড়, চিৎকার, পাগলা কুকুর, সব পড়ে থাকে মোরমের প্লাটফর্মে। জানলা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাথার চুল, ঝরে পড়ে নখ, হারিয়ে যায় চোখের পিচুটি, মাথার দপদপানি কমে আসতে থাকে।

•

স্টেশানে গাড়ী থামে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, গোটা প্লাটফর্ম তক্‌তকে—সদ্য কামানো গালের মত। কানের কাছে কথা ভাসে, চোখের সামনে চলমান জনসাধারণ, আমার ভাল লাগে, প্রেমিকাকে প্রথম চুমু খাওয়ার মত, নির্বাসন থেকে গৃহে ফিরে আসার মত—আমি পা-পা করে করে বাইরে বেরিয়ে আসি। রাস্তার ওপর এক গাদা কাক হৈ হৈ করে, বড় বড় বাড়ীর মাথায় এসে পড়েছে সূর্যের প্রথম স্পর্শ, লাল, বৃষ্টি ধোয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি রৌদ্রের ঘ্রাণ টেনে নিই শরীরে। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রোদে ঝলসে নিই শরীর। চিকচিকে বাদামী রোম, বারবার মাথা তুলে জাগতে চায়। বুকের ভেতর তীব্র হাল্কা উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে, কিশোরীর বুকের মোলায়ম ত্বকের স্বল্প-পরিচিত গন্ধ আমার মগজে নাড়া দেয়। আমি অভিভূত হয়ে পড়ি, গোটা শরীর ও ইন্দ্রিয়ময়ে ছেয়ে যায় নেশা। চারদিক চোখ ফিরিয়ে দেখি, লাইটের সমান্তরাল তার চলে গেছে দূর, তারে বাঁধা সুতো শুদ্ধু লাল মুখপোড়া ঘুড়ি, কয়েকটা শালিখ ডানা ঝাপটে উড়াউড়ি করে, একটা কুকুর পা শুঁকতে শুঁকতে সরে যায় দূরে। আমি চেয়ে থাকি, চেয়ে দেখতে থাকি।

সব কিছু আমার কাছে নতুন লাগে, দ্বিতীয়বার আবিষ্কারের নেশায় হাঁটতে থাকি রাস্তা দিয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে থাকি, সবে দোকান খুলতে শুরু করেছে, বেরিয়ে আসছে ধূপের গন্ধ। এক ঝাঁক প্রজাপতির মত মেয়ে-নারী-রমণী বেরিয়ে আসে স্টেশান থেকে, তাদের কারু কারু সাদা পোশাক, হাতে বই, দেবীর মত মনে হয়—ছড়িয়ে পড়ে

এদিক-ওদিক, উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ, স্পষ্ট হাসি কিছুক্ষণ আমায় মুগ্ধ করে রাখে। ট্রামের টুং টাং শব্দ, অনেক দূরে থেকে, আধোঘুম-আধোজাগরণ চেতনায় এসে লাগার মত। রেস্তোরাঁ থেকে ভাজা-ডিমের ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে লাগে, পাশ দিয়ে সাইকেলে 'আজকের তাজা খবর'—কাগজ অলা হাঁকতে হাঁকতে দ্রুত চলে যায়। এই সময় বেজে ওঠে গীর্জা-সংলগ্ন স্কুলের বড় ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ⋯ ⋯।

বাড়ীতে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। তালায় চাবি সেঁধিয়ে ঘোরাতে গিয়ে মনে হয়, দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে—যার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। কে সে? দরজা খুললেই বেরিয়ে আসে আমারই মত একজন, হুবহু আমারই চেহারা, আমারই প্রতি-আমি। স্নান করে ওঠা, পোশাক চাপানো গায়ে পরিপাটি, নিখুঁত কামানো গাল, চুল আঁচড়ানো, পুরু গোঁফ—হেসে স্বাগত জানায় আমাকে। আমি দরজা খুলে সোজা ঢুকে পড়ি বাথরুমে, শার্ট প্যান্ট ছেড়ে প্রকৃতি হয়ে পড়ি আমি, আয়নায় অপরিচিতের গালে শেভিং ক্রিম ঘষতে শুরু করে দিই। দাড়ি কামানো হলে আফটার শেভিং লোশন মেখে দিতে একটা মিষ্টি গন্ধ পাই। শাওয়ার খুলে দিই, তাক থেকে স্যাম্পু ঘষি মাথায় ভুর ভুর করে ওঠে। গুন-গুন গান গেয়ে উঠি বাথরুমে। স্নান সেরে ওঠার পর শরীর-মন ভয়ানক ঝরঝরে মনে হয়। ঘ্রাণে একটা মিষ্টি গন্ধ ছেয়ে থাকে। বেরিয়ে আসতেই দেখি, দোরগড়ায় সুচন্দ্রা দাঁড়িয়ে। আমার চোখে চোখ পড়তেই ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়, মাথার এলো চুল ছড়িয়ে পড়ে। কোন কথা না বলে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। আমি হেসে জিজ্ঞেস করি—'কেমন আছো?'

সুচন্দ্রা আগের মতই চুপ থাকে। চা শেষ করে আমি ঘড়ির দিকে নজর ফেলে বলি—'একবার অফিসে যেতে হবে।' সুচন্দ্রা তবুও কিছু বলে না, পাশ থেকে চোখের পাতা দেখা যায়, কাঁপছে নাকি? এগিয়ে এসে আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরে। বুকের কাছে মুখ আড়াল করে বলে—'তুমি এমন নিষ্ঠুর! কি নির্মম তুমি?'

—'কি হলো?' আমি তার মুখ তুলে ধরি। চোখে টলটল করছে অশ্রুবিন্দু। ডান হাত স্বয়ংচালিত উঠে আসে তার পিঠে, পিঠ ছাড়িয়ে মাথায়—বুলোতে থাকে। একটা হাল্কা শুষ্ক মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে এসে লাগে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বুলোতে থাকি, সে আমার কাঁধের উপর

মাথা রেখে থাকে। সে বলে—'তোমায় আজ অফিসে যেতে দেবো না—না—'

'দূর বোকা মেয়ে—' আমি, আশ্চর্য, আদর গলায় বলি—'একবার অফিসে গিয়ে দেখি কি অবস্থা—'

'না—না—আজ যেতে দেবো না….' সে মাথা নাড়ে কাঁধের ওপর, তারপর অনুযোগ করে—'বাব্বা, কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি! এখনও বিশ্বাস হয় না তুমি ফিরে এসেছো—'

—'পাগলি মেয়ে। এতে আবার ভয় কিসের—।'

সুচন্দ্রা আমাকে আর বেরোতে দেয় না। সে-ই আমার রান্নাঘর দখল করে রাঁধে, খেতে দেয়, একসঙ্গে বসে খাওয়া শেষ করি, রেকর্ড প্লেয়ার থেকে গান শুনি, জানলায় নীল পর্দা টাঙ্গিয়ে দিয়ে তারপর আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ে, মুখে পুরে দেয় এলাচ। আমার চুলের ফাঁকে হাত বিলি করতে করতে আবার সে অনুযোগ করে, আমি তাকে প্রশ্রয় দিই। সে উঠে আসে, আমার বুকের রোমগুচ্ছে নখ খুঁটতে খুঁটতে বকে যায়! তার এলো চুল আমার গলায় সুড়সুড়ি দেয়, তার বাহু-পিঠ-ঘাড়ে হাত বুলোতে থাকি, কথা বলি কত কি, বুঝতে পারি তার শরীরে বিদ্যুৎ নেমে আসা, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসে আমার মুখ দুহাতে চেপে চুমু খায় গট গট করে, মিষ্টি এলাচের গন্ধ। আমার হাত মুঠো শক্ত হয়ে আসে, অনেক আনন্দ অনেক সুখ ভর করে আছে ওই মুঠোয়………।

লাঞ্চ আওয়ারে অফিসে যাই, আটপৌরে সাড়ির মত লাগে গোটা অফিস, নাক টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিই। আবছা অন্ধকার করিডর দিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চাই। আশ-পাশে চোখ তুলে তাকায় কৌতূহলী দৃষ্টি, নিজেকে কেমন অহংকারী মনে হয়, ইচ্ছে করে সকলকে জড়িয়ে আদর করি, ঠোঁটের রেখায় হাসি খেলে যায়, বুক ভারি ভারি মনে হয়। মণিকা এগিয়ে আসে, ওর পরনে লাল সাড়ি জ্বলজ্বলে আগুন ছড়ায়, আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে দেখি, ওর সারা মুখে উপছে পড়ছে লাল আভা, শরীরে কেমন একটা উড়ুউড়ু চলন, ওর ভরাট শরীর ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। পা থেকে চোখ পিছলিয়ে ওপরে তাকাই, মণিকাকে বলি 'বড্ড লোভ দিচ্ছ মণিকা।' সামান্য লজ্জা মেশানো গলায় বলে—'তুমি তো ছিলে না, আমি কত খোঁজ করেছি—আমার বিয়েতে তুমি থাকলে না, এ কি কম আফশোস।' আমার কোন কৈফিয়ৎ দেয়ার আগে মণিকা হাত ধরে টেনে

আনে বাইরে, কাছে একটা কেবিনে নিয়ে যায়, তারপর পর্দা টেনে দিয়ে বলে—'কাল, আমরা যাচ্ছি গোপালপুরে। তোমাকে আর কিছু দিতে পারবো না—শুধু—' বলে আমাকে গোটা গোটা চুমু খায়। লিপস্টীক মুছতে মুছতে বলে—'ভুলবে না তো প্রিয়। মনে রেখো।' হেসে গড়িয়ে পড়ে আমার গায়ে।

রিক্সার উপর উঠে বসি একা, বলি—যেদিকে, যতক্ষণ তোমার ইচ্ছে নিয়ে চল। কোন বাধা নেই। আজ আমি দেখবো কোন্ মুহূর্তে আকাশ লাল হয়ে উঠবে, লাল থেকে ফিরোজা, ফিরোজা থেকে নীলে—গুটি গুটি দু'চারটি তারা জেগে উঠে আমার খবর নেবে—তুমি কেমন আছো? আমি ভাল আছি, সুস্থ আছি, সুখী আছি। আমার পেছনে কেউ আর তাড়া করে না, কুকুরের গর'র'র' শব্দ ভেসে আসে না, মগজে যন্ত্রণা নেই। রিক্সার দু পাশে লোকজন, দোকান-পসার, ট্রাম-বাস চলে যায়, পোঁওক্-পো' বাজে হর্ন, হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পাই নবজাত শিশুর ক্রন্দন—ওই শব্দে সে তার অস্তিত্ব জানাতে চাইছে। রিক্সা থেকে নেমে আমি হাঁটতে থাকি ফুটপাত ঘেঁষে, বিশাল-বিশাল দালান ঝুঁকে পড়ে আমায় কুর্নিশ করে, পায়ে চুমু খায়, আমি শুধু ঘাড় কাৎ করে 'নড্' করি। খুশীতে আমার শরীর থৈ থৈ করে, অনাবিষ্কৃত মহাদেশে পা রেখে আমি পতাকা তুলে দিই, গুরুম্ গুরুম্ বন্দুকের ভারি ও গম্ভীর শব্দে জানিয়ে দিই আমার জয়োল্লাস। বন্ধ দরজা খুলে যায় আমার পায়ের শব্দ পেয়ে, অন্ধকারে ডানা ঝাপটে ফর' ফর' শব্দ তুলে যায় যথেচ্ছাচারী পাখী, তাদের অনুসরণ করে আমার স্থির চোখ মিলিয়ে যায় সীমান্ত রেখায়। আমি এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াই, কোন ক্লান্তি না, এতটুকু শ্রান্তি নেই। রাস্তা দিয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে গেলে, ইচ্ছে করে তাকে থামিয়ে কথা বলি, তার ঘাড়ের কাছে আঙুল ছুঁয়ে টেনে আনি স্পর্শউত্তাপ, পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, গভীর ও ভরাট শরীর নিয়ে মনে করায় স্মৃতি, আমি বলি—'মনে পড়ে প্রিয়।' সে মাথা নাড়ে, তার মমতাভরা চোখে আমি স্মৃতি ফিরে পাই, প্রতিটি স্মৃতিসুখের চাপা আভা ফেটে বেরোয়, আমার বুকে হাল্কা কাঁপন জাগে, আমি শিস দিতে দিতে এগিয়ে যাই। আমার হাতে যেন ভর করেছে ক্ষমতা, ক্ষমা করে যাই পৃথিবীর সকলকে যারা ঈর্ষা করে, আমার কিছু মনে পড়ে না এসব, একা-একা হেঁটে বেড়াই, জীবন বড় স্বল্প, মাথার উপর চাঁদ উঠলে গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে

করে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাহত আমি ঘুরে বেড়াই, মৃত্যুর বড় সাধ হয়—এমন গভীর সুখে মৃত্যুর ইচ্ছেই জাগে।

ঠোঁটের কোণে কখন যে ফুস্কুরী জেগেছিল, অলক্ষ্যে নখ খুঁটতে গিয়ে টের পাই তার জ্বালা। কষ গড়িয়ে ছেয়ে ফেলে কিছুটা অংশ, তারপর, আরও দিন-দিন ক্রমশঃ ছড়াতে থাকে পরিধি। চোখ মেলে চেয়ে থাকতে পারিনা, যখনই চাই—চোখের সামনে ভেসে ওঠে দগদগে ঘা, মাথার পেছনে দপ্ করে জেগে ওঠে চিনচিনে ব্যথা। ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি, হাত আপনা-আপনি ক্ষতের কাছে এসে থামে, চড়াৎ করে যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, মনে হয় মাথার ওপরে ঘনিয়ে এসেছে মাকড়শার জাল, জটিল ও কালো। আমাকে জড়িয়ে ধরে পাকে পাকে ঠেসে নিয়ে যায় এক কোণে—পড়ে গেছি সেই ফাঁদে, আমার পায়ের তলায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সরষে দানা; চোখের সামনে থেকে যাবতীয় রঙ মুছে একাকার হয়ে যায়, এখন কোন রঙ নেই—কেবল কালো অন্ধকার, কোন গান নেই, কোন সঙ্গীত নেই—কানের কাছে উন্মত্ত সমুদ্রের প্রচণ্ড ফেটে পড়া গর্জন, অবিরাম কাঠ-কাটা মেশিনের কাটা-কাটা শব্দ, বাতাস উদাসীন ঘূরপাক খায়, শাঁই-শাঁই, থেকে-থেকে কেবল চাবুকের হিসহিসানি শুনতে পাই। নিজেকে একটা ভার-ভার মনে হয়।

জানালার বাইরে তাকাতে আকাশে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলা দেখে নিঃশ্বাস গরম হয়ে ওঠে। ভাঙ্গা কার্নিশের ধারে একটা উচ্ছৃঙ্খল কাকের কা-কা কর্কশ ডাক মাথায় এসে লাগে। সেই মুহূর্তে মাথার পেছনে যন্ত্রণা টের পাই—টুপ্‌টুপ্ করে চুঁয়ে পড়ে রক্তবিন্দু। আকস্মিক আবিষ্কারে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। লাল আগুনের লকলকে শিখা আমায় গ্রাস করতে চায়, দু হাতে কপালের শিরা টিপে চোখ বন্ধ করে ফেলি সভয়ে। অস্থির, বিচলিত হয়ে পড়ি, জানালার পাল্লা বন্ধ করে ঘরের চারদিক চেয়ে দেখি। প্রতিটি বস্তুতে আমার অনিচ্ছুক ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে, সর্বত্র, কিছুতেই আমার বুকের ভেতর জলোচ্ছ্বাস জাগে না। আমি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে, সিঁড়ির মাঝপথে দেখা হয় সুচন্দ্রার সঙ্গে, কোমরের তলায় সাড়ির সীমা, ফেটে পড়া ব্রা, ব্লাউজের ফাঁক থেকে বের করে দ্যায় খাম। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র উপেক্ষায় আমি ছুঁড়ে ফেলি সিঁড়িতে, তার দুটি চোখ আমায় গিলে খেতে আসে, আমি বিচলিত,

রাস্তায় নেমে আমি দিশেহারার মত হেঁটে চলি। আমার কিছুই ভালো লাগে না, পুরনো ভাঙ্গা রেকর্ডের আওয়াজের মতই কানের কাছে অবিরাম বেজে চলে পথচারীবাবুদের কথাবার্তা, রাজনীতি, বাজার দর, খাওয়া দাওয়া, অফিস, ক্লাব, সহবাস, পাৎলা প্রেম, খবরের কাগজে পাথর করে দেয়া সংবাদ। আমার শরীরের চামড়া ফাটতে থাকে, ঝলক বাতাস নাড়া দিয়ে গেলে চিড়্‌চিড়্‌ করে ওঠে যন্ত্রণায়। জনসাধারণ বাবু ও গিন্নীদের পান চিবুনো মুখ, চেহারা, হাসি, সুখের উপকরণ, দু পাশের বাড়ী, বাঁধা তারে ঝুলনো সাড়ি,—আমি আর সহ্য করতে পারি না। গলার কাছে উগ্‌ড়ে আসে বমি, গলা টকে যায়। ঘুরে বেড়াই এ-রাস্তা-সে-রাস্তা, এ-ফুটপাথ সে-ফুটপাথ, হায়, কোথাও আমি স্থির থাকতে পারি না। একটা পোকা অবিশ্রান্ত কুড়্‌কুড়্‌ করে খেয়ে চলে, অফিসে গিয়ে দেখি, মণিকা সীটে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। কাল রাতে ভালো করে ঘুমোই নি, অনিল বড্ড জ্বালাতন করছিল—মণিকার হাসি, হায়, এও আমায় দেখতে হয়। ওর ওই মিটি-মিটি হাসি কি বিশ্রী, কি নোংরা! ঘিন-ঘিন করে ওঠে শরীর। টেবিলের সামনে দাঁড়াতে খারাপ লাগে। আমি আবার নেমে পড়ি রাস্তায়, হাঁটতে থাকি উদ্দেশ্যহীন, মাথার ভেতরে পোকা খাওয়ার শব্দ আমার অস্তিত্ব নাজেহাল করে তোলে। কোথাও এক মিনিট স্থির, স্তব্ধ, দাঁড়াতে পারি না, চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। গোটা শরীরময় ঘামে প্যাচ-প্যাচ অস্বস্তি বোধ হয়। অন্ধকার হয়ে এলে আমি মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসি।

ব্যালকনীর একপাশে অন্ধকারে সুচন্দ্রা তখন নতুন প্রতিবেশী যুবকটাকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে এলোপাথারী। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারা দুজনে. আমি চেয়ে দেখি, মাথার শিরা দপদপ করতে থাকে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। হাতের আঙুল দুমড়ে আসে, ঘরে গিয়ে জামা প্যাণ্ট ছুঁড়ে ফেলে দিই, দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম আসে না চোখে, পায়ের তলা ছাৎ-ছাৎ করতে থাকে, জীবন সম্পর্কে ভাবতে গেলে শরীর ভিজে যায় কান্নায়। চোখের ওপর হাত ঢেকে ঘুমোবার চেষ্টা করি, শত চেষ্টায়ও ঘুম আসে না, পাতার ওপর এক ঝাঁক ছুঁচ তীব্র ভাবে ফুটতে থাকে। উঠে, ঘরের সিলিং-ফ্যানের পয়েণ্ট টিপে ফিরে এসে বিছানায় শুই, এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে বুলিয়ে যায়। বোঁ-বোঁ করে সিলিং ফ্যান দ্রুত ঘুরতে থাকে। আমি চেয়ে থাকি সেদিকে। ব্লেড লক্ষ্য করে আমার চোখও

ঘুরতে থাকে তীব্র গতিতে। সহজে, নির্দিষ্ট ব্লেড ধরতে পারি না, চেষ্টা করি মাত্র, চোখ ঘুরতে থাকে গোলাকার। আমার মাথাও ঘুরতে থাকে। কিছুক্ষণ এই খেলার পর আমার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে, মনে হয় শিরা ছিঁড়ে গলগলিয়ে রক্ত ভরে উঠেছে খুলির ভেতর, চোখ, কান, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে রক্তস্রোত।

...চেয়ে দেখি, একি!—ব্লেডের পরিবর্তে একজোড়া শুভ্র মসৃণ মেদহীন পা, ঊরু থেকে ঘুরছে, সার্কাসে ট্র্যাপিজ-মেয়েটি বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে! আলো, তার মসৃণ পায়ের ত্বকে পিছলে চক্‌চক্‌ করে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি। মেয়েটি বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে, কখনও একটা পায়ের হাঁটুর ওপর পায়ের পাতা ঠেকিয়ে, কখনও বাঁ হাত কোমরে রেখে, ডান হাত সামনে প্রসারিত—দর্শকদের দিকে রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে ঘুরতে থাকে। বাতাসে তার মিনি স্কার্ট বার বার উড়ে যায়। তারপর, একসময় গতি হ্রাস পেলে দেখি, ট্র্যাপিজ মেয়েটি টুক করে নেমে পড়ে আমার বিছানায়, হাল্কা পালকের মত আমার বুকের ওপর এসে পড়ে। এতক্ষণে আমি স্পষ্ট চোখে তাকে দেখি, তার আকর্ষণীয় শরীর, রূপ, ভঙ্গিমা, যাবতীয় একাকার হয়ে আমার মাথা ফাঁকা করে দেয়। দু-হাতে তার কোমর জড়িয়ে টেনে আনি কাছে, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার চুলের ফাঁকে আঙুল বোলাতে বোলাতে তেলের মিষ্টি গন্ধ পাই, শরীর থেকে সুষমা ছড়িয়ে পড়ে—আমি জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাস নিই। তখনই টের পাই, মাথার ভেতর সেই রক্তক্ষরণের যন্ত্রণা আর অনুভূত হচ্ছে না, জিভ নাড়াচাড়া দিয়ে দেখি দাঁতের ফাঁকে কোন হাড়ের টুকরো নেই, বরং অন্য একটি লালামিশ্রিত মাংসল জিভ নাড়াচাড়া করে, শরীরের কোন অংশে আর জ্বালা নেই, কামনাকাতর এক মসৃণ শরীর জুড়ে থাকে আমার মনে। বুকের ওপর থেকে ভারী পাথর কখন যে নেমে পড়েছে—টের পাইনি। আমার চোখ জড়িয়ে আসতে থাকে আবেশে। ঢলে পড়ি।

পরদিন পরিতৃপ্ত ঘুম থেকে উঠে খুব ফ্রেশ মনে হয় আমার, মগজে একটা তৃপ্তির আমেজ ছেয়ে। চোখ খুলে আকাশের বাইরে একটা সাদা পাখী উড়তে দেখি—তার ডানা কাঁপানো। জানালার ফাঁক বেয়ে উঁকি মারছে মাধবীলতা—হাত বাড়িয়ে আমার ছুঁতে ভয়ানক ইচ্ছে হয়। তেরচা রোদ এসে পড়েছে মেজেতে, একরাশ যুঁই ফুল ছড়িয়ে আছে।—হাওয়ায়

ক্যালেণ্ডার দোলে, ঘর ভরে যায় লাল-নীল সাদা ঘুড়িতে, আমার হাতে সুতো, সুতোর টানে গোঁত্তা খায়। আমি উঠে দাঁত মাজি, শেভ করি, স্নান করি শাবান মেখে, গুনগুন গান গাই—পোষাক পরে বেরিয়ে পড়ি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখি, জানালার শিকে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুচন্দ্রা—তার বুকের একপাশে আঁচল খসানো। চোখে চোখ পড়তে আমার দিকে চেয়ে হাসে—অমনি দেখি, আশ্চর্য একটা সাদা কবুতরী গুঢ়ুম গুঢ়ুম করে নাচতে থাকে! রাস্তায় নেমে দেখি, দু পাশের দালানের ছাদে লাল নীল হলুদ সাড়ি উড়তে উড়তে মেঘের মত মিশে যায়। ট্রেনের কামরায় ছড়ানো খুদ, কিচির মিচির শব্দে শালিখ গলা ফাটায়। অফিসের মুখে বিরাট কাষ্ঠমণ্ডপ, আমি ঢুকে পড়ি গুহাপথে, অন্ধকার রহস্যময় পথে এগিয়ে যাই, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেক্সান-হলে দেয়াল জুড়ে বিশাল আয়না, অফিসারের চেয়ারে কানে-কলম-গুঁজে বসে আছে চশমা চোখে শেয়াল, ক্যান্টিনে ম্যানেজারের গায়ে বুনো গণ্ডারের চামড়ার কোট, ল্যাভাটেরী জুড়ে ছোট ট্যাংক—তাতে সুইমিং পুল, মণিকাকে দেখি বেল-বটম্ পরে রেকর্ড নিয়ে ঢুকলো শেয়ালের ঘরে, একটু বাদে জিভ চাটতে-চাটতে বেরিয়ে আসে কুক্কুরী……।

রণজিৎ দাশ

ছেলেকে বলা রূপকথা

১.

আমার গায়ের মানুষগন্ধে একটা রাক্ষসী একবার খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আমি বুঝতে পারিনি, রাক্ষসী ছিল তোর মায়ের ছদ্মবেশে। সে অনেক দিনের কথা। দিনটা ছিল শ্রাবণের, অল্প অল্প বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া আর মেঘের ডাক। এমন দিনে মঠমন্দিরের সাধুরাও ছটফট করেন, রাত্রি হলে প্যাঁচার গলায় অন্ধকারকে ডাকেন। আমি রাজার বাড়ির কাঠ কেটে রাণীর বাগানের ঘাসনিড়ানি দিয়ে ঘেমে নেয়ে সন্ধেবেলা ফিরেছি দেখি দরজায় এলোচুলে সে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ভেবেছি তোর মা। জামা খুলেছি, কাপড় খুলেছি, তোয়ালে পরে চান করেছি। সারাক্ষণ সে আমাকে দুইচোখে লক্ষ্য করেছে। জল খাবার নিয়ে বসে সরলমনে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি, 'হ্যাঁ গো তুমি খেয়েছো তো কিছু ?' উত্তরে সে আনমনে বলে, 'তোমার কাঁধদুটো কী চওড়া যেন ভিনদেশি রাজপথ !' শুনে আমি চমকে উঠি। তোর মা তো কখনো এমন পাহাড়ী গানের সুরে কথা কথা বলে না! তখন আমার দারুণ সন্দেহ হয়। পরীক্ষা করার জন্যে আমি তাকে বলি, 'এমন ঝড়জলে ঘোড়াটা বাইরে বাঁধা আছে, ওটাকে একটু তুলে নিয়ে আসি।' আমি জানতাম তোর মা হলে নির্ঘাত বলবে 'খবর্দার তুমি বেরুবে না, ওই ঘোড়াটা পাজি, ওটা বাজ পড়েই মরুক।' কিন্তু এ বলে, 'ঠিক আছে যাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, তোমার মাথার চুল জলে ভিজলে ঘোড়ার কেশর, আমি আলো নিভিয়ে জোনাকি জ্বালিয়ে দেখবো।' যদি বলিস এ কথার মানে কি তবে বলি, এ কথার কোনো মানে নেই, এ হচ্ছে কথার আগুন। বড় হলে বুঝবি। আমার আর ধন্ধ থাকে না যে এ তোর মায়ের ছদ্মবেশে এক মায়াবিনী রাক্ষসী। আমাকে খেতে চায়। তারপর আমার ঘোড়াটাকেও খেতে চায়। থর থর করে কাঁপতে থাকে আমার শরীর, ঝড়ের মুখে পোড়োবাড়ির

রাক্ষসী টানা টানা চোখ মেলে আমাকে মোহ করতে থাকে, দেখতে হুবহু পটে আঁকা তোর মায়ের মুখ, আমার খালি ভুল হয়ে যায়। এমনই তার বশীকরণ যে আমার এ-ও মনে হয়, রাক্ষসী যদি আমাকে খায়, আদ্যোপান্ত সুন্দর করে খায়, তো মন্দ কি! মনে হয়, রাক্ষসীর পেটের ভেতর হয়তো আছে চৈত্রমাসের রাত আর নীল চাঁদ, আর আছে এক পাথরের জল্লাদ, আমি তার পায়ের কাছে ঘুমিয়ে থাকবো। বাইরে, ঘোড়াটা এক অদ্ভুত গলায় চিৎকার করছে। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়—যেন শয়তানের শিস। তেপান্তর অন্ধকারে লণ্ঠনের মতো কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যেতে থাকে আমার হুঁশ। তারই মধ্যে আচমকা মনে পড়ে, তোর মা কোথায়? রাক্ষসী তাকে মন্ত্র দিয়ে কোথায় কিভাবে লুকিয়ে রেখেছে? ঘরের কোণে যে অচেনা বেড়ালটা ভীরু চোখে তাকিয়ে আছে, সেই কি তোর মা? দেয়ালে যে টিকটিকিটা গোমরামুখে আমাদের দেখছে, সেই তোর মা? খাটের নীচে যে আচারের শিশিটা পড়ে আছে, সেই কি তোর মা? রাক্ষসী বুঝি টের পায় আমার মনের উথাল-পাথাল। সে মৃদু হাসে—মেঘময়ূর হাসি। আমি দেখতে পাই তার লাল ঠোঁট তার শাদা দাঁত, তার গোলাপী জিভের সেই হাসি—যেন বৃষ্টির ফোঁটা জমে-থাকা রঙীন কচু পাতা বাতাসে দুলে ওঠে। আমার তখন মনে হয় এ কি সত্যিই রাক্ষসী, না তোর মা? হ্যাঁ, তোর মা-ই তো, অবিকল সেই নাক-মুখ-চোখ-ভ্রূকুটি, কেবল একটু বেশি সুন্দর দেখতে। তা, মনের থেকে ভালো-মন্দ মুছে ফেললে মানুষকে একটু বেশি সুন্দর দেখায়, এ তো জানা কথা। হয়তো তোর মা আজ, বর্ষার ঝোঁকে, পুঞ্জমেঘের তুলো দিয়ে মুছে ফেলেছে মনের ভালোমন্দ, তাই রূপ খুলেছে এমন! এসব ভাবি আর টের পাই, তেপান্তরের সমস্ত আঁধার এসে ঢুকেছে আমার শরীরে, আমি হয়ে উঠেছি এক কালো বাইসনের সওয়ার। রাক্ষসী, নাকি তোর মা, এইবার আমার দিকে এগিয়ে আসে। দু-বাহু মেলে দেয় শূন্যে, তার নখ, খয়েরি নখ, দশপাখির ঠোঁটের মতো বাতাসে ওড়ে। একটু দীঘল দীঘল হয়ে ওঠে তার পা, একটু ফুলে ওঠে তার ঊরু। মুখে সেই হাসি, যা দেখে আমি বুঝতে পারি যে সে আমাকে অবশ্যই খাবে, এবং তারপর আমার শাদা পরিচ্ছন্ন হাড়-গোড় সে নিঃসন্দেহে লুকিয়ে রাখবে সেই বৃষ্টির ফোঁটা জমে-থাকা রঙীন কচুঝোপের তলায়। আর, অনেক অনেক বছর পর, তোর মতো কোনো বালক ফড়িং ধরতে এসে সেই ঝোপের তলায়

খংজে পাবে তার বাবার হাড়-গোড়। বাড়ি ফিরে গিয়ে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনবে, তার বাবাকে কিভাবে এক রাক্ষসীতে খেয়েছে। আরো শুনবে যে তার মা, সেই ভীরু-চোখে-তাকিয়ে-থাকা অচেনা বেড়ালটা, সে নাকি এখনো বেঁচে আছে। রোঁয়া-ওঠা বুড়ি বেড়াল, ক্ষেতে জাঙ্গালে ঘুরে বেড়ায়, কারুর অন্ন মুখে নেয় না, কেবল সন্ধ্যেবেলা কোনো বয়স্থা মেয়েকে এলোচুলে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লাফ দিয়ে উঠে তার টুঁটি কামড়ে ধরে।

২.

তখন সেই বালক তার মা-কে খুঁজতে বেরুবে। গল্পটা শুনে কিছুক্ষণ সে ঠাকুমার কোলে থম্ হয়ে বসে থাকবে, ভুলে-যাওয়া-কবিতার মতো। তারপরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলবে,

'আমার মা বেঁচে আছে! আমার মা বেঁচে আছে!'

—বলেই, পাগলের মতো ক্ষেত জাঙ্গালের দিকে ছুটতে শুরু করবে। পেছন থেকে ঠাকুমা প্রাণপণে বারণ করবে,

'ফিরে আয় ভুতু, যাস না, এখনো অনেক কথা বাকি আছে।'

কে শোনে কার কথা। ভুতু ততক্ষণে চলে গেছে চোখের আড়ালে।

বেশ কিছু দূর ছুটে ভুতুর ছোট্ট শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পরিশ্রমে ততটা নয়, যতটা উত্তেজনায়। সে গ্রামের প্রান্তে এসে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। সামনে একটানা ক্ষেত জমি, তার ওপাশে একটা রোগা আঁকা-বাঁকা নদীর পর মস্ত বড় একটা পাহাড়। পাহাড়ের পেছন থেকে শুরু হয়েছে আকাশ। বাবা বলতেন, আকাশের নীল তাঁবু। ভুতু গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেই পাহাড়টার দিকে তাকালো। বাবা তাকে বলেছিলেন, ওই পাহাড়টা ডিঙিয়ে গিয়ে কেউ যদি আকাশ-তাঁবুর তলা দিয়ে কোনো রকমে গলে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলেই সে দেখতে পাবে এক মজার দৃশ্য। তাঁবুর বাইরে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক জোকার যে রকম মেলা-টেলায় থাকে। সেই জোকার ঘণ্টা বাজিয়ে নেচে-গেয়ে সবাইকে তাঁবুর ভিতর ঢোকাচ্ছে—মানুষজন, পশুপাখি, সব। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার আকাশ-তাঁবুর ভিতর কী খেলা গো?' তাহলে সে সুর

করে জবাব দেয়,

'সুখের খেলা দুখের খেলা
আলোর খেলা সূর্য্যিমামার
বাদলমেঘের বজ্রতালে
মনময়ূরের নাচের বাহার
সবার চেয়ে আসল খেলা
চক্ষু বেঁধে কানামাছি
যাকে ছোঁবে, সে-ই তোমার
না পারলে তো আমি আছি !'

গোপন কথা হল, ওই জোকার নিজে নাকি কোনোদিন তাঁবুর ভিতরে ঢোকেনি, তাঁবুর ভিতরে কি হয় সে আসলে কিছু জানে না।

এখন, বুক-ভরা অভিমান নিয়ে ভুতু ভাবলো, সে যদি বহু চেষ্টা করেও তার মাকে না খুঁজে পায়, তাহলে সে নিশ্চয়ই ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে তাঁবুর তলা দিয়ে বেরিয়ে সেই জোকারের কাছে যাবে। তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি যদি এই তাঁবুর ভিতর মানুষ ঢুকিয়েছো, আমার মাকে ঢুকিয়েছো, তাহলে এর ভিতর রাক্ষসী ঢুকিয়েছো কেন ? বলো, রাক্ষসী ঢুকিয়েছো কেন ?' যদি সে উপযুক্ত জবাব না পায়, তাহলে নিশ্চয়ই জোকারের হাতের ঘণ্টাটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে ভুতু সেই গাছতলায়, টুপ-করে-খসে-পড়া পাকা ফলটির মতো, ঘুমিয়ে পড়লো। আর, একটা স্বপ্ন দেখলো। দেখলো, ক্ষেতের আল ধরে চুপচাপ হেঁটে আসছে একটা বেড়াল, তার মুখে একটা আতাফল। আতাফল খেতে ভুতু দারুণ ভালোবাসে। সেই বেড়াল হেঁটে হেঁটে একেবারে ভুতুর কাছে এলো, আতাফলটা তার মাথার কাছে নামিয়ে রেখে ঠিক তার মায়ের গলায় ডাকলো, 'ভুতু !'

চমকে জেগে উঠলো ভুতু। এদিক-সেদিক তাকালো, কিছু দেখতে পেলো না। তবু তার কেমন যেন মনে হল, বেড়ালটা খুব কাছেই কোথাও আছে। এমন সময় তার হাতে ঠেকলো একটা জিনিস, অবাক হয়ে দেখলো, একটা পাকা আতাফল। সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো ভুতুর। যে গাছটার তলায় শুয়েছিল সেটা আতাগাছ হতে পারে একথা ভুতুর একবার মনে হলো, কিন্তু সে ঘাড় তুলে গাছটাকে দেখার কোনো তাগিদই অনুভব করলো না। পৃথিবীর সব গাছই যদি আতাগাছ হয়, তাহলেও-ও কিছু আসে যায় না।

এই আতাফল অন্যকিছু। মা তাহলে খুব কাছাকাছিই আছে। কোথায় আছে, দেখা দিচ্ছে না কেন ? আতাফলটা যত্ন করে কোঁচড়ে ভরে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ভুতু, কিন্তু তার মনে হলো দাঁড়িয়ে হয়তো ঠিক খোঁজা যাবে না, সবকিছু চোখে পড়বে না। তখন সে হামাগুড়ি দিয়ে, ঠিক যেভাবে বেড়াল বেড়ালকে খোঁজে, সেইভাবে গাছপালার ফাঁক দিয়ে, আকন্দঝোপের পাশ দিয়ে, এঁদো পুকুরের পাড় দিয়ে তার মাকে খুঁজতে লাগলো।

৩

সারা গ্রাম জুড়ে তখন, রাক্ষসীর খোলা চুলের মতন সন্ধ্যে নামছে। কুপি না জ্বালালে আর মানুষে কিছুই দেখতে পাবে না, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাঙকে ভাববে সাপ, সাপকে ভাববে ব্যাঙ।

ভুতুর ঠাকুমা ওদিকে সারাদিন দুশ্চিন্তায় ঘর-বার করেছেন, বিকেলে ভুতুর কাকা কাজ থেকে ফিরে আসার পরই তাকে পাঠিয়েছেন ভুতুকে খুঁজতে। ভুতুর কাকা এক দশাসই চেহারার জোয়ান পুরুষ, কিন্তু তাঁর মনটা ভারি নরম। তিনি পাগলের মতো ভুতুর সন্ধানে বেরুলেন আর সারা গ্রাম তন্ন তন্ন করে একটা গোয়ালঘরের পেছন থেকে হামাগুড়ি-দেওয়া ভুতুকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এলেন। ভুতু অনেক হাত-পা ছুঁড়লো, কাকুতি-মিনতি করলো 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মায়ের কাছে যাবো'। শুনে কাকার দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়লো, কিন্তু হাত শিথিল হল না।

বাড়ি ফিরে আসার পর ঠাকুমা ওকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে, কিন্তু ভুতু শক্ত হয়ে রইলো। ঠাকুমা বোঝালেন,

'ওরে পাগল ছেলে, রাক্ষস-রাক্ষসীদের সঙ্গে কি কেউ এঁটে উঠতে পারে ? যদ্দুর সম্ভব ওদেরকে এড়িয়ে থাকতে হয়। প্রাণপণে এড়িয়ে থাকতে হয়। এটাই মানুষদের একমাত্র কাজ। ভোরবেলা উঠোন নিকোতে হয়, সাজিভর্তি শিউলিফুল কুড়িয়ে আনতে হয়, সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে হয়। এরপরও যদি ওরা কারুর জীবনে হানা দেয়, তাহলে তার সম্পর্কে আর খোঁজখবর করতেও মানা। সে মরে গেছে বলেই ধরে নিতে হয়। তুই তোর মায়ের কথা ভুলে যা, বাছা। হেসে খেলে বড় হ', আমি যেন তোর মুখের আলোয় দুচোখ বুঁজি।'

এসব কথায় ভুতুর মন টললো না। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ যেভাবে কথা বলে, সেভাবে সে বললো,

'ওসব রাক্ষস-টাক্ষস বুঝি না, আমার মাকে আমি খুঁজে বের করবোই। মা ছাড়া আমার আর কে আছে বলো?'

তখন ঠাকুমা বললেন,

'কেন, এই যে আমি আছি। ছোটবেলা থেকে তোকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলুম—'

ভুতু বললো,

'তুমি একটা হাসিখুশি পাথরবাটি! তুমি আমার কেউ না।'

তখন কাকা বললেন,

'কেন ভুতু, এই যে আমি আছি।'

ভুতু বললো,

'তুমি একটা শক্ত-পোক্ত ঘরের খুঁটি। তুমি আমার কেউ না।'

তখন ঠাকুমা বললেন,

'তোর প্রিয় ফুলবাগানটা। ওটা তো তোর নিজের—'

ঠাণ্ডাগলায় ভুতু বললো,

'ওই ফুলবাগান জলপরীদের নাচের ঘাঁটি। ও বাগান আমার কেউ না।'

তখন সকলের সব কথা ফুরিয়ে গেল।

শেষরাতে, ভুতুদের ঘরের জানালায় একটা তোবড়ানো হলুদ চাঁদ উঁকি দিল। ভুতু জেগেই ছিল, সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। একটু হলদেটে রং-এর জ্যোৎস্না, যেন ঐ চাঁদের আলোয় তার মা হলুদ-মাখা হাত ধুয়েছে। মা চাইতো, লেখাপড়া শিখে ভুতু অনেক বড় হবে। অথচ ভুতু যে প্রতিদিন পাঠশালা পালিয়ে নদীর ধারের সরু রাস্তাটা ধরে চলে যেতো ভিনগাঁয়ের হাটে নয়তো বাগদীপাড়ার মাঠে, একথা-ও মা-র অজানা ছিল না। কিন্তু কখনো কিছু বলতো না, বকতো না। কেবল একাকিনী মায়ের হাসির মধ্যে কখনো একটু আবছা দুঃখ ফুটে উঠতো। ভুতুকে দেখলেই সেই হাসি লুকিয়ে ফেলতো মা। যেন ওই হাসি ভুতুর জন্যে নয়, বালাই ষাট, ওই হাসি যেন নদীর ধারের সরু রাস্তাটার জন্যে। এটুকু ভুতুর মনে পড়ে।

সে এখন ফিসফিস করে চাঁদকে জিজ্ঞেস করলো,

'চাঁদমামা, তুমি তো অনেক কিছু জানো। আমার বাবা রাক্ষসীর পেটের ভিতরেও তোমাকে দেখতে পাবে আশা করেছিল। তুমি আমায় বলতে পারো, আমি কি করে আমার মাকে ফিরে পাবো?'

শুনে চাঁদ একটুকরো রাতকানা মেঘ মুখের ওপর টেনে ভারি গোমড়া ভঙ্গিতে বললো,

'বলতে আমার বারণ, তবু তোমায় বলি, যে বেড়াল তোমায় আতাফল দিয়ে গেছে সে বেড়াল তোমার মা-বেড়াল নয়, এই বেড়াল ছদ্মবেশী রাক্ষসী। মনের কথা টের পেয়ে সে আবার শকুনের ঘুমের ভিতর থেকে জেগে উঠেছে। তুমি-ও তোমার বাবার মতো, এক মায়াচক্রান্তের শিকার হতে চলেছো। সাবধানে থেকো।'

চাঁদের মুখে এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে মাথায় আগুন ধরে গেল ভুতুর। তার ইচ্ছে হল ঐ আতাফলটা প্রচণ্ড জোরে চাঁদের মুখে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু সে টের পেল তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

৪.

সকালবেলা ভুতু গেল ক্ষেত পেরিয়ে নদীর ধারে। ছোট্ট নদী, টলটলে জল। সেই জলে মুখ দেখা যায়, ছোট ছোট ঢেউয়ের টানে মুখের হাসি, মুখের কান্না অচিন দেশে ভেসে চলে যায়।

জলে নেমে ভুতু গভীর একটা ডুব দিল। জলের তলা থেকে কুড়িয়ে আনল একটা রঙীন নুড়িপাথর। তারপর নদীর পাড়ে বালির ওপর পাথরটাকে বসিয়ে দিয়ে তার চারপাশে বালির দেয়াল তৈরী করতে লাগলো।

এমন সময় সেই বালির দুর্গে কার ছায়া পড়ল। ভুতু দেখলো, পেছনে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতমশাই।

'কি রে ভুতু, যাবি নে আজ পাঠশালে?'

'না।'

'আর কোনোদিন যাবি না?'

'না।'

'তাহলে ওই পাঠশালা আমি বন্ধ করে দি।' পণ্ডিতমশাই নিজের মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'তোরা সব ছুটির রাজপুত্তুর। তোদের কত কাজ। ফড়িং ধরা, কানামাছি খেলা, মা-কে খোঁজা, তোদের কত কাজ। তোদের চাই চিরকালীন ছুটি। আমি কী করে এই পাঠশালা চালাবো?'

ভুতু যে কখন সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে পণ্ডিতমশাই টের-ও পান নি।

টের পেলেন, যখন রাজার পেয়াদা খুঁজতে খুঁজতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পণ্ডিত-মশাইকে সেলাম জানালো, আর বললো,

'হুজুর, মহারাজ একবার আপনার দর্শন চান। যদি আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে যান।'

রাজার স্মরণ মরণ-বাঁচন। ভুরু কুঁচকে পণ্ডিতমশাই বললেন,

'কি ব্যাপার পেয়াদাভাই, কারণটা কি জানতে চাই।'

পেয়াদা গলা নামিয়ে পণ্ডিতমশাইকে বললো,

'সব কথা তো জানি না হুজুর, তবে রাজকন্যার মনে গুমোর, স্বপ্ন দেখছে উপর্যুপর। দেখছে যে এক কমবয়েসী ছোঁড়া নাকি কাকে খুঁজছে বনবাদড়ে ক্ষেতপাহাড়ে খুঁজেই চলেছে, কিন্তু পাচ্ছে না, আর তাই রাজকন্যার ভারি কষ্ট হচ্ছে। হাকিম-বদ্যি নিষ্ফল, মহারাজ গিয়েছিলেন তাঁর গুরু কাপালিকের কাছে, কাপালিক জপ করে বলেছেন নাকি যে এক বালক এই রাজ্যে দেবাসুর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করার চেষ্টা করছে, যার ফল হতে পারে ভয়ানক দুর্দৈব। তাই মহারাজ আপনার জরুরি পরামর্শ চান।'

চিন্তিত মুখে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'চলো।'

৫.

ভুতু এদিকে একটা রোগা একগুঁয়ে কুকুরের মতো খুঁজেই চলেছে। এই পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য আছে কিনা, বটগাছ আছে কিনা, কাজলাদিঘি আছে কি না, অত সব ভুতুর জানার দরকার নেই, সে খুঁজে পেতে চাইছে একটা বেড়াল। ক্ষ্যাপা, রোঁয়া-ওঠা একটা বেড়াল। তার মা।

গতরাতে চাঁদ যা বলেছিল সেই কথা মনে হলে বুকটা সীসের মতো

ভারী ঠেকছে ভুতুর। কথাটা সে মানতে পারছে না, ফেলতেও পারছে না। সেই বেড়াল যদি চাঁদের কথামতো সত্যি রাক্ষসী হয় তাহলে তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু যদি রাক্ষসী ভেবে ভুল করে সে তার মা-বেড়ালকে—, তাহলে কি হবে? ভাবতে-ও সারা শরীর পাথর হয়ে আসে ভুতুর, তাই সে কোনোরকম ঝুঁকির মধ্যে না থেকে নিশ্চিন্ত হতে চায়। কিভাবে সেটা সম্ভব? হঠাৎ ভুতুর মনে পড়ে আতাফলের কথা, কোঁচড়ে তখন-ও সে ফল অটুট। ভুতু ভাবে, বেড়াল যদি রাক্ষসী হয় তাহলে এ ফল বিষ। বেড়াল যদি মা হয় তাহলে এ-ফল অমৃত। কাজেই, এক কামড় ফল খেয়ে দেখলেই সব সন্দেহের নিরসন। এই ভেবে ভুতু আতাফলে দিল এক কামড়, আর আশ্চর্য হয়ে টের পেল, এই ফল বিষ বা অমৃত কোনোটাই নয়, এ একটি সত্যিকারের সাধারণ আতাফল। একটি সত্যিকারের সাধারণ আতাফল—এর থেকে বেশি আশ্চর্যের আর কি হতে পারে? তৃপ্তি করে ফলটি খেতে খেতে ভুতুর এই অভিজ্ঞতা হল।

সে দ্বিগুণ উৎসাহে তার মাকে খুঁজতে লাগলো।

খুঁজতে খুঁজতে দিন যায়। দিনের আবার সুদিন-দুর্দিন, সব মিলিয়ে জীবন যায়। ভুতু খোঁজে, পায় না, আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একদিকে কাকা, আর একদিকে রাজপেয়াদা, এই দুয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে দিন কাটায় যত্র-তত্র, রাত কাটায় পাঠশালার ঘরে। সেই ঘরে অনেক পুঁথি, অন্ধকারে ভুতু সেসব পুঁথির গায়ে হাত বোলায়, অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে ওঠে।

একদিকে ভুতুর মনে হল, এভাবে খুঁজে কিছু হবে না। এই জল, জঙ্গল, মাটি আকাশ এরা সবাই খুব ধূর্ত, দৃশ্যকে অদৃশ্য করে দেয়, তারপর কিছুই জানি না ভাব করে নিজেরাই দৃশ্য সেজে বসে থাকে। এদের মধ্যে থেকে কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। গল্পের বেড়ালকে গল্প দিয়েই ধরতে হবে।

তখন ভুতু প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে মিশে গিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে খুঁজতে লাগলো, কোথাও কোনো বয়স্থা মেয়ে এলোচুলে দাঁড়িয়ে আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে বেড়াল আসবে। ভুতুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু এভাবেও কোনো ফল হলো না। গ্রামের মেয়েরা আর কখনো দরজায় এলোচুলে দাঁড়ায় না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে, নিষিদ্ধ

হয়ে গেছে। দেশের মেয়েরা সাবধান হয়ে গেছে।

তখন ভুতু একদিন দুপুরবেলা কাকা যখন বাড়ি নেই এমন সময় লুকিয়ে ঠাকুমার কাছে গেল। ঠাকুমা বুড়ি, ভুতুর জন্যে কেঁদে কেঁদে আকালের গরুর মতো রোগা হয়ে গেছে। এখন ভুতুকে কাছে পেয়ে বুড়ির কি আনন্দ, সারা পৃথিবী-ও বুঝি সেই আনন্দ ধরে রাখার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা নয়। ভুতুও দুচোখ ভরে দেখলো, তাকে ফিরে পেয়ে ঠাকুমার ফোকলা মুখের হাসি। সেই হাসি মানেই অঘ্রাণ মাস আর পিঠেপুলির গন্ধ।

ভুতু ঠাকুমাকে বললো, 'ঠাকুমা, তোমাকে বয়স্থা মেয়ে সেজে এলোচুলে দরজায় দাঁড়াতে হবে সন্ধ্যেবেলা, যে করেই হোক, নইলে আমার মাকে ফিরে পাবো না।'

কথা শুনে ঠাকুমা থ'। 'বলিস কি রে ভুতু, এ কখনো সম্ভব। আমি এক হদ্দ বুড়ি, আমার চুল কোথায়, এই শনের দড়ি. চামড়ার ভাঁজে মরণ-থড়ি, চন্দ্র সূর্য চেষ্টা করলে-ও আমি কি আর যুবতী সাজতে পারি?'

অবুঝ ভুতু ঠাকুমার কোমর জড়িয়ে ধরে অনেক আবদার করলো. নিরুপায় বুড়ি কেবল অঝোরে কাঁদলো।

তখন ভুতু সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

৬.

একদিন হঠাৎ ভুতু দেখলো, একটা বেড়াল। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়েছে, জলের রং কালো, ঘরে ঘরে লন্ঠনের আলো। ভুতু বেড়ালটার দিকে পা টিপে টিপে এগুতে থাকলো। ভুতুর পায়ের শব্দে বেড়ালটা প্রথমে আস্তে পরে জোরে ছুটতে লাগলো। ভুতু-ও ছুটতে শুরু করলো। অন্ধকারে বেড়াল কোথায়, পথের ধুলোয় ঝোপের ফাঁকে কদাচিৎ কখনো বেড়ালের সামান্য ইঙ্গিত, সেটুকু-ও মনগড়া না সত্যি তা বোঝার সময় নেই। সেইটুকু নিশানা করে, সেইটুকু সম্বল করেই ভুতু ছুটছে।

আমবাগান পেরিয়ে, জেলেপাড়ার ভিতর দিয়ে, হোঁচট খেয়ে, উর্ধ্বশ্বাসে, ভুতুর সে এক জীবনপণ দৌড়।

রাজকন্যা তখন রোগশয্যায় উঠে বসেছে, পণ্ডিতমশাই কয়েদখানায়

সেপাইকে বলছেন আমায় খুলে দাও, মহারাজ উদভ্রান্তের মতো ঘোড়ায় চেপে চলেছেন কাপালিকের কাছে, সমস্ত রাজ্যের মানুষ শুনতে পাচ্ছে এক অদ্ভুত অচেনা ঘণ্টার আওয়াজ।

সমস্ত গাছ মাথা নুইয়ে শুনতে চাইছে দু'টি ছুটন্ত পায়ের শব্দ, সমস্ত জোনাকিরা দ্বিগুণ জ্বলে উঠে আলো করে তুলতে চাইছে পথ-বিপথ।

ভুতু ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ভুতু পৌছে গেল এমন একটা জায়গায়, যেখানে সে এর আগে কখনো আসে নি। সেই অচেনা পাড়ায় একটা গলির মধ্যে বেড়ালটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ততঃ ভুতুর তাই মনে হল। সে-ও ঢুকলো গলিটার ভিতর।

ঢুকে দেখে, সেই গলির দুপাশে সব হলুদ রং-এর দোতলা কাঠের বাড়ি, সেইসব বাড়ির দরজায় মেয়েরা সাজগোজ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকেরই এলোচুল। দেখে দারুণ উল্লাস হল ভুতুর।

হয়তো এতদিনে সে খুঁজে পেয়েছে আসল জায়গাটি, যেখানে একটি উন্মাদ বেড়াল, আর অসংখ্য টুঁটি।

রঙীন পোষাক-পরা হাসিখুশি ঐ মেয়েদেরকে দেখে ভুতুর মনে হল, কেউ যেন তাদেরকে বাসন্তী মেলায় নিয়ে যাবে বলে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গেছে। তাদের জন্যে ঘোড়ার গাড়ি ডাকতে গেছে। তাদের ঘর থেকে ভেসে আসছে আতরের গন্ধ, গানের সুর, আর ঘুঙুরের আওয়াজ। সেই গন্ধ, সুর আর হাসির ভিতর দিয়ে হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'একজন বয়স্ক পুরুষ, যাদের হাবভাব দেখে মনে হল, এরা ছোটবেলায় বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে সাপ দেখেছিলো আর ভয় পেয়েছিলো। এদের হাঁটাচলায় এখনো সেই বালককালের ভয়, হাতে সেই বালককালের ফুল।

এরই মধ্যে একটি মেয়ে খপ্ করে ভুতুর হাত চেপে ধরলো। ভুতু দেখলো, মেয়েটি সবকিছুই জানে। মেয়েটি ভুতুকে বললো,

'আমাকে তুই চিনিস? তুই কাকে এত খুঁজিস? কাছে আয়, ভয় পাস না………

আমি তোর মা এবং আমিই রাক্ষসী। আগুন থেকে, তুফান থেকে এসে রাত্রিবেলা আঁধারে মুখ ঘষি।'

এই বলে, মেয়েটি ভুতুকে কোলে তুলে নিলো। ভুতু বাধা দিল না।

বহুদিনের ক্লান্তিতে, ব্যর্থতায় সে অবশ, সে শুধু মেয়েটিকে বললো, 'তুমি আমায় বাসন্তী মেলায় নিয়ে যাবে?' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ'। ভুতু বললো, 'তার আগে তুমি আমার মা-বেড়ালকে খুঁজে দেবে?' মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ'। ভুতু আর কিছু বললো না। মেয়েটি তখন এক অদ্ভুত গান ধরলো, যেরকম গান ভুতু কখনো শোনেনি। সেই গান শুনতে শুনতে ভুতু, অনেকদিন পর, নিজের ছোট্ট শরীরটার আলো-অন্ধকারের ভিতর, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো।

৭.

ভুতুর গল্পের যেটুকু আমি জানি, সেটুকু এখানেই শেষ। কিন্তু মনে রাখিস, ভুতুর গল্প শেষ নয়। ভুতু আবার জেগে উঠবে, পাহাড় নদী জীবন মৃত্যু তোলপাড় করে তার মাকে খুঁজবে। সেই গল্প তুই বড় হয়ে তোর ছেলেকে বলবি। এইভাবে, যতদিন আকাশ-তারা আছে, চাঁদ আছে, ঠাকুমা আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, রাজকন্যা-পণ্ডিতমশাই আছে, ততদিন এই গল্প চলবে। আর আমরা সবাই, এই গল্পের ভিতর দিয়ে বাবার হাত ধরে বাসন্তী মেলায় যাবো, ফিরে এসে মায়ের পাশে চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়বো।

ভুতু তখনো তার মা-কে খুঁজে যাবে। আমাদের জানালায় জানালায় এসে সে গভীর রাতে উঁকি মেরে দেখবে, কোথাও তার মা-বেড়াল লুকিয়ে আছে কি না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সেই ছবিটা

তা হলে আর দেরি করে কী হবে? চলুন যাওয়া যাক!

লোকটি আমার দিকে সবুজ পাথরের আংটি পরা হাত বাড়িয়ে দিল। আমাকে টেনে তুলতে চায় নাকি? অতটা দরকার নেই, আমার এখনও যথেষ্ট মনোবল আছে। তবে এই বেতের চেয়ারের মাঝখানটা এমনই গভীর খোদলের মতন যে উঠতে একটু সময় লাগে।

উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি আমার চেয়ে সামান্য লম্বা। মাথার চুল পাতলা। চুড়িদারের সঙ্গে ঢোলা পাঞ্জাবি পরা, স্টিলের ফ্রেমের চশমা। ধারালো চিবুক। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, এই ধরনের চিবুক-ওয়ালা মানুষ আমার ঠিক হজম হয় না। এরা পদে পদে আমাকে ছোট করে। কথার মাঝখানে অকারণে এমন ভাবে হেসে ওঠে যেন আমি এতক্ষণ যা বলছিলাম তা মৃগী রুগীর বিলকিস ছিলকিস!

চটি পরার দরকার নেই!

হুকুমের সুরে লোকটি এই কথা বলায় আমি একটু দ্বিধা করলুম। সাতাশ বছর আগে আমার খালি পায়ে হাঁটা অভ্যেস ছিল, তার ওপর নির্ভর করা যায়? দেখা যাক।

বাইরে রয়েছে লোকটির মটোর বাইক। আমাকে পিলিয়ান সীটে বসার জন্য ইঙ্গিত করলো। মটোর বাইক আরোহীদের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব এসে যায়। হাত দুটি ছড়াবার ভঙ্গিই এমন, যেন জগৎ শাসন করতে চলেছে। সেই সঙ্গে গর্জন। মটোর বাইকে বুঝি সাইলেন্সার লাগানো যায় না? আমার ধারণা, ইচ্ছে করেই আওয়াজটা রেখে দেওয়া হয়েছে। ওদের কখনো হর্ন বাজাবার দরকার হয় না।

প্রায় চল্লিশ মিনিট যেতে হলো, অনেকটা দূর, শহর ছাড়িয়ে টাটকা বাতাসে, বৃষ্টির গন্ধমাখা মাঠের পাশ দিয়ে। এটা ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তা, আমার চেনা।

মাঝখানে কোনো কথা হলো না। মটোর বাইকটি একটি পেট্রোল পাম্পে

ঢুকলো। তেল টেল নিতে হবে ভেবে আমি নেমে দাঁড়িয়ে এক কোণে একটা নিম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাবার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি। তখনই বিকেলের আকাশ খুব নিচু হয়ে এসে একটা বিদ্যুৎ হানলো। মুখ তুলে দেখলুম বুলন্দ দরওয়াজার মতন একটা বিশাল দরজা খুলে গেছে, তার ওধারে স্বর্গনগরীর এক ঝলক দৃশ্য। বুঝলুম, ঐ বিদ্যুৎটি আমার ব্যক্তিগত, শুধু আমাকে দেখাবার জন্যই ঐ দৃশ্যের আয়োজন, আর কেউ দেখতে পাবে না।

লোকটি তা হলে মিথ্যে বলে নি।

মটোর বাইকটিকে এক পাশে রেখে লোকটি কাচে ঘেরা ঘরটিতে ঢুকে আমায় ডাকলো। সে ঘরের চেয়ার সব খালি।

এই পাম্পটা আপনার ?

লোকটি বললো, এটা আমাদের অফিস ঘর। তারপর সে পেছন দিকের একটা সবুজ রঙের দরজা খুলে বললো, আসুন !

আমার সামান্য একটু দ্বিধা হলো। ফিরতে পারবো তো ? কোনো জায়গায় যাওয়ার মধ্যে যতই নতুনত্ব থাক, ফিরে আসাটাই সবচেয়ে লোভনীয়।

লোকটি আমার দিকে ফিরে হাসলো। সেই কথার মাঝখানের হাসি। বললো, ঠিক আছে, সিগারেটটা শেষ করে নিন।

এ রকম কত গুপ্ত অফিস আছে আপনাদের ?

প্রশ্ন করা শেষ হয়ে গেছে, তাই না ? এই রকমই তো শর্ত ছিল !

সবুজ রঙের দরজার ওপাশে সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে। একটি বাঁকে একটি মার্কারি ল্যাম্প। সেই পর্যন্ত এসে ধারালো চিবুকওয়ালা লোকটি বললো, শুভযাত্রা ! সিঁড়ি একটাই, আপনার পথ ভুল করার উপায় নেই।

বুঝলাম, এবার সে ফিরে যাবে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করা গেল।

নামতে নামতে মনে হয়, ফেরার সময় এতগুলো সিঁড়ি উঠতে হবে। ফেরার চিন্তা কিছুতেই মাথা থেকে যায় না। বুকে হাত বুলিয়ে নিজেকে একটু আদর করলুম।

কিসের গন্ধ আসছে ? চাঁপা ফুলের ? মাটির তলায় কী করে ফুলের গন্ধ আসবে ? কিন্তু মনটা বেশ উৎফুল্ল লাগছে।

আর একটি সবুজ দরজা। সেটি বন্ধ থাকলেও তার ওপাশে আমাকে যেতে হবে, এ তো জানা কথাই। দরজাটি ঠেলতেই দেখা গেল, মেঝেতে দুটি রমণী হাঁটু গেড়ে বসে আছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে, তাদের চুল পিঠের ওপর মেলা, তাদের পাশে ছবি আঁকা দুটি তালপাতার পাখা। ওদের শরীরে সুতো, নাইলন, উল, পাসক, পাট, পলিয়েস্টার কিছুই নেই।

আমি মনে মনে বললুম, বাঃ! কিন্তু দু'জন কেন? এক ঘরে একাধিক নারীর জায়গা হয় না। আমি অস্বস্তি বোধ করি। যদিও আমি খেলতে আসিনি, তবু একাকিনীর মাধুর্য আমাকে সব সময়েই টানে।

মেয়ে দুটি চোখ তুলে দ্বৈত কণ্ঠে বললো, খুলে ফেলুন!

জামার বোতাম, কোমরের বেল্ট, প্যান্টের জিপার ···এক মিনিটও লাগে না। এই জন্যই আমাকে খালি পায়ে আসতে বলা হয়েছিল। ঘড়ি ছাড়া। না, আমার লজ্জা খুলে ফেলার দরকার হয় না।

তালপাতার পাখা দিয়ে ওরা দুজনে আমাকে বাতাস করতে লাগলো। সেবাদাসীর মতন নয়, পূজারিণীর মতন নয়, নার্সের মতন। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, তোমরা কত মাইনে পাও?

কিন্তু এখানে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে না।

পাখার বাতাসে এরা কি আমার বাসনা-কামনা উড়িয়ে দিতে চায়? কিন্তু আমার লিবিডো অতি প্রবল। হাতের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওদের এক একজনের বাঁ ও ডান স্তনের আকৃতি বদল লক্ষ্য করি মন দিয়ে। রোমশ যোনিদ্বয়ের দিকে কোমলভাবে তাকাই। আমি এখানে খেলতে আসিনি। তবু আমার উত্থান হয়, আমি হেসে উঠি।

আসলে ওরা আমার ঘাম মুছে দিচ্ছে।

হঠাৎ সে ঘরের আলো নিভে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম স্থির ভাবে। পরীক্ষা করা হচ্ছে আমাকে নিয়ে? এইসব ছেলেমানুষী পরীক্ষা, এর জন্য আমি কাজ নষ্ট করে আসিনি! একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছেতে ছটফট করছে বুক।

একটু পরেই আবার আলো জ্বলে উঠলো। একটি নারী অদৃশ্য হয়ে গেছে, অন্যজন ঠিক আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটু রভসের ছোঁয়া লাগানো হাসি নিয়ে সে বললো, এসো।

আমি জানি, অন্য দিকে আর একটি দরজা আছে। আরও দূরে যেতে হবে।

অন্যদিকের দরজাটি খোলা। এবারে সমতল পথ। দু দিকের দেয়ালে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল। কেন যেন মনে হলো, এই রাস্তায় সাপ থাকতে পারে কিংবা কোনো বালক কন্দর্প আচমকা ছুঁড়বে তীর। পার লাগের্কভিস্টের গল্পের মতন কিছু হবে নাকি? পিছন ফিরে দেখি নারীটি আমার সঙ্গে আসেনি। দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, পেছন দিকে উজ্জ্বল আলো, তাই তার মুখ নেই, শুধু রেখা শিল্প।

অন্য নারীটি কোথায় গেল? সে কি এগিয়ে গেছে? আমি ভেবেছিলুম, এই নাটক হবে নারী ভূমিকা বর্জিত। তবে, মোটামুটি সংলাপহীন।

ইস্কুলের ঘণ্টার মতন একটা শব্দ আমাকে সচেতন করে দিল। সামনেই উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি পুরুষের দেহ। ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, শুধুই দেহ। মুখটা উল্টে দেখারও দরকার নেই। যেন আগে থেকেই জানা ছিল, এই শব আমাকে ডিঙিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমার পা আটকে গেছে। ডিঙোতে গেলেই যদি, এই শব উঠে বসে? যদি বলে, খোকা, ফিরে আয়!

আমি চোখ বুজলুম। এই প্রথম আমার বুকে উথলে উঠছে বাষ্প। দেয়াল চোঁয়ানো জল ছিটকে গায়ে লাগছে মায়ার মতন। এখনও একছুটে ফিরে যাওয়া যায় ঐ পিছনের দরজায় বাহু মেলে থাকা নারীটির কাছে।

চোখ বুজেই আমি একটা লাফ দিলুম। বেশ জোরেই। হুমড়ি খেয়ে হাঁটুতে একটু চোট লাগলো। সম্ভবত নুনছাল উঠে গেছে। কিন্তু সেই শারীরিক জ্বালা মনকে শক্ত করে।

এবারে দ্রুত এগিয়ে যাই। এটা নরক নয়, আমি শয়তানের খোঁজে আসিনি। এটা মহাশূন্যে যাবার গোপন সুড়ঙ্গ নয়। এটা একটা মাটির নিচের রাস্তা। মাঝপথে নগ্ন নারী-টারি রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

প্রথম নারীটি অদৃশ্য হয় নি, সে আগে থেকে অনেকটা এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছে একটি বাগানের সামনে। এখানে স্বাভাবিক আলো। দেয়াল শেষ হয়ে গেছে, তবে কি আবার উঠে এসেছি ওপরে, এই বাগানের সব ফুল হলুদ রঙের! ছোট ছোট স্বাস্থ্যবান গাছ। ওপরের গাঢ় নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, এখান দিয়ে কোনোদিন বিমান যায় নি। এখানে দিগন্ত ঝাপসা।

মেয়েটি তার হাতের তালপাতার পাখা নিয়ে বাতাস করতে এলে আমি *বললুম, থাক আর লাগবে না।*

সে জিজ্ঞেস করলো, পারবে ?

এবারে আমি আর তার সম্পূর্ণ শরীর দেখি না, শুধু চোখ দেখি। দেখলেই বোঝা যায়, এই নারী এখনও জননী হয় নি। তার চোখের তারায় ঝিকমিক করছে একুশ বছরের দুঃখ। তার ভুরু উড়ন্ত বালিহাঁসের মতন।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ, পারবো।

সে তার ডান হাতের পাঞ্জাটা তুলে ধরলো আমার মুখের সামনে। শিশির ভেজা স্থলপদ্মের মতন রক্তাভ। অন্য কোনো সময় হলে আমি ওর আঙুলে চুমু দিতুম, কিন্তু আমার সে সময় নেই।

সে আমাকে জায়গা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে কাতর মিনতি করে বললো, ফিরে এসো!

আমি কঞ্চির বেড়া সরিয়ে ঢুকে পড়লুম বাগানে।

অনেক ফড়িং ওড়াউড়ি করছে ফুল রাশির মধ্যে। গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে সরু পায়ে চলা পথ। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা জলের ধারা। এখানে সমস্ত ফুলের রং হলুদ কেন? এদিক ওদিক তাকিয়েও আমি আর অন্য কোনো রং দেখতে পাইনি। মনটাকে খুব একাগ্র করে অন্য কোনো রঙের চিন্তা করি। মনে পড়ে না।

কিছু দূর যেতেই আবার ঝলসে ওঠে বিদ্যুৎ। আকাশের দিকে চোখ চলে যেতেই একটুখানি সরে যায় নীল পর্দা। আমার বড় সন্তুষ্ট লাগে, ইচ্ছে করে গান গাইতে। ঠিক জায়গায় এসেছি, ঠিক জায়গায় এসেছি। ওরা তাহলে জানে।

সেই বিদ্যুতের মশালেই আমি দেখতে পাই শিশুটিকে। জলধারার পাশে সে ঘুমিয়ে আছে। হাতে কাদা মাটি মাখা, ন্যাংটো। তার মাথার চুল রেশমের মতন, ঘুমের মধ্যে হাসছে সে কোনো স্বপ্ন দেখে, ঝিলিক মারে তার দুধ সাদা দাঁত।

আমি বসে পড়ি সেই শিশুটির পাশে। আঙুল দিয়ে ভিজে মাটিতে সে একটা ছবি আঁকতে আঁকতে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। এমন সরল ঘুম আমরা জানি না।

আমার সারা গা কাঁপতে থাকে। সমস্ত রোমকূপ দিয়ে যেন বেরিয়ে আসতে চায় আত্মা। মাথার মধ্যে উথাল-পাথাল করে সারাটা জীবন।

ঐ ছবিটা আমায় সম্পূর্ণ করতে হবে॥

সিদ্ধার্থ বসু

ভ্রূণ

১ : স্বপ্ন কুশীলব ঐ আঙুল

গতকাল এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এসেছিলো, ধন্যবাদ। অতয়েব সন্ধ্যের আগেই ১৪৪ ধারা সহ কারফ্যুও জারি। অনুষ্ঠানে কোনো ত্রুটি থাকবে না। সেনাতলবের কথাও ভাবা হবে। দাঙ্গায় জনশূন্য শহরতলির পথঘাট, ঝাঁপফেলা দোকান সব, হঠাৎ দু একটা দৌড়নেশাড়ু কুকুর—দৃশ্য ক্রমশঃ সাজানো হতে থাকে যেন। যেন ফটো তোলার ক্লিক্ শব্দটুকু যা' ঘাটতি। জুট মিল ও ময়দা কলে নাইট শিফট্ বন্ধ। তবু, অয়াচটাওয়ার। তবুও, হাইওয়ে নং পাঁচ লাগোয়া ঐ প্রিয় হোগলাচালা ভাটিখানা আজ কেন ফাঁকা, হতবাক। মদ ফুরোনো বোতলে বন্দী নীল মাছির বোঁ বোঁ পাখা ঝাপটানো। নাহ্, এই প্রলোভন, এই প্রবৃত্তি, দেখা গেলো ক্লান্তিকর, অশেষ। বর্ণনা-মূলক লালা ও স্বেদে মাখামাখি মগজ, তাই গল্প লেখকের বড়ো ঘুম পায়। আপৎকালীন মানসকল্প এ'র কম হবে, কোনো পূর্বাভাস কখনো ছিলো না। হলো। সচেতনতা ও সংকেত পাঠালো, 'কাল সকালে পাপ্নকে নিয়ে ক্লিনিকে যেতে হবে'। যেতেই হবে?

'তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছো'—কে বলেছিলো? মৃত্যু, মৃত্যু! 'একান্ত ব্যক্তিগত'—শীলমোহর ছাপা হলুদ লেফাফা ছিঁড়ে এ ভাবেই কি যৌথ মৃত্যু? কোথায়, কোনদিকে মৃত্যু? লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়। মৃত্যু সুন্দর। মৃত্যু কুৎসিত। কিন্তু কোথায়? টানা লাল মেজের ঢাকা-বারান্দায় তিনটে খালি বেতের চেয়ারের আত্মমগ্নতা। থাকা। সেই ফাঁকা চোদ্দনম্বর প্ল্যাটফর্ম, যেখানে শুধুমাত্র মালগাড়ীর আসা-থামা-ছেড়ে যাওয়া। অপেক্ষায় ছিলাম তো! সকাল ১০টা ১৫ দেখা হলো। কোনদিকে? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়া, আজকাল পথ মানে সুড়ঙ্গ, সিঁড়ি বেয়ে আসা। রোদ হাওয়া ধুলো অতি স্বাভাবিক, আকাশের নীচে বাস-টার্মিনাস। গন্তব্য হয়তো থাকে, অথচ জানা থাকে না। পৌঁছনো

কি চাই-ই ? দুর্ঘটনা চাই। তবু ইদানীং কি ভীষণ হিংস্র দ্রুত-পেঁছনোর দ্বৈত খেলা। আসলে বিবমিষা। বুঝি, ঘৃণা।

খোঁড়ো। খোঁড়ো। খোঁড়ো। বেজে যাক সতীচ্ছদপর্দা ছিঁড়ে সাইরেন। মজদুর, হে খালাসী—চিরদিন কি থাকে এই বেলচার চ্যাটালো থাবা, উভমুখী জিভ গাঁইতি, উত্থিত শাবল যা' লিঙ্গ ভেদে পুং। বাবুরা বলুক না, 'শালার কোনো কালচার নেই। বাৎসায়ন ছাড়া পেরেক ও তক্তার কলা-বিহীন একি পরিণতি !' যদিও ভোরে নিশ্চিত দেখা যাবে, সাইরেন শব্দে-ধড়মড়-জেগে ওঠা তাদের সার বেঁধে মাথা নত হেঁটে যাওয়া কারখানার নীল ফটকের দিকে; কার্ড পাঞ্চ, নইলে দিন খোরাকি বন্ধ্। লালশালু নিশান উড়িয়ে নেতারাও বলে গেছেন, 'ভাই সর্বহারা, তোমাদের সংগ্রামের পথ চিনে নিতে হবে'। এখন তেরচা পুবরোদ দীর্ঘায়িত ছায়ারা শ্রেয় পথপ্রদর্শক ! নাছোড়বান্দা ছায়ারা শরীর ঘিরেই আমৃত্যু। হায়, বেগুনি রং ছায়া……।

রোজই ভোর হয়। তেমন হয়েছিলো। বড়বোনের হাত থেকে হাতল-ভাঙা কাপে চা। বিস্কুট চলনসই মিয়োনো। সুস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ভোলার জন্য কোনো চেষ্টা লাগেনা। স্বয়ংক্রিয়। প্রাত্যহিক রেনেসাঁ! এই বাসী বিছানায় জুড়োনো আধকাপ চা, কে হাতে গুঁজে দিয়েছে বইয়ের একটি ছিন্নপাতা। এই গ্রন্থপ্রীতি আজো ? শৌচকাগজের পরিবর্তে যা' হয়তো ব্যবহার্য হবে একদিন। বড় অক্ষরে শিরোলিখন ঃ—

THE TIME OF THE ASSASSINS

এবং কা'র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পৃষ্ঠার কটি বরাবর একটি বাক্য লাল দাগানো। হুবহু উদ্ধৃতি দিই ঃ—

'Let us refine our fingers, that is all our points of contact with the external world'। চা ক্রমশঃ কি তরল সবুজ অ্যাবস্যাতে, বিস্কুট ইতিমধ্যে বুড়ো আঙুলের রূপ নিলো। কামড় দিয়ে, কষে রক্তের ছোপ, ভাবি, কেন ধনুর্বিদ, কে একলব্য ? হেরে যাবো আমিও ? চারপাশে অসহ্য বাস্তবতাও মেনে নেবো একদিন ? ফ্রেম ছাড়া কম্পোজিসন ! এক মামুলী সকালে কারণপারম্পর্য বিনা এ'ভাবে অন্ধ ও হাবা হয়ে যাবার আকস্মিক নিয়তি নিয়ে জন্মেছিলাম। স্মৃতিহীন হওয়া কতো ভালো ছিলো। ভালো কি ছিলো আয়নার সামনে ভার্জিন বালিকার হাড় কাঁপানো নগ্নতা ? ভালোবাসা ফুরোলে যখন জেনেছি, অনেক দেরী হয়ে

গেছে। অনেক।

—তোর কি দুঃখ থাকতে নেই? —দুঃখ্‌খো? (অবাক স্তব্ধতা) ও, ইয়েস্‌…। আছে। সো টিপিক্যাল! মেয়েদের যেমন হয়…মাসে মাত্র পাঁচ দিন।

ফলতঃ, পাপুনের ১৭ বছর ৯ মাসেই দুঃখ মোচনের দায়িত্ব কেউ না কেউ নেবে, এবং নিয়েছিলো। কি যুক্তিসঙ্গত, কি ভয়ানক নৈতিক। এ'মাসে বালক ভৃত্য চিরকুট ও দশ টাকা নিয়ে যায়নি ওষুধের দোকানে। আমি দরজার শর্ত বুঝিনি কখনো। কেবল রাতের সুন্দরী জানালা, ঐ হাওয়ায় ওড়া খোলা সোনালী চুল, ঐ বিবাহিতার সুখশিহরিত শীৎকার—পৌনঃপুনিকতা থেকে কখনোবা হাত বাড়িয়েছি সদ্যনারীত্বের শূন্যতার দিকে। সেই আকন্দ-ফুটি-ফুটি সময় হতেই কদাচিৎ। এত অভিজ্ঞ বিবেচনা সত্ত্বেও, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি ঘোষিত হলো, তোর সেচপ্রকল্প বাতিল। এ'হলো আমলাতন্ত্রী লাল ফিতে বাঁধা কয়েকটি দিন, কয়েকটি রাত। দুরাশাকে শুইয়ে এসেছি নিরাপদ ঘড়ির পাশে, তখনই কুঠারের ঘায়ে দু'টুকরো হলো মিনিটের বড় কাঁটাটি। আমার কাজ বাকি, বরফের ওপর ছেনিবাটালি দিয়ে এপিটাফ খোদাই করা। 'দেখিস, মাত্র ন' মিনিটেই… যন্ত্রণাহীন সর্বাধুনিক পদ্ধতি…'। খুকি, ভয় পায় না। পাপ? পাপ শব্দটার পরে জিজ্ঞাসাচিহ্ন।

ঐ এঁচড়ের ফালিটি—আপাতভারী, হাবাগোবা ও শ্বেতস্রাবময়। অবশ্য শরিকী, অবশ্যই এজমালি ভোগদখল স্বত্ব। একটুকুও ক্ষোভ ছিলো না কেননা, আমাদের আড়াই বছরের টুকুনসোনা সেদিন ফাঁস করে দিলো: 'রাত্তিলে মায়েল অ্যাক্‌তা ঘোঙাই আমাল্‌, অ্যাক্‌তা ঘোঙাই বাবাল্‌' ঘোঙাই…? হোঃ হোওঃ হোঃ…। সে' ভাবে ভাগাভাগি নিয়ে আমার ছিলো সরু আলের দু'পাশে নরম মুথা ঘাস। বেহালাছড় আঙুলের টানে সুর্যবিজড়িত ফুলও ফুটতো। দু' দিগন্তে ছড়ানো উরু, কমলাকোয়া ঠোঁট, আপেলবাগানে কাঠের জুতো পায়ে কে হেঁটে গেলো? আমড়া পোড়ার গন্ধ। চলন্ত ট্রামের গায়ে বিজ্ঞাপন: 'মেয়েদের মুখের হাসি অটুট রাখে—অশোকারিষ্ট'। ভোরের নির্জন রাস্তায় দাঁড়ানো সাদা এম্বুলেন্স দৈবপ্রেরিত, দু'উরুর চঞ্চল—জব্দ সেবা বেশ ফর্সা। রাজভবনের পাঁচিল ঘেঁষে যেতে যেতে, অসময়ে কোকিলের ডাক শুনে, উফ্‌ গায়ে-জ্বালা-

ধরানো জ্যোৎস্না, থমকে দাঁড়ানো। মনে কি পড়ে? লজ্জায় গালে রাঙা ছোপ। তবু, আমি দায়ী নই। আমার যে এখনো বিষে আস্থা আছে। ধমনীতে রক্ত ও দুধ। মদের গেলাস ঠোঁটে তুললে গোলাপের গন্ধে আমারো মনে পড়ে। সামান্যই স্মৃতি, সামান্যই বিস্মরণ।

শৈশব ছিলো কিংবা আদতে ছিলোনা। মামাতোবোনেদের ছুটির দুপুর সমকামী সংঘ। একটা আস্ত সমুদ্র আমার নিজস্ব। বাগানবাড়িতে সতরঞ্চিপাতা ছাতে বিকেল, গ্রীষ্মের লেবু সরবত। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, মা-কে লাল টুক্‌টুকে চটি উপহার দেবো। বিয়ের পরেই যে স্বপ্নাদি পাগল হয়ে গেলো, তা'র গান। হাওয়ায় কথা শোনা যায়। প্রথম হত্যাকারী— কেইন, কেইন....।

—এ্যাবর্শন ইজ আ মেটাফিজিক্যাল মার্ডার

—কোট্‌ করছিস? সার্ত্র! বাঃ বাহ্‌

—তখন বলেছিলাম ইন করিও না....শুনলে না তো!

—ফোর্সফুল অ্যাগ্রেসন্‌....প্রতিরক্ষা দপ্তরের আর কি কাজ

—মজা লুটছো? তোমার যদি হতো....

—আমার?

—কি বিশ্রী লাগছে....শারীরিক পেইন ছেড়ে দাও, তবু মানসিক.... মানে মেণ্টালি

—অপরাধবোধ? অবৈধতা? প্রথম দিন থেকেই তোদের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা, বৈধতা প্রশ্ন কে তুলবে?

—এখনো মজা! শয়তান, বেইমান, রিয়্যালি খুনী....আ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারার্‌

—থ্যাংক য়্যু ফর্‌ দা কমপ্লিমেণ্ট

—উফ্‌। তোমার জন্য আজ এই কণ্ডিশন্‌....আর তুমি

—আমার জন্য? তাই বুঝি! তুই সংবিধান পড়েছিস? পুরুষের শরীরে গোপনতা, কখনো কি বুঝবি না? ভুল বোঝা? প্রাককৈশোর থেকে গুপ্ত সংগঠনে বেড়ে ওঠা আমার শরীর। নির্লোম পিউবিসে আনাড়ী রেজার টেনে আমিও প্রার্থনা করেছি, তাড়াতাড়ি বড়ো করে দাও। প্রত্যেকের মতো। গৃহশিক্ষকের কাছে সদ্যরপ্ত হস্তমৈথুনের হোমটাস্ক খাতা। প্রত্যেকের মতো। তবে কেন....? আজো আমার জীবনের সেই নিঃসন্তান দম্পতি, যারা জল ফুটিয়ে পান করে, যারা বিয়ের এগার বছর

পরেও সপ্তাহে চারবার 'ভাগ্যলক্ষী'-লটারীর টিকিট নিয়ে বিছানায় যায়, আজ ঠিক নম্বরে নম্বর মিলবে! এ'ভাবে যৌবনও যায়। তখনো কবিতা-লেখা শুরু করিনি। যৌবন আসলে স্বাস্থ্যবান জানোয়ার মুখটেপা স্মিত হাসি ছুঁড়তে পারে। বারংবার অভিজ্ঞতাকে সাবলীল দুঃসাহসে হাতছানি দিয়ে ডেকেছি। তুমি এলে, দূর্বা।

যখন আসি, তখন রোদ এত জমাট স্বচ্ছ, সাঁতরাতে হয়েছে। তারপর, আকাশ থেকে আলকাতরা ঝরলো। অগুনতি কৃষ্ণসাপ শুষে নিলো রাস্তার শুকনো ধুলো। পদছাপ মুছে যায়। যেন উত্তরসূরী অনুসরণের দিকে না যায়। শুধু আততায়ী গন্ধ শুঁকে পেছনে পেছনে। সর্বদা, সর্বত্র।

আমাকে দেখুন। আমার প্রতারণা, আমার কাপুরুষতা প্রমাণের জন্য একটিও তদন্ত কমিশনের প্রয়োজন নেই। বাস রাস্তার ওপরে, গোলাপী দোতলার এক-ফালি পার্টিসানখণ্ডিত ঘরে, এই মুহূর্তে কোণের চেয়ারে বসে আছি এক্স-ওয়াই নিয়ামক অক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অতিসরল সংস্থান। চেয়ে থাকি, মানুষটির ডান হাতের আঙুলগুলির দিকে; বাঁ হাত এমনিই টেবিলের আড়ালে। বিশেষ উপলক্ষ্য হলো, মধ্যমা ও তর্জনী, যাদের ফাঁকে চুরুট জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগে পাপুনকে অন্য ঘরে নিয়ে গেছে, এখনো সেখানে। একটি চিতা জ্বলে ওঠে। নির্বাপিত মৃত আগ্নেয়গিরির খোলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে চাপা গোঙানী। প্রধান কুশীলব তাহলে ঐ দু'টি আঙুল—মধ্যমা ও তর্জনী। যখন প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য পার্টিসানের অপর পারে, মেয়েলি মূত্রত্যাগের ঈষৎ শব্দে আড়মোড়া ভেঙে জন্তু হাই তোলে। তারপরেই নিশ্চিত, দু'টি আঙুলের মধ্যে যে কোনো একটি স্বস্থানে, এবং রুগিণীকে উঠে বসতে বলা হবে। এ'পারে ঘোষিত হয়, এক মাস আঠারো দিন। উনিশ-বিশ নেই। তখন থেকেই চেয়ে আছি আড়চোখে, চৌবাচ্চায় পোষা অক্টোপাসের দাঁড়ার মতো আঙুলের দিকে। এই আঙুল প্রকৃত এ্যাবর্শনিস্টের।

চৌমাথাকে বিশ্বাস করা চলে না, বহু কারণ আছে। চৌমাথায় পেঁছে হাঁটা শ্লথ করে পাপুন, প্রায় নিজেকে শোনাতে স্যালিলকি শুরু করেছিল। শেষাংশ শুনবো না ভেবেও শুনে ফেলি : '....একা নিয়ে যাবে অন্য ঘরে.... সজ্ঞানে....কি যে করবে....(হঠাৎ স্বর স্পষ্ট) আমার কান্না পাচ্ছে'।

—'কাঁদো....মানে কাঁদ্। কাঁদলে জানিস কি দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়'।

এবং বাস্তবিক, গাল বেয়ে নামতে দেখি ধারা। অশ্রুবাহিত চোখ থেকে গলে ভেসে আসে বাদামীর কেন্দ্রে যে পিউপিল। ডানচেটো বাড়িয়ে কালো-মণি দু'টি বাঁ বুক পকেটে রাখি। এতদিনে বালিকা তাহলে চক্ষুষ্মতী, তাই জানলো ভালোবাসা। ভ্রূণ মোচন পদ্ধতি আমি পুস্তিকা পড়ে জেনেছি।

পঞ্চম পৃষ্ঠা অব্দি এই গদ্যটা পড়ে দূর্বা: 'একী বাড়াবাড়ি! লোকজন পড়ে ভাববে আমিই....' সেদিন আবার, আমার মুড-অফ্ সকাল। ছন্নছাড়া কা-কা-কা শব্দের মাঝে নিশ্চুপ বসে মুখোমুখি দু'জনে। বাঁজা নিভৃতি। গত বিকেলেই সোমার অন্তর্দেশীয় নীল ডাক এসেছে। দ্বৈত ভ্রমণের নিমন্ত্রণ? কয়েকদিন আগে, আমাদের শহরতলিতে নতুন সেতু উদ্বোধন করলেন পুরমন্ত্রী। নবনির্মিত এই ঢালু যোগাযোগ, কার না ভালো লাগে। ভালোত লাগবেই, পথে পড়ে থাকা রশ্মিবিম্বিত উজ্বল সিকি-আধুলি হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিতে। বিরতিহীন নবনব মুদ্রায় ভরে ওঠা পাত্র, গঠনও হেলেনিক। যেমন ধরো, তুমি কোনোদিন বেঁগড়বাই করলে, ভেবেছি, তোমার মেজবোনই প্রণয়ী হবে কথা ছিল—এ'মত নিয়মেই সেজও—কিন্তু ছোটটির (এখন বয়স ১১) সঙ্গে বহুদিন অবিকল্প বাগদত্ত আছি। মধ্যবিত্ত নীতিবোধসহ যেতে হয়, সাধারণতঃ কর্ডলাইন লোক্যালে। স্বীকার করি, চোলাই-য়ে জিভ শানাতে। সত্তর দশকের শ্লোগান, ভাগচাষী রেকর্ডিং বি.ডি.ও. আপিস থেকে সুফলা সার, শ্যালোর ঘণ্টায় ভাড়া কতো—এসব ভুলি নাই এখনো, কতোদিন ভট্‌কিবাজি? স্বপনকুমার কুমারী গাঁগঞ্জ লুটে দিলো রে। আর, মেন লাইন বলতে, বাবার আঙ্গুল ধরে শেওড়াফুলি—স্টেশন রোডের ময়রা, শালপাতার ঠোঙা-ওপচানো ক্ষীরমোহন। আহা। নামটির এটেমোলজি? এই মাত্র ভ্রমণকাহিনী এবং সোমা। দূর্বা কি জানে পাপুন কে? মাংসালো ক্ষেত চিরে ছুটছে কুঝিকঝিক ন্যারোগেজ। ইচ্ছাপূরণ আর কি!

দূর্বা ও সোমা দু'জনেই বেশ শৈশবগ্রস্ত আজো, গেটের মুখে করবী, যুঁই, ইত্যাদি। পরে জানা গেল, দু'জনেই উষাগ্রামের মিশনারী পাঠশালা থেকে সোজা কলকাতায়। তা-ও ইংরিজি সাহিত্যে ষাম্মানিক শ্রেণীতে। 'গায়ের রং মরে যাচ্ছে'—আশংকা নিয়ে কাপ কাপ কালো কফি খেতে হয়। খুচরো বিপ্লব ও ইতিহাস। শহীদ হবার উচ্চাভিলাষ কি দোষের? মিশ্র

নিবিড় মাছ চাষ। পন্থনগরের বীজ। 'আমরা বাঙালী'। মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের নিষ্কর জাগীরদারি। সন্তর্পণ আঙুল গলিয়ে দিয়েছি খাঁচার ভিতর, টিয়াপাখীর ঠোঁটটি লাল, ঠুকরে দিলে! বেগমপুরের হাত তাঁত, উৎকৃষ্ট বয়ন। কিংবা জ্যাবড়ারিলিফের হাতছাপাই এচিং। খোকা, সাহিত্য করে কি হয়? দশতলা ফ্ল্যাটের বাথরুমে কিউরিও র‍্যাকে 'রীডার্স ডাইজেস্ট', কিংবা পঞ্চাশ ডিঙোলেই, সেরিব্রাল বা করোনারিতে অন্ততঃ দু'বার মাসখানেকের জন্য বেলভিউ-এ, নচেৎ সম্মান থাকে কি করে! ইতিমধ্যে, সংবেদনদা-র পোস্টকার্ড এসেছিলো—'তুমি একটা গদ্য পাঠাও। পরীক্ষামূলক গল্প বা গদ্য—যা' মনে আসে'।

সেতুর ওপর দূর্বা ও আমি। যে' ভাবে দাঙ্গা শুরু, সে'ভাবেই শেষ। এই হয়। আজ বিকেলে ময়দানে সর্বধর্মীয় প্রার্থনাসভা ডাকা হয়েছে। খবরকাগজে ভাষায়, অবস্থা আয়ত্তাধীন, শান্তিপূর্ণ। কি চেয়েছিলাম, কি চাইনি! দূর্বা, তোমার মা-কে আমি ভালোবেসেছিলাম। কতটা সাম্প্রদায়িক? চোখের সামনে যবনিকা, একখণ্ড নিকষ অন্ধকার—যেখানে নিহিত আমাদের প্রেম অপ্রেম জেহাদ বশ্যতা ক্রোধ ঘৃণা মোহ অভিমান উদাসীনতা যৌনতা অহংকার বান্ধবপ্রিয়তা একাকীত্ব মমতা উচ্চাকাঙখা এমন কি মৃত্যু এবং তা'র সপ্তরঙ স্পেকট্রাম। তবু বলবে, শিল্প নিরপেক্ষ, সার্বজনীন, নৈর্ব্যক্তিক। সেই খণ্ড-অন্ধকার নিঃশব্দ ভাষায় হেঁটে আসছে....নাকি আমি নিজেরই অজান্তে অথচ স্বেচ্ছায় সে'দিকেই....। পিছনে ফেলে আসা সেতু জ্বলছে।

এখনো কেন তবে? আর কেন?

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

রতনের ছবি

বস্তুতঃ ছবিটি আঁকতে বড় কষ্ট হয়েছিল রতনের। দীর্ঘশ্বাস চোখের জল রক্তমাংস সুখ সুখহীনতা সফলতা ব্যর্থতা সবকিছু মাখামাখি শরীরে রতন ছিল অর্দ্ধশায়িত। বড় গোল টেবিল থেকে দুমড়ে মুচড়ে শরীরের অনেকটা অংশই বাইরে ঝুলে ছিল। ক্রোধ ঘৃণা প্রেমহীনতায় ছিল কিছুটা অসহায়। জামাগুলি কাপড়গুলি টেবিলের নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। শরীরে যথাযথ স্থানে হাত পা মস্তিষ্ককে ধরে রাখতে পারছিল না। এবং হৃদয় ছিল কাতর। অথচ হাত পা সবই জামাকাপড়গুলো দখল করে পড়ে ছিল। ওর ছিলনা কোমরে জোর। শায়িত অসহায় ত্রিভঙ্গ-রতনের চোখ থেকে জলের ধারা। রাগতে চাইছে ভীষণভাবে—পারে না। কাঁদতে চাইছে, পারে না। অদূরে দরজা খোলা এবং তখন মধ্যরাত। এবং বাহিরে প্রবল বাতাস। ঘরে তার শব্দ। কতকিছু ভেসে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে খসে যাচ্ছে। ও দেখছে। কোন-কোন দিনে রাতে ওর থাকে এই একরকমের অসহায়তা। কোমরে জোর থাকে না। দাঁড়াতে পারে না শুতে নয় বসতেও নয়। কেমন একপ্রকার মাংস পিণ্ডবৎ পড়ে থাকে। স্পন্দন কখনও দ্রুত কখনও ধীর। কিছু ফলমূল রয়েছে অভুক্ত তখনও। ওর চোখে জলের ধারা। ও কি কাঁদে? সব কিছুই ওর অনায়ত্ত তখন। কিছু ধরতে পারে না। বোঝে না কিছু। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অচল। আর কোথাও ওর যাবার সাধ হয় না। ওর সময় ওকে ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে। ও জানে ওর কাছে কেউ আসবে না, ওকে দেখবে না। ও-ও দেখতে যাবে না। ওর এখন কোনও সাধ নেই আহ্লাদও নেই। ও আপাততঃ স্বপ্ন দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত। রতন নিরুপায়। রতন অসহায়। রতন ক্লান্ত। তরল আগুনে রতনের মাংসপিণ্ড ঝলসে যাচ্ছে। হয়তো জীবনের রাতগুলি এভাবে ঝলসে যেতে যেতে শুয়োর থেকে শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে। সরে যাবে পৃথিবীর মাটি থেকে দূরে অনেকদূরে। আগুন আগুন। কোষে কোষে আগুনের জ্বালা। নিরুপায় জ্বলন রতনের শেষ কোথায়? রতনের বাসনা কি ছিল? রতন কি একা? একা রতন মধ্যরাতে জ্বলে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে। এমন রাত শেষ হবে কিভাবে??

সমীর রায়চৌধুরী

সমরেশ কিভাবে অপেক্ষা করে

সারারাত সমরেশের ঘুম হয়নি। কেবল ছটফট করেছে। মাথার ওপরে মস্ত বিপদ। কি যে করে! যেভাবে হোক জগদীশ ঝাকে চাই। একবার যদি দেখা হয়ে যায়। সকালে উঠেই ঝা'জীকে বের করতে হবে। নইলে উদ্ধার নেই।

জগদীশ ঝা'র বাড়ি দ্বারভাঙা জেলার লৌকাহা থানায়। গ্রাম ঝুনকুনপুর। জগদীশ ঝা'র বাবা চুনচুন ঝা ছিলেন জনপ্রতিনিধি। স্বাধীনতার পর বিহারের প্রথম মন্ত্রীমণ্ডলীতে ছিলেন রাজ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয়তে ক্যাবিনেট মন্ত্রী। সেই থেকে পরপর দুবার ক্যাবিনেটে জায়গা পেয়েছেন। হঠাৎ শিবরাজপুর স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু। লৌকাহার স্থায়ী শহীদ। দলবদল করেছেন, দল তৈরী করেছেন, দল ভেঙেছেন, ইস্তফাও দিয়েছেন। কিন্তু সবার উপরে জিন্দাবাদ থেকেছে লৌকাহা।

জগদীশ ছোটবেলায় খেলা করতেন আহুজার চোঙা নিয়ে। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতেন অনুপস্থিত শ্রোতার দিকে—'কমলা বালনের ওপর সেতু হবে। লৌকাহা বর্ষায় আর জলবেষ্টিত হয়ে যাবে না। লৌকাহার সঙ্গে যোগাযোগ হবে সারা পৃথিবীর।' সেতু হয়নি। পথঘাটও তেমন হয়নি।

বালক জগদীশের আরেকটি প্রিয় খেলা ছিলো, হিন্দুস্থান পাকিস্তান। মাটিতে আড়াআড়ি দাগ কেটে, দাগের দুপারে সবাই দুদলে ভাগ হয়ে দাঁড়াতো। তারপর কাঠিকুটি জড়ো করে হাওয়ায় শপাং শপাং সবাই শব্দ করে নাচতো। কে কত বেশী শব্দ করে নাচতে পারে। এই অস্ত্র-নৃত্যে জগদীশ ক্রমাগত শব্দ বৃদ্ধি করে জিতিয়ে দিতেন নিজের দেশকে। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদের রকমারি ব্যবহার শিখেছিলেন বাবার দেখাদেখি।

একটা ব্যাপার জগদীশ ঝা টের পেয়েছিলেন। একটা যুৎসই জিন্দাবাদ এগিয়ে দিতে পারলেই যাবতীয় সমাধান। কিন্তু লৌকাহার মানুষ চুনচুন ঝা, স্ত্রী মনোরমা ঝা এবং জগদীশ ঝা'কে কোনদিন ভুলবে না। প্রতিবার

রিলিফ ঠিক পেয়ে আসছে লৌকাহা। এবছর ঘোষণা করা হয়েছে ফ্লাড এ্যাফেক্টেড এরিয়া, গতবার ছিল ড্রট এ্যাফেক্টেড এরিয়া। এইবা মন্দ কি!

সমরেশের আজ যেভাবেই হোক চাই জগদীশ ঝা'কে। ঝা'জীর শরণে যেতে পারলেই হলো। মাত্র একটা কথাই উনি সবাইকে বলেন: 'কোই বাত নহী, ঠিক হো জায়গা। ধীরজ রখখো।'

মনোরমা দেবী এখনও জনপ্রতিনিধি। একবার হেরেছিলেন বৈভব মিশ্রার কাছে। লৌকাহার মানুষ দেখে নিয়েছে মিশ্রাজীকে জিতিয়ে কোন ফল হয়নি। সেতুর একটা নক্শা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ঐ অব্দি। রিলিফ হয়নি মিশ্রাজীর আমলে। লৌকাহার মানুষের পরিশানি বরং বেড়েছিল। ঝা'জীর পরিবারই ঠিক। বর্ষা আসে। জলবেষ্টিত হয় লৌকাহা। প্লেনে করে দেখে যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। দিল্লী থেকে রিলিফ আসে। ঝা'জীদের কল্যাণে লৌকাহার মানুষ তো বেঁচে আছে। এর বেশী আর কি চাই।

সমরেশের আজ বড় প্রয়োজন এই জগদীশ ঝাকে। চুনচুন ঝা জগদীশকে ঢুকিয়ে ছিলেন স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেণ্টে। বি.এ. পাশ করার পর সামান্য স্ট্যাটিসটিশিয়ান হিসেবে। সেখান থেকে ডেপুটেশনে কল্যাণ বিভাগে প্রমোটি আই.এ.এস. যখন ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর হলেন, জগদীশ ঝা'র জন্য পৃথক মার্কেটিং এ্যাণ্ড স্ট্যাটিসটিকস সেল হলো। সেপারেট ক্যাটাগরি। প্রথমে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর। তারপর ডেপুটি ডাইরেক্টর।

তারপর প্রমোটি আই.এ.এস. এলেন ডিপার্টমেণ্টে জয়েণ্ট সেক্রেটারী হয়ে। এবার ক্যাটাগরি এক হয়ে গেল। জগদীশ ঝা জয়েণ্ট ডাইরেক্টর। এস্টাবলিশমেণ্টের ইনচার্জ এখন জগদীশ ঝা'র রমরমা। যখন ইচ্ছে অফিস যান। সকাল থেকে মোটামুটি কাটান এইভাবে। সকালে বন্দনা রেষ্টুরেন্টে, দুপুরে এসেম্বলির চত্বরে, বিকালে কফি হাউসে, রাত্রে প্রেসিডেন্সি ক্লাবে। মাঝে হয়তো একবার অফিস। জনপ্রতিনিধিরা সবাই চেনেন। পারিবারিক সম্বন্ধ।

সমরেশ সকালে উঠেই চলে যায় বন্দনায়। প্রত্যেক টেবিলে মানুষ। গমগম করছে পরিবেশ। জিলিপী কচুরির ঘুঘনি আসছে। মাঝে মধ্যে সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে এক একটা টেবিল থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠহাকা। ঠহাকা অর্থাৎ প্রাণখোলা হাসি। অর্থাৎ, কোই বাত নহী, হো জায়গা!

সমরেশের তো হতে হবে। এ যে মাথার ওপর মস্ত বিপদ। সেবারও এমনই বিপদে একদিনের মধ্যে ফাইল নম্বর 6/85-এ ফেভারেবল অর্ডার

করিয়ে ছিলেন জগদীশ ঝা। সে যাত্রা সমরেশের বিপদ কেটে গিয়েছিল। বিপদ যে বার বার ফিরে ফিরে আসে। ঘুরে ফিরে আসে পঞ্চবার্ষিকী। জগদীশ ঝা এখনও আসেননি। দেখা হয়ে যায় প্রকাশের সঙ্গে। প্রকাশেরও দরকার জগদীশ ঝাকে। প্রকাশেরও মস্ত বিপদ।

প্রকাশ বলছিল বিনোদ ঠাকুরকে দিয়েও পৈরবীর কাজ হয়। ওঁরই গ্রামের ঠাকুরজী দুবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে রমেশ শ্রীবাস্তব কিংবা দেবেশ সাকসেনার পরিচয় আছে। পরমানন্দ রামকে দিয়েও অবশ্য কাজ হয়। প্রমোটি আই.এ.এস. রামবিকাশ পাণ্ডের সঙ্গেও রামের ভালো রিলেশন। কিন্তু সমরেশ বা প্রকাশের সঙ্গে তো রিলেশন নেই।

কি যে হবে। জগদীশ ঝাকে যেভাবেই হোক চাই।

ঝাজী সেবার কি একটা রঙ যেন বলেছিলেন। মন্ত্রীর স্ত্রী পছন্দ করেন হাল্কা বেগুনী রঙ। জয়েণ্ট সেক্রেটারীর বউ পছন্দ করেন ক্যাকটাস। কমিশনারের বউ পছন্দ করেন রঙীন মাছ আর মানানা এবং ঘিয়ের টিন। দ্বারভাঙার খাঁটি ঘি। আর বিকেলের দিকে একসঙ্গে মার্কেটিং কার বউ না পছন্দ করেন।

সমরেশের এই ক্রাইসিস। জগদীশ ঝাকে যেভাবেই হোক চাই। প্রকাশেরও তো দরকার। বন্দনায় নেই। এ্যাসেম্বলীতে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। হয়তো পাওয়া যাবে কফি হাউসে কিংবা প্রেসিডেন্সীতে। কোথাও এক জায়গায় পাওয়া যাবেই।

বন্দনায় সোসাল গসিপ, এসেম্বলীতে রাজনীতি, কফি হাউসে কালচার, প্রেসিডেন্সীতে ধর্মালোচনা। কোথাও জগদীশ ঝাকে পাওয়া যাবেই। একটু খুঁজতে হবেই এই যা। নেতাও বলেছেন, পরিশ্রম কে সিবা কোই চারা নহী।

সমরেশ খুঁজতে থাকে। সমরেশ যেভাবেই হোক খুঁজে বের করবেই।

সমরেশের মনে পড়ে কলেজ জীবনের কথা। তখন উত্তরপাড়ায় থাকতো। সঙ্গে থাকতেন ঠাকুমা। বয়স ঢের হয়েছে। তবুও নড়ে চড়ে সেই শরীরে সব কাজ করতেন। সকালে উঠেই ঘর পরিষ্কার। সেদিনও ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন, এমন সময় চড়ুই পাখিদের হুল্লোড়ে ডানা ঝাপটানিতে পুরানো আয়না পড়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটিয়ে যায়।

একটা ঈষৎ বড় টুকরো হাতে ধরে ঠাকুমা মুখ দেখেন মনোযোগে। তারপর সমরেশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন :

হ্যাঁরে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, আমাকে সত্যি সত্যি দেখতে খুব খারাপ হয়ে গেছে, তাই সবাই কেমন করে তাকায় আমার দিকে। কতকাল আমি আমার মুখ দেখিনি।'

ঐ দূরে জগদীশ ঝা আসছেন প্রকাশের দিকে অথবা সমরেশের দিকে।

সমরেশ ও প্রকাশ পৃথকভাবে একত্রে অপেক্ষা করে।

মৌসুমী মুখোপাধ্যায়

ডবল ডেকার

কলেজ স্ট্রীট-বউবাজারের ক্রসিং থেকে পার্থ আর বনানী দু'নম্বর বাসে ওঠে। প্রথমে পার্থ তারপর দুজনারই একতলার চেয়ে দোতলাকে অধিকতর ভালো মনে হওয়ায়, ওরা সিঁড়ি ভাঙ্গে। ওদের গন্তব্য একেবারে শেষের কাছাকাছি, দক্ষিণে। সিট্ নেই। একটু পরে হবার আশা। দুপাশে চেয়ার সিটের মাঝামাঝি দাঁড়ায় ওরা। সাত, আটজনের পর। দাঁড়াতে অসুবিধে হয়। বিশেষ করে বনানীর। সে দুহাত দিয়ে এক পাশের সিট্ আঁকড়ে ধরে। বাস ঝাঁকুনি দিলে, দাঁড়ানো অবস্থায় যাত্রীরা আগে পেছনে দোলে।

বনানীর কিছুটা সামনে একটা রড। ওটা ধরতে পারলে বেশ কিছুটা সুবিধে হয়। ও পার্থকে পেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তবুও রডের নাগাল পায় না। ওর একেবারে পাশে কোন চেয়ার-সিট্ও নেই। পার্থর সামনে আসার ফলে পেছনের সিট্টা বেশ দূরে এখন। সামনেরটা অপেক্ষাকৃত হলেও খুব কাছে নয়। তাছাড়া বনানীর সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকও ধরেছেন আগের সিট্টিকে।

সামনের ভদ্রলোক, বনানী, পার্থ, সবাইকেই ডানদিকের সিট্ ধরতে হয়। সংকীর্ণ মাঝের জায়গার বাঁ দিকে, জানালার ধারে বসা এক স্থূলকায় ভদ্রমহিলার, ততোধিক আয়তনের একটি সুট্কেস্। ফলে বনানী বাঁ দিকের চেয়ার সিট্টি কাজে লাগাতে পারে না। বনানীর সামনে এখন দুটি অলটারনেটিভ। হয় সামনের ভদ্রলোকের সঙ্গে আগের সিটের ব্যাক রেস্ট ধরা। অথবা পার্থকে আবার সামনে এগিয়ে নিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া, যা কিনা সামনের রড্ থেকে তার দূরত্বকে বাড়িয়ে দেবে। এবং তার আর পার্থর পুনরায় জায়গা বদল দৃষ্টিকটু না হলেও আশপাশের যাত্রীসাধারণের পক্ষে বিরক্তিকর তো বটেই। বিশেষত এই গ্রীষ্মের প্রায় বিকেলে, যখন হাওয়া নেই এবং এই দোতলা বাসে তারা সবাই কিঞ্চিৎ ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও কিছু অতিব্যক্তিগত কারণ যেমন পার্থ তার কটিদেশ স্পর্শ করলে কিছু বাড়তি এনার্জি পেয়ে থাকে এবং যা কিনা

তখনই সম্ভব যখন সে পার্থর সামনে ইত্যাদি।

বনানী ভাবে, যদি তার চিবুক বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ে সামনের প্রৌঢ় ভদ্রলোকের লঙক্লথের সার্টের ওপর? সাদা জমিতে জলের দাগ ফুটবে অনায়াসেই! এ হেন সঙ্কোচ বশত, সব সময়ই রুমালটিকে মুঠোয় ধরে রাখতে হয় এবং এর ফলে বনানীর একটা হাত বিশেষ গ্রিপ্‌ পায় না। তাছাড়া ও নিশ্চিত হয়, ওর ঘামে এখন সকালের লিরিল বা দুপুরের কিউটিকুরার রেশ নেই। যদি বনানী সামনের সিট্‌টিকে একটু বেশী ঝুঁকে ধরতে পারে, তাহলে তার চিবুকটি এগিয়ে যাবে অন্তত ভদ্রলোকের হাঁটুর কাছাকাছি যেখানে তিনি একটি ক্যামবিসের ব্যাগ এবং তার ওপরে একটি খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছেন।

বনানী তার রুমালটি ব্যাগে গুঁজে ডানহাতটা ব্যাগের কাছাকাছি এবং ঝাঁকুনির সময় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সরিয়ে রাখে। এর পর প্রায় ৫৫° সামনে হেলে তার বাঁ হাত সামনের ভদ্রলোকের কনুইয়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে বনানী আগের সিট্‌টির নাগাল পায়। ওর কানে আসে পার্থর গলা।

তাদের দুনম্বর বাসটি ওয়েলিংটনএ ঢোকা স্বত্তেও কোন যাত্রীই ওঠার তোড়জোড় না করায় বনানী বোঝে যে অন্তত ধর্মতলা অবধি তাকে এই একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। জনৈকের মন্তব্য থেকে যাত্রীরা আরো বুঝতে পারে যে সামনে মিছিল থাকার দরুন ধর্মতলা পেঁছিতে এক আধ ঘণ্টা লাগাও বিচিত্র নয়।

বনানী সামনের সিট্‌টিকে ধরতে চাওয়ায় ওকে অনিচ্ছাকৃতভাবে সামনের দিকে কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে হচ্ছিল এবং এর ফলে সামনের ভদ্রলোকের অসুবিধে স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। তিনি বোঝেন যে আরো অন্তত আধঘণ্টা, অর্থাৎ অন্তত কোন সিট্‌ খালি না হওয়া পর্যন্ত তাকে এই চাপটি সহ্য করতে হবে এবং এই বোধ তাঁকে হঠাৎই তাঁর নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তিনি আগে ঝুঁকেছিলেন প্রায় ১৫°, বনানীর জায়গা পরিবর্ত্তন এবং এবং তার রডটি ধরা তাঁকে আরো প্রায় ১০° ঝুঁকিয়েছিল, এইবার তিনি সচেতন ভাবে একটি প্রায় শূন্য কোণ তৈরি করতে সচেষ্ট হন। ফলে তাঁর কনুই পিছিয়ে আসে এবং এ ব্যাপারে বনানীর বাঁ স্তনের বাঁ পাশের এলাস্‌টিসিটি তাকে সাহায্য করে।

প্রায় রিফ্লেক্স্‌ এ্যাকসান বশত বনানী এবার পিছিয়ে আসে এবং পার্থকে

একটি ছোটখাটো ধাক্কা দেয়। সামনের চেয়ার সিটের মোহ ত্যাগ করে বনানী পার্থের ধরা সিট্‌টির দিকে চোখ ফেরায়।

একেবারে সাময়িক বিভ্রান্তি বশত পার্থর মনে হয় বনানীর এ হেন মুভমেণ্টের হেতু বুঝিবা সঙ্গসুখ অর্থাৎ কিনা বনানীর বুঝি হঠাৎই পার্থকে প্রয়োজন। কিন্তু পরমুহূর্তেই বনানীর অভিব্যক্তি দেখে, পার্থের দৃষ্টি একেবারে মোক্ষমভাবে সামনের ভদ্রলোকের ওপর স্থিত হয়। পার্থ টের পেতে থাকে তার কানের লতির চারপাশের তাপমাত্রার বৃদ্ধি পেশী টান এবং ভদ্রতা লুপ্ত-প্রায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে এ সমস্তই ঘটে যেতে থাকে সামনের ভদ্রলোক এবং বনানীর দৃষ্টির বাইরে—যেহেতু সে দাঁড়িয়ে ওদের পেছনে। তাই একেবারে আচম্বিতেই পার্থের হাত গিয়ে পড়ে সামনের ভদ্রলোকের কলারে। বনানী চমকে ফিরে তাকিয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে ব্যাপারটা ধরে ফেলেই বলে ওঠে—

আরে না না সেসব নয়—সেসব নয়—এবং সামনের ভদ্রলোকের পেশী শক্ত হওয়ার আগেই গলার সবটুকু ফেমিনিটি ঢেলে বলে ওঠে—

আপনি প্লীজ কিছু মাইণ্ড করবেন না—ও আমাব সঙ্গে আছে মানে ঠিক বুঝতে পারে নি আর কি—

বলে, বনানী পার্থের ইতিমধ্যেই শিথিল হয়ে আসা হাতকে ভদ্রলোকের কাঁধ থেকে সরাতে সচেষ্ট হয়।

পার্থর নিজেকে বোধহীন লাগে। তারপরই ফিরে আসে একটা অসম্ভব রাগ। অন্য কোন বোধ হয়, কিম্বা সব বোধ মিলে মিশেই। এবং খুব সাধারণ ভাবে এর সবটাই গিয়ে পড়ে বনানীর ওপর। পার্থর সাময়িকভাবে নিজেকে অন্ধ এবং বোবা মনে হয়। কিছুক্ষণের চেষ্টায় নিজেকে সামলিয়ে পার্থ গলাটাকে প্রায় স্থির করে বনানীকে বলে—নেমে এসো।

বনানীর শারীরিক কষ্ট, যদিও বাসটি থেমে থাকায় তাকে রড বা ধরবার সিটের কথা ভাবতে হচ্ছিল না, তবুও তাকে জেদী করে তুলছিল। পার্থর কথা তাকে একটা ছোটখাট আউটবার্স্টএর সুযোগ দেয়।

—সব সময়ই অসহিষ্ণুতা! এত লোক বসে আছে—এখান থেকে আর কিছুতে উঠতে পারব?

—চল নামি।

—দাঁড়িয়ে থাক—একটু পরে. পি.জি.তে অন্তত লোক নামবে।

—চল একটু খাই টাই—ভীড় কমলে যাব—

—না ! আমায় ফিরতে হবে।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো দেরী হচ্ছে।

—নামলে আরো দেরী হবে।

—সেই দেরীটা আর এই দেরীটা এক ?

বনানী উত্তর দেয় না।

—কি হল ? দুটো দেরীর মধ্যে কোনটা প্রেফারেব্‌ল ?

—এইটা।

একটু থেমে বনানী বলে,

—বলছি না আর একবার মারামারি করে বাসে উঠতে পারব না ?

—তুমি কি বলতে চাইছ ? আমি প্রপোজ করছি আর আমার কোন রেস্‌পন্সিবিলিটি নেই ?

—এই তো দেখাচ্ছ !

পার্থর পেশী আবার শক্ত হতে থাকে এবং হয়তো অজান্তেই তার হাত এগোতে থাকে সামনের ভদ্রলোকের কলারের দিকে। বনানী এবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেলে পার্থর হাত ধরে। এবং, আর একবার গলায় ফেমিনিটি ঢেলে পার্থকে বলে—

—চল নামি।

পার্থর ভেতরকার ফারনেস তখন ইগ্‌নিশান পয়েন্টে। বাসের ষ্টার্ট তখনও বন্ধ, বনানী বলে,

—খিদে পেয়েছে।

এবং টের পায় বিরক্তিভরা বেশ কয়েকটা অবজরভেশন। এতক্ষণ বাস না চলায় দুএকজন উঠে দাঁড়ায়, যারা পিজি যাবে তারাও হয়তো। দাঁড়ানো অবস্থায় বনানীর চোখ সতর্ক, বনানীর পাশে বসা লংক্লথের পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়াল। বনানী বসতে পেয়েই পার্থর সঙ্গে পেয়র করে, ওপাশে ভ্রূকুটি কিনা চেয়ে দেখে না।

অনড় অটল জ্যাম দেখে ওরা দুজনে স্বস্তি পায়—জমিয়ে আউটবার্ষ্ট।

—আ ! সেন্টিমেন্টস্‌।

অসীম রায়

ভয়

'অথচ লেদু,' কথা শেষ করবার আগেই কানের পাশ দিয়ে তারের বাজনা বাজিয়ে যায় এক ঝাঁক পাখি।

'ঠিক যেন আমরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে এসেছি,' ন বছরের গাঁটোল গিনু তাব মাথা দুলিয়ে বলে।

বোধহয় স্প্যান পত্রিকায় সে দেখেছে ছবি কিন্তু অমিয় টের পায় এক পরম সাদৃশ্য বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও। তিন চারশো ফুট নিষ্পত্র ক্রমাগত পাথুরে ঢিপি পাহাড়ী রাস্তার বাঁ দিক ঘেষে বরাবর দিগন্তব্যাপী। যেখানে হরিণমারি জঙ্গলের নীলাভ রেখা; মাঝে মাঝে এক একটি পাহাড়ের ভঙ্গিল ধরে পায়ে চলার রাস্তা উঠে গেছে কোন অনির্দিষ্ট লোকে। ডান দিকেও বিরাট ঢালের নীচে খামচা খামচা ক্ষেত নালা। কোথাও বেঁটে বুনো পলাশ—আর ঠিক তার পরেই গোটা ডান দিকের দিগন্তব্যাপ্ত হাজার ফুট উঁচু নিষ্পত্র চড়াই। অর্থাৎ ডান বাঁ সমস্ত দিক জুড়ে মাইলের পর মাইল গৈরিক মহিমা। আর প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজকীয় নিস্তব্ধতা।

'লেদুর কথা ছেড়ে দাও। রোজ সকালে এক বোতল মহুয়া খায়। ওর কি মাথার ঠিক আছে?'

স্ত্রীর কাঁধ থেকে জলের বোতল নিয়ে অমিয় বললে। 'ভাবছি আমিও লেদু সিংএর শিষ্য বনে যাব। আর তো কয়েকটা দিন।'

'সত্যি, রোববার যখন টাঙা থেকে নামলাম চারদিকের নির্জনতায় গা ছমছম করছিল,' রত্না বললে।

'ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো রত্না। আমার গা জুড়িয়ে গেল। মনে হোল মায়ের কোলে এলাম অনেকদিন পর।' তারপর উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কি হবে ভারতবর্ষের? কিলবিল করছে পোকার মতো লোক। এখানে কোনো প্ল্যানিং সম্ভব না। যা ঘটে গেছে তাকে কোনরকম টিকিয়ে রাখা যায়। নতুন কিছু সম্ভব না। কিছু না!'

'বাবা, বক্তৃতা দিও না,' গিনু বললে।

'কমিউনিস্টরা বলে খালি দারিদ্র্য দূর করার সমস্যা, কিন্তু আর একটা সমস্যাও ভারতবর্ষে মস্ত বড়—নির্জনতা রক্ষার সমস্যা। মনে আছে রত্না, পাহালগামের ব্যাপারটা?'

'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো!'

'বেশ, বাড়াবাড়ি করি।'

পাহালগামের প্রসঙ্গটা মজার। বাস্তবিক মাথার ওপর ঝলমলে নীল আকাশখানা যেন নেমে এসেছে পাইন গাছগুলোকে চুমু খাবার জন্যে। আর সেই ঘাসের মখমলে একটু জায়গায় বসে নিশ্চিন্তে ডিমসেদ্ধ খাবার জন্যে ক্ষুধার্ত তিনজন হতবাক হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সর্বত্র পোকা উড়ছে। সর্বত্র পিকনিক পার্টি, ট্রানজিস্টর, রেকর্ডের তালে তালে পাঞ্জাবী রমণীদের ডিস্কোডান্স। মাদুরে পানের বাটা, ভারী টিফিন ক্যারিয়ার, ব্যাগ, জাপানী ক্যামেরায় ছয়লাপ। কোথাও সুস্থিরভাবে বসার জায়গা নেই। তারপর একটি পরিবার মাদুর গুটোতেই ওত পেতে থাকা তারা তিনজন যখন একটু পা ছড়িয়ে বসে ঠিক সেই মুহূর্তে আব্রহ্মস্তম্ভ কাঁপিয়ে অপেক্ষমান টুরিস্ট বাসের হর্ন। রত্নার গলায় ডিম আটকে যায় আর কি!

গম্ভীরভাবে অমিয় বললে, 'কতগুলো জায়গা আছে মানুষের রত্না, যেখানে তাকে আঘাত করে না। এই বক্তৃতার ব্যাপারটা আমার আছে, আমি জানি। কিন্তু অনেক লোক তো খোঁড়া নুলো কানা। মানুষ তো তাদেরও মেনে নেয়।'

রত্না তার গা ঘেষে বললে, 'কি পাগলের মতো বলো। আমি কি তাই বলেছি।'

'আসলে নির্জনতা না থাকলে মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। মানুষ যদি আত্মমগ্ন হতে ভুলে যায় তাহলে তো সে পোকা। তার আর কি থাকল!'

গিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা দ্যাখো দ্যাখো কত ছাগল!'

ডান দিকে হাজার ফুট গৈরিক ঢালে সাদা হলুদ কালো অসংখ্য চতুষ্পদ প্রাণী।

'ওগুলো গোরু।'

আর রত্নার কথা শেষ হতে না হতেই সহসা গির্জার ঘণ্টার মতো ঘণ্টা

বাজতে থাকে। আর সেই নিখিল পরিব্যাপ্ত দিব্য সঙ্গীত আসলে অসংখ্য গোরুর গলার ঘণ্টা। পাহাড়ের বাঁকে হাওয়া ঘুরেছে আর হাওয়া ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ঘণ্টার ঢেউ আছড়ে পড়ে এপারে ; নৈঃশব্দ আরো নিটোল ভরপুর হয়ে ওঠে হাওয়া থামলেই।

'সত্যি জায়গাটা বড্ড ভালো লাগছে। তুমি এমন বাছতে পারো কি করে ?'

'যেমনভাবে তোমাকে বাছলাম।'

'ওটা একদম ভুল বাছাই।'

'ঐ যে ঐ যে কালো পাথর।' আবার গিনুর হাঁক।

'আশ্চর্য! আমরা তিন মাইল এসে গিয়েছি।'

রত্নার মতো অমিয়রও অবাক লাগে। সেও চোখের আরামে টের পায়নি পথের ক্লান্তি।

পাথরের কাছে পেঁছিতে চড়াই থেকে নামতে হয়। নীচে নামতেই বটের বাদামি অন্ধকার। এক জোড়া কাঠঠোকরা উড়ে খেজুর গাছের পাতায় বসে। এখানে মাঝে মাঝে কদিন আগের বৃষ্টিধরা দহ। চিকচিকে জলে পুজোর নীল আকাশ। আর এই আকাশের দিকে তাকালেই যেন বাজনা শুনতে পায় অমিয়।

কালো পাথর কিছু আহা মরি নয়। বরং জলে রোদে নিকষ কালো এখন ঘোলাটে। তার মাঝে মাঝে চক দিয়ে দেবনাগরী বাংলায় নাম লেখার চেষ্টা। তারা মুড়ি মামলেট চা খুলে বসে।

'অথচ লেদুর কাণ্ড।'

'লেদু আমাদের তাড়াতে চায়।'

'কেন বাবা ?'

'আবার ফালতু খাটনি। বাসন মাজা জল তোলা বাড়ি সাফ।'

'তুমিও তো অফিস যাও।'

'তা বটে।'

লেদুর দেহের লম্বা কালো কাঠাম খানা এখন নড়বড়ে। দুলে দুলে বলে, কালো পাথর যাবে না বাবা, হুঁ হুঁ! ডাকু আছে পাথর ফেঁকে হুঁ হুঁ।'

রত্না বলেছিল, 'কী সব ভয় দেখাচ্ছ লেদু। গিনু ভয় পাবে ওসব বললে।'

পরে লেদু পাকা রোয়াকের এক কোণে (যেখানে তিন দশক আগে চাঁদনি সন্ধ্যায় সঙ্গীতের জলসা বসত) বাসন মাজতে মাজতে নিজের মনেই বলেছিল, 'হুঁ, পাথর জরুর ফেঁকে। আদমি মার দিয়া বাবু।'

'কী সব বাজে কথা বলছিস !'

'বাজে কথা এঁ হুঁ।'

আবার হাওয়ায় ঘণ্টার সঙ্গীত ভেসে আসে। গিনু কোঁচড় ভর্তি করে হরেক রকম পাথর কুড়োচ্ছিল। সূর্য নামছে আর পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চারপাশের এই বিশাল বিপুল নির্জনতা অমিয়র চোখে মুখে চুলে হাত বোলায়। তার দিকে চেয়ে রত্না মিট মিট করে হাসে।

'হাসছো ?'

'কেন বলতো।'

'এমনি।'

'তুমি এই পাহাড় জঙ্গল বিয়ে করলেই পারতে।'

অমিয় হেসে বললে, 'সেইটাই তো মানুষের ট্র্যাজেডি। পাহাড় জঙ্গল বিয়ে করা যায় না। বিয়ে করতে হয় মেয়েমানুষ।'

'মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ বোল না। কি বিচ্ছিরি কথাটা !'

'সত্যি, কথাটা শুনতে বিচ্ছিরি লাগে। মেয়েমানুষ না বলে কী বলব ? নারী।'

'নারী কেন ? রত্না।'

রত্নার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অমিয় বলে, 'আচ্ছা, আমার কেন এরকম হয় বলতো ! বাইরে এলেই....'

রত্না চুপ করে থাকে। তার দশ বছরের এই পাগলাটে স্বামীর দিকে চেয়ে হেসে ফেলে।

'বাইরে এলেই আমরা ভাই বোন হয়ে পড়ি। কেন বলতো ?'

'বাঃ। আমি কি করে বলব। তোমার মাথায় কতো ভাবনা আসে, তার আমি কি জানি !'

'তোমার মাথায় আসে না ?'

'কলকাতার বাড়ি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।'

'তুমি নিশ্চয় ভাবছো, আমাদের খিড়কির দরজায় ঠিকমতো তালা পড়েছে কি না।'

'হ্যাঁ সত্যিই, তালাটা আমি টেনে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে,

ছাতের দরজার তালাটা দেখেছি। একেবারে খোলা বাড়ি। কেউ নেই। বুড়িদি বলেছিল কদিন থাকবে এসে! ঠিক এই সময় বেছে বেছে মেয়ের জণ্ডিস।'

'গুলি মারো! সারাটা বছর তো কলকাতা আঁকড়ে কামড়ে পড়ে আছি। কলকাতা বাদ দিয়ে কি ত্রিভুবনে বাঁচতে নেই?'

'মা, দ্যাখো একটা লোক,' গিনু হাঁক দেয়। তারা দুজনেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েই লজ্জা পায়। একটি নিকষ কালো খালি-গা রাখাল বালক। বছর চোদ্দ বয়স। তাদের দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। মাথায় ছাতি, বেমানান বড়।

'কিরে, কী নাম তোর?' অমিয় পাথর থেকে নামতে নামতে বলে।

'সকাল।' 'স'-এ ইংরিজি এস-এর উচ্চারণ।

'সকাল. বাঃ! ইধার জানোয়ার মিলতা হ্যাঁয়?'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ায়।

'লক্কড়?'

ছেলেটি ফের ঘাড় নাড়ায়।

'কোন্ জানোয়ার মিলতা হ্যাঁয়?'

'জানোয়ার নেহি, ডাকু, পাত্থর ফেঁকে।'

'দূর!' অমিয় জোরে হেসে ওঠে।

রত্না হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'গিনু, জুতো পরে নে। দেখছিস না, অন্ধকার হয়ে আসছে।'

তারপর অমিয়র দিকে ফিরে বললে, 'খেয়াল আছে? এখন এই অন্ধকারে তিন মাইল যেতে হবে।'

'নার্ভাস হয়োনা। এগুলো সব শেখানো কথা। বাইরের লোকেরা যাতে এ অঞ্চলে আসতে না পারে সেজন্যে এদেরকে এইসব কথা শেখানো হয়েছে। দেখছো না, আসামে কী হচ্ছে? সবাই বহিরাগত। সবাইকে তাড়াও।'

নামবার সময় মনে হয়নি। কিন্তু এবার উঠবার সময় রাস্তাটা অনেকখানি উঁচু লাগে। গিনু নুড়িতে গড়িয়ে পড়ে। তারা যখন ওপরে উঠে আসে তখন দুপাশের সমান্তরাল গিরিশ্রেণী রক্তাভ গৈরিকে চুবিয়ে দিয়েছে অস্তাচলের সূর্য। স্তব্ধ হয়ে অমিয় সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। রত্না তাড়া দেয়, 'চলো চলো।'

আলো ঝপ করে পড়ে আসে। যেন প্রসারিত বিরাট ঝকঝকে গৈরিক আলখাল্লা কোন এক অদৃশ্য হাত একটার পর একটা পাহাড়ের গা থেকে টেনে নিতে থাকে। একফালি ম্লান চাঁদ আকাশে ; পিঁড়িক পিঁড়িক শব্দে একটা দুটো পাখী ঝোপেঝাড়ে উড়ে যায়। মাইল খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত পাহাড় জুড়ে এক আবছা নীলাভ সৌন্দর্য পরিব্যাপ্ত। তারা খেয়াল করেনি। তিনজনেই প্রায় দৌড়চ্ছে। এক একটা পাহাড়ের ঢাল শেষ হতে না হতেই ভঙ্গিল পথে সাদা কালো পাথরের সারি থাকে থাকে ওপরে উঠে গেছে। আব তাদের খালি মনে হতে থাকে কারা যেন নেমে আসছে, কারা যেন এখনই নেমে আসবে।

মাইল খানেক পথ যাবার পর যেখানে পথটা বাঁক নিচ্ছে সেই বাঁকে কারা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় গিনুর হাতখানা শক্ত মুঠি করে ধরে।

'এই সব বনে-বাদাড়ে না এলেই পারতে,' রত্নার গলায় স্পষ্ট আতঙ্ক।

'বাবা, আমি একটা পাথর তুলে নিয়েছি।' গিনু তার মুঠো করা বাঁ হাতের থাবাখানা দেখায়।

বাঁকটা বেশ দূরে। গলার আওয়াজ আসছে নাকি ? কারা কথা বলছে। অমিয় ভাবলে, গিনু আর রত্নাকে না আনলেই ভালো ছিল। হাতের ঘড়ি রত্নার অজান্তে টপ করে খুলে প্যাণ্টের পকেটে চালিয়ে দেয়। বাঁক যত এগিয়ে আসে তাদের গতি ততো মন্থর। হঠাৎ হেসে ওঠে অমিয়। দুটো বন পলাশের বেঁটে নিষ্পত্র সিলুয়েট দুজন লোকের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু ভয় কাটে না। সামনে আরো দেড়মাইল ভয়। তাদের স্নায়ু এখন রিনরিন করে স্পর্শকাতরতায়। হাওয়া উঠলে তারা চমকায়। পাখী ডাকলে তাদের হৃদযন্ত্রের তাল কাটে। আর বারে বারেই কারা নেমে আসে পাহাড়ী পথ ধরে। চারপাশে নিস্তব্ধ আবছা চাঁদের আলোর নীলাভ সৌন্দর্য তাদের তাড়া করে নিয়ে চলে। পথ আব ফুরোয় না। 'বাবা আস্তে, বাবা আস্তে !' পরিশ্রান্ত গিনু হাত ধরে টানে।

'উঃ মা !' অন্ধকারে হোঁচট খায় রত্না।

'বললাম, ঐ সব ফ্যান্সি জুতো এখানে পোর না।'

'ফ্যান্সি কোথায় ! পুরনো জুতোটাই তো পরেছি।'

রাস্তা বর্ষায় জলে আর গোরুর গাড়ির চাকায় ভেঙেছে। মাঝে মাঝে লম্বা খাল রাস্তার মাঝখান জুড়ে। টাল সামলাতে অমিয়কেও বেগ পেতে

হয়। চোখের কাছে ঘড়ি তুলে সময় দেখে। আরও বোধহয় এক মাইল।

এই প্রথম সৌন্দর্যের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত বোধ করে অমিয়। একটা দুটো যদি বাড়ি থাকত রাস্তার ধারে—নীল আর সাদা রং করা কাঠের বাড়ি ; পাশে চীনে বাঁশের ঝাড়। তার ভাবনাটা রত্নাকে বলতে গিয়ে সামলে নেয়। রত্নার বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারে। তাছাড়া কথা বললে তাদের গতি মন্থর হয়ে আসবে।

এবার পাহাড়ের বাঁক নিতেই খুব কাছ থেকে, যেন রাস্তার ঢাল থেকে খররররর-খল করে বুক কাঁপানো জান্তব শব্দ ওঠে। আগুয়ান অমিয় শুধু থমকায় না. ছেলের হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে তিন পা পিছিয়ে আসে। তারপর ভক ভক ভক ইঞ্জিনের নিশ্বাস। ভয় ঢাকবার জন্য অমিয় চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইঞ্জিন, ইঞ্জিন শান্টিং করছে।'

'আমি ভাবলুম নেকড়ে বাঘ', গিনু বললে।

আবার তারা দৌড়তে থাকে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ী পথ ধরে। অমিয় বললে, 'অতো দৌড়িও না, আমরা বাড়ির কাছে এসে গেছি।' কিন্তু এখনও আরও দুতিনটে পাহাড়ের ঢাল সামনে। আবার দুতিনটে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে কারা নেমে আসবে। বললে বটে, কিন্তু প্রায় দৌড়িয়েই তারা বাকী পথ অতিক্রম করে।

'ঐ যে রাজার বাড়ি, আর ভয় নেই মা, গিনু হাততালি দেয়।'

কতগুলো ঝাউগাছের ফাঁকে পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িখানা দেখা দেয়। দরজা জানালা কড়ি বরগা হাপিশ করা ভূতো বাড়িখানার একদা সাজানো মার্বেলের দোতলা ঘরগুলো হাঁ হয়ে আছে আকাশের দিকে। জমিদার বাড়ির পাশে ঝাউবন পেরোলেই তাদের বাড়ি অন্ধকার নিস্তব্ধ। কেউ কোথাও নেই।

'লেদু! লেদু সিং!' হাঁক পাড়ে অমিয়।

সাড়াশব্দ নেই কোথাও। আবছা চাঁদনীতে রোয়াকে বসে তারা জিরোয় ; অনেকক্ষণ পর দূর থেকে একটা লন্ঠনের আলো এগিয়ে আসে।

'লেদু!'

'হুঁ হুঁ', শানে লাঠি ঠং ঠং করতে করতে লেদু সিং আসে।

বিনয় মজুমদার

দুদিন

আমি বললাম—মধুসূদনবাবু, এই যে সামনে অশথ গাছটা, এর পাতাগুলিকে লক্ষ্য করুন।

আমি আর মধুসূদনবাবু তখন মধুসূদনবাবুর কাপড়ের দোকানে উপবিষ্ট। সামনে শ দেড়েক বছরের পুরোনো এক অশথ গাছ। আরো বললাম—সময় এবং অশথ গাছের পাতা—এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে আমার বিবেচ্য বিষয়। সময় বাড়ছে এবং অশথ গাছের পাতাও বাড়ছে। সময় এবং অশথ গাছের পাতা। অশথ গাছের পাতা বাড়ছে অথচ সময় বাড়ছে না—এটা কি হওয়া সম্ভব মশায় ?

মধুসূদন—না তো, অসম্ভব।

আমি—আবার সময় বাড়ছে এক মাস দুই মাস অথচ একটি কচি অশথের পাতা বাড়ছে না—এটা কি হওয়া সম্ভব মশায়, মধুসূদনবাবু ?

মধুসূদন—অসম্ভব, বাড়তেই হবে অশথ গাছের পাতাকে।

আমি—আচ্ছা, তা হলে কোনো কারণে দুটো একই সঙ্গে বাড়ে—সময় এবং অশথ গাছের পাতা একই সঙ্গে বাড়ে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মশায়, অশথ গাছের মধ্যে সময় নেই কল্পনা করতে পারেন ? অশথ গাছের পাতাটা রয়েছে অথচ তার মধ্যে সময় নেই—এটা কি কল্পনা করতে পারেন ?

মধুসূদন—কী হল ব্যাপারটা ?

আমি—তার আগে বুঝুন সময়ের সংজ্ঞা কী। আপনি তো আর সারাক্ষণ এখানে দোকানে বসে থাকবেন না, মধুসূদনবাবু। দোকান থেকে অতঃপর কোথায় যাবেন ? দোকানে তো আর সারাজীবন থাকবেন না। দোকান থেকে যাবেন কোথায়, বলুন, মধুসূদনবাবু ?

মধুসূদন—বাড়িতে যাব, আনন্দপাড়ায়।

আমি—তাই, তাহলে আপনার এই অবস্থান পরিবর্তনের মাঝখানে জিনিষ চলে যাচ্ছে। সেই জিনিষটাকে সময় ধরছি। আপনার একটি

অবস্থান আগে। আরেকটি অবস্থান পরে। এই আগে পরে বুঝছি যা দিয়ে তাই সময়।

মধুসূদন—তা ঠিক।

আমি—তাহলে অশথ গাছের পাতার মধ্যে সময় নেই—একথা কল্পনা করতে পারেন কি? অশথ গাছের পাতারও অবস্থান পালটাচ্ছে।

মধুসূদন—এবং অশথ গাছের পাতাও বাড়ছে।

আমি—ঠিক। ভাবতে কি পারেন, অশথ গাছের পাতা বাড়ছে, অশথ গাছের পাতার অবস্থান পালটাচ্ছে—অথচ অশথ গাছের পাতার মধ্যে সময় নেই—এটা কি ভাবতে পারেন? অশথ গাছের পাতার কাছাকাছিও সময় নেই এটা কি ভাবতে পারেন?

মধুসূদন—না, ভাবা অসম্ভব। অশথ গাছের পাতার মধ্যে সময় আছেই।

আমি—এইবার ভাবুন। সময় এবং অশথ গাছের পাতা দুটোকে পৃথক করা সম্ভব নয়, কারণ সব সময় অশথ গাছের পাতায় সময় আছেই। যদি সময় এবং অশথ গাছের পাতা দুটি আলাদা জিনিস হত তবে চেষ্টা করে যেকোনো উপায়ে নিশ্চয়ই সময় এবং অশথ গাছের পাতাকে আলাদা করা যেত—সময়হীন অশথ গাছের পাতা করা যেত। কিন্তু তাতো করা যাচ্ছে না। আর দুটো জিনিসকে কখনো কোনো উপায়েই আলাদা করা না গেলে আসলে সে দু-টো জিনিস নয়, একটা জিনিস।

মধুসূদন—নিশ্চয়। একটাই।

আমি—তাহলে সময়ই হচ্ছে অশথ গাছের পাতা।

মধুসূদন—নিশ্চয়।

আমি—সময়কেই অশথ গাছের পাতার আকারে দেখা যাচ্ছে। আর অশথ গাছটাও সময়।

মধুসূদন—নিশ্চয়।

আমি—মধুসূদনবাবু, আপনি সামনে সাক্ষাৎ সময়কেই দেখতে পাচ্ছেন।

মধুসূদন—নিশ্চয়।

আমি—অথচ দেখুন লোকে এটার নাম দিয়েছে অশথ গাছ।

মধুসূদন—তাই তো শুনি লোকমুখে।

আমি—আজ তাহলে যাই মশায়।

অন্য এক দিনের ঘটনা। আমি আমার পিতামাতৃক দালানে বসে ছিলাম, বারান্দায়। বিকালবেলা। বেঞ্চিতে বসে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আমার মায়ের হাতে রোয়া ফুলগাছগুলো দেখছিলাম। এমত সময় বৈদ্যনাথ দলপতি এসে হাজির।

আমি বললাম—আরে বৈদ্যনাথ এসো এসো।

বৈদ্যনাথ আমার আদেশ পালন করল।

আমি—বসো ওই বেঞ্চির উপরে বসো।

বৈদ্যনাথ বসল। আমার দিকে মুখ করে। বৈদ্যনাথের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করার পরে বললাম—

আমি—বৈদ্যনাথ। একটা আশ্চর্য পদ্ধতিতে আমি বিশ্বের অনেক ব্যাপার বুঝি।

বৈদ্যনাথ—কী পদ্ধতি দাদা?

আমি—পদ্ধতির একটি প্রয়োগ তোমাকে বলছি তা হলে বুঝতে পারবে পদ্ধতিটা কী। তোমার নাম বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ একটি শব্দ—ধ্বনি সমষ্টি। এই যে শোনো মুখ দিয়ে ধ্বনি বেরুচ্ছে বৈদ্যনাথ। তোমাকে ডাকছি বৈদ্যনাথ বলে। তোমার শরীর হাত পা নাক কান চোখ পা ইত্যাদি ইত্যাদি তোমার শরীরের রক্ত মাংস—তোমার পুরো শরীরটা আর বৈদ্যনাথ শব্দটা এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী ভেবেছ? ভেবেছ কখনো?

বৈদ্যনাথ—না তো।

আমি—এবার তা হলে ভাবো। তোমার নাম বৈদ্যনাথ। তোমার শরীরটি রয়েছে, সামনে তুমি রয়েছ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অথচ তোমার শরীরের মধ্যে বৈদ্যনাথ শব্দটি নেই—এটা কি হতে পারে? বৈদ্যনাথ ধ্বনি সমষ্টিটি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে—অথচ তুমি এখানে রয়েছ—এটা কি হতে পারে? ভেবে দেখ মনোযোগ দিয়ে।

বৈদ্যনাথ—না, হতে পারে না।

আমি—তাহলে তোমার শরীরের মধ্যে সারাক্ষণ বৈদ্যনাথ ধ্বনি সমষ্টি থাকতে বাধ্য।

বৈদ্যনাথ—নিশ্চয়!

আমি—তাহলে বুঝছ। তোমার শরীর আর বৈদ্যনাথ ধ্বনিসমষ্টিটি—এ দুটিকে কখনোই পৃথক করার উপায় নেই। পৃথক করে ও দুটিকে—দুটি আলাদা যায়গায় দূরে রাখার উপায় নেই।

বৈদ্যনাথ—না নেই।

আমি—এবার বোঝো। ক আর খ দুটি আলাদা জিনিস হলে—নিশ্চয়ই কোনো উপায়ে হাজার হাজার বছর ধরেও চেষ্টা করে নিশ্চয়ই আলাদা করা যায়। আর দুটি জিনিসকে কখনোই কোনো উপায়েই আলাদা না করা গেলে দুটো জিনিস আসলে একটা জিনিস—এক-এর সংজ্ঞাই তাই।

বৈদ্যনাথ—নিশ্চয় নিশ্চয় তা ঠিক।

আমি—তবে দেখ বৈদ্যনাথ। তোমার শরীরই বৈদ্যনাথ ধ্বনিসমষ্টিটি।

বৈদ্যনাথ—ঠিক।

আমি—তা হলে বোঝ ব্যাপারটা। এই হচ্ছে আমার পদ্ধতি—কাকে কাকে কখনোই আলাদা করা যায় না তাই খুঁজে বার করলেই তো হলো! বোঝা যায় কোনটা আসলে কী।

শংকর বসু

ভ্রম সংশোধন

কল্পনা করা যাক এমন এক পরিস্থিতি যখন দু-জন মানুষ পরস্পরের মুখোমুখি, তাদের কোন তাড়াহুড়ো নেই, প্রাত্যহিকতার একটু বাইরে সরে এসেছে বলে এবং মধুর এক শূন্যতার ছায়া আছে বলেও তারা যেমন বিমনা তেমনি হঠাৎ অকপট হয়ে পড়েছে, পরস্পরের সম্পর্কে জমে উঠেছে আগ্রহ।

অলক আর সুদেষ্ণা আর কিছুতেই ফিরে পেতে পারে না এমন কোন প্রত্যূষ, কিছু ঘটনা ও তথ্য রয়েছে তাদের ঘিরে, যেমন আছে 'ভালোবাসা' শব্দটি। গল্পটি শুরু হতে পারত এরকমই কোন ঘটনা বা অনুভব থেকে। একজন অলক, যে কোনও একজন অলক হলে-ও, সাজানো-গোছানো নিয়ম মাফিক গড়ে তোলা জিনিসে সে বিরক্ত বোধ করে। এর দুটি কারণ আছে : এক সে নিয়মের মত করে নিজেকে গড়ে তোলে ৩০ বছর পর্যন্ত, তার জীবনের প্রথম তিনটি দশক এভাবে অতিবাহিত হয়েছে। দুই, পরবর্তী দশ বছর অফিস নামক একটি চটপটে, ব্যস্ত জায়গায় শুধু সংখ্যা ও বর্ণমালার এক নিপুণ ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভালোবাসা, সৃষ্টি, যৌনতা ও যূথবদ্ধতা ; ক্রোধ, শোক, উল্লাস ও উৎসব ; সমস্তই শেষ পর্যন্ত এক বর্ণহীন ক্যালেণ্ডারের তারিখ হয়ে যায়।

যথা সময়ে অলক অন্যান্য প্রসঙ্গ স্মরণ করবে, এখন এইটুকু প্রকাশ থাকা উচিত যে অলক কোন একদিন অনুভব করেছিল যে সে একজন মানুষের মুখোমুখি বসে আছে, নতুন আলাপ হওয়া এই মানুষটিকে তার খুব ভালো লাগছে, যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করছে 'আপনার কথা শুনতে চাই, বলুন'। বলা যায় না, 'বুঝলেন আমি কোনদিন সাজেশান পড়িনি, দু-ঘণ্টার বেশি পরীক্ষার হলে থাকিনি' বা 'কোনদিন দ্বিতীয় হইনি'! এসব হাস্যকর একঘেঁয়ে কথা সে কী করে বলবে। কী করে বলবে, 'তারপর একদিন বিয়ে করে ফেললাম' 'নাহ্ আর কোন লক্ষ্য

নেই সামনে···মানে যাকে বলে মূর্ত লক্ষ্য।' অলক মুখ খুলতে পারছে না, চল্লিশ বছরের একটি জীবন যে এতখানি গল্পহীন সে যেন আজ-ই তা জানতে পারল। ফলে যতটুকু বিমর্ষ হওয়ার সেসব ত ছিলই, উপরন্তু সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল সামনের দিনগুলি ভেবে, তারা ত আসছে। তারিখহীন, দিনহীন হু-হু সময়···

সামান্য-অসামান্য কিছু ঘটনা যেভাবে ছেদচিহ্ন সমেত পর-পর ঘটেছিল তাতে সময়ের কোন ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব না-হলে-ও, বোঝা যাচ্ছিল একজন অলক এগিয়ে চলেছে তার পরিণতির দিকে, এমন-ও নয় যে অলক তার পরিণতির প্রশ্নে সজাগ ছিল না।

তবে অলকের দিক থেকে ভাবলে দেখা যাবে, নরম সরম শৈশবের পরে সময়ের গতি কোন ভবিষ্যতের দিকে ছিল না, যেমন ছিল না কোন দগ্ধ অতীত। ধর্মঘটের দিন ক্রীক রো'র হঠাৎ মাঠ হয়ে যাওয়া, ইট সাজিয়ে সেখানে ক্রিকেট খেলা, পাশে সংকীর্ণ গলিতে বল কুড়িয়ে আনতে যাওয়া মানেই এক অতি বৃদ্ধের কাশির শব্দের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়া—এইরকম শৈশবের পর স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ফ্ল্যাট, প্রশস্ত সেতু পেরিয়ে গাছের ছায়া, তার ফ্ল্যাটটিতে ফিরে আসা। যাবতীয় ঘটনার শরীর এখানেই ছড়িয়ে আছে অজস্র টুকরোয়। দু-একটি টুকরোয় রীতিমত রক্তের দাগ আছে।

এবার শহরের কথা, এজন্য যে ধর্মঘটের গলি ও গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা ছিমছাম বাড়ির মধ্যে পড়ে থাকা টুকরো-টুকরো ঘটনা ত এই শহরেরও কাহিনী, এমন কি কাহিনী না বলে শহরের এক দিনপঞ্জী বলাই ঠিক হবে। যানবাহন ও ব্যস্ততাহীন ধর্মঘটের শহর আশ্চর্য ভুতুড়ে হয়ে উঠত, যেন তখন শহরটির পুরনো কর্তৃত্ব ধ্বসে পড়েছে অথচ নতুন কোন কর্তৃত্ব উঠে আসেনি, মনে হত শহরের নাগরিক ও শ্রমজীবীরা বহুদিন পরে জানতে পেরেছে আলস্য কাকে বলে, এক লহমায় তারা গভীরভাবে বুঝে ফেলেছে কাজের অসারতা। দীর্ঘ সময় নিয়ে তারা স্নান করছে। কথা বলছে জিরিয়ে-জিরিয়ে, প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ধ্বনির প্রতি জেগে উঠছে আগ্রহ, যেন ধীরে একটির পর একটি চুমুকে পান করে চলেছে মৃদু নেশা। যে রাজনৈতিক দলটি ধর্মঘট ডেকেছে তাদের কর্মীরাই খুলে রাখত একটি দোকানের পাল্লা, আধবোজা চোখের মত দেখতে দোকানটিকে, চা আর সিগারেটের ধোঁয়ার অস্পষ্টতা জড়িয়ে নিত ঐ কর্মীদের, ফলে তাদের মধ্যে-ও কোন তাড়াহুড়ো দেখা যেত না। বড় বিশ্বস্ত ও একাগ্র দেখাত

তাদের, তারা গভীরভাবে জানে ধর্মঘট এক সুদীর্ঘকালের ব্যাপার, ক্ষমতার হস্তান্তর কোন আকস্মিক বজ্রপাতে ঘটবে না বরং অজস্র মানুষের জীবন বৃত্তান্তে-ই লুকিয়ে আছে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বীজ, একদিন যা হয়ে উঠবে মহীরুহ।

অন্ধকার গলিটিতে বল খুঁজতে ঢুকে এরকমই এক ধর্মঘটের দিনে অলক পাথর হয়ে গিয়েছিল, প্রাচীন কাশি তখন-ও হাঁপড় টেনে চলেছে এবং এক যুবক তাঁকে জিজ্ঞেস করছে, 'কতদিন বাঁচতে চান?' কাশির দমকে উত্তর বড় জড়িয়ে গিয়েছিল, 'পল্টুর বিয়ে পর্যন্ত।' এতে যুবক-টির মধ্যে ঠাণ্ডা নির্দয়তা দেখা গেল, যেন সে এখুনি বৃদ্ধকে খুন করবে, তার হাতে ছুরি আছে! সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন?' বৃদ্ধ নিরুত্তর। তারপর এরকম কথাবার্তা:

আপনার মৃত্যুর পর যদি শ্মশানে একটা পাথর বসানো হয়, তাতে কী লেখা হবে?

জানি না।

আপনি কি হেরো?

জানি না।

এই যে এত কষ্ট করছেন, কেন?

জানি না।

দেখতে চাইছেন কত কষ্ট সহ্য করতে পারেন?

জানি না।

যেহেতু পল্টু অলকেরই ডাক নাম, ফলে সে শিউরে উঠেছে, অদ্ভুত টান অনুভব করেছিল। সে আর গলিটি থেকে বেরিয়ে এল না, বরং ঐ যুবককে চমকে দিয়ে এমন ভয়ার্তভাবে 'দাদু' বলে ডেকেছিল যে যুবকটি অপ্রস্তুত হয়ে যায়, বানিয়ে বানিয়ে একটি গল্প বলতে চেষ্টা করে, অলক সেই গল্পের একটি বর্ণও বিশ্বাস করেনি। কলকাতার আবছা অন্ধকারে গলিটিতে তখন এক অতিজীবিত মানুষ, যে শুধু কাশির শব্দে বেঁচেছিল, আকস্মিক সে যেন পৌঁছে যেতে থাকে প্রকৃত বেঁচে থাকায় এবং খক খক শব্দে চেষ্টা করছিল পল্টুকে বলতে সে কেন বেঁচে আছে, অথচ গলা ও বুকে জমে থাকা পাথর, কিছু গহ্বর ও অজস্র ব্যবধান, দূরত্ব, তার কণ্ঠস্বরকে এত অস্পষ্ট করে তোলে যে পল্টু কিছুই উদ্ধার করতে পারছিল না সেই গোঙানির স্বর থেকে। সে শুধু দেখল বিস্ফারিত দুটি চোখ মরুভূমির

মত দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে—'আমি দেখে যেতে চাই।' দাদু যখন মারা গেল চোখদুটি ছিল ঐরকম খোলা, বিস্ফারিত আর ঐ প্রথম অলক জানতে পারে সম্পূর্ণ জেগে থেকে, দেখতে দেখতে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

অলকের মনে দাদুর ঘটনা যতখানি দেগে বসেছিল, তার স্ত্রীক রো ছেড়ে চলে আসা, পরীক্ষা-জীবিকা ঘিরে উত্তেজনা, সুদেষ্ণার সঙ্গে প্রথম মিলন কোন কিছুই ততখানি দেগে বসেনি। বাদ বাকি রহস্য-রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাকে সে কিছু দিনের মধ্যেই একটি মালায় আবদ্ধ দেখেছিল, যা কেবল ঘুরে ঘুরে আসে। অলক ঠিক শূন্যতার অনুভবে আক্রান্ত হয়নি, বরং এই অনুভূতিমালার কেন্দ্রে সে অবসাদ দেখেছিল শুধু।

তবু অলক নামের একজন মানুষ, বিশেষত যার বয়স এখন চল্লিশ হতে চলল, তার ক্ষেত্রে কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামার সংক্ষিপ্ত ও গড়পড়তা যেটুকু ঘটনা থাকার কথা, সে নিজেও তা অগ্রাহ্য করতে পারে না, ফলে চল্লিশটি বছরের মধ্যে অলক যেভাবে নিজের জীবন অন্বেষণ করেছিল, সে-ই বৃত্তান্তে প্রবেশের আগে, মামুলি ঘটনারাজি একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাইরের দুর্দান্ত জগৎকে যৌবনকাল পর্যন্ত সে সতর্কে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, এভাবে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে ২০টি পরীক্ষা, ৮টি মোক্ষম ইণ্টার-ভিউ, ৬টি সেমিনারের পর অলক বেশ বিপন্ন বোধ করছিল। তখনকার মানসিক অবস্থা হুবহু বর্ণনা করা অসম্ভব, তবু বলা যায় এক ধরনের দক্ষতা তার অস্তিত্ব প্রায় ছেয়ে ফেলছে অনুভব করে অলক একান্তভাবে চাইছিল এইসব পটুত্ব ঝেড়ে ফেলতে।

অলকের এই ২৫ বছর পর্যন্ত এসে যাওয়াকে আরও কয়েকটি দিক থেকে উপস্থিত করা যেতে পারে, অন্তত আরেকটি দিক থেকে। অথাৎ তার পারিবারিক দিক থেকে এই পঁচিশ বছরে পেঁাছে যাওয়াটা না দেখলে ভুলের গোড়া যে একেবারেই দেখা যাবে না তা নিদ্ধিধায় বলা চলে। দাদু সম্পর্কে সে শুনেছিল গ্রাম ছেড়ে আসার ঘটনা এবং অকেজো হয়ে পড়ার বিবরণ। বাবা কাকা প্রভৃত কষ্ট করে তাদের বংশে প্রথম উকিল ও ডাক্তার হয়ে একটা বিশাল পরিবারকে রক্ষা করেছিল, পরিবারটি ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছিল দুর্ভিক্ষের ভয়, পরিচয়হীনতার অন্ধকার থেকে। অলক-কে নানা-ভাবে, বিশদে, এইসব গল্প শোনানো হয় এবং পরে বহুবার প্রায় মন্ত্রের মত

তার কানে ঢেলে দেওয়া হয়েছিল কয়েকটি শব্দ : তুমি যতদূর খুশি যেতে পারো, যতদিন ইচ্ছে পড়াশুনো করতে পারো, আমাদের কথা ভাবতে হবে না, তোমার কাঁধে কোন বোঝা নেই। এরকম পারিবারিক চিত্রের মাঝখানে ছিল দাদুর চোখ দু-টি, দাদু যদিও মুখে বলছিল 'পল্টুর বিয়ে পর্যন্ত' বাঁচতে চায়। আসলে বলতে চেয়েছিল পল্টুর পরিণতি দেখে যাওয়াই বৃদ্ধের কামনা।

এই প্রতিশ্রুত জীবনের কোন পূর্ণাঙ্গ অবয়ব অলকের সামনে ছিল না, মূর্ত লক্ষ্যগুলি সে একের পর এক ছুঁয়েছিল অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গেই কিন্তু অনিশ্চয় ও লক্ষ্যহীনতা ততই বেশি করে কব্জা করছিল তাকে। ত্রিশে পৌঁছে তার আলাপ হয় সুদেষ্ণা নামের এক যুবতীর সঙ্গে। যার মুখে এক ভুবনমোহিনী হাসি দেখে অলক হঠাৎ অনুভব করে, এতদিনে তার জীবনে কিছু ঘটতে চলেছে। সে হেসে ফেলে, তার শরীরে হাসি ও শিহরণ ছড়িয়ে যায় ঢেউয়ের মত, সুদেষ্ণা এবং অলক এই পর্বটি প্রকৃতই যেন একটি ঢেউয়ের ব্যাপার। তারা হাত প্রসারিত করল। প্রেম এল দু-হাত ছড়িয়ে।

আজ-ও আছে সেই প্রসারিত হাত, তবে তা যেন শুধু এ কারণে যে মৃত কোষগুলি হাত দুটি পাথর করেছে, তারা আর হাত টেনে নিতে পারে না। একটির পর একটি পরিণতিকে এড়িয়ে যাওয়া অলক কখনও শেখেনি, সুদেষ্ণাও নয়। সুদেষ্ণার কাহিনী এমন স্বতন্ত্র কিছু নয়, সমস্ত-ই নিয়মানুগ, সে ৮টি রবীন্দ্রসঙ্গীত সুরেলাভাবে গাইতে পারে নিখুঁত উচ্চারণে, অনেক মানুষের সামনে তার যা আচরণ নিভৃতে সে-ই আচরণ বেশ বদলে যায়। সুদেষ্ণা একটু হৈ চৈ ভালোবাসে, রাত আর সকাল নির্জন থাকাই তার পছন্দ, এইসব বৈপরীত্য এমনভাবে আছে যে অলক ভয় পেয়েছে, সুদেষ্ণার শরীরের তাপ, বুকের শব্দ শুনতে চেষ্টা করেছে আর ভয় পেয়েছে কেন ওকে পুতুল-পুতুল লাগে? শরীর নষ্ট হয়ে যাবে ভয়ে সুদেষ্ণা সন্তান চায় না কেন, সুদেষ্ণার সন্তান ধারণের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে কি? আবার যখন সে বন্ধুর সন্তানকে প্রলোভন প্ররোচনায় বুকের মধ্যে নিয়ে এসেছে তখন অলককে ভাবতে হয়েছে সন্তানের আগমন তার ঘরে টাঙিয়ে দেবে বিজ্ঞাপনের হাস্যময়ী এক জননীর ছবি। ক্রমে অলক *ধাতস্থ হল, জানতে পারল, খুব বেশি মেয়েদের* সঙ্গে মেশেনি বলেই সে সুদেষ্ণাকে কৃত্রিম ভেবে ফেলেছে। আসলে নির্ঝঞ্ঝাট

এই ফ্ল্যাটের জীবনে, অলকের মত একজন মানুষের সঙ্গে থেকে, অফিস করে, মজবুত নিরাপত্তার শিখরে পৌঁছে সুদেষ্ণার বাল্যকাল ফিরে আসছে। মাঝে মধ্যে সে অলকের কাছে আব্দার করে ফেলেছে শৈশবেরই এক গাঢ় প্রভাবে।

সুখে পরিপূর্ণ না হলেও, এ শহরে সুখী জীবনও প্রবাহিত, শক্তি, সামর্থ্য ও মর্জি অনুসারে মানুষ কত রকমভাবে বেঁচে আছে। অলক-সুদেষ্ণা, যারা শেষ পর্যন্ত সরে এসেছিল নিভৃত ফ্ল্যাটটিতে, ছায়ার সান্নিধ্যে, তারাও বেঁচে থাকার নানা পদ্ধতি প্রকরণ দেখেছে। ক্রীক রো'র বাড়িতে তখন আর সে-ই বৃদ্ধাও বেঁচে নেই, যার কপাল রক্তাক্ত করে জ্বলজ্বল করত একটি বিশাল টিপ। এই ঘটনাটিকে সুদেষ্ণা বহুবার উল্লেখ করে থাকে, সে বলতে চায় অলকের বাবা ও মার মৃত্যুর জন্যই তারা ক্রীক রো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অলক জানে তার বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ঘটেছিল নেহাৎ-ই বাল্যকালে, এ প্রসঙ্গে সে শহরের একটি গলিকে ধর্মঘটের কব্জায় দেখতে পায়। সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যাওয়া দাদু এবং পরিবারের কনিষ্ঠতম ব্যক্তি হিসাবে নিজের ভূমিকার কথা তার মনে পড়ে যায়। এখনকার অবস্থায়, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে তারা দুজন মানুষ, সে আর সুদেষ্ণা মাঝেমধ্যে দু-চার জন বন্ধু সহ কোথাও-কোথাও এক কলরোল সৃষ্টি করলেও, সকলেরই মুখ-চোখ শরীর বড় ঝাপসা। নিরুত্তাপ প্রতিটি দিন রয়েছে অলকের অপেক্ষায়, এই সব মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় অলি-গলি ভাঙা পার্ক-সিনেমার হোর্ডিঙের একটি শহরকে তার কাছে ভয়াবহ করে তোলা হয়েছিল, ভয়ের রঙে চিত্রিত করা হয়েছিল। সে কি শুধু এইজন্যে অলক যাতে এক দুরারোগ্য ভয়ে আক্রান্ত হয়ে, মুদ্রিত অক্ষর গিলে যায় শুধু, একের পর এক বই গিলে ফেলে ভয়ের বিকারে এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে সুখী জীবনে, যাতে সে বেঁচে থাকতে পারে দীর্ঘকাল। নাকি তারা কল্পনা করেছিল নবতম এক নায়কের, অভিযান, যুদ্ধ, সাহস, শক্তি ও সম্পদে এই নায়কের প্রতিমূর্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ স্বাধীনতার পর আর কোন যুদ্ধের প্রশ্ন ওঠে না, এখন একমাত্র সৃষ্টি ও আবিষ্কার হল পরিকল্পনা। অন্যদিককার ঝোঁকটি, অর্থাৎ একটি বামপন্থী ঝোঁকও ছিল, তাতে বলা হয়েছিল, প্রথমে জঞ্জাল সাফ করো তারপর রোপণ করো শিশু গাছ। অলক দীক্ষিত হয়েছিল প্রথম

অবস্থাতেই। সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে এই বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন আছে।

বলাবাহুল্য বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে আজ তার বোধ আমূল বদলে গিয়েছে, তবে অলকের মত মানুষের কথায় সে প্রসঙ্গ এখন অবান্তর বরং চল্লিশ বছরের বহু কাগজপত্র, সই সাবুদ, হাসি বিষাদ, বহু মানুষের হাত ছোঁয়া, ক্রোধ ও বিরক্তির স্তূপাকার ঘটনার তলায় চাপা পড়া, কিছুটা হারিয়ে যাওয়া নিখাদ জীবন পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করাই সঙ্গত। তার আগে রূপকথা সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়, কারণ অন্তত ষোল বছর বয়স পর্যন্ত অলক বিশ্বাস করত রূপকথার দত্যি দানো কোন কাল্পনিক ব্যাপার নয়। খবরের কাগজ ও অন্যান্য সূত্রে পাওয়া যে কোন হিংসাত্মক ঘটনার মধ্যে রূপকথার দত্যি দানোকে সে স্পষ্ট দেখতে পেত। অর্থাৎ তার বাল্যকাল একদিকে যেমন কেবলই নিয়মের আনুগত্য, নিয়ম শেখা, নিয়ম আয়ত্ত করা, নিয়ম ব্যবহারে কৌশলী হওয়া, তেমনি অন্যদিকে সেখানে ছিল গভীর অরণ্য, খা খা প্রান্তর ও অতিকায় প্রাণী, মন্ত্রপূত তরবারি। স্বর্ণকেশী এক রাজকন্যা মল্লিকবাড়ির জমকের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে সে বিশ্বাস করত। বরং সেদিক থেকে ভাবলে, ক্রীক রো, মৌলালি, শিয়ালদা, পার্ক, রাস্তা, হোর্ডিং এসব তার কাছে ছিল এক অলীক অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে জগৎ। অলক যেনবা সরাসরি এসেছে রূপকথার ঐ জগৎটি থেকে, যেজন্য সে অপরাজেয়ও বটে। তাকে ঘিরে পরিবারের মানুষজনের অতিকল্পনা এখানেই এক বাস্তব ভিত্তি পেয়েছিল।

এখন ত সে নির্বাচন করতে বসেছে, অর্থাৎ তার জীবনের ঘটনাপঞ্জী সে একটু সাফসুফ করে নিতে চাইছে। নায়কের অতিকল্পনা রূপকথার সঙ্গে বিসর্জন দিতে গিয়ে প্রায় এক ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছে সে। এরকম অর্থহীন, হাঁদা ব্যাপার আর পুষে রাখা সম্ভব নয়, অথচ এই দুটি জিনিস ছেঁটে ফেললে, সে তার চল্লিশটি বছর এত ন্যাড়া কৃশ দেখতে পায় যে শিউরে ওঠে।

নতুন এই উপাখ্যানে বাল্যের দত্যি-দানো অনুপস্থিত, ভেলকি ও যাদু থেকে ঝরে গিয়েছে মন্ত্রের জোর। ভালো মন্দ মানুষের অতিকায় শরীর পচে তৈরি হয়েছে তার পায়ের তলার মাটি, রাস্তাঘাট, হোর্ডিং ও অ্যাণ্টেনা। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তার শরীর ও প্রয়োজন যতখানি বদলেছে তাতে ঐ প্রাগৈতিহাসিক শৈশব একদিন বেয়াড়া, বেখাপ্পা হয়ে ওঠে।

ফলে তাকে ঝেড়ে ফেলতেই হল অসাড় কল্পনা ও আজগুবির এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি, আসলে ঝেড়ে ফেলা তার পক্ষে এত দুরূহ ব্যাপার ছিল যে তাকে ঐ জলাভূমি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে চোরের মত। এ প্রায় তার দাদুর গ্রাম ছেড়ে আসার ঘটনার মত, যার পর দাদু সম্পূর্ণ অকেজো, বাতিল হয়ে যায়। এইভাবে শৈশবকে গুপ্তহত্যায় সরিয়ে ফেলার পর অনুভব করেছিল যে, সে শক্ত হয়ে উঠছে। ভুল ভেঙেছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে চেষ্টা করেছিল চল্লিশটি বছর থেকে একটি চমৎকার জীবন রেখা আবিষ্কার করতে। যেনবা সে নিজের জীবনেই খুঁজে চলেছে মূল্যবান এক শিলালিপি। আর প্রতিকারের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে কয়েকটি প্রশংসাপত্র ও সাফল্যের দলিল, পাতলা খসখসে কিছু কাগজ। প্রতিটি কাগজে আছে কিছু ক্রমিক সংখ্যা আর সাংকেতিক চিহ্ন এবং সুবিশাল অশোক স্তম্ভ।

অলক ঠিক করল এ বিষয়ে সে ঘনিষ্ঠ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলবে, চল্লিশ বছর বয়সে এই যে হঠাৎ একটা ঝোঁক এসেছে তার মধ্যে, সে কিছুতেই এই ঝোঁকটি অবহেলায় নষ্ট করতে পারে না, এক ধরনের তীব্র মাদকতায় সে পূর্ণ হয়ে উঠছিল ক্রমশ।

'বিচ্ছিন্নতা' আর 'পরিকল্পনা' এই শব্দ দুটি বেছে নিল, তার চল্লিশ বছরের সরল-রেখা জীবনের মূল দুটি বিন্দু এই শব্দ দুটি-ই। দুটি শব্দকে অভিজ্ঞতার দিক থেকে আগে পরে বা আলাদা করা অসম্ভব, তবু আলোচনার সুবিধের জন্য প্রথমে সে বেছে নিল 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি। সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম যে সমস্যাটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তা হল, এ নিয়ে সে কার সঙ্গে আলোচনা করবে। বাবা-মা-কাকারা বেঁচে নেই, অন্যান্য আত্মীয়রা জীবিকা শিক্ষা এই সব মিশিয়ে দু-এক ধাপ নেমে গিয়েছে, সম্পর্কে এসেছে এমন দূর-দূর ঠাণ্ডা ভাব ও জটিলতা যে তাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা জন্ম দেবে এক অর্থহীন প্রলাপের। এ ছাড়া এ জিনিসটা যে সমস্যা হতে পারে কার-ও কাছে, তা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর, কল্পনারও বাইরে।

ভাবনার সঙ্গে সিগারেট খাওয়ার সম্পর্ক খুবই প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার। ব্যালকনিতে চেয়ার টেনে, মাথার পিছনে দুটি হাত ভেঙে রেখে, ছাইয়ের স্তম্ভ গড়ে তুললে সুদেষ্ণার পক্ষে একথা জিজ্ঞেস করা খুবই সংগত 'কী

অত ভাবছো ?'

সুদেষ্ণাকে বেশ দেখাচ্ছে, পাতলা পোশাকে, স্বচ্ছ পোশাকে সুদেষ্ণার নগ্নতা অপরূপ, অলক একবার তাকিয়েই বুঝল আবার সেই ভুল ঘটতে চলেছে, সে এখন উঠে দাঁড়ালে, এই গ্রীল-ভাঙা রোদ-ছায়া সময়ে যদি সে সুদেষ্ণার বুকের তাপ ও শব্দ অনুভব করতে চায় তাহলে সমস্যাটি জলো হয়ে যাবে। তাছাড়া সমস্যা বলা হলেও, এ-জিনিসটা তার কাছে ঠিক সমস্যাও নয়, সে যেনবা এগিয়ে চলেছে অজান্তেই স্বচ্ছ এক চিন্তার দিকে, 'বিচ্ছিন্নতা' তার সোপান মাত্র।

ধবধবে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, অলক সিঁড়িটি চোখ বুলিয়ে দেখতে পেল। পাওয়া মাত্র সে একটু চমকেও ওঠে, বলা যায় সে ভয় পেয়েছে, কেননা সে কেন এরকম মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দেখছে। তাহলে ত আবার এসে যাবে আজগুবি কল্পনা, শৈশবের অভ্যাস ফিরে আসছে কি, রূপকথার ঝোঁক। অলক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

উঠে পড়লে যে !

না, সুরঞ্জনের অসুখ, যেতে হবে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সুরঞ্জন বহাল তবিয়তে রয়েছে সিমলা স্ট্রীটের তিনতলা বাড়িটিতে, হয়ত সেখানে এখন জড়ো হয়েছে দু-চারজন বন্ধু, আড্ডা জমে উঠেছে। অলককে সত্যি সত্যি ভেবে নিতে হল সুরঞ্জনের ওখানে যাওয়ার অর্থ-ও এই বিশেষ মানসিক অবস্থাটি হারিয়ে ফেলা, গুলিয়ে যাওয়া। 'আয়' বলে সুরঞ্জন যে অমায়িক হাসিটি বিলিয়ে দেবে তার প্রভাব বড় কম নয়, তদুপরি দু-চার জন বন্ধু-বান্ধবে এতক্ষণে সেখানে গড়ে উঠেছে ভিন্ন এক পরিস্থিতি। হয়ত বা সেই প্রতিদিনের বিষয়েই তারা মজে গিয়েছে, 'গালিভারস ট্রাভেল' নিয়ে মজা ও হুল্লোড় করছে তারা! তাতে দেখা যাচ্ছে অনেক 'মহান ব্যক্তি'ই আদতে বামনবীর, সুরঞ্জনরা একে-একে প্রমাণ করে চলেছে এই তত্ত্ব, আর প্রীত হয়ে উঠছে। 'আমার মনে হয় তুই একটি সামাজিক পরিস্থিতি থেকে নিজের সমস্যাকে পৃথক করে নিচ্ছিস, তা হয় না।' বড় জোর সুরঞ্জনরা এরকম কথা বলতে পারে, একথা ভুল নয়, ঠিকও নয়, এ শুধু পরিস্থিতির বিবরণ। অলকের আপাতত এরকম বিবরণে কোন আগ্রহ নেই। অথচ সেই সুরঞ্জনরা গালিভার্স ট্রাভেল নিয়ে যখন মেতে ওঠে তখন তো তারাও পরিস্থিতিরই গোলাম। কী হবে সুরঞ্জনের কাছে গিয়ে, সুরঞ্জনের কাছে সে আজ যেতে চাইছে না।

এল নাইন বাসটিতে গোল পার্ক থেকে উঠলে বসার জায়গা পাওয়া কঠিন নয়, বিশেষত এই ছুটির দিনে। দেড় তলায় চলে গেল সে, বসল জানলার পাশে, যথা সময়ে ঘণ্টি দিয়ে বাসটি রবীন্দ্র সরোবর ধরে ছুটে চলল। অলক ততক্ষণে ভুলে গিয়েছে যে সে আগে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে ভাববে ঠিক করেছিল। সে 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে দিল আচমকা।

অলকের পিতৃপুরুষ-ই তাকে প্রথম আলাদা করে দেখেছিল, আসলে তখন তাদের আর্থিক ও পারিবারিক পরিস্থিতি পৌঁছে গিয়েছিল এমন এক অবস্থায় যখন কল্পনার দুটি ডানা সংগ্রহের কথা ভাবা সম্ভব। পারিবারিক দিক থেকে ভাবলে হয়ত তারা তখন আন্তরিকভাবে কামনা করছিল বাস্তবতার একঘেঁয়ে দিনলিপি থেকে বেরিয়ে আসতে। সদ্য স্বাধীন একটি দেশও হয়ত তাদের কল্পনাকে কিছুটা উস্কে দিয়েছিল। অলকের স্থানটুকু ঐ মধ্যবিত্ত পরিবার বেশ পরিচ্ছন্ন করে রেখেছিল, রেশন-দোকান-বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন থেকে অলককে তারা মুক্ত করে দিয়েছিল, এম. এসসি. পাশ করা মাত্র তাকে উপার্জন করতে বলা হয়নি, এবং বলা হয়েছিল 'অলক তুই যতদূর পারিস যা।'

নরম বয়সের কথা আজ নাড়াচাড়া করলে অলক দেখতে পায় সে-বে খুব একটা অহংকারী ছিল এমন নয়। তবে স্ক্রীক রো'র জীবন যে তার জীবন নয় এই কথাটি প্রবাহিত হচ্ছিল তার রক্তে, বন্ধুদের প্রতি দুর্বলতা সে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল, নিজের মধ্যে একজন নায়ককে সে অনুভব করত। যদি এ-জিনিসটা শুধুমাত্র তার নিরাপত্তার বোধ থেকে ঘটত, তাহলেও হয়ত অলক আজকের মত নিঃস্ব বোধ করত না। পারিবারিক জীবন থেকেও অলক সরে যেতে থাকে, অথচ তার চোখের সামনে অতি তুচ্ছ কথায়, গল্পে সবাই গোল হয়ে বসে হাসত, দুঃখ পেত, উত্তেজিত হত। দাদুর মৃত্যুতে নেমে এসেছিল শোকের প্রলয়, আর অলকের তখন মনে পড়ছিল ধর্মঘটের সেই দিনটি, দাদুর কাশি, অস্পষ্ট গোঙানির মধ্যে উচ্চারিত 'পল্টু' শব্দটি।

প্রবাহ থেকে সরে আসা আর প্রবাহের বাইরে চলে যাওয়া এক কথা নয়, প্রবাহের বাইরে চলে যাওয়া যায় না। যদিও রক্ত-মাংসে প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত থাকা অলকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কোথায় যেন শিশুকালে সে একটি গল্প পড়েছিল, তাতে একজন মানুষ এক জীবনে যতগুলো ভুল

করেছিল সেইসব ভুলের স্মৃতি সমেত তাকে দ্বিতীয় জন্মের বর দেওয়া হয়। তবু সেই মানুষটি একই ভুলের নিখুঁত পুনরাবৃত্তি করেছিল। কেন এমন হয়?

এল-নাইন বাসটি বেশ নমনীয়, বেঁকে চুরে চলতে জানে, সে জানে না এল-নাইনের জন্যে বিশেষ চালক নির্ধারিত থাকে কি-না, তবে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে এই বাসটির আছে গতির উপর অসাধারণ নিয়ন্ত্রণ, একটু প্রশস্ত, ফাঁকা রাস্তা পেলেই বাসটি কেমন দুর্বার ছুটে যেতে পারে এবং জ্যামের মুখে এসে মুহূর্তে পাথর হতে পারে, এ এক আশ্চর্য কৌশল মনে হয় তার। রাসবিহারি, পি.জি., লিণ্ডসে, সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ, মানিকতলা পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে অলকের পরিচিত মানুষেরা ছড়িয়ে আছে! কতবার তার ইচ্ছে হয়েছে বাস থেকে নিঃশব্দে নেমে গিয়ে কোন একটি বাড়ির কলিং বেলের বোতামে সূক্ষ্ম চাপ দিতে। পরক্ষণে মনে হয়েছে না থাক, কী হবে অনর্থক লোকজনকে বিব্রত করে। আবহাওয়া-শরীর-অফিস ও শহরের চমকপ্রদ কোন ঘটনা সম্পর্কে কিছুক্ষণ কথা বলার মধ্যে ফাঁকে-ফাঁকে, তাদের হন্যে হয়ে খুঁজতে হবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে কথা বলা যায়। এমন কথা যার মধ্যে কিছুটা বুদ্ধি ও অনুভব থাকে, বোঝা যায় যে তারা ভাবতে জানে। বিচার-বিবেচনারও এক মাদকতা আছে, তবে এতদিনের চর্চায় এখন মাদকতা আর নেই, এখন যা আছে তা অমোঘ শব্দ প্রয়োগ ; প্রাণহীন, বরফের মত ঠাণ্ডা সততা আর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কিছু যুক্তি।

জানে না, দেড়তলায় বসে থাকার জন্যই কি না, অলকের দৃষ্টিপথে গোলপার্ক থেকে মাণিকতলা পর্যন্ত ছিল শুধু বিজ্ঞাপনের মুখ। ঘোড়ার উপর ছুটন্ত এক জনপ্রিয় নায়ক, নায়িকার শরীরের যৌন উচ্ছ্বাস, নিষ্ঠুর ভিলেনের কোঁচকানো চোখ, উদ্যত রিভলবার, ফতুয়া পরনে এক চাষার 'গঙ্গা মাইয়া' বলে চীৎকার আর বিশাল ব্লেড, বীভৎস ও বিপুল একটি বোতল ও ভয়াবহ তৃষ্ণার্ত দুটি ঠোঁট। বিজ্ঞাপনের এই সব হোর্ডিং-এর উপর দিয়ে তার চোখ যেহেতু এক নাগাড় ৩৫ মিনিট সরে সরে গিয়েছে, বিশাল মুখগুলি গতিশীল, ফলে এমন এক আচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, এমন একটি দু নম্বর দুনিয়া বাস্তব হয়ে ওঠে যে দেড়তলার নীচের সব কিছুই অবাস্তব হয়ে উঠতে থাকে। অলক দেখল সে পুনরায়

ভুল করতে চলেছে, শৈশবের অতিকল্পনার জগৎ, রূপকথার জগৎ আবার হানা দিচ্ছে, সে কেমন মন্থর ভাবে ঢুকে যাচ্ছে ঐ জগৎটির মধ্যে।

একবার সে, বিপুল প্রান্তরের ঠিক কেন্দ্রে সামান্য ডালপালায় ছাওয়া একটি গাছ দেখেছিল, এখন হঠাৎ সেই দৃশ্যটি মনে পড়ে গেল, বুঝতে পারে প্রান্তরের বিপুল নিঃসঙ্গতাকে ঐ গাছটিই সেদিন প্রকাশ করেছিল। এই শহর অত ভয়াবহ নয়, মাণিকতলায় এসে অলক যে হঠাৎ নেমে পড়ল তার কারণ দূর সম্পর্কের এই ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবে স্থির করে ফেলে।

দূর সম্পর্কের ভাইকে ঘিরে ছিল বিভিন্ন বয়সের তিন-চারটি বালক বালিকা, তাদের মা, ভাইয়ের জনা দুয়েক কলিগ ও একজন রাজনৈতিক কর্মী। অলকের সেই ভাই, ধরা যাক তার নাম দীপঙ্কর, দীপঙ্করকে দেখে অলকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাবার বসার ভঙ্গী ও কথা বলার ধরন। দীপঙ্কর এত দিন পরে আকস্মিকভাবে অলককে পেয়ে এতটু স্মৃতিচারণ করল, পরে দু-একবার সে ব্যক্তিগত হা-হুতাশ-ও প্রকাশ করেছে। সমবয়স্ক দীপঙ্করকে দেখাচ্ছিল বেশ মোটা, তার মাথার সামনের দিকটা যথেষ্ট ফাঁকা হয়ে এসেছে, দীপঙ্কর কথা বলছিল ধ্বনির সাহায্যে। যথা, 'হুঁ', 'উঁ'। এসব থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দীপঙ্করের তেমন কিছু বলার নেই। আবার তার উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর যেরকম মন্থর, শিথিল ও মৃদু, তাতে মনে হয় দীপঙ্কর জেগে নেই। চল্লিশ বছরের নিদ্রা ও জাগরণ, জাগরণ ও নিদ্রা, এত বেশি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে যে, সে ঘুমোতে-ঘুমোতে জেগে ওঠে। বা জেগে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ে।

পনেরো বছর যাবৎ ব্যাঙ্কে চাকরি করছে বলে দীপঙ্করের উপার্জন ভালই, কিন্তু এত কম আসবাব, এত পুরনো ধাঁচায় তারা বেঁচে আছে যে মনে হয় দীপঙ্করের সঙ্গে অলকের আর্থিক পার্থক্য অনেক খানি। দীপঙ্করের স্ত্রী অলকের চেহারা, মুখ ও বেশবাশ দেখে বলে ফেলেছিল 'আপনি এখনও কচি আছেন।'

দীপঙ্করের কাছ থেকে অলককে সরে আসতে হল এক সময়। সে তখনও জানে না এরপর কোথায় যাবে, যেমন জানে না বাসে-ট্রামে

ইতিপূর্বে বহুবার সে দীপঙ্করকে দেখেছে কি-না। চড়া দাম, এশিয়াড, হরিজন ও সি.পি.এম সম্পর্কে আলোচনায় দীপঙ্করই কি সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করেছিল প্রতিবারের বাস ও ট্রামে!

অলক কতখানি সরে এসেছে! সে আর এইসব কথা শুনতে পারে না, কোন দিনই সেরকমভাবে পারত না। বরং মনে পড়ে যেত জমাজিরেত নিয়ে বলে চলা দাদুর উত্তেজনা-অধীর গল্পগুলি। বাস স্টপে অলক বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি, তার গন্তব্য যেন নির্ধারিতই ছিল। আশ্চর্য টান অনুভব করছিল মৌলালির দিককার অতি পুরাতন এক কলকাতার দিকে। খুনী যেখানেই থাকুক কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে নাকি একবার ফিরে আসতেই হয় হত্যাকাণ্ডের অকুস্থলে, প্রায় সেই রকম টান, অলক এড়াতে পারল না।

অরূপরতন বসু

নিরক্ষর

এখন অনেক রাত, রুক্মিণী ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। তেতলার এই বারান্দা থেকে অনেকদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে, সামনে পার্ক থাকায় বহুদূর পর্যন্ত ফাঁকা, পার্কের ঘাস থেকে হাওয়া উঠে আসে। নীচের রাস্তায় দু-একটা রিক্সা, দূরে মোড়ের মাথায় তীব্র হেডলাইট জেবলে বোধহয় একটা লরি দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ফের হু-হু ক'রে চলে গেল, চারদিকের জনহীন রাস্তা ঝকঝক করছে আলোয়, তবু তার ভেতর হঠাৎ এক ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায়, লক্ষ্য করলাম, ডাস্টবিন থেকে শুকনো পাতা আর খবরের কাগজ উড়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে পেঁছিয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট শুধু, তুমুল বৃষ্টির জলে জানালার শার্সির ওপর লেপ্টে যাওয়া দৃশ্যের মত কালো কয়েকটা অক্ষর জেগে রইল, কয়েকটা চিহ্ন, আমি চিনতে পারলাম না, পড়তে পারলাম না।

রুক্মিণী পরশু চলে যাবে। এই ক'দিন আমরা উন্মাদের মত পরস্পরকে নিংড়ে বের করে নিতে চেয়েছি এমন কয়েকফোঁটা স্মৃতি, যা ছাড়া ভবিষ্যতে আর পরস্পরের কাছ থেকে দাবী করার মত আমাদের কিছুই থাকবে না। এটা আমরা দুজনই জানতাম। রুক্মিণী এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ ধ'রে ও কথা বলেছে, আমি চুপ ক'রে ছিলাম। নগ্ন শরীরের সঙ্গে নগ্ন শরীরের কথা বলার জন্য আজ আমার মনে হয়েছিল, ভাষা নয়, নৈঃশব্দ্য প্রয়োজন। কিন্তু রুক্মিণী তা পছন্দ করে না, আজও করেনি। সোনালি ধনুকের মত বেঁকে রুক্মিণীর কোমর যখন আমার মধ্যবিন্দুতে মুহুর্মুহু লক্ষ্যস্থির করছিল, তখনও রুক্মিণী বলে চলেছে ঃ 'চুপ করে থেকনা প্রদোষ, চুপ করে থাকলে মনে হয় তুমি দূর থেকে লক্ষ্য করছ।'

এই হচ্ছে রুক্মিণী ; সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভাষায় উন্মুক্ত করে না-দিলে যার নগ্নতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ রুক্মিণী ঠিকই বলেছিল, একদিন আমি রুক্মিণীকে লক্ষ্য করেছি, লক্ষ্য করেছি ওর ইচ্ছা কীভাবে

শরীর ও ভাষায় নিরাবরণ হ'য়ে ওঠে। শুধু কথা নয়, শব্দ কীভাবে কথায় ; কথা চিহ্নে ; চিহ্ন, অক্ষরে পাল্টে যায় তা-ও। শুধু রুক্মিণী নয়, এই শহরের শব্দ, আলো, অন্ধকার, চিহ্ন এসবও আমি লক্ষ্য করেছি। ঘরের অন্ধকার থেকে রুক্মিণীর গলার আওয়াজ পেলাম, আমাকে ডাকছে। ভেতরে গিয়ে কাছে বসতেই দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, 'দরজা বন্ধ কর প্রদোষ, আলো জ্বালো।' আমাকে চুমু খেতে-খেতে বলল, 'আমি জেগে আছি।' দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললাম। রুক্মিণী বলল, 'কই, দেখি তোমাকে—'

আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ও দু-হাতের মধ্যে আমার স্পন্দনকে ছোট্ট একটা পাখির মতো জড়ো করে এনে বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কেন, এই দেখ—' বলে সে আমার হাত, তার সিক্ত যোনির উপর চেপে ধরল, 'দেখেছো, আমি এখনও জেগে আছি।'

আমি নিচু হয়ে দু-হাত পেতে দিলাম ওর যোনির নিচে, যেমন ঝর্ণার নিচে নিচু হয় শস্যখেত, নাবিক যেমন ভিক্ষা করে সমুদ্রপথ, শিশু মাতৃগর্ভ, আমিও তেমনই ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। রুক্মিণী জড়িয়ে ধরল আমাকে, তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'তোমার সঙ্গে না-থাকলেও আমি বেঁচে থাকব প্রদোষ, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি তোমার।'

আমার মনে পড়ল রুক্মিণী প্রথমদিনও এই একই কথা বলেছিল। দিল্লীতে রুক্মিণীর ফ্ল্যাটে এ-কথা শোনার পর আমি বলেছিলাম, 'পূর্বাপর বলে একটা ব্যাপার আছে রুক্মিণী, নদীর কোন্ জায়গায় হাত দিয়ে তুমি বলবে এটা আলাদা! এতো ঘড়ি নয় যে একেকটা মুহূর্ত সেকেণ্ডের ঘরে আলাদা করা যাবে।'

'আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্তই আলাদা,' বলেছিল রুক্মিণী। কিন্তু আজ চুপ করে রইলাম। রুক্মিণীর ঠোঁট আমার ঠোঁটের নিচে কাঁপছে। বিশাল দুই নিমীলিত চোখের কালো তারা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। একটি স্তন ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ডের উপর, অন্য স্তনটি আমার হাতের মুঠোয় সন্ধ্যার আকাশ থেকে অন্ধকারের মত ঘন ও নিবিড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, মুহুর্মুহু ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছে কুণ্ঠিত তট রেখায়, 'বলো, আর পারছিনা।' রুক্মিণী আমার কাঁধে মাথা রাখল। আমি ওকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিলাম, ও ধীরে ধীরে চোখ খুলে বলল, 'এসো।'

আমি ভেতরে যাওয়া মাত্র মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল রুক্মিণী, তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অস্ফুট গলায় বলল, 'যতদূর যেতে চাও প্রদোষ যাও, আর কখনো তুমি কারও ভেতর এতদূর যাওনি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল ওর সমস্ত শরীর, ঢেউ-এর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে ওঠানামা করে খেলতে থাকল উম্মুখ মাছ, করজোড়ের ভেতর থেকে প্রার্থনার মত উঁচু উঠে রুক্মিণীর কোমর ডুবে যাওয়ার আগে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরল আমাকে। আমি বুঝতে পারছি একস্রোতের ভেতর ভেতর অন্য স্রোতের মিশে যাওয়া, ঈষৎ স্খলিত গলায় রুক্মিণী বলল, 'আমাকে পাচ্ছো!'

আমি তখনও চুপ করে রইলাম। ধীরে ধীরে রুক্মিণীর নিঃশ্বাস গভীর আর মন্থর হয়ে যেতে থাকল, চোখ বোঁজা, আমি জানি ও এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। আর এখন কথা বলবেনা রুক্মিণী। আমার ঠোঁট ও হাতের মধ্যে রুক্মিণীর দুই ছায়াচ্ছন্ন স্তন ধীরে ধীরে এক নিঃশ্বাস থেকে অপর নিঃশ্বাসের ভেতর, এক গোলার্ধ থেকে অপর গোলার্ধের রাতের মত যাতায়াত করতে থাকল।

আমি অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম, ঘুম আসছে না। ঘটনা নয়, ঘটনার চিহ্নের জগতে রুক্মিণী এখন ডুবে গেছে। চিহ্নের জগৎকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবে অপর এক রুক্মিণী এখন চিহ্নের সঙ্গে চিহ্নিতের খেলায় মগ্ন হয়ে আছে। সন্তর্পণে উঠে এলাম, আলো নিভিয়ে দিলাম, আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। একটা সিগারেট ধরালাম। নিচের রাস্তার ল্যাম্পোস্টের আলোয় দেখলাম একটা বেড়াল পার্কের রেলিঙের উপর বসে আছে, চারদিক জনহীন, ধু-ধু করছে রাস্তা। শোনা যায় মৃত্যুর নির্দেশ এলে নিভন্ত মাথা ভুলে যেতে অস্বীকার করে। আজ এই মুহূর্তে সামনের জনহীন ও পরিত্যক্ত রাস্তা দেখে আমার পেছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করল।

তেতলার এই ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। বাড়ির সকলে থাকে ধানবাদে, কোনও যোগাযোগ নেই। মানুষের জীবনে প্রেম ছাড়া অন্য সমস্যা আছে, তা আমি জানি। পৃথিবীতে নদী আছে, এ-ও নতুন খবর নয়, তবু নদী-তীরেই জনপদ গড়ে ওঠে। এই শহরে, এই ধূসর শহরে নদী, নারীর অন্তঃশীলা বীজ-নিঃসরণের মত অবিরল বয়ে চলেছে। তার উপর

কোথাও উপনিবেশের পরিত্যক্ত সমাধিফলক তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড ইস্পাতের ব্রিজ, কোথাও বা নবীন স্থানীয় পুঁজির অসমাপ্ত সেতু। সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে, এখানেই, যে নদী সবচেয়ে গভীর, তা বন্দর তৈরি করার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর ঝানু নৌজীবির চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিল। কিন্তু নদী-বন্দর নয়, কিপলিং-এর মনে হয়েছিল, আকস্মিকতাই, উপনিবেশের ম্যাপে কলকাতার নিমন্ত্রণহীন হাজির হওয়ার কারণ। নাবিক ও সভাকবির তফাৎ এখানে। সাম্রাজ্যবিস্তারের যুক্তি আর তর্কের মতই ছেঁড়াখোঁড়া এ-শহরের রাস্তাঘাট। এরই মধ্যে শৃঙ্খলার জয়ে জাতির অভ্যুদয় ঘটবে কিনা তারও বিতর্ক মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনে পেঁছোয়। দাবার কাঠামোর মধ্যে আছে অনন্ত সম্ভাবনা, গোল ডায়ালের মধ্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে নির্দেশ করে চলেছে অনন্ত সময়, অতএব কেউ কেউ ভাবেন চিড়িয়াখানার মধ্যেই আছে যথার্থ স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষ এমন কোনো বীণা নয় যার উপর প্রকৃতি কিংবা অর্থনীতি তাদের গান বাজিয়ে চলেছে। এমনকি সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থপতি পর্যন্ত মৌমাছির চেয়ে একধাপ এগিয়ে, কেননা সে যা বানায়, তার পরিকল্পনা তার মাথায় আগে থেকেই আছে। এসব কথা আমি কাল রুক্মিণীকে আস্তে আস্তে বললাম, শুনে ও বলল 'তাহলে তোমার নিজের জীবন কেন তোমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রদোষ, ইতিহাসের বাইরে তো তুমি দাঁড়িয়ে নেই।'

আমার গণ্ডগোল এখানেই। আমার কাজ হচ্ছে কম্পিউটার বিক্রি করা। দিল্লীতে আমাদের হেড আপিশ। আমাদের কোম্পানীর তৈরি করা কম্পিউটারের বাজারে নাম আছে। আজকাল বহু আপিশ ও কারখানায় কম্পিউটার বসছে। আমি কেবল তাদের গুণাবলী সুযোগ সুবিধে বর্ণনা করি। খদ্দের রাজি হলে কোম্পানীর এঞ্জিনিয়াররা এসে মেশিন বসিয়ে দেয়। বাস আমার কাজ শেষ। বেশ্যা আর খরিদ্দারের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় দালাল, দরকার আর দরকারী জিনিসের মধ্যে যোগাযোগ ঘটায় টাকা। কম্পিউটার আর জাতির অগ্রগতির মধ্যে প্রতিদিন যোগাযোগ ঘটায় আমার মত দেড়হাজার সেল্সম্যান, যাদের সারা ভারতবর্ষে ছত্রীসেনার মত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব সব জায়গাতেই ফেরিওয়ালার মত অনর্গল বাক্য-স্রোতের ঠেলায় যে-কোনো সমস্যাকে আমি নস্যাৎ করে দিতে পারি। 'ভবিষ্যতের বিজ্ঞান হচ্ছে সাইবারনেটিক্স, আর সাইবারনেটিক্সের ভবিষ্যৎ

হচ্ছে যাদুকর টগরকুমারের কথা বলা পুতুল' এরকম একটা ঠাট্টা অবশ্য আমার বন্ধু সত্যসাধন মাঝে মাঝে করে থাকে। বেচারা সত্যসাধন, সে জীবনবীমার দালাল।

ওদের কোম্পানীর ট্রেডমার্কের কথাই একবার ভাবুন। দুটি কাঁকন-পরা হাত, একটা ভীরু প্রদীপকে দু-দিক থেকে আগলে রেখেছে, পাছে নিভে যায়। ও-দুটি সুডৌল কাঁকন-পরা হাত যে জীবনবীমার, আর ঐ ভীরু দীপশিখাটি যে 'জীবন' তা আশাকরি বলে দেয়ার দরকার নেই। জীবনে অনিশ্চয়তাকেও যদি বাজারে বিক্রি করার দরকার হয়, তাহলে এর চেয়ে আরও আকর্ষণীয় কোনো চিত্রকল্প পাওয়া যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে।

'যেমন ধরুন পদ্মপাতায় জল', সেদিন তারাপদবাবু মদের টেবিলে প্রস্তাব দিলেন, শুধু দুটো হাতে কী হবে মশাই, একটা গোটা মেয়েছেলে থাকলে তবু হ'ত, বেশ দু-হাত দিয়ে—' 'আপনার মত একজন গোঁফ-ওয়ালা স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরেছে এই তো?' যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বলল সত্যসাধন। 'তাতে ক্ষতি কী?' বললেন তারাপদবাবু, 'বার্ধক্যের সান্ত্বনাই তো জীবনবীমা।' বলে বেশ গর্বিতভাবেই তাকালেন আমার দিকে। আমি হেসে ওঠার সময় মনে মনে তারিফ না-করে পারলাম না। এমন কি সত্যসাধনও হেসে ফেলল। 'বার্ধক্যের সান্ত্বনা'র ফেরিওয়ালা হিসেবে অবশ্য সত্যসাধন ততো কৃতকার্য নয়। হওয়াও কঠিন। বার্ধক্যের ভাষা যদি বা হয় পাকা চুল, মৃত্যুর তবুও কিন্তু কোনো ভাষা নেই। কম্পিউটারের আছে। অক্ষরকে সংখ্যায় পাল্টে দিলেই তার ভাষা, এমন কি রক্তচাপ হৃৎস্পন্দন সব কিছুকেই গণিতে পরিণত ক'রে মুহূর্তের মধ্যে রোগ নির্ণয় মায় চিকিৎসা পর্যন্ত বাৎলে দিতে পারে ঐ যান্ত্রিক মগজ। ডিজিটাল কম্পিউটারের কথা-ই প্রথমে ধরুন এই দানবটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতে পারে। কিন্তু এ্যানালোগ কম্পিউটার নামক ময়দানবটি তা তো পারেই, এমন কি কোন্ প্রশ্ন করা উচিত তাও বাৎলে দিতে পারে। কাজেই আমলা শাসিত সমাজে, সাহিত্য কিংবা নগর পরিকল্পনায় এর যে কদর হবে তা তো স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কী অক্ষরকে সংখ্যায় পাল্টে দেয়াই হচ্ছে এখনকার আধুনিকতা। রক্ত মাংসের সঙ্গে বহির্জগতের ওতপ্রোত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নয়, চিহ্নকে এখন অর্থ সরবরাহ করছে আমলা কিংবা বাণিজ্য শাসিত খবরের কাগজ আর বিজ্ঞাপন কোম্পানীর কেন্দ্রীয় চিহ্ন পরিকল্পনা। সারা শহর জুড়েই এখন চিহ্ন-শাসন। ট্রাফিক পোস্টের

লাল আলোয় নিষেধের চিহ্ন, হলুদে নিষেধ মুক্তি, সবুজে স্বাগত। আছে মাখনচোর বালগোপাল, যারা দুষ্টু হাসির টানে মা-যশোদা নির্ঘাৎ আমুল মাখনই কিনবেন, আছে সুগৃহিণীর মত নির্ভরযোগ্য অমুক ব্যাটারি, আছে ঈষৎ রহস্যময় স্তনের আভাস ছোঁওয়া এক তরুণীর নগ্নপিঠ যা নাকি দর্পিতা হেলেনের মত সহস্র যুদ্ধ জাহাজ নয়, সহস্র কিংসাইজ ফিল্টার সিগারেটের প্যাকেট ভাসিয়ে দিয়েছে খরিদ্দারের মগজে আর সর্বোপরি রয়েছেন হঠাৎ বেঁটে হয়ে যাওয়া রাজ্যপাটহীন সদাহাস্যময় 'মহারাজা'— যিনি এয়ারইন্ডিয়ার যাদুকার্পেট ভাসিয়ে একদিকে টেনে আনছেন বিদেশী মুদ্রা, অন্যদিকে ভূ-প্রদক্ষিণে পাঠাচ্ছেন সদ্য গোঁফ ওঠা ভারতীয় পুঁজির তরুণ দিবাস্বপ্ন। এই হচ্ছে 'ইউ.বি.আই-এর নিজস্ব শহরে' কলকাতার আকাশবাণী, যার হাত থেকে আমার পক্ষে রেহাই পাওয়া সোজা নয়। অথচ এ-শহরে ট্রামে বাসে উত্তাল রক্ত কণিকার অবিরাম প্রাণস্পন্দন····কালো স্লেট-পাথরের মত কাঁধ, কোমর আর বাহু একসঙ্গে ওঠানামা করে পাতাল রেলের সুরঙ্গ তৈরির কাজে, বাড়ি ঘরদোর রাস্তাঘাট গাড়ি ক্রেন লোকজন ফুটপাথ সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে ঐ কালো ছন্দোবদ্ধ শরীর, যেন ক্যামেরার আতসকাচের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে ঝাপসা কালো সংঘবদ্ধ অক্ষরের মত ফুটে উঠতে থাকে রৌদ্র করোজ্জ্বল দৈনন্দিনের ফাঁকা পৃষ্ঠার উপর। সেদিন সুখরঞ্জন, রুক্মিণীকে দেখিয়ে বলল, '৩৬-২২-৩৬, আহা দর্জিগিরি করলেও তো পারতাম, ওরকম বুক আর কোমর মেপে জীবন ধন্য হত।'

বেচারা সুখরঞ্জন, পৃথিবীর তাবৎ আলসকন্যাদের জন্য ছেনি ও বাটালি নয়, কেবল গজ ফিতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ রুক্মিণী যেদিন প্রথম আমার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়, সেদিন মনে হয়েছিল ওকে বলি, 'যে-পাথর কেটে তোমায় তৈরি করা হয়েছে রুক্মিণী, সাধ্য থাকলে আমি তোমাকে সেখানেই ফিরিয়ে দিতাম।'

কিন্তু মানুষ, নিরবয়বকে ভেঙ্গে মূর্তি তৈরি করে আপন প্রতিচ্ছায়ায়, মৌমাছির শ্রেষ্ঠ চারুকীর্তি মৌচাক-ও সেখানে ম্লান। মৌমাছি বানায় তাৎক্ষণিক জৈব-দরকারে, আর মানুষ যা-বানায়, তার নক্সা তার মাথায় আগে থেকেই আছে। কাজেই নিরবয়বকে সেদিন রুক্মিণীর ছায়ায় হঠাৎ লক্ষ্য করে আমি বিপদগ্রস্ত বোধ করি। পশ্চাৎভূমি হিসেবে নিরবয়বের ধ্যান অনেকেরই আদর্শ তা জানি, কিন্তু নিরবয়ব পেছন থেকে অবয়বকে

ধরে রেখেছে এটা আর বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। নিরবয়বের ধ্যান নয়। ইন্দ্রিয় দিয়েই আমি বুঝি এই সূর্যালোক। এই গাছ, এই নারী, এসব কিছু ভাষায় চিহ্নিত হওয়ার আগে থেকেই আছে।

রুক্মিণী যেদিন আমাকে বলেছিল, 'কী দেখছ প্রদোষ, আমি তো কিছুই লুকিয়ে রাখিনি।'

'তবু তুমি আলাদা রুক্মিণী,' আমি ওর অস্থির স্তন দু-হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিলাম, 'নিজের হাতকে তো আর কেউ নিজের মুঠোর মধ্যে ছোঁয়না ছোঁয় অন্যকে।'

গতবছর এসব কথা হয়েছিল, যখন আমি গেছিলাম রুক্মিণীর কাছে দিল্লীতে। এবার ও এখানে এসেছে এক সপ্তাহের জন্য। দিল্লীর এক ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক হয়ে রুক্মিণী কলকাতার হাল স্বচক্ষে দেখার জন্য একটা কাজ জোগার করে নিয়ে এসেছে। এটা যে নেহাতই অজুহাত তা আমরা দুজনই জানতাম। কলকাতা দর্শন নয়। আমার সঙ্গে সম্পর্ক শেষকরার অজুহাত। কাল রাতে রুক্মিণী আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুমি যখন আমাকে জড়িয়ে ধর প্রদোষ, আমার মনে হয় ঠিক যেন এই শহর আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, আমি ভয় পাই, কিন্তু ছাড়তে পারিনা।'

'কাউকে জানতে গেলে', আমি বলেছিলাম, 'সে যে-শহরে থাকে, তাকেও জানতে হয়।'

'জানার দরকার কী,' রুক্মিণী বলেছিল, 'ইতিহাস হচ্ছে পাথরের দেওয়াল থেকে কাটা মূর্তির মত, কেবলই ভবিষ্যতের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। আমি সহ্য করতে পারি না। তার চেয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে বাঁচা ভালো,' একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে বলেছিল, 'আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা।'

দৈনন্দিনকে যদি চলচ্চিত্রের ফিতের মত একেকটা ফ্রেমে কেটে আলাদা করে দেয়া যায়, তাহলে অবশ্য ইতিহাসের চেহারাটা ওরকমই দাঁড়ায়, কিন্তু চোখের ভুল দেখার ওপর পর্দার ছবির নড়াচড়া যেরকম নির্ভর করে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক তো আর সেরকম নয়। অথচ এটা তো ঠিকই যে আমার নিজের জীবন কখন নিছক চিহ্নের জটলায় পাল্টে গিয়ে দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষার ফলকের মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা লক্ষ্য করিনি, বুঝতে পারিনি। গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপারটা চোখে পড়েছে, আজ রাত্রে ফের লক্ষ্য করলাম, কাল ভোরেও করেছি। গত দু-দিন

রাতে রুক্মিণী আমার ঘরে ছিল। প্রত্যেকদিন সকালে উঠে ও চলে যায়। কাল ও চলে যাওয়ার পর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনো ভালো করে দোকানপাট খোলেনি, মোড়ের মাথায় খবরের কাগজওয়ালাদের জটলা। সাইকেলে করে দুধ নিয়ে যাচ্ছে গোয়ালারা, মিষ্টির দোকানের সামনে দু-একটা ভিকিরি দাঁড়িয়ে, ট্রাম যাচ্ছে মাঝে মাঝে, ডবলডেকার যাচ্ছে, রিকশা-ওয়ালারা চা খাচ্ছে, পেট্রলপাম্পে দাঁড় করানো সারি সারি ট্যাক্সীর গায় ঝাড় পোঁছ করছে একটা বাচ্চা ছেলে, ভোরবেলার শব্দ আর আলোর ভেতর যেন প্রকাণ্ড একটা ফাঁকা পৃষ্ঠার মাঝখানে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট কয়েকটা অক্ষর ভেসে উঠছে, আমি অনেক চেষ্টা করেও চিনতে পারলাম না, পড়তে পারলাম না।

ব্যাপারটা অবশ্য ভেবে দেখলে এমন কিছু অদ্ভুত নয়। সত্যসাধনের মা'র ক্যান্সার হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ত ; ক্যান্সারের যদি কোনো ভাষা থাকে, তাহলে এই রক্ত তার অক্ষর। আবহাওয়াবিদ, রোজ ঝড়ের চিহ্ন খোঁজেন যান্ত্রিক উপগ্রহ থেকে পাঠানো সাংকেতিক বার্তায়, সূত্র সাজিয়ে গোয়েন্দা পড়তে চায় অপরাধের ভাষা। আর নারী যব মাছ জলরেখা বহুদূর অতীতে পাল্টে গেছে প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক চিহ্নে। অথচ এখন আবার চিহ্ন যদি নিরর্থক হয়ে ওঠে তাহলে চিহ্নিতের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে আমি বারবার, এসব কথা ভাবি। 'দেশে তো আরও অনেক শহর আছে প্রদোষ', রুক্মিণী আমার কথা শুনে বলেছিল, 'চলো আমরা চণ্ডীগড়ে যাই।'

'ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে সবচেয়ে আগে কারা পালায় জানো?' আমি বলেছিলাম। 'জানি' রুক্মিণী ঘাড় কাৎ করে বলেছিল 'ইঁদুর। কিন্তু এটা মরা শহর প্রদোষ', বলে এক ঝটকায় আমার মাথা ওর নগ্ন হৃৎপিণ্ডের উপর চেপে ধরল, 'শুনতে পাচ্ছ, বুঝতে পারছ তফাৎটা কোথায়?'

'বুঝতে পারছি', রুক্মিণীকে চুমো খেয়ে বললাম, 'তবু এখানকার যে নদীপথে একসময় সমুদ্রগামী জাহাজ সহজেই চলাচল করত, তুমি তার চেয়ে গভীর নও।

তৎক্ষণাৎ হাসল রুক্মিণী, 'এসো', শুয়ে পড়ে নদী-গহ্বরের মত ডাকল সে।

সকালবেলায় রুক্মিণীর ডাকে ঘুম ভাঙল। এরই মধ্যে ও স্নান সেরে

ফেলেছে। 'ওঠো, চা, নাও', ও আবার ডাকল। 'এখনই যাবে?' আমি ঘুমের মধ্যেই বললাম। 'হ্যাঁ', রুক্মিণী আমার পাশে এসে বসলে, 'আমি কালই চলে যাব প্রদোষ, এরপর কী হবে বুঝতে পারছ?'

'দাঁড়াও', আমি তৎক্ষণাৎ চায়ের কাপে চুমুক দিলাম, ঘুমের জড়তা কেটে গেলে লক্ষ্য করলাম রুক্মিণী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম কাল চলে যাবো, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'কেন?'

'তুমি কিছু করছ না প্রদোষ, করবেও না।' রুক্মিণীকে ঠাণ্ডা আর নিরুত্তাপ দেখাল। ভোরের আলোয় কি রুক্মিণীর আরও ঝলমল করে ওঠা উচিত নয়। আমার মনে হ'ল, যদি এ-শহর ধ্বংসস্তূপ-ও হয়, তাহলেও আমরা দুই গৃহহীন একসঙ্গে খুঁজে দেখতে পারি কোথায় আমাদের বিনষ্ট গৃহের ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু রুক্মিণী বলল, 'এ-শহরে তুমি যতক্ষণ আছ প্রদোষ, ততক্ষণ তোমার স্বারা কিছুই হবে না! কেউ মারা গেলে তার রক্ত কণিকাও মারা যায়; মরা লোকের মুঠো এত শক্ত হয়ে যায় যে তখন আঙুল কেটে না-ফেললে তুমি বেরোতে পারবে না। তোমার সে ক্ষমতা নেই, আমার আছে।'

'কী করব আমি তো তোমার মত নই।'

'কত লোক রোজ এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রদোষ, তারা কেউ আমার মত নয়।'

'ধর বেরিয়ে গেলাম, তারপর?'

'তারপর নিজের মত বাঁচবে, সেটা কি কিছু কম?' আমি হেসে ফেললাম, 'নিজের মত বাঁচা কাকে বলে তুমি জানো রুক্মিণী! এখানে কেউ কেউ বলে দিল্লীর অবহেলার জন্যই আমরা নিজেদের মত বাঁচতে পারছি না, আবার কেউ বলে তার ক্ষমতাই আমাদের নেই। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মত করে বাঁচতে চাই বলে আমাদের প্রত্যেকের বাঁচা শেষ পর্যন্ত এত একইরকম যে কথাটার কোনো মানেই হয় না। তাছাড়া গত কয়েকদিন ধ'রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছি'—আমি থামলাম।

রুক্মিণী তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি আবার বললাম, 'যদি তোমাকে সেটা বলি, তাহলে ভাববে নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ—'

'না, ভাবব না, বলো—'

আমি তখন ওকে বললাম কাল রাতে, কিংবা গত কয়েকদিন ভোরবেলায় কিংবা দুপুরে কিংবা আপিশ ছুটির পর আমি কী দেখেছি। গোটা শহরের যানবাহন, রাস্তাঘাট, বাড়ি, লোকজন এসব কিছু ধীরে ধীরে যেন ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে পেছিয়ে গিয়ে অস্পষ্ট হ'তে হ'তে শুধু ঝাপসা কয়েকটা অচেনা অক্ষরের মত ভাসতে থাকে। যাদের আমি অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারি না। সব শুনে ক্লান্তভাবে রুক্মিণী বলল, 'চারপাশের সঙ্গে তোমার কোনো যোগ নেই প্রদোষ, বুঝতে পারছ। অথচ তুমি বেরিয়ে আসবে না।' 'তোমার মনে হয়না এসব কিছুর মানে আছে।' আমি তবু ভূতগ্রস্তের মত বলে যেতে থাকলাম 'এইসব লক্ষণ এক সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হয়ত কিছুদিন পরে বোঝা যাবে একটা বড় কোনো ঘটনা যেমন ধর ক্যান্সার—' আমি বলে চললাম, 'মাঝে মাঝে রক্ত পড়ছে, কোনো জায়গা ফুলে আছে, অনেকদিন পরে ধরা পড়ল, তখন আগেকার খাপছাড়া ঘটনাগুলো জোড়া দিয়ে—'

'থাক, বুঝতে পারছি।' রুক্মিণী উঠে পড়ল, 'আমি এখন যাই।'

'আর আসবে না?'

'আসব, দুটোর সময়। তুমি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে থেক, আর হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি।' রুক্মিণী হাসল, 'নটার সময় তোমার কাছে একটি মেয়ে আসবে, রজনী প্যাটেল, কলকাতা শহর নিয়ে কাজ করছে, বম্বে থেকে এসেছে.' বলে একবার তাকাল আমার দিকে, 'কাল হঠাৎ আলাপ হ'ল আমার সঙ্গে, আমি ওকে তোমার ঠিকানা দিয়েছি, মনে হ'ল তুমি ওকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে,' এবার আমার মুখের অবস্থা চট করে দেখে নিয়ে বলল, 'রাগ করোনা, প্রদোষ, এতবড় একটা অচেনা শহরে, একা ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে ভীষণ খারাপ লাগল। তাছাড়া, এত সুন্দর কালো মেয়ে তুমি এর আগে কখনো দেখনি।'

রুক্মিণী চলে গেল। রুক্মিণী এরকমই। আমাকে অপ্রস্তুত করে দিয়েই ও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে আমি কী ভাবে অপ্রস্তুত হই।

ঠিক নটার কয়েকমিনিট আগেই ঘণ্টা বেজে উঠল, দরজা খুলে দেয়া মাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভাবনীয়ভাবে কালো আর রূপসী একটি মেয়ে, এই তাহলে রজনী! 'রুক্মিণী মালহোত্রা আছেন?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'আপনি রজনী?'

মেয়েটি সামান্য মাথা হেলিয়ে নীরবে উত্তর দিল। বাইরের ঘরে ওকে বসিয়ে আমি চায়ের জল চাপালাম। ফিরে এসে বললাম, 'একলা মানুষ, আপনার অভ্যর্থনায় কিন্তু ত্রুটি হবে।'

'অভ্যর্থনার জন্য তো আসিনি,' রজনী হাসল, 'রুক্মিণী বলছিল আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে, অনেককেই অবশ্য জিজ্ঞেস করেছি, আপনি যদি কিছু না-মনে করেন, তাহলে আপনাকেও—'

'বাপ্‌রে এ-তো দেখছি রীতিমতো একটা পরীক্ষা।'

'না, না, তা কেন,' রজনী বলল, 'আপনার বন্ধুকেও আপনি এরকম প্রশ্ন করেন।'

রজনী ব্যাগ থেকে নোট বুক আর কলম বের করল। তারপর বলল, 'আপনি এ-শহর ছাড়তে চান না কেন?'

'কে বলল আপনাকে, রুক্মিণী?'

'আরে মহা মুশকিল তো', রজনী বলল, 'এর মধ্যে রুক্মিণী কেন?

'তাহলে জানলেন কী-করে?'

'উফ' রজনী স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে হাসি চেপে বলল, 'আপনার আগে আমি অন্তত আঠারো জনকে এই একই প্রশ্ন করেছি।'

'তাই বলুন,' আমি বললাম, 'তাহলে আর আমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। আমার উত্তর তো আপনি জানেন।'

'জানলে আর জিজ্ঞেস করব কেন?'

'তাহলে শুনুন, আমি যে-ভাষায় কথা বলি সে ভাষা বোঝে ও বলে এরকম বড় শহর আর অন্য কোথাও নেই।'

'কোনো বিদেশী শহরের ভাষা শিখতে আপনার আপত্তি কেন?'

'খুবই কঠিন প্রশ্ন। দাঁড়ান আগে আপনার চা নিয়ে আসি।'

বেরিয়ে এসে রান্নাঘরে চা তৈরি করতে করতে মনে হ'ল, আমাকে বেকায়দায় ফেলে যাওয়ার কোনো অধিকার রুক্মিণীর নেই। চা-নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম, রজনী খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন দেখছে। আমাকে দেখে বলল, 'নীচের রাস্তার লোকজনের সঙ্গে আপনার কিন্তু কোনো যোগ নেই।'

'তা ঠিক, তবু ওদের ভাষা আমি বুঝি,' আমি বললাম, 'এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি।'

‘করুন’, রজনী হাসল।

‘গবেষণা করে একটা শহরকে পুরোপুরি জানা যায় ?’

‘না।’

‘তাহলে করেন কেন ?’

এবার রজনীকে অন্যরকম দেখাল। তার চোখের তারা আরও গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, ‘একেকটা নতুন শহরকে মনে হয় একজন নতুন লোক যার সঙ্গে এইমাত্র আলাপ হল।’

‘অথচ কারও সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত কোনো আগ্রহ আছে বলে তো মনে হয় না,’ আমি বললাম, ‘আমাকে নিয়ে উনিশ জনকে আপনি একই প্রশ্ন করেছেন। হয়ত আরও আটত্রিশ জনকেও তা-ই করবেন।’

আমার প্রশ্ন শুনে রজনী হাসল, ‘হয়ত তাই ! কিন্তু আমার আপনার মত লোক যে-কোনো বড় শহরের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের কাজ দূরে থেকে অন্যদের লক্ষ্য করা। এখানে এসে সবকিছু থেকে একটা দূরত্ব বজায় না-রাখলে আমি কোনোকিছুই ঠিক মতো জানতে পারব না।’

এরপর আমরা পরস্পরকে প্রশ্ন করা থামালাম, মোটামুটি আমাদের যা জানার তা পরিষ্কার হয়ে গেছিল।

দুটোর কয়েকমিনিট আগে আমি মিউজিয়মে পেঁছিলাম। টিকিট কেটে ঢুকতেই সামনে কুষাণ যুগের বিশাল যক্ষিণীমূর্তি। একটু দূরে মুণ্ডহীন কণিষ্ক, যার ছবি ছোটবেলায় ইতিহাসের বই-এ আমরা সকলেই দেখেছি। আরেকটু তাকিয়ে ডানদিকের বারান্দায় সারিসারি পাথরের ফলক। তাদের সামনে ছাঁটা ঘাসজমি, টবে ফুল। এর আগেও এখানে মাঝে মাঝে এসেছি, রুক্মিণীর সঙ্গেও, তবে অধিকাংশ দিনই একা।

‘প্রদোষ’ শুনেই আমি চমকে তাকালাম, আবার রজনী ! আমার মুখ দেখে বোধহয় ও কিছু বুঝতে পারল, খুব নম্রভাবে হেসে বলল, ‘একটা খবর দিতে এসেছি, রুক্মিণী আসবে না।’

‘কেন ?’

‘ও আজই হঠাৎ একটা কাজে দিল্লী চলে গেছে, গাড়িতে। আপনাকে বলে যেতে পারেনি—’

‘ধন্যবাদ’। মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেলাম। অপমানে আর রাগে কাঁপছিলাম আমি।

'চলি, তাহলে ?'

'এখনই যাবেন ?' হঠাৎ অসহায়ের মত আমি বলি, 'এখানে এত সব দেখার, আপনার কাজেও তো লাগতে পারে।'

'আমার কাজ এখন রাস্তাঘাটেই বেশি।'

'বাঙলা ভাষা সম্পর্কে আপনার কোন আগ্রহ নেই ?'

'আছে।'

'কী করে বাঙলা অক্ষর তৈরী হল তার কিছুটা ঐ পাশের কতকগুলো পাথরের ফলক থেকে জানতে পারবেন।'

'আমি তো কথা-ই ভালো করে বুঝিনা,' এবারে হেসে ফেলল রজনী। 'অক্ষর নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কী। আচ্ছা চলি—' হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ও বলল, 'আপনার টেলিফোন নম্বর আমার কাছে আছে। দরকার হলে যোগাযোগ করব।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল রজনী, ফুটপাথে নেমে চলে গেল, আমি তখনই বুঝতে পারলাম সবকিছুর এখানেই শেষ। রুক্মিণী যে এরকম কিছু একটা ঘটাতে পারে তা আমি আন্দাজ করেছিলাম, রজনীরও এইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া অসম্ভব অপমানজনক। অথচ এসবই স্বাভাবিক। রজনীর আমার সম্পর্কে কোনো কৌতূহল থাকার কথা নয়। আমি এমন লোক নই, যাকে জানলে এ শহরের কিছুটা জানা যায়। আস্তে আস্তে ডানদিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মূর্তি আর পাথরের ফলকের ভীড়। ব্রাহ্মী-লিপিতে খোদাই করা শিলালিপি। এর আগেও মাঝে মাঝে একা এসে লক্ষ্য করেছি কীভাবে অচেনা চিহ্ন পাল্টে যায় চেনা অক্ষরে।

আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ-ই মনে হ'ল একের পর এক পাথরের উপর খোদাই-করা সারি সারি চিহ্নের হাজারবছর ব্যাপী ক্রমপরিবর্তনের নিচেই হয়ত ডুবে আছে চিহ্নিত গ্রাম ও নগরের বিপুল হৃৎস্পন্দন। কখনো এই ব্যস্ত শহরের ভীড়। ট্রাফিক আর নদীর অন্তহীন কলরোলে অবিরাম ব্রিজের উপর দিয়ে পদধ্বনির মত ঐ হৃৎস্পন্দন বেজে চলে। আবার কখনো জটপাকানো ভীড় আর যানবাহনের ভিতর থেকে উঠে এসে ধীরে ধীরে ঝাপশা কোনো অচেনা অক্ষরের মত ফুটে উঠতে থাকে রাস্তায়।

হয়ত তাদের চিনতে পারলে বুঝতে পারব আমার সমস্ত কাজ আর ইচ্ছা কোন্ পশ্চাৎভূমির সঙ্গে বাঁধা হয়ে চিহ্নে পাল্টে যাচ্ছে।

কমল চক্রবর্তী

জয়হিন্দ চিড়িয়াখানা

এই নাম দিয়েই শুরু। দুটো খেঁকি বেড়াল, একটু পার্টিকলে প্রায় বুনো মনে হতে পারে। খেঁচাকলে ধরা ছিটে শেয়াল একটি। দুটো ঝড়তি পড়তি বক। বাইরে চোঙ্গাওয়ালার পাশে নিভুচোখ ধনেশ। ময়ূর, কুমীর, গোসাপ, কাঁকড়াবিছে। একখানা হ্যাংলা গুলবাঘ, সবই সুন্দরী ছায়া থেকে ধরা। এ ছাড়া জয়হিন্দে অতিথি হোত ফেউ, তক্ষক, উলফ্‌বয়—রামু। দুটো পুটকে বাঁদর ছিল, না খেয়ে সারাদিন পেঁয়াজি করত। ধূসর।

চিড়িয়াখানার প্রোপাইটার ব্রজেন ডিন্ডা। গ্রাম থেকে গ্রামে। চলত। মেলা থেকে মেলা। সেই ছিল আমাদের শুরুর চিড়িয়াখানা। পরে পরে আরও বড় এলেও ভুলতে পারিনি ঐ ডিন্ডা চিড়িয়া। ঐ চোঙ্গা চিড়িয়া। ঐ আবাল বৃদ্ধ বনিতার তেল চিটচিটে কাতার। পশ্চিমে ওর নাম হয় ডেন্ডা চিড়িয়াওয়ালা।

আরও পরে এক ব্যাটা হিং-ওয়ালা 'রাংতা' না রুংতা তার জয়হিন্দ-এ ভরতে শুরু করে সাতফুট দুই ঢ্যাংগা। আট এক, সিড়িঙ্গে। দুই তিন, বোড়ে। কিংবা পাঁচমণি পেটু। চিড়িয়াওয়ালার রঙীন খানা ক্রমে হয়ে উঠল দর্শক লাঞ্ছিত।

রুংতার ছিল নানা ধরনের মানুষ জমানোর নেশা। একটা ঢ্যাংগা, একটা ছিটিয়াল, একটা সাঁতারু। দাবারু, দৌড়বাজ, খেলোয়াড়. কালো, হলুদ, সাদা, ফ্যাকাসে, হ্যাংলা, রগুড়ে, লম্পট, উনপাঁজুরে, হাবা, নষ্ট, পণ্ডিত, জোতদার, সমকামী, সন্ন্যাসী নানা প্রডাক্ট। সে হয়ে উঠেছিল। লোকমান্য চিড়িয়াওয়ালা।

রুংতার জয়হিন্দ কিছু কম নয়। চিড়িয়া ধরার আগাপাস্তালাই সরেস। কথা হোত। জীবন যাপনের পাশাপাশি চোঙ্গা, হলদে ঠোঁট ধনেশ, ডোরাকাটা ট্র্যাক স্যুট, রোয়া ওঠা দস্তানা। ভোজবাজীর শ্বেত সরষে হড়

হড় সড় সড় সারা দিনমান।

এত কথা আজ যে মনে পড়েছে, কারণ সুদেষ্ণা। মুখে রুমাল, চুলে গামছা, বুকে তোয়ালে, ম্যাক্সির এক প্রান্ত গোছ অবধি, হাওয়াই পায়ে, বাঁশের ডগায় ঝাঁটা। দেয়ালে মাকড়সা লক্ষ্য। ঐ অবস্থায় অস্পষ্ট, 'একটু টুলটা ধর, নড়ছে'। এই বলে আমার দিকে তাকাল। আমি বাজার দালানে নামিয়ে।

ঘরে উড়ন্ত আরশোলা, মাকড়সা, দেয়ালে সাঁটা কুমোড় পোকার ভাঙা ঘর, অচল পাখার বড় ঢাকনা উল্টানো গেলাস থেকে ঝরেপড়া চড়াইএর খড়কুটো। পাখি দুটো খোঁচা খেয়ে ঘুলঘুলিতে বসে অসহায় চিঁ-চিঁ। এসবের মধ্যে এক যুবতী, হাঁটু অবধি ম্যাক্সি। বাঁশ হাতে। ফের, গোঁ-গোঁ। হেমেন্দ্রকুমারের ডিটেকটিভ পরিবেশ থেকে, 'ধর, ধর না পড়ে যাব'। গুহামানবীর আহ্বান।

এবং সত্যিই, অন্যমনস্ক না হলে পড়ত না। সুদেষ্ণা টুলে থাকতে পারল না। নড়ে পড়ে যেতই। পায়া, অন্যমনস্কতার সুযোগে অস্থির হয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটি ঝাঁটা ফেলে দিয়ে পাখার ব্লেড, দুহাতে দুটি।

সুখী স্থবির অসহায় মেদমজ্জা তামাশা নিয়ে দুখানা আস্ত ব্লেড দুমড়ে নুয়ে পড়ল। সুদেষ্ণা ঘুরছে। এই না পড়ার চেষ্টাই, দৃশ্য। ভ্রমণ। টুলটা ততক্ষণে মেঝেয় কাৎ। সুদেষ্ণার পা দুটো যদি শুধু লক্ষ্য করা যেত, ফাঁসি ভাবাপন্ন হতে বাধ্য। ঐ রকম মাটি ছুঁতে চাওয়া দীঘল, যন্ত্রণাদায়ক, ব্যথাতুর। যেমন ওপরটা, ব্লেডদুটো ক্রমে বেঁকে এক বিন্দুতে মিশে যাচ্ছে। হাত দুটো 'ওগো স্বামী' মুদ্রায় ডাকছে, শরীরের ভার নিথর। কোণঠাসা, অসহায়। খুব আস্তে বিয়ারিং এর ছোট ছোট ধাক্কায় শরীর উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরে যাচ্ছে। ওগো, ঘুরে যাচ্ছে প্রিয়।

এই অবস্থায় ওর মুখোশ মানে ঐ রুমাল, গামছা, বিছে, মপচেন, তোয়ালে, পায়েল, ম্যাক্সি একে একে সব খুলে নিতে! যাঃ! নিচে প্যানটি ব্রা থাকবেই।

তখন সবে বিয়ে হয়েছে। একদিন বলল, একা সময় কাটেনা, একটা

চৌবাচ্ছা করে দাওনা।

—কেন সাঁতার কাটবে? আমি গাল ওর টিপে।

—না। হাঁস পুষব।

দেখ দেখ করে ইঁট, সিমেণ্ট জোড়াই। খান তিনেক হাঁস এলেও হাঁসা এসেছিল তারও একমাস পরে। কারণ পাখির স্ত্রীং পুং চিনতুম না।

একদিন বলল, মাছের পোনা এনে দেবে।

যাচ্ছিলুম নৈহাটী কি বাগনান, মনে নেই। লোকালে। হাঁড়ির জল থাবড়াচ্ছিল মেছো। দু টাকায় দু ছিপি ডিম নিলুম।

ততদিনে সিনেমা, অডিটোরিয়াম, লোকাল ট্রেনে ছোটকাকীর বাড়ি থেকে ছারপোকা এসে পড়েছে। ছারপোকা মনে পড়তেই ভাবছি, আগে দারোয়ানদের দেখতুম ফি রোববার কেৎলীতে গরম জল, খাটিয়ায়। রোদে কাপড় চোপড। মাসকাবারী টিকটুয়েণ্টি। এখন টিকটুয়েণ্টির বিজ্ঞাপন দেখতেই পাইনা। সেই সব অভিমানী প্রেমিক, দুর্বল পরীক্ষার্থীরাও সব চলে গেলেন যারা সময়ে অসময়ে টিকের সাহায্য নিতেন, হায়। এ জীবনে নাই নাই করে কম হারালুম না। ছারপোকা।

হ্যাঁ, হারানোর কথা উঠল বলেই বলি।

আরশোলা যদি ঈষপের জানোয়ারদের মত কথা বলতে পারতো তো বলত, ওহে গাড়ল তুমি ভাগ্যবান। আরশোলা দেখে আতস রঞ্জিত হয়ে ওঠা যুবতীর দল এখন প্রায় এক্সটিংক্ট হতে চলেছে। তোমার সুদেষ্ণা বিরল সেই প্রাণীদের একটা, ওকে চুম্বন দাও, আদর দাও।

তাই তো কোথায় চলে গেল আরশোলা ভীত সুন্দরী রমণীকুল! কেন ওরা সাহসী হয়ে উঠল!

কেবল কি ছারপোকা!

১৯৬১তে নববর্ষ গিফট্ 'বিচিত্রা'র সারা গায়ে নলি করে দিয়েছে সিলভারফিস। অপূর্ব নির্মাণ। ছোট ছোট টিকটিকির কুঁচো, সেলফের গা ঘেঁসে একদিন অবাক চোখে। অসময়ে গড়িয়ে পড়া ডিম থেকে সম্পূর্ণ না হওয়া টিকটিকি।

উঃ পিঁপড়ের জ্বালায় বাঁচবো না মনে হচ্ছে। চিনিটা একটু আলগা

ছিল সব শেষ করে দিয়েছে।

দুধে চিনি। কেবল পিঁপড়ে ভাসছে, ছিঃ ছিঃ। কুজো থেকে জল গড়াল, পিঁপড়ে। বিছানায় শুয়েছি বালিশের তলা থেকে একেকটা করে লাল বেরুচ্ছে, উঃ কি কামড় !

—চুলে একটু কম তেল দেবে।

—পারবো না। তেল ছাড়া তোমার বোনেদের মত উড়ুক্কু টঁ্যাস। ও পারবো না।

রাতের বিছানায় পিঁপড়ের সঙ্গে যুদ্ধ ! ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে আর কখনও ঘাড়ে কখনও কানে কখনও সুদেষ্ণা শিথিল কাপড়ে।

অন্যমনস্ক পাঁউরুটির ঝাঁঝরা, বাতাসার তাঁবুর ভেতরে বাসা। মিছরির খাঁজে খাঁজে ছোট নিরলস টানেল। পিঁপড়ে।

—সংসার বাড়ছে, হেসে ফেললুম, ওদের সঙ্গে পারবো না।

—কেয়াকে জিজ্ঞাসা কোর না, ওতো সায়েন্স কলেজে পড়ায়, হয়তো পিঁপড়ে নিধনের একটা না একটা কিছু বলতে পারবে।

রাতের খোলা জানালা দিয়ে অপূর্ব রঙীন একটা মথ ঢোকে। ডুমের কাছে যায়। মান্নাদের বাগান থেকে মাঝে মধ্যে আমরা পেয়ে যাই। গোলা পায়রা কি যে ঘু-ঘু গু-গু-র। হঠাৎ নির্জন গুহা করে দেয়। যেন ডুবন্ত গুহার চারপাশ। দেয়ালের বুনো লতাপাতা, আকড়ি-মাকড়ি। কালো লাল চোখ পায়রা ডাকে গু-রু-র-গু-রু-র। গুহামানবী ঠিক তখনই হাসবে। হিঃ হিঃ হিঃ।—বল, কারটা সুন্দর ! বল !

টং টং টং টং চিঁড়িয়াওয়ালার ডমরু বাজতো।

ছোটন পরীক্ষার পর এদিকে বেড়াতে এল। একদিন ঘুলঘুলি হাতড়ে দুটো পায়রা। নিজেই কাটলো। নিজেই আদা নুনে জারাল। নিজেই তেলে আগুনে, চমৎকার।

আমি ঘরে আসতে সুদেষ্ণা অসম্ভব গম্ভীর থাকল। কথা বলল চাপা-স্বরে। রাগ মেশালো ভাতে। দুঃখ কথায়। আমি ছোটনের অন্য ব্যবহার আশা করি। আমিও। সে পায়রা চুরি করে। করে ! সে পায়রা কাটে। কাটে ! সে আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লঙ্কায় পাখি ভাজে। ছিঃ ছিঃ। ভাজেই তো !

ছোটন পরদিন চলে গেলো। ঘুলঘুলি থেকে দুখানা অসমাপ্ত পাখি গড়িয়ে পড়ল। ডিমে তা দেবার নেই। স্নান করে, রান্না সেরে, ঘর গুছিয়ে, শুতে এসে সুদেষ্ণা,—ওহ্! মেঝেয় এ্যাবরসন ডিমের প্রায়-হয়ে-ওঠা পাখির আকার ঘিরে লাল ডেঁয়ো।—ওহ্ মাগো!

তখন সবে বিয়ে হয়েছে। আমরা ভাইজাগ বেড়াতে গেলে নাইডু আমাদের জন্যে পলিথিনে এনে দেয় জ্যান্ত শঙ্খ। জেলিফিস, তারামাছ এবং চলমান ঝিনুকও। সে বলে, নিয়ে যান! এ্যাকুরিয়াম হবে। সঙ্গে সীউইড। ঐ জল-লতাপাতা।

ও মাগো, কি মজা কি মজা! ও নাইডু তুমি কি ভালো। একটা ডালডার টিন ঠাসা সামুদ্রিক বালি। এক তেলটিন নীল নোনা জল সঙ্গে আসে। গোটা ট্রেন আমাদের পক্ষে শঙ্খ ঝিনুকের ভবিষ্যত আলোচনা। ওদের খাদ্য খাবার, ছানা পোনা, বাঁচা মরা। ওদের ঘাসবনে নীল জলে ঘুরে বেড়ান।

হোত কি ততদিনে সুদেষ্ণা ছিপ হাতে চৌবাচ্চায়।

নানা ধরনের কুঁচো, যেমন ল্যাটা, গড়ুই, বাচা, ইচা, সোল, ট্যাংরা, কই, মাগুর। এই ধরনের জলাদের থৈ থৈ। হাঁস চড়ত। সাদা দুধেল। চারটির লাল পায়ে পেতলের ঝুমঝুমি।

বাথটবে উলঙ্গিনী দেখেছি, ফেনায় সাঁতারু দেখেছি। দুপুরে মাথায় সোলার মেক্সিকান হ্যাট, লাল গেঞ্জি, হলুদ সর্টস, ডান হাতে ছিপ, বাঁ হাতে 'তাতল সৈকত' এ দৃশ্য এই একবার। তাছাড়া ছিপ হাতে কখনও কোন যুবতী ইহজন্মে দেখিনি। আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে, দেখেছি।

আত্মমগ্ন সে একবার গ্রন্থে, চকিতে কখনও ফাৎনায়। সারা ঘর, দালান, বাগান ভরে যেত চারের মিষ্টি প্রথায়। হাওয়া টানতো দুপুরের রোদে সে একা, হাঁসের চই-চই-চই। দু-একটা করে শালিখ পাশে পড়ে থাকা আপেল বীচি, কমলা বীচি, কখনও ঠুকরে যেত সিগারেটের তামাক। দালানের কাকাতুয়া—'মেয়ে ও মেয়ে, মেয়ে মাছ পেলে'—'ওঁ মাঁগি", মাঁগি" মাঁছ" দেঁনাঁ', নাগাড়ে। চুমকি বেড়াল ভারি পেট রোদে সেঁকা মেঝেয়। চোখ খোলে, বন্ধ করে।

এরও কিছু পরে এসেছে শঙ্খ। ঝিনুক, রামবহাল, বাঘা। রামবহাল বাড়ি ঘর দোর গাছপালার। বাঘা চৌকি। বাঘা করত কি মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে আসতো। উঃ এক একদিন নাকের দুপাশে, মুখের দুপাশে ঝুলে থাকতো রক্ত টুসটুসে ছোট, কালো ছিনে জোঁক।

সুদেষ্ণা আতঙ্কে, অত্যাচারে, যন্ত্রণায়—রামবহাল। ও—রা—ম—।

সরু-সুতো-রক্ত বাঘার মুখ থেকে লোমে। দাঁড়িয়ে থাকত। রামবহাল ঝটকায় নুনে। মরা জোঁকের দিকে না তাকিয়ে সুদেষ্ণা হঠাৎ কি মনে পড়ায়—পোষাক রোদে দিতে হবে। আলমারী। সারা বছরের ঠাণ্ডা পোকামাকড়, ন্যাপথলিন। একটা হঠাৎ ভ্রমর। মাথার গন্ধ তেল, ফুল নয়তো।

রামবহাল বাগান থেকে কোদালে কাটা মাটির তলার কেঁচো। মাছ ধরা দুপুরে। মাছ পাওয়া যাবে এই তাড়নায় পাখির মধ্যে কখনও চিল ছোঁ মারার মত হয়ে ওঠেনি। কখনও কাক বসেছে। টিয়ার খাঁচা। বদ্রী ছিল বছর খানেক। দুটো খাঁচাই ফাঁকা হয়ে গেলে ঝিরিঝিরি দু' ধরনের ফার্ন। দুটোই আগে টবে জন্মালে শেষে খাঁচায়। টব শুদ্ধু সেই সেই লতাবাহার পাখির মত হাওয়ায় শিস দিত, দোল খেত, উড়াল ডানার ফার্ন।

বিয়ের দুবছরেই উক্ত জলাধারে মাছ মরে গিয়ে মশা এবং কালক্রমে মাছি জন্মায়। এমন কি কোন কোন দিন শেষ বিকেলে বাড়ি ফিরলে নীল ডুমোমাছির গোঙানিতে মাৎ সুদেষ্ণা, দেখতুম। পাকা কাঁঠালের লক্ষ্যে বিবাহের তৃতীয় বছর নীলডুমো উড়ত। ঐ ছিল ডিণ্ডাচিঁড়িয়ার উপস্থিতি। দেখা যেত না। দেখা যেতে পারে ভেবে ভয় পেতুম। ডিণ্ডা তখন কাঁধে চাদরের মত ময়াল ফেলে গ্রামে গঞ্জে।

কে কবে এক হাঁড়ি। রসগোল্লাই হবে। কি কাজে হাঁড়িটা বহুদিন পরে তুললে, ওরে বাবা! লাফ মারি। তলায় অসংখ্য উইচিংড়ে। কি করে হোল!

আরও কথা! সুদেষ্ণা মস্ত হেঁসেলে-বৌ হয়ে স্নোবল ফুল কপি কাটতে বসেছে। সেও উঃমাগো বলে বঁটি হাটকে লাফিয়ে ওঠেনি! যেন কপিতে লাফা-পোকা নয়, তক্ষক। সেন রাজা পরীক্ষিৎ ফুলের গন্ধ শুকছেন। মৃত্যুদূত ফণা তুলছে।

—তুমি কি কখনও বেগুনে পোকা বা চালে ঘুনু পোকা পাওনি।

সুদেষ্ণা খপ্ করে আমার হাত মুঠো করল, সারা গায়ে কেরোসিন, হলুদ, ছাই, নুন, চালসেদ্দ, চা, ঘাম, সরষের তেল একটা মুদিখানা, একটা রবিশস্য।

—তুমি আমার ডিন্ডা চিঁড়িয়াওয়ালা, বলেই হাসতে হাসতে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিল।

একটা ছোট সাইনবোর্ডে লেখা থাকতো, 'প্রাচীনতম, নিবিড়তম প্রাণী' কতদিন শুধু সুদেষ্ণাকে পাব বলে, অন্যরকম পাওয়া। সুদেষ্ণা না হয়ে অন্য সুলেখা, সুমনা, সুচিত্রা হতে পারে! নিয়ে যেতুম, ঐ খানে, ঐ ছোট বোর্ডের প্রাচীন প্রাণীতে।

—ও মাগো! শাড়ি মাথায় যুবতী নৃত্য, কখনও গোলা ফাটার মুহূর্তে, কখনও আগুয়ান বসন্ত, এজন্মের সব থেকে প্রিয়, ভয়ে, আতঙ্কে, লালে, আবীরে, ঈষৎ হলুদ লাগা সে মেয়ে। স্বাস্থ্য উপচে কি নাচ! কি নাচ!

আরশোলা উড়ে বেড়ান সেই যৌব রাজ্যে কখনও প্রবেশ করেছি। উঃ মাগো! রক্ত ছলকে—আমি তোমাকে এত প্রাণবন্ত, এত সসাগরা, এত হিরণ্ময় আর কখনও দেখিনি সুদেষ্ণা। তুমি আরশোলায় সবচেয়ে প্রাচীন সবচেয়ে সুন্দরী লেগেছিলে।

ডিন্ডার চুবড়ি লণ্ডভণ্ড, চিঁড়িয়াখানা মাথায়, সেই প্রবল আরশোলা-নাচ, ভুলবনা। সুদেষ্ণা ঐ স্বাস্থ্যে মানুষ বাঁচে। ঐ 'উঃ মাগোর!' মন্ত্রে। সেখানে তোমার যৌনরস, রৌদ্ররস, হাস্যরস, মৃত্যুরস একাকার।

ব্রজেন ডিন্ডা বেজায় জোগাড়ে। জয়হিন্দ চিঁড়িয়াখানার জন্য সে নিত্যনতুন। ভাবতে ভাবতে পেয়ে যেত ঢ্যামনা সাপ, পিপীলিকা ভোজী লম্বা জিভওয়ালা, হঠাৎ গ্রামের মুরগী হাতাতে খাসা বনবেড়াল কিম্বা মহুয়াচোর ভালুকছানা।

সেই ব্রজ চিঁড়িয়াওয়ালা দিয়েই আমাদের নতুন প্রভাত। পরে রুংতার পছন্দের মধ্যে সিঙ্গে ফুকতো নানা ধরনের জোয়ান। ঘুঁসিওয়ালা, চিমটিওয়ালা, লেঠেল, ঠেঙ্গারে, ঘুমকাতুরে, পিপ্‌ফিসু। আমরা নানারকম ফোঁসফোসানি শুনতে পেতুম। এক একদিন সারা দুপুর, শীতকাল,

সন্ধ্যা আকাশে, ঝরাপাতা নানা জান্তব শ্বাসাঘাতে। ওহ্ ভয়ানক ঠা ঠা ঠা, ঠে ঠে ঠে, হেঃ হেঃ হেঃ।

সুদেষ্ণা একদিন মধ্যরাতে আদুরে শ্বাসাঘাতে—ওগো আমাকে একটা মুলতানী গরু কিনে দেবে।

—কেন? গরু কেন? চিকন গোয়ালিনির নোলকে দুটো টোকা দিই।

—দুধ দুইব, ঘুঁটে দেব, বলে চিকন আমাকে গোয়ালে উল্টে ফেলে।

—গরু কেন, গরু কেন! তুমি ছাগল পোষ। রামছাগল। লম্বা, ঝোলা কান, মুখে লম্বা দাড়ি। পাটনাই। বিশাল ব্রা বাঁধা থন, টনকো বাঁট, দুধে উদগার। ও তুমিই পারবে।

—কেবল ইয়ার্কি। কোন ব্যাপারই তুমি সিরিয়াসলি নিলে না। সবটায় কেবল ইয়ার্কি মেরে চালিয়ে দিলে, সুদেষ্ণার মজাদার ভঙ্গি।

—না না, জানতো ছাগল বলতে মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগের কথা। দিদিমার এক ভাই ছিলেন। খুব পণ্ডিত। টিবি হয়েছিল। ওকে গঙ্গার ধারে আলাদা করে একটা ঘর করে দেওয়া হয়। উনি একাই ওখানে থাকতেন। আর থাকতো একটা রামছাগল। এক ঘরে। ছাগলের দুধ খেতেন। ছাগলের গায়ের গন্ধে নাকি টিবি ভালো হয়। হয়ত ঐ প্রাণীটির জন্যই এক বছর বাড়তি বাঁচেন।

—মিশরের ছাগল-দেবতা মনে নেই। ফারাও বন্দিত মহান ছাগল। কেন গান্ধীজী? ছাগল বলতেও তোমার গান্ধীজী মনে পড়েনি ও-হো-হো-হো-

ওরে বাবাগো ছাগলের দুধ নপুংসক করে দেয়, সুদেষ্ণা আঁৎকে উঠল।

—তুমিতো আর পুরুষ নও ফলে তোমাকে কি করবে নস্ত্রীংস, ওহোঃ-হোঃ-হোঃ—ছাগল পোষ ছাগল তোমাকে খুব মানাবে।

—তোমার চেয়ে বড় ছাগল আর কোথায় পাব, এই বলে সুদেষ্ণা আমার ঝোলা লম্বা কান দুটো দুহাতে মুঠো করে নিজের মুখের দিকে টেনে নিল।

আমি কোন কথা না বলে, অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে শোনা খেয়াল শিল্পীদের মত ক্রমাগত গলা খাঁখারি দিয়ে যেতে লাগলুম। এতদিনে

জানা গেল খেয়ালের গুপ্ত কথা।

কখনও কিছু ভেবেছি। অতি ধীরে দক্ষিণ পবনে নীল মৎস্যকন্যা অথবা দ্রুত কোন অশ্বারোহিণীর মগ্ন দুলকি। কখনও ভাবিনি ডাইনি তন্ত্রে সুদেষ্ণা, মড়া কোলে, অন্ধকার ধুধু নাচছে। ঝাঁটার কাঠি সরু পেলব কোমর থেকে ছিটকে ছিটকে স্তূপাকার। নেভা মোমের গলনাঙ্কে হাওয়া।

স্তুতি থেকে মুখ ফিরিয়ে। এক এক করে দেখব চোখ, নাক, কপাল, স্তন, হৃদয়পদ্ম, আসমানী আঁচড়, দাঁতে মুক্তো, নখে রক্তের দাগ, রোঁয়া কোমল নলী। কি সুন্দর, কি সুন্দর তুমি! বলব, এই ছিল আমাদের প্রত্যেক রাতের অলিখিত চুক্তি। কারণ প্রশংসা থেকে রাত্রি গভীর হয়ে যেত। প্রশংসা থেকে জন্ম নিত বাঘিনী, সিংহিনী, ডাকিনী, রাক্ষসী, দৈত্যী, পাপিষ্ঠা, লোমশী, হৃদয়হীনা, মিথ্যাচারী, উলঙ্গিনী, নাস্তিকা, শোষিতভর্তৃকা, কামুকী, হীনা, নীচা, নিঠুরা।

আমি দেখতে চাইতুম, যে জীবন একে একে এইসব রাত্রিলেহ পেরিয়ে। বর্জিত ঊষায় পড়ে থাকে শরীর।

সে যখন গরু চাইল?

শুধু দুহাতে জড়িয়ে খলখল।

তিনটি চুগলিখোর গভীর রাতে পকেট থেকে অব্যবহৃত ডেঁয়ো, কেন্নো, গুবরে পোকা টেবিলে ঝাড়ল। পোষা বেড়াল তখন একটা ইঁদুর মুখে। ইঁদুরের গলা থেকে দু-এক ফোঁটা রক্ত। নড়তে পারছে। বেড়াল ইঁদুরকে মেরে ফেলতে চাইছে না। কারণ তিনটি সদ্য বাচ্চা খেলবে। ইঁদুরমনস্ক হতে চাওয়ার সেই প্রথম-পাঠ।

ঘা-ইঁদুর পালিয়ে যেতে চাইছে। থাবা বাড়িয়ে মনস্ক। ফের উল্টে পাল্টে ইঁদুর অসহায়। একটু করে আশা, এগোয়। অন্য বাচ্চাটি ঝাঁপিয়ে। লড়াই-এ ব্যস্ত মাত্র দুমাসের শিশু। মাসল-এ দোল বাচ্চা-গুলো আধমরা নিয়ে খেলছে।

সুদেষ্ণা বলল, দেখ, চুমকির বাচ্চাগুলো কি শিকারী।

ইঁদুর দেয়াল ঘেঁসে রক্তের সুতো ধরে ধরে। একটু দূরে, তা দুহাত, তিনটি ছানা থাবা নামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে যেন স্ফিংক্স চোখ বুজছে,

অবহেলা ব্যবহারে, থাবা ক্ষয় ও সরু ধুলোয় ঝাপট। যাবে বলে দিন চলে গেল। গেল নাকি ?

—দেখ কি বিচ্ছু ? যেন জ্যান্ত,' এই বলে সুদেষ্ণার হাসিতে গড়াগড়ি লাগল। মরুপ্রান্তরে সীমমুবাহিত রৌদ্ররস।

বাচ্ছা তিনটে খেলতে অভ্যস্ত হলে, পাঁচ সাতটি ইঁদুর মারা গেল। মরা ইঁদুরের নরম চোখ মুখ কিছুটা ভুঁড়ি, খাদ্য। এদিক সেদিক আলমারী খাটের নিচে মরা পড়ে থাকতো। দুর্গন্ধ।

—এই ঘেসুড়ে দেখ এদিকে দেখ, এই বলে সুদেষ্ণা আমার মুণ্ডুটা নিজের চোখের দিকে,—ভাল করে দেখ, মুখ আমার চোখের কাছে আনলে দেখতে পাই, একটা মাদি পায়রা ফরফর করতে করতে একের পর এক ডিম পেড়ে বুঁদ। চোখ দুটো চকচকে সদ্য ডিমে ভরে যায়। পায়রার ছটফট মাদী কোমলত্বে ভরে যায় অক্ষিবলয়।

সুদেষ্ণা পিশাচিনী যখন হয় তখন, 'ঘেসুড়ে' বলে। ডেকে মাংস লেগে থাকা দাঁতের বড় বড় কোয়া, সোনা বাঁধানো শ্বাদন্ত, লম্বা আঁচড়ে আমার বুকে পিঠে, বাঘ-ডোরা ফেলে দেয়। বড় হাঁ, হাত ঢোকাতে বলে। দেখত ক'খানা দাঁত ; গোন !

একদিন বলল, ঘেসুড়ে আমি একটা চিড়িয়াখানা করব সেখানে রাক্ষস, খোক্কস, দৈত্য, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, পেত্নী, শাকচুন্নি, ডাইনি, যক্ষ, একানোড়া।

ভয়ে সিঁটিয়ে—কি বলছ, পাগলা—

—ভূত আমার খুব ভাল লাগে। তোমাকে যে ভালবাসি সে তো তুমি ভূত বোলেই না।

বাস্তবিক নিজেকে ভূত। নিরাকার ভাবতে পারি। সতত অস্তিত্বহীন এক জীবন। চিড়িয়াখানার আতিশয্যে আমিও।

ছিপ ছিপ, ঝিম ঝিম বৃষ্টি। হঠাৎ জলের মেলোড্রামায় চরাচর। জানলা দিয়ে দুটো একটা, ধীরে। সহস্র বাদলাপোকা। ডুমে ঝাঁপিয়ে, পাখা ছিঁড়ে গড়ায়। ঘি রং টিকটিকি কখনও সাহসে মেঝেয় হামা।

বাদলা পোকা ডিনার। ব্যাঙ ঢুকে পড়েছে। সেও পোকার টানে।

খাটে। পাশে সুদেষ্ণা, আয়ত, অস্থির। বলতে চেষ্টা করে দেখ বাদলা পোকা, দেখ কোলা ব্যাঙ। সে বৃষ্টির রোমে দিক্‌বিদিক সমাহিত কম্বল ফুঁড়ে কখনও বলে, আলো নেভাও, নাইটল্যাম্প জ্বলুক। কখনও বলে, রাত হোল। কখনও বলে, বৃষ্টির কি সুন্দর শব্দ!

দেখতে পায় না, বাদলা পোকা, লোভে ঢুকেছে টিকটিকি, ব্যাঙ। ব্যাঙ টিকটিকি অন্য অন্য পৃথিবীর। একজন দেওয়ালের একজন মাঠের, খাদ্যের জন্য মুখোমুখি। একটু পরে সাপের প্রবেশ। সেইমত আবহে বীণ।···মন দোলে····।

হঠাৎ বলে ফেলি, তুমি রুংতার কাছে যাবে, ওর তোষাখানায়!

বেডল্যাম্প জ্বললে অন্য আলোকিত নিভে যাবে। হঠাৎ বলে ফেলি, তোমার পক্ষে মুলতানী গরুর দুধ দোয়া সম্ভব না! বাঁট অসম্ভব শক্ত। ঠোক্কর খেয়ে বাদলা পোকা ঝরা পাতার মত। হঠাৎ বলে ফেলি, মনে আছে, হনিমুনের দ্বিতীয় দিন তুমি নদীর ঘাসবনে একপাল সাদা ভেড়া নিয়ে চড়াতে চড়াতে সারা সকাল। সকাল পেরিয়ে দুপুর। সন্ধ্যায় আমি ভুট্টা পুড়িয়ে বসে ছিলুম। একটা মশা মশারির শত্রু; উড়ছে। মাঝে মাঝে সুতোর দেয়ালে। দুহাত হত্যা মুদ্রায় অনুসরণ। খুঁজে পাই না। আলো নিভে গেলে, জোনাকী। বৃষ্টির অস্থিরতা ঘুম নাড়ে চাড়ে। সুদেষ্ণা জানলা দিয়ে শব্দে মিশে যায়। জোনাকী কখনও থুতনিতে। কখনও দোহন ভাবনায়।

—ঘেসুড়ে দেখ, দেখ, বোঁটা জ্বলছে নিভছে····

—হ্যাঁ, কি করে হোল? আমি গুঁড়ি মেরে জ্বলা নেভা আলোর কাছাকাছি এলে আলো উড়ে গিয়ে নাভিতে, দপ্‌দপ্ একটা শহীদ স্তম্ভ। মাথা নিচু, পনেরো আগস্ট।

—জানতো ডাইনীরা পেছনে মোম জেলে নাচে, দেখ আমার থাইয়ে মোম জ্বলছে. সুদেষ্ণা থাই তোল্লা দিয়ে দেখায়, দপ্‌দপ্ জ্বলে ঘিএর পিদিম। ওহ্···কি ভয়ানক সে নীলকমল-লালকমল অসি ঝনঝন····

আমি রাক্ষসী হলে কি ভাল হোত, তোমাকে খেতুম। আমার খুব ইচ্ছে করে ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ হয়ে যাই। ভূতেরা অমর। ভূতের মৃত্যু নেই! পেত্নী প্রথমে প্রিয় ভক্ষণ সারে।

জোনাকী উড়ে সুদেষ্ণার চুলে। শহীদের অর্ঘ। সুদেষ্ণা ঘুমিয়ে পড়ার আগের বিবেচ্য হাসি, ধারা স্নান, অম্লান জ্যোৎস্না রায়ট। আমি ন্যাংটো-খোকা মুঠো করার জন্য একবার মশা, একবার জোনাকীর ওড়া লক্ষ্য করে যাই। মশাও নাগালে থাকে না, জোনাকী পিছলে নাভি থেকে বোঁটা, থুতনি থেকে মরজগতে।

তিনজন চুগলিখোর, একজন কানখুসকিওয়ালা, পাঁচজন মশালচি, একজন হিংওয়ালা, দুজন তাম্বাকুওয়ালা, একজন করে কোৎকাবাবু, কুচি-পুরি মেঝেয় গড়াগড়ি আর নাচে কোঁদে। গিড়ে গিড়ে হাসির দমকে চিড়িয়াখানায় দেয়াল ঘেঁসে সব জন্তু জানোয়ার, 'ওরে বাব্বা' রাক্কস, খোক্কস, ভূত, পিশাচ, এনোফেলিস, কিউলেক্স, মাছি, গিনিপিগ, খরগোশ, বুক মাপের ব্রয়লার, স্বপ্ন-প্রতিম ইয়র্কসায়ার বিশাল শুয়োর—ও-ও-ও-ও—

—ডিন্ডা—চি-ড়ি-য়া-ও-য়া-লা—

শ্রীকমল কুমার মজুমদার

খেলার বিচার

মাধবায় নমঃ তারা ব্রহ্মময়ী মাগো, জয় রামকৃষ্ণ! ঠাকুর করুন, যাহাতে আমার অতীব গ্রাম্য—আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি; ইহা ১৯৩০ এর আগেকার সময়ের কথা। ইহার স্থান, কলিকাতার দক্ষিণে ২৪ পরগণা অঞ্চলে, ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের দক্ষিণভাগের যে তিনটি শাখা বিস্তৃত, আহারই একটির, সর্ব্বশেষ ইষ্টিশানের কিছু মাইল দূরে অবস্থিত।

বালকটি অটল রহিয়াছিল ; এই সময়তে সে গাত্রস্থিত সার্টটিকে আপন দেহেতে যথাযথ ভাবে বসাইয়া লইতে বিবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা চেষ্টা করিতে আছিল ; তৎসহ সে দেখিতেছিল, ঐ সুবিশাল ফাঁকা জমি, কোথাও গ্রাম, পথ, বৃক্ষ, উড়ন্ত পাখীসকল, এ সমস্ত কিছু তাহার দেহ মধ্যে ছিল আর সে বিশেষ উত্যক্ত হওয়াতে ঐ সবকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে—কোথাও তাহার ঘাম, কোথাও তাহার গাত্রগন্ধ এখনও লাগিয়া আছে—অধুনা সে এই চরাচরের সহিত কোন সম্পর্ক আর রাখে নাই।

ঐ লোকটি দুই হাতে লম্বাটে দুটি কাপড়ের থলি লইয়া, বেসামাল পদক্ষেপে, কখনও হাঁপাইতে থাকিয়া, থপথপ করিয়া আসিতেছে সঙ্গে ঐ মেয়েটি এখন উহার ডাহিনে পরক্ষণেই বামে ছোটাছুটি করিতেছিল। বালকটির এতটুকু মায়া হয় নাই বরং ঐ দৃশ্যকে মহা তামাসার বলি বোধ হয়! আশ্চর্য্য ইহার কারণ সে নিজেরে ধিক্কার পর্য্যন্ত দেয় নাই। একবারও মনে করে নাই ঐ লোকটি কে ? এরূপ বিজাতীয় ঘৃণায় তদীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।

বরং মা যদি যাহা সে দেখিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষিত তাহা হইলে, কুরুক্ষেত্র বাধাইতো, যদি মা ইহা শোনে, তবে নিশ্চয় বলিত, তুই উহাদের ফেলিয়া চলিয়া আসিলি না কেন ? এখন মা যেটুকু শুনিয়াছে তাহাতে এখনও শেলসম নিষ্ঠুর বচন সকল উচ্চারিতেছিল, তোমাকে কি ঠাকুর গরু ভেড়ার বুদ্ধিও দেন নাই, ফাঁসির আসামীও রয়ে বসে খায়, নোলা তোমার সুক্-

স্ক্ করিতেছিল, হঠাৎ ইহার পরেই তিরিক্ষি কর্কশস্বরে—কেন না বাবা কি যেন বলিল—ঝাঁঝিয়া জবাব দিল, মরে যাই! তিনি তোমায় সাতজন্ম পেটে ধরিয়াছিলেন, ছাড়! উহারা বলিল আর তুমি গিলিতে বসিলে, তোমার লজ্জা করিল না, তুমি না বল, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পরিমিত আহার! তোমার গীতা পড়ার মুখে ঝাড়ু। মনে পড়িল না যে আমার একটা মান মর্য্যাদা আছে! ছাঁদা বহিলে।

বাবা স্নান করিবার পর একটু ভাল, গম্ভীরভাবে তক্তাপোষে বসিয়া আছে; বোন শুইয়া ছিল। বালক মায়ের গঞ্জনা শুনিতেছিল। এই সময়ে বাবা মৃদু স্বরে কহিল, নে শুইয়া পড় তুই! হঠাৎ মেয়েটি কহিল, মা ঢের হইয়াছে এইবার উঠ! উঠ!

ক্রমাগত মায়ের খেদোক্তি ঝিঁঝিঁ রবের সহিত মিলিত হইয়া এক বড় করুণ ধ্বনি সূচিত হইতে আছে। একটি শব্দ বারম্বার শ্রুত হয় যে আমরা গরীব! এবং বালক প্রতিজ্ঞা করিল, বড়লোক হইতেই হইবে, এবং সে অঙ্গুলি মটকাইল প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু সেই সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের কর্ম্মচারী পুত্র বলিয়াছিল, তোমার ব্যারিষ্টার হওয়া ঠিক নয়, আমাদের ডাক্তার হওয়া উচিত, ইহাতে দেশের উপকার! ইহাতে ধন্দ লাগিল! অবশ্য ডাক্তারীতে পয়সা আছে। মাকে টায়রা সে কিনিয়া দিবে তৎসহ বোম্বাই বেঁকি চুড়ী—ইহাই চমৎকার। এবং সে সর্ব্বসময় দিনের আতঙ্কদায়ী ঘটনা ঠেকাইতে বহু কিছু ভাবিতে চাহিল।

লোকটি গায়ে আর কোট পর্য্যন্ত রাখিতে অস্থির হইল; ইতঃপূর্বে সে উড়নী লইয়া ঠিক এমনই আতান্তরে পড়িয়াছিল, উড়নী লইয়া কি যে করিবে তাহা বুঝিতে কুলায় নাই; অবশেষে অল্পবয়সী কন্যা যাহার মুখে শ্রী হাস্যকর কিম্ভুত—চোখের কাজল এখানে সেখানে, পানের দাগ দুই কষময়, পিক্ বেসামাল ফ্রকে, কহিল, আমারে দাও!

লোকটি তৎক্ষণাৎ নালিশের ছাঁদে স্বীয় মনঃক্ষোভ প্রকাশিল, দেখ হতচ্ছাড়া দেখ, ছোট বোনকে দেখিয়া শিক্ষা কর। নির্লজ্জ বেহায়া! ভাবিয়াছে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি ত আর কি, আমার দায় দায়িত্ব আর নাই, সব ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিলাম! এই পর্য্যন্ত বেচারী মহা শ্বাসকষ্টের সহিত ভাঙ্গা শব্দক্রমে উচ্চারিল।

ও বাবা তুমি কেমন করিতেছ···ছাঁদাটা····এই দাদা! মরণ দশা! ধরনা।

না না তোমার দাদা কেন লইবে! তিনি লইলে তাঁহার মান যাইবেক! এই পর্য্যন্ত কোনরকমে অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিয়া লোকটি, বেশ বুঝাইল যে, শ্বাস কষ্টে চলিবার শক্তি হারাইল, ইহারই মধ্যে একবার কাতর দৃষ্টিতে আপন পুত্রকে দেখিতে কালে কন্যাকে বিশেষ আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল, একটু জল আনিতে পারিবি, মুখে চোখে দিব। কিসে করিয়া আনিবি মা!

কেন কচু পাতায়! বাবা তুমি কথা বলিও না, এই দাদা লজ্জা করিতেছে না তোর! ছোট লোক।

বালকটি রাগে অপমানে পুড়িতেছিল, পিতার কষ্টে সে ঈষৎ মাত্র নরম হইল না, বরং ইতরের মতো ভগনীকে উত্তর দিল, দেখ বেশী বাড়াবাড়ি করবি না! এবং ইহার সহিত নিজ ছোট দেহ কম্পিত করত মহাদুঃখের এক শ্বাস ফেলিয়াছে। মনে তাহার 'ইস!' শব্দটি কেবল বারম্বার ধোঁয়াইয়া উঠিতে আছিল; সমস্ত নিমন্ত্রিতরা যদিও দেখিল লোকটিকে মহা আদরে গৃহিণীগণ খাওয়াইআছেন, তবু কত যে বিদ্রূপ করিল তাহা বলা যায় না, কেহ বলিল পোষ্ট বক্স! (যাহাতে কখনো চিঠিতে পূর্ণ হয় না) সকলেই তাহার দিকে তর্জ্জনী সঙ্কেতে ব্যক্ত করিল, এই ছেলেটি নিম্ন প্রাইমারীতে প্রথম হইয়াছে—ঐ ভদ্রলোক ইহারই পিতা! ঐ বুদ্ধিদীপ্ত বালকই উহার পুত্র। কেহ চিন্তার ভানে টিটকার দিল, দেখ এখন তো খাইতেছে পরে কি ঘটে।

নিশ্চয় আমার জামা কাপড়ের কোথাও ছেঁড়া, এবং সে সপ্রতিভ হওয়ত খুঁজিল।

কেহ বিস্ময় প্রকাশিল, মাইরী এত সব কোন গহ্বরে যাইতেছে! লোকটি কি মরিবে?

বালক মাটিতে যেমন মিশিয়া যাইতে চাহিল; কখনও মনে ভাবিল আমার মূর্খ হওয়া লাম্পটবয় হওয়া উচিত!

গৃহিণী কহিলেন, দিদি তখনই বলিয়াছিলাম, পাঁচ চোখের সমক্ষে ইহারে, মহাশয়কে খাইতে বসাইও না। দেখ গোমস্তা মহাশয় আর খায়াইতে নারাজ! পাতা বদলাইতে দিবেন না, ও 'অমুকের' মা, তুমি হাঁ করিয়া বাছা দাঁড়াইয়া রহিলে কেন! দিদিকে ডাক দেখি।'

এখন কেহ এই কথা বলিতেছে, এ সময় ব্রাহ্মণ এত খাইল যে, সে পঙক্তির পাশেই শুইয়া পড়িল; লোকে, ঐ অবস্থা দর্শনে, মহা চিন্তিত হইল; ভাবিল, ব্রাহ্মণ বুঝি মারা যায়! পুণ্যাত্মা গৃহস্থ তখনই—এই

পর্যন্ত বিশদিয়া বক্তা থামিলেন, কেন না পরিবেশনকারী মাছের কালিয়া হাঁকিতে আছে, সে প্রস্থান করিতেই—খেই ধরিলেন, গৃহস্থরা ডাক্তারকে খবর দিল ; ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া দুটি বড়ি খাইতে দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই বড়ি কোন মতে চোখ চাহিয়া দর্শনে কহিল, রে মূঢ় ডাক্তার ঐ দুটি বড়ির মধ্যে একটিও যদি খাইবার জায়গা পেটে থাকিত ত আমি দুইটি লাড্ডু খাইয়া ফেলিতাম !

গৃহিণী চারিদিকে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হওয়ত নেত্রপাতে স্বীয় স্বামীকে খুঁজিলেন, অথচ এক মুহূর্ত্ত আগে তিনি, অবলোকনিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী জোড়হস্তে প্রতি নিমন্ত্রিতকে আদর আপ্যায়ন করিতে কালে নিবেদিতেছিলেন যে, লজ্জা করিয়া খাইও না—, এইসব প্রায়ই পাঁচ বাড়ীর গৃহিণী,—যাঁহারা আমার এ দায় স্বেচ্ছায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন ! তাঁহারা হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়াছেন।

এত আয়োজন ! খাওয়া কি সোজা কথা ! ইহা শুধু আমাদের শাস্তি দিতে ! আমরা ত দ্বারকার দশ সেরি বামুন নহি ! এত রকম মাছ ! কোনটি ফেলিয়া কোনটি খাই !

নিম্ন কণ্ঠে পার্শ্ববর্ত্তীকে একজন কহিল, উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে হইবে ! লোক কি করিতেছে !

মা গো তুমি শোন, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা—উচ্চারিয়া বৃদ্ধ গায়ের উড়ানীতে চোখ মুছিলেন, পুনরায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশিলেন, আমার মা যাইবার আগের দিন, হিক্কা উঠে নাই—ঐ যাহা ভোর রাত্রিতে একবারই উঠে !—যাইবার আগের দিন কি কি রান্না হইবে, কাৎলার মুড়া আর রুই মুড়া মিশ্রিত যেন ডালে দেওয়া না হয় ; মাছ ছয় হইতে বড় জোর সাত সেরই ! এমনই কথা ! কে কহিবে তাঁহার ছিয়ানব্বই বছর বয়স হইয়াছিল, যাইবার সময় হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ রাম নাম,....কি তোমার পাত যে খালি ! পেট ভরিয়া খাও !

এমত ক্ষণে দিদি আসিলেন, গৃহিণীর নালিশ শুনিয়া ধমকিয়া উঠিলেন, দেখ, খেলা করিও না, আমার মা প্রায়ই বলিতেন, তুমি নিজ কানে শুনিয়াছ, যে তুমি পেট ভরিয়া খাইলে তিনি শান্তি পাইবেন ! ধ্যান্‌পানা করিয়া আবার কোটের বোতাম দেওয়া হইয়াছে—খোল বোতাম ! পেটের উপর অমনধারা আঁট রাখিলে মানুষে খাইতে পারে !

দিদি আপনার পা ছুঁইয়া শপথ করি ! আর জায়গা নাই !

অথচ মাছ এখনও স্পর্শ কর নাই, ডাল পর্য্যন্ততেই হাত গুটাইতেছ ?

দিদি বল কি আমি ঐ দিকে ব্যস্ত, সর্ব্বনাশ ! ডাল খাইবে না কেন, যেমন বলিয়াছিলে মা'কে—দালচিনিগুলি না বাটিয়া টুকরা করিয়া দিতে—ঠিক তেমনই হইয়াছে ! তাই তুমি খাইলে ! তুমি মরিতে ঐ দিয়াই অত ভাত খাইলে কেন ! না দাদা ও বলিলে চলিবে না !

বৃদ্ধকর্ত্তা ভোজনের পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়াছিলেন, যে আমরা পোলোয়া (পোলাও) করি নাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে আমাদের বাবুর কন্যার বিবাহতে যে ভিয়ানে বামুন আসিয়াছিল সে বাবুকে বলিতেছে, বলিতেছেই বা বলি কেন, বলা ভাল বুদ্ধি দিতেছে, পোলোয়া করুন উহাতে নিমন্ত্রিতদের মুখ মারিয়া দিবে, আর যাহা সব পদ হইবে তাহা খাইতে রুচি চলিয়া যাইবে—নেবু থাক্ আর যাই থাক্ !

আপনারা জানেন, আমার বাবু যিনি আমার অন্নদাতা, তাঁহারা মুঘোল আমলাবধি জমিদার, দশশালা ব্যবস্থার কোম্পানীর তৈয়ারী উটক্ জমিদার নয় ! ভিয়ানে বামুনের কথা শুনিয়া রাগে অপমানে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, এত বড় আস্পর্দ্ধা আমাকে ঐ উঞ্ছ বুদ্ধি দেওয়া, বেটা ভাবিয়াছে কি !

ভিয়ানের বামুন আপন প্রমাদ বুঝিল, কহিল বাবু মহাশয়, কলিকাতার সবাই জজ ব্যারিষ্টারদের · ।

তৎশ্রবণে বাবু আরও রাগিয়া উত্তর করিলেন, সেই হারামজাদাগণকে চাপকাইয়া সোজা করিতে হয় ! যাহারা জ্ঞাতি আত্মীয়র প্রভেদ কি জানে না—দায় বিদায়ে সাহেব নিমন্ত্রণ করে, যাহারা নিজ সর্ব্বস্ব ভাবে, শালারা স্বার্থপর— ! সেই বেটাদের সঙ্গে আমাকে এক করা—দারওয়ান এই বেটাকে পাঁচ জুতি মারিয়া ফটকের বাহির কর !

পরে একটু ঠাণ্ডা হইতে আমাদের বাবু কহিলেন, ঐ হারামজাদাগণ শুনিয়াছি তোমাকে এক রেকাব খাবার দিল, তুমি কিছু ফেলিয়া রাখিলে ; অমনই সেই রেকাবের খাদ্য অন্য আগতকে দেয় ! ছি ছি ! আর আমাদের ! ···তোমরা দেখিলে, জ্ঞাতি কুটুম্ব খাইবে, তাহাদের মুখ মারিয়া দিতে হইবে । কি কথার ছিরি । কলিকাতা নষ্ট হইয়া গেল । লোকে যদি টের পায় আমার সামনে, ভিয়ানের পাচক বেটা ইহা বলিয়াছে, ছি ছি । অথচ দেখিয়াছে, যেক্ষেত্রে শুনিতেছে যে, লুচি দুধ-জলের বদলে দুধ দিয়া মাখা হইবে—যাহাকে লুচি বলিত তেমনই হইবে । কোথায় পাবনা হইতে গব্য ঘৃত আনাইতেছি—যশোহর খাটাল তেমন নহে । বলিয়া—পুনঃ রাগত

প্রকাশিলেন বেটাকে কয়েদ করা উচিত ছিল! 'মুখ মারিয়া দিব' শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। বাবুর নিকটে আমরা বিভিন্ন মহালের নায়েবরা মনুষ্য চরিত্রের বিকৃতি ঘটিয়াছে জানিয়া স্নান করিলাম।

বৃদ্ধকর্ত্তা, নিজ জমিদারবাবুর মানসিকতা চমৎকারভাবে বিবৃতিয়া যোগ দিলেন, ঠাকুর আমাকে বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া বাঁচাইয়াছেন, ইহা আমার মা'র কাজ, পিতৃদায়ের পর এইটি একটি পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করিবার ক্রিয়াকর্ম্ম—তাহার মধ্যে কপটতা করিব এ যেন আমার অধস্তন কোন পুরুষের কেহ না ভাবে!

পঙক্তির সকলে ধন্য ধন্য করিলেন, বলিলেন, আপনি অতীব সততা ও সাধুতার পরিচয় অদ্যই নহে চিরকাল দিতেছেন, এই পরগণায় আপনার মত সজ্জন নায়েব কেহ কখনও দেখে নাই, অতি বেয়াড়া প্রজাও স্বীকার করে—মানুষ ত ঐ একটি! অতএব আপনার পোলোয়া না করার কৈফিয়ৎ দিবার কোন অপেক্ষা রাখে না!

এখন তাহা হইলে বসিতে আজ্ঞা হউক! বৃদ্ধকর্ত্তা বলিলেন, আমি সর্ব্বোত্তম টেবিল রাইস যাহা বড়লাট ছোটলাট আদি গণ্যমান্য ইংরাজ রাজপুরুষ গণের, শুধু এখানেই নয় ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত, অতীব প্রিয় সেই চাউল আমি সংগ্রহ করিলাম, যাহাতে আমার মায়ের নিয়মভঙ্গের কাজে ব্যবহার করিতে পারি! ইহা, এই চাউল, আরব আগত, যা পেশোয়ারী হইতে যারপরনাই উপাদেয়। তৎসহ লুচিও করা হইয়াছে—তবে ময়দা এতৎদেশীয়,—রুলের (এনড্রুইয়ুল। লোক মুখে, রুল), ইংলণ্ডের ময়দার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন এখন স্বদেশীর হাঙ্গামা! গতকাল ব্রাহ্মণগণ প্রীতি হইয়াছেন অদ্য আপনারা হইলে আমার মা শান্তি লাভ করিবেন।

বালক তেমনই দাঁড়াইয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল, এখন অসম্ভব রোদ, চারিদিক জনমানব শূন্য, সে দেখিল বোন কচু পাতা ছিঁড়িয়া রাস্তার ঢালুর নীচে খাল হইতে, যেখানে কিছু শালুক আছে সন্নিকটে জল আনিতে যাইতেছে, মেয়েটি ভয়ে আড়ষ্ট, হঠাৎ একবার মুখ ফিরাইয়া কহিল, দাঁড়াওনা বাড়ী চল আমি সব মাকে বলিয়া দিব! ছোট লোক!

বেশ দিবি ত দিবি! এবং ইহার সহিত আরও কতকগুলি অভব্য পদ সে উচ্চারণ করে যাহা তাহার নিজের কানে তুলিতে অর্থাৎ শুনিতে লজ্জা হয়! বেচারাতে হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞান, মান্য গুরুজন, শ্রদ্ধেয় আদি উচ্চবর্ণ

উচিত মর্য্যাদা বোধ আর ছিল না—তাহা অপহৃত হইয়াছে, দেহ বিষাইয়া উঠিয়াছে ; লাঞ্ছনাতে তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডলকে লাল করিয়াছে, কেন না খাওয়ার পর পুকুরে মুখ ধুইবার সময়ে, কয়েকটি অসভ্য বালকরা যখন মুখ প্রক্ষালনের জল লইয়া ইতর আমোদের একসা করিতেআছিল, তখন সে বেচারী ঘাটের উপরে বয়সীদের মধ্যে ছিল, এইবার ঐ খেলা শেষ হইলে একজনে কহিল, ঐ লোককে কিছুমিছু খাইতে দিতে হয়, তাহা হইলে টের পাইত। এহেন রসিকতা করিয়া সকলের মুখের প্রতি তাকাইল।

তোর বিবাহতে উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিছুমিছু খাওয়াইবি ত!

কিছুমিছু গল্পটি ভারী মজার, ইহা বহুদিনের, ইহার চরিত্রগুলির মধ্যে বিক্রেতা বাদে কোথাও মা শ্বাশুড়ী, কোথাও দিদি ইত্যাদি এবং কোথাও কহিল, বাছা শ্বশুর বাড়ী যাইতেছ, পথ অনেক, যাইতে কালে যদি ক্ষুধা পায়, এই টাকা দিয়া কিছুমিছু কিনিয়া খাইও। পুত্র অনেক পথ অতিক্রম করিবার পর এক হাটে পৌঁছাইল। প্রায় প্রতি দোকানে খুঁজিল কিছুমিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কোথাও কিছুমিছু পাওয়া গেল না। নূতন পসরা আসিতেছে। সে পুনরায় নূতন পসরাতে খুঁজিল, এক হাটুরে পসারী একটি বুনো ওল দেখাইয়া, কহিল, এই ত কিছুমিছু কতটা চাই! পুত্র, কহিল, এক টাকার! হাটুরে পসারী তাকে বুনো ওলটি দিল। এবং সে ঐ ওল লইয়া এক বৃক্ষের তলে বসিয়া খানিক খাইতে বাপরে মারে করিয়া উঠিল! ওলটিতে গলা বিষাইয়া উঠিল।

বিবাহের ঢের দেরী গোমস্তাবাবু ততদিন থাকে কি না....তাহা হইতে তোর ঠাকুরদাদার অবস্থা ত এখন তখন নাভিশ্বাস!

উহার ঠাকুরদাদার অবস্থা বছরে একবার করিয়া ঐরূপ হয়....মরিলেই হইল? যাহার ঠাকুরদাদা সে সত্বর কহিল, তোমাকে বলিয়াছে, বলিয়া আর তর্কে না গিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিল।

অন্যান্যরা হাসিল একজনে জ্ঞাত করিল, আমি সব জানি, উহার বাবা এক পয়সা খরচ করে না, বলে, বাবার অসুখ সারিবার নয়, টোটকাতে তবু ভাল কাজ করে। ডাক্তারের কর্ম্ম নহে! উহার বাপ ডবল কঞ্জুষ!

অথচ দেখিবি শ্রাদ্ধে খুব ঘটা করিতেছে, 'বাঁচলে দিবে না দানা পানি। মরলে দেবে ছানা ছানি॥' বলে না, 'জীয়লে দেবে না তুণ্ডে। মলে দেবে—বেনা গাছের মুণ্ডে॥'

উহার বাপ সে পুত্র নহে—বরং সকলকেই কিছুমিছু খাওয়াইবে।

যে লোকটি খাইতেছে তাহাকে গিয়া বল না—উঠিবেন না কিছুমিছু আছে ! তাহাও হয়ত হজম করিবে !

বালকের মধ্যে, যে এখনও গাছের নিকটে আছিল, কি ভাবে যে মান চেতনা, সাধারণের তুলনায় একটু বেশী যাহা, গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ঠাকুরই জানেন ! শ্রাদ্ধ বাড়ীর নিয়মভঙ্গের নিমন্ত্রিতদের বাক্যের শ্লেষ তাহারে কণ্টকিত করিয়াছিল ! ইহা সত্য তাহার মায়ের শাসন ও মর্য্যাদা জ্ঞান তাহাকে প্রভাবিয়াছে ; যদি কখনও খাওয়ার দেরীতে সে ক্ষুণ্ণমনা হইল, তখনই তাহার মা বলিয়াছে, সব যেন বালুর ঘাট হইতে এখানে আসিয়াছে, (বালুর ঘাটে ১৯২৫/৩০ র মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়) আবার খাদ্য অপচ্ছন্দ তাহার হইলে মা কখনও কটাক্ষিয়াছে, এখানে সব মরিতে আসিলে কেন ? বড় লোকের ঘরে জন্মাইতে পারিলে না ! গরীবের ঘরে যখন জন্মাইয়াছ, তখন সব সহিতে হইবে, ইহা ভাল লাগিতেছে না উহা মন্দ, ইহা বাসি, এইসব ভিরকুটি করিলে ভগবান রাগ করেন ।

এই নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ে মা পৈ পৈ করিয়া পড়াইয়াছিলেন, দেখ, এমন খাইবেনা যাহাতে লোকে হাঘর হইতে আসিয়াছে বলিতে সাহস করে, যাহা দিবে তাহা খাইবে নষ্ট করিবে না, নষ্ট করিলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন, মা লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যান—কখনও যত ভালই লাগুক্ দ্বিতীয়বার চাহিবে না, পান একটা খাইতে পার তবে দেখিও পিক না জামাতে পড়ে ! ভুলিও না তোমরা গরীব মানুষের ছেলেপিলে, এতটুকুতেই বদনাম হইবে ! প্রথমই হও আর যাহাই হও !

বালকটির মনে এই সব কথা নিশ্চয়ই বেখাপাত করিতেছিল, ইহাও মন্তাবিয়াছিল, কৈ বাবাকে ত একটা কথাও বলিল না ! নিজেই উত্তর করিতে, এইটুকু ভাবিয়া থামিয়া কহিল আমি একবার বাড়ী যাই না, বলিব আমাদের ত সাত সতেরো লেকচার দিলে, বাবাকে ত একটি কথাও বলিলে না, বরং বলিয়াছিলে যে, এটা খাইব না, উহা নহে ; দেখ যেন উঁহারা খুসী হয়েন, দুর্গা দুর্গা ! আর আমার জন্য কিছু দিতে চাহিলে কিছুতেই লইবে না । আমার দিব্যি রহিল, এমন কি সন্দেশ ইত্যাদি পর্য্যন্ত নহে ; উহাদের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটম্ব বাড়ী পূর্ণ, আমি না যাইলে যে খাদ্যদ্রব্য সকল ফেলা যাইবে এমন নহে ! ছাঁদা লইয়া আসিলে মঙ্গল হয় না ! লোকেই বা কি বলিবে, হাভাতের ঘর হইতে আসিয়াছে, না হইলে ছাঁদা বাঁধে !

ঐ ঢালু সবুজ ঘাসের প্রসারে বাবা পা ছড়াইয়া পশ্চাতের দিকে দুই

হাতে ঠেস দিয়াছে এবং ঊর্দ্ধে মুখ তুলিয়া আঃ আঃ শব্দ করিতে আছে। আর ছোট বোন কাতর দৃষ্টিতে ঐ দশা দেখে।

ঐ পর্য্যন্ত মননের শেষে, মর্ম্মে নিপীড়িত বালক সুবিস্তৃত দিক চরাচরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, সর্ব্ব স্থান তাহারই গাত্রদাহের উত্তাপে ঝলসাইয়া গিয়াছে, এমন যে পাখীর ডাকগুলি অবধি নিস্তার পায় নাই, মধুর গান সকল পুড়িয়া ফর্‌ফর করিয়া ফিরিতে আছে ; সে চোয়াল শক্ত করিয়া পুনঃ এইদিকে অর্থে রাস্তার দিকে নজর করিল, দেখিল, কোথা হইতে এক গোবর কুড়নী বুড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে বালকের দেহে অদ্ভুত সিঁিড়া লাগিল, ইহার মধ্যে সে বিশেষভাবে তাহারে নিরখিল !

ঐ বৃদ্ধার চেহারা হাড়সার, পরণে মলিন ছিন্ন অপটু সেলাই করা কাপড়, যাহার আঁচল ভাগ, দাঁড়ির মত ডান কোমরের আঁটন হইতে বাম স্কন্ধ পার হইয়াছে, বাম হস্তের কব্জি একটি বেশ বড় চ্যাঙারী-ঝুড়ী কাঁকে চাপিয়া আছে ; বৃদ্ধা প্রস্তরীভূত ; উহার দৃষ্টি ছিল, ঢালুর উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকা লোকটির দিকে, লোকটি দুই হস্ত পিছনে অনেক খানি প্রসারিত করিয়া জমি ঠেস্ দিয়া, মাথা যতদূর সম্ভব পশ্চাতের দিকে হেলান এবং সমস্ত মুখ উন্মোচিত আছে, যে এবং মহা যন্ত্রণার এক প্রকার শব্দ উহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে !

লোকটির গাত্রস্থিত নকল আলপাকা-র (আলপাকা একরূপ জন্তু—উহার লোমের) কোট—তাহার সমস্ত বোতাম খোলা। একটি কচি মেয়ে কচু পাতা দিয়ে পাগলের ন্যায় হাওয়া করিতে সময় কি যেন বলিতে আছিল এবং কান্দিতেছে। সে বলিতেছিল, বাবা তুমি এইরূপ কেন করিতেছ ?

গোবর কুড়নী বৃদ্ধা নিজের পিঙ্গল বর্ণের জটিল চুল খামচাইল, কত রকমারি ভাবভঙ্গি নিজ দেহে ঘটাইয়া জিজ্ঞাসিল, এই ছেলে, ঐটি তোমার বাবা ! কি হইয়াছে ? বালক অতিমাত্রায় বিদ্বেষ বিরক্তি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। এই ইচ্ছাকৃত অস্বীকারের অভিব্যক্তি তাহার নিজেরই বড়ই চোরা প্রীতির কারণ হয় ; তাহার মতি এইরূপ যে তাহাকে যেন মুখ আর ফিরাইতে না হয় ! অবশ্য তখনই নিজের ঐ মতিচ্ছন্নতা বোধের ব্যাপারে উত্তর দিয়াছিল, আমি মোটেই ইচ্ছা করিয়া মুখ ফিরাই নাই, বা কোন কথাই ভাবি নাই ! এবং এই সময়েতে সে আড় চোখে দেখিল গোবর কুড়নী আপন ঝুড়িটি এখানকার একস্থানে রাখিয়া, কহিল, ও ছেলে ঝুড়িটা দেখিও ত। বলিয়া তখনই ঐ লোকটির নিকট যাইল, এবং সস্নেহে

মেয়েটিকে প্রশ্ন করিল, কি হইয়াছে। এই মানুষটি তোমার কে ? মেয়েটি উত্তরিল, আমার বাবা কি হইয়াছে জানি না ! এই দাদা ছোটলোক !

ঐটি তোমার দাদা ?

হুঁ দাদা

আপন মায়ের পেটের ভাই

হুঁ হুঁ

ইঁহার ছেলে

হ্যাঁগো

তুমি ঐ ছেলেটির বোন

মরণ দশা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

বল কি তুমি, অবাক কাণ্ড আর আমি ছোঁড়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি তোমার বাবা। আমাকে (গোবর কুড়নী) আর কিছু বলিতে হয় নাই যে তুমি (মেয়েটি) উহার দিকে লক্ষ্য করত দাদা বলিয়া সম্বোধনিতে ছিলে। কিন্তু ছোঁড়া ফ্যারাক দিল !

বালক ঐ বৃদ্ধার, গোবর কুড়নীর, বাক্যতে ঝটিতে ছেদ টানিল, নিশ্চয়ই তাহাতে আশঙ্কা উপজয়ে যে যদি ঐ বৃদ্ধা ঐখানে বসিয়াই কহে যে তাহার 'বাবা কি না' জানিতে চাওয়াতে, সে বালক ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, অর্থই অস্বীকার করিয়াছে যে 'তাহা নহে'।

তাহা হইলে ? তবে কি ? কে যেমন ধিক্কার তাহায়ে দিয়া উঠিল। সে আর এক নিমেষও সেখানে থাকে নাই। এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কি করিবে তৎবিষয়ে ইতস্তত আছে !

মেয়েটি ব্যক্ত করিল, এই যে বাবু আসিয়াছে লজ্জা করে না তোর ! তুই নরকে যাইবি তোর গাত্রে কি মানুষের চামড়া ছি ছি ! গ্রাম্য অল্প বয়সী মেয়েরা এইরূপ বয়সীদের ন্যায় কথা বলিতে অতীব পটু ! এখানেই সে থামে নাই, তিক্ত কণ্ঠে টিটি্কারিল, তোকে না মা ঐ শ্লোক পড়িতে রোজ বলে, পিতা স্বর্গ ! ঝাঁটা মারি ! শ্লোকের উদ্দেশ্য মেয়েটির হৃদয়ে গ্রথিত।

ইহাদের মাতা যেহেতু যে কিভাবে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম' শ্লোকটি বালকের মনে যাহাতে বিশেষ সাঁধ করে তাহার জন্য নিশ্চয়ই বহুভাবে ব্যাখ্যা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছিল।

বাবা বলিয়াছে, তোমার যেমন খাইয়া দাইয়া কোন কর্ম্ম নাই ঐ শ্লোক শিখাইতেছ—বরং না শিখান ভাল তাহাতে আপশোষ থাকিবে না, ঐ ত

আর দুই জনকে ত শিখাইয়াছিলে ! কি হইল ! নায়েব মশাইকে ধরিয়া বাবুর বাড়ী একজনকে, বাবুর বন্ধু পুণ্যশ্লোক জমিদার……বাহাদুরের বাড়ী রাখিয়া পড়িতে পাঠাইলাম। দেশমাতৃকা তাহাদের বড় হইল, বেশ হইয়াছে একজন যাবজ্জীবন, অন্যটি কে জানে কতদিন মেয়াদ খাটিবে বৃথা পরিশ্রম ! আমরা দুঃখ পাইব না ত পাইবে কে ! জানকীর ত ছেলে পিলে আমরা—রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হনুমান দুঃখের পর দুঃখ পাইয়া কথং জীবতি জানকী ! আমার জানকী কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন। ঐ ব্যক্তি এমন ভাবে জানকী বলিয়া উঠিত যে সকলের বক্ষঃদেশ নিঙড়াইত।

বৃদ্ধা নিকটে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, জুতো জোড়া খুলিয়া দাও না! এই বৃদ্ধার উপস্থিতি মেয়েটিতে এক অধিক বয়সী, জ্ঞানসম্পন্ন গৃহিণীর ভাব আনিয়াছিল এখন এই কথা নিজে যেন বুঝিয়া বলিল, এই দাদা হা করিয়া দাঁড়াইয়া আছিস, জুতা জোড়া খুলিয়া দে না। নিদ্দর্য় !

এই ধমকানিতে বালক থতমত হইয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা মান্য করত জুতা জোড়া খুলিয়া দিল।

বৃদ্ধা মন্তব্যিল, পা একেবারে লাল, জল ছিটে দাও বেশ করিয়া, দাও।

অল্প বয়সী মেয়েটি বাবার পায়ের দিকে তাকাইয়া পোড় খাওয়া গিন্নী-পনাতে খেদ উক্তি করিল, জানি না কপালে কি আছে, কাহার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিলাম। ওকি অমন হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে, যাও না নিজের কোঁচার খুঁটটা সত্বর জলে ভিজাইয়া আনয়ন কর না কেন হ্যাদা এবং হৃদয় মোচড়াইয়া ডাকিল, বাবা তোমার কি হইতেছে ! এই শেষোক্তটিতে মেয়েটি তদীয় অসহায় বয়সে ফিরিয়াছিল, যে তির্য্যকে বৃদ্ধাকে নিরখিয়া যাহা সে হারাইল না। পুনঃ বুক ছাঁচা দরদে মায়ের মত, শিশু যেমন, পিতাকে ঐতিহাসিক উদ্বিগ্নতাতে জানিতে চাহিল, বাবা তোমার কি কষ্ট হইতেছে ! অমন অত্রাহি করিতেছ কেন, কি হইতে আছে এই ত আমি ! ঐত দাদা জল আনিতেছে, তোমার পায়ে দিবে ! আরাম হইবে !

বালক জলের কাছে আসিয়া কোঁচা খুলিয়া উহার খানিক অংশ জলে ডুবাইতে কালে, ইহা মনন করিল, যে, যদি সত্যিই আমার কোন কিছু দোষ ত্রুটি অপরাধ হইয়া থাকিত ঠাকুর আমাকে বাবার পায়ে সর্ব্ব প্রথম হাত দিতে দিতেন ! এখানে সে থামিল, এ তাবৎ নিজ ব্যবহারকে কোন রকমেই সে বিচার করে না। এই সময় সহসা ঠাণ্ডা জলের স্পর্শতে তাহার ছোট দেহ তাজ্জব হইল, একদিকে শালুক ও পার্শ্বেই কলমীর আঁকাবাঁকা রেখা

তাহাকে আকর্ষিয়াছে—ঐ রেখা সকল কিছু উজিয়া উঠিতে ছিল। আঃ সেই বৌটি যে গরুগাড়ী হইতে নামিল প্রায় সেখানে, ইহা খিড়কীর নিকট, যেখানে পাঁঠা ছাড়ান হইতে আসিল।

আঃ সেইখানেতে ঐ বৌটি আপন কাপড় জামাতে যত্ন দিতে আছিল, কপালে টায়রাতে (অলঙ্কার) গোল মুখখানি ভারী খাসা দেখিতে হইয়াছিল, টায়রাটি কি চমৎকার দুই পাশে দুই পানের মতন টিকলী (চাক্তি) মধ্যে সীঁথির সামনে আর একটি পাথর বসান তারা ; পানের মতন টিকলীর প্রতিটি অক্ষর উৎকীর্ণ ; ও পাথর বসান বালক পড়িল, গোবর্দ্ধন। পাথর বসান অক্ষর ঝলকিত এবং তখনই বধূটির পানে নেহারিল, গোবর্দ্ধন লেখা টায়রা পরা গর্ব্বিত মুখখানি তাহার বড় ভাল লাগিল গোবর্দ্ধন নির্ঘাৎ ঐ মেয়েটির বর। মন্তব্যিল—ঐ টায়রা, টায়রার জন্যেই উহা ঐ বৌটি এত আকর্ষণীয় !

কেন যে লোকে আজকাল টায়রা পছন্দ করে না ! বেশ ত ! আমি মাকে অমন একটা টায়রা গড়াইয়া দিব, যখন বড় হইব ! ঐরূপ টায়রা উহাতে বাবার নাম লেখা থাকিবে ! কত টাকা লাগে ! উচ্চ প্রাইমারীতে আমায় সর্ব্ব উচ্চ স্থান অধিকার করিতেই হইবে ! ছয় টাকা বৃত্তি পাইয়া ! ইস আমরা কি গরীব ! শুধু টায়রা না মাকে আমি চার গাছা করিয়া বোম্বাই বেঁকী প্যাটার্ণের চুড়ীও গড়াইয়া দিব যেমন এ টায়রা পরা বৌটির হাতে আছে। ম্যালেরিয়া মাকে খাইয়াছে, ডি গুপ্ত বেহালার পাচন কিনিতে জেরবার না হইলে কি মা সুন্দর বাবার মত ফর্সা না হইলেও, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের কিন্তু মুখখানি এত ভোগেও কি সুন্দর।

না বোম্বাই বেঁকী নহে, কারণ যে বৌটির ঐ প্যাটার্ণের চুড়ী ছিল সে কি অসভ্য। বাবার অবস্থা (ভদ্র কথায় বালক ভাবিল) দেখিয়া একটি চপল মতি বধূ বছর পাঁচ ছয়ের ছেলেকে শিখাইতে আছিল যা ঐ লোকটা গাণ্ডে পিণ্ডে গিলেছে তাহার সামনে গিয়া ডাক বাতাপি, বাতাপি ! দেখিবি পেট ফাটিয়া যাইবে ! হিহি হাসিল। বালকের সামনে সর্ব্বত্রে ঐ হা ইতর হাস্য খেলিয়া বেড়াইতেছিল। ঐ ঐ ইল্বলের-স্বরে বায়ু ঘূর্ণায়মান হইল, তাহার চোখে জল আসিল ; ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আর একটু বড় হইলে অর্থ, আর একটু অভিজ্ঞতা থাকিলে নিশ্চয়ই সে এমত ক্ষোভ প্রকাশিত যে হায় পৃথিবী কত নিষ্ঠুর !

বৃদ্ধা হাঁটুর উপর দুই কনুই স্থাপিয়া বিস্তীর্ণ হস্ত দ্বয় দ্বারা একটি

ত্রিকোণের দুই দিক যেমন, নিম্মাণ করত করজোড় করি রাখিয়াছে, সে বন্ধুর মতন জিজ্ঞাসিল—মানুষটির কি হইয়াছে গা।

কি করিয়া জানিব বল সুস্থ মানুষটি·····।

তবে হঠাৎ! নিশ্চয়ই বোধহয় হাওয়া লাগিয়াছে।

তোমার মুণ্ডু! যত অলক্ষণে কথা—। তুমি উঠত, গোবর তুলিতেছ তোল গিয়া! যে এবং একই রুক্ষ কণ্ঠে ঝাঁঝিয়া উঠিল, আমার মরণ হয় না! দাদা, বলি মরিয়াছ না কি, তোমার যে দেখি ভাব লাগিয়া গেল!

বৃদ্ধা মেয়েটির তাড়না গায়ে মাখে নাই, বরং মন্তব্যিল, কি যে বল, বাবা বলিয়া কথা তাই আলা ভোলা লাগিয়াছে এবার সস্নেহে, উচ্চারিল, আস্তে আস্তে আইস! এবং বালক আসিতে উপদেশিল, হাঁ দাও গোড়ালি ভিজাইয়া, হাঁ বাপ দাও আঙ্গুলের ফাঁকে, নখে, বাঃ বেশ, বেশ সেবা জানে এইবার গোড়ালি আর গাঁটের পিছনে বাঃ এবং ইহার পরে ছেলে মানুষের মত উপ্তাপনিল, উঃ তখন যে বড় স্বীকার করিলে না তোমার বাবা!

এইরূপ প্রশ্ন নির্ঘাৎ সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর তৈয়ারী সম্ভব হয় নাই, সে প্রথমত মহা আতান্তরে থাকে, কোনক্রমে সে বৃদ্ধার প্রতি নেহারিল, এই সেই বুড়ী যে জলাতে থাকে, এবং রাতে আলেয়া রূপ ধরে নিশ্চয়ই! অবশ্য ইহাতে আতঙ্ক আসে নাই। ইস এতক্ষণ বাদে অর্থাৎ নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে এত খানিক পথ অতিক্রমের পর যখন সে বাবা বোন, অনুপস্থিত মা ঘরের দাওয়ার নিকটের লাউ গাছ, পুকুর ঘাটের খেজুর গাছের গুঁড়ি প্রভৃতির সহিত এক অভিন্ন হইয়াছিল। তথাপি তাহার নিজের মুখখানি নাড়ানোর ভঙ্গিতে ইহা আঁচ পাওয়া যায় যে সে কিছু সত্য লুকাইতে সচেষ্ট আছে। এক নিমিষে বাবার দিকে অসহায় (!) চক্ষে তাকাইল! দেখিল বিরাট একটি হাঁ হইতে ক্রমান্বয় অত্যন্ত যন্ত্রণার আওয়াজ নির্গত হয়, তৎপশ্চাতে নাশাগহ্বর ও দূরে নিমীলিত চক্ষুদ্বয়!

আঃ সোনার টায়রার টিকলিতে, যাহা কপালে ধনুর আকারে সাজান, সেই টিকলির এক একটিতে তাহার বাবার নামের অক্ষর প্রতি অক্ষর মহামূল্যবান পাথর বসান! এরূপ পাথর কেহ দেখে নাই তখন। তখন আলোতে নাগ ঝলমল করিতে আছে!

বৃদ্ধার কথায় অথবা বাবার কষ্টে বালকের মধ্যেও নাকানি চুবানির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, কিন্তু সে বুদ্ধি হারায় নাই, উত্তর করিল, তুমি কি পাগল নাকি! যে এবং সে তির্য্যকে বোনকে দেখিল বটে যে সে

ঈর্ষান্বিত হয় যে বোন বাবার কত কাছে।

বৃদ্ধা ঐরূপ থাকিয়া সমগ্র দেহকে কিছুটা বাঁকাইয়া, পূর্ব্বস্থান নির্দ্দেশে করজোড় দ্বারা ইঙ্গিতে জবাব দিল, উঃ ঐ ত এখানেতে! তোমার বাবা তখন কাতরাইতেছে! হুঁ! স্বীকার করিল না, মুখ ঝটকা দিলে।

হেৎ।

হেৎ! হেৎ! মিথ্যুক।

ইহাতে, ঐরূপ অসহ্য প্রাণান্ত শ্বাস-রোধ কষ্ট হইতে লোকটি বড় মায়াযুক্ত স্বরে, ক্রমে ভাঙ্গিয়া আপত্তি করিল, না না তাহা কখনও হয়, তোমার বুঝিবার ভুল, পাগল!

বাবা তুমি আর কথা বলিও না ত, উঃ কি কষ্ট! দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, চুপ কর!

না, এই বোঝাটা উহারে লইতে দিই নাই তাই রাগ, পারিবে কেন বল!

বৃদ্ধা এবার হাসিয়া কহিল, আমারে বুঝ্ দিতে গিয়া শেষে কি হিত-বিপরীত হইবে! ছাড়! তুমি যাই বল না কেন আমি যা জানি—জানি।

মহা বেআক্কেলে তুমি ত, তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকিয়াছে, উঠ এখান থেকে! মেয়েটি প্রকাশিল।

বাঃ উঠিব কেন, আমার কি জ্ঞানগম্য নাই লোকে শুনিলে কি বলিবে··· হাড়ি-র মা ছি ছি ঐ মানুষটির এমন অবস্থা, দুটি দুধের বাচ্চার উপর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলে বলিহারী যাই, তোমার কি ধর্ম্ম! চেঁচাইয়া লোক জড় করিবার লোকও মানুষের দরকার হয় না কি বল।

বটেই ত অন্যমনস্ক মেয়েটি সায় দিল—ইহা আশ্চর্য্য।

বাবা আমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে আমি উচ্চ জাতির গা ছুঁইব না, ছুঁইয়াছি কি মরিল, ব্রহ্মহত্যা হইল ত! তবে সেই ঠাকুর মাঝে মাঝে আমায় দেখা দিয়া থাকে বলে ওরে হাড়ি-র মা আমায় খুব বাঁচিয়েছিস; গরীব হয়ে বাঁচার মত পাপ আর নাই মহাপাপ! আমি অমুকহাড়ি-র নাতনী, অমুক হাড়ি-র কন্যে, আমি সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না!

মেয়েটি হঠাৎ অন্য কথা পাড়িল, এতক্ষণ কোনকালে আমরা ঘর কে পোঁছাইয়া যাইতাম,

আস্তে হাঁটিলে দেরী হইবে না—তাহার পর নেবুর পাতা পাড়াতেই ঘণ্টা খানেক,

তোর মুণ্ড! ভেড়ির পাশ বরাবর যাইলে—কতক্ষণ পোঁছাইয়া যাই!

বালক পিতার করুণায় অনেক চোখের জল কব্জি দিয়া মুছিয়াছে আপনকার মতিচ্ছন্নতার জন্য সে সত্যিই ডুকরাইয়াছে ; সে এখন অন্য মানুষ, কর্তব্য বোধ তাহারে এতক্ষণ বাদে এখন অন্তাহি করিল, নিশ্চয় গরীব শব্দটি স্বকর্ণ হইতে সরাইতেও বটে, কহিল 'তুমি আমায় রাস্তা চিনাইও না' এই উক্তিতে কর্তব্যের 'ক' ছিল না বরং নিজের দোষকে ঢাকিবার কথা ছিল—যাহা কর্তব্যপরায়ণের বাচনভঙ্গিতে উক্ত হইল। এবম্প্রকার উত্তর মেয়েটির মান মর্য্যাদাতে আঘাতিল, তখনই বলিল, ঐ বুড়ী মানুষটাকে জিজ্ঞাসা কর না ! ঐত খবর দিল !

হ্যাঁ বাপ এই রাস্তা বড় ঘুর, আমি যে এখানে সেখানে হাট কুড়াইতে, গোবর কুড়াইতে যাই !

বালক কহিল, বাবাও ত...

বাবা আবার কি বলিবে, তুই যা ইয়ে করিলি !

বালক ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু নিজ পক্ষ সমর্থনে মনেতে গুমরাইতে আছিল ইহা যে, হ্যাঁ ঐ পথে যাই, আর দুনিয়ার লোক এই ব্যাপার দর্শনে কৌতুক করুক। আমাদের বড় মান তাহাতে বাড়িত ! আর তখন ত বাবার ইত্যাকার শোচনীয় অবস্থা হয় নাই ! কেন যে, ভাবিয়াই থামিল আর কিছু এই অসম্পূর্ণ পদে যোগ দিতে, তাহাতে পীড়া হইল, আপশোষ হৃদয়ে ধোঁয়াইতে থাকিল, এবং খেদ করিল, অথচ মা ! কত কথা আমাদেরই শুধু বলিল !

মা তুমি আবার উঠিয়া আসিলে কেন, কাঁথাটা গায় দাও, ইস এখনও বেশ জ্বর, এই সময় সে মায়ের কপালে হাত দিয়া বলিল, যে জ্বর, না বাবা আর ইয়ে যাক্ আমি যাইব না। তোমার কাছে থাকি !

থাম, যে কথা বলিতে উঠিয়া আসিলাম, হ্যাঁ মন দিয়া শুন, ধীরে সুস্থে খাইবে, হাঁক পাক করত কোন কিছু গোগ্রাসে গিলিবে না, যেন কেহ না ভাবে হাঘর হইতে হাভাতে গরীব কাঙালের ঘর হইতে আসিয়াছে, এমন ভাবে আহার করিবে যেন লোকে নিমেষেই বুঝে মানী লোকের ছেলে পিলে, গরীব হইতে পারে তবে আত্মমর্য্যাদা আছে ; মন দিয়া শুনিতেছ, আর তুমি (বালক কে) আগে আগেই বলিও না, 'আর দিবেন না' বা 'থাক থাক' ; ও ! শুধু আঙুল দিয়ে খাইবে—তিন চার আঙুলের, প্রথম কড় (মানে আঙুলের দাগ) পার যতটা না হয় মানে কড়ের নীচে না যায়— তাহা, দ্বারা খাইবে, কোন ক্রমেই হাতে তালুতে খাদ্যের দাগ না লাগে—

যেন লোকে বুঝে ইহারা উচ্চ বংশের ভদ্র ঘরের, তোমাদের বাবার খাওয়া দেখিয়াছ ত কি পরিষ্কার, তিন আঙুলে কড়া পার হয় না।

বড়লোকদের মতন !

হাঁ মাছের কাঁটা ধীরে বাছিবে, লোভের জ্বালায় কাঁটা না ফুটে—জানিও লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যদি অসাবধানতা বশত একান্তই কাঁটা গলায় ফুটে তবে····

জানি মা ! ভাত দলা পাকাইয়া গিলিব।

লুচি হইলে তেমন দলা পাকাইয়া গিলিবে ; কাঁটা ফুটিতেই অসহিষ্ণু হইয়া 'ওয়াক' শব্দ তুলিবে না, উহাতে অন্যের আহারের ব্যাঘাত ঘটে, 'ওয়াক' শব্দ নিম্ন শ্রেণীর লোকেতে করে—যতটা সম্ভব কাহারেও জানিতে দিবে না। কোন সূত্রেই হাত চাটিবে না, আঙুল চুষিবে না, কোন কিছু চটকাইবে না। দধি আদি খাইতে 'সুপ' শব্দ করিবে না। কেহ যেন না বলে, কোথাকার ভিখারী। মনে রাখিও, আমরা গরীব হইতে পারি কিন্তু খুব উচ্চবংশ। আমাদের বংশমর্য্যাদা কাক পক্ষী পর্য্যন্ত জানিত। ও ভাল কথা, খাওয়ার পর লবন দ্বারা আঙুল মার্জনা করিও এবং যখন শুনিবে, 'উঠিতে আজ্ঞা হউক' তখন উঠিবে।

বাবা কি কোন মান মর্য্যাদা রাখিল !

বাপ পা ছাড়িয়া এক কাজ কর, কাপড়ের কষিটা খুলিয়া দাও, তাহাতে খুব আরাম হইবে, ঐ উপদেশ বৃদ্ধা দিতে মাত্র, বালক এমত তড়বড় করিয়া উঠিতে গেল যে বেকায়দাতে নিজ কাপড়ের উপর পা পড়িয়া, সমস্ত কাপড় খুলিয়া পড়িল, ভাগ্যিস সার্ট ছিল।

গোবর কুড়নী হাসিয়া যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন্তব্যিল, ওমাঃ কি কাণ্ড ! গিঁট দিয়া কাপড় পর না কেন, তুমি ছেলেমানুষ !

দাদা কি যে কচ্ছিতেছিস্, এইবার ন্যাংটো হইয়া নাচ !

চুপ কর পোড়ার মুখী ! যে এবং কোনরূপে নিজেরে সামাল দিয়া অতঃপর বাপের কাপড়ের কষি খুলিতে এখন প্রস্তুত হইল এবং তজ্জন্য যেক্ষণে তাঁহার পিতার সার্টটি পেটের উপর হইতে তুলিল, এবং বাবার ঢাউস পেট ওতপ্রোত হয় তন্মুহূর্তে তাহার মাথা চক্র দিয়া উঠিল, দেহ চমকাইয়াছে। এবং বিশ্বাস হইল, ফাঁকা মাঠের ঘূর্ণায়মান বায়ু তদীয় দেহ মধ্যে সাঁধ করত 'বাতাপি' ডাকে যারপরনাই ঘোর রব তুলিয়া তাহারে প্ররোচিত করিতেছে, যাহাতে সে যেন বা ইল্বল—সেও অমনই ডাক দেয়

—হায় সে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানহীন যে, প্রায় নিষ্ঠুর ইল্বলের মতই 'বাতাপি' ডাকিতে উদ্যত হইল। আঃ ভগবান দয়াময় তিনি রক্ষা করিলেন!

কি হইল দাদা তোরে কি ভূতে পাইল নাকি!

এবং মেয়েটির সঙ্গেই বৃদ্ধা মহা তাজ্জবিয়া প্রকাশিল, বাপরে! পেটটা কি বা ফুলিয়াছে! এতক্ষণ গায়ের কোর্ত্তা ইত্যাদিতে এতটা ত বুঝায় নাই! ব্যাপার কি! রহ! রহ! নাড়ী দেখি! অথচ তদীয় হস্তদ্বয় তেমনই আছে,—নাড়ী দেখার কথায় ভ্রাতা ভগ্নী আতঙ্কিত মা যদি শুনিতে পায়! সে উহাদিগের প্রতি ইতঃমধ্যে নেত্র পাতিয়া ভারী খুন খারাবী আমোদে তাহার স্বভাব মত ছেলেমানুষী হাস্যে লতাইতে ছিল এবং এই কালে, শতছিন্ন আঁচলের কিছুটা এক হাতে লইয়া মুখে রাখে, এখন এই বস্ত্রখন্ড মুখ হইতে সরাইতে থাকিয়া বিবৃতিল, তোমাদের ইসকুরুপ্ (স্ক্রু) ঢিলে তোমাদের! আমি অমুক হাড়ির নাতনী, আমার বাবার নাম অমুক হাড়ি, আমার জ্ঞান গম্য নেই। তোমাদের মতন আমি আলুকে আলু বলি পানাকে পানা, সব! তবে সে বার কি হইয়াছিল, সেই যে উপোসী বামুন, তাড়ি-খোলার কাছে পড়িয়া, হাতের কালোঠাকুর (শালগ্রাম) একদিকে, জিনিষপত্র রাস্তায়, ভাবিলাম মরিয়াছে, কোন রকমে ডোঙায় তুলিয়া বাড়ী পোঁছাইয়া দিলাম, বাড়ীর লোক বলিল, করিলি কি! তুই হাড়ি। সর্ব্বনাশ। নূতন হিমের দিন, বামুনকে তিনবার স্নান করাইয়া ঘরে তুলিল। জ্বর দেখে কে! ব্যাস রাত না পোহাইতে শেষ—বৈকুণ্ঠে চলে গেল! সেই হইতে পণ দেবদ্বিজ উঁচু জাতি স্পর্শ করিব না! সেই থেকে পণ আর পাপ করিব না!

এ পর্য্যন্ত কহিয়া বৃদ্ধা এখন পূর্ব্বকার আসন ভঙ্গিতে বসিয়া বলিল, নাড়ী! আমার হাতের নাড়ী উহার নাড়ী দেখা নহে, এবং করজোড় বিমুক্তিয়া স্বীয় অতীব শীর্ণ কব্জির শিরা দর্শাইয়া ঘোষিল, আমার নাড়ী দেখিলেই, উহারটিও দেখা হইল সব নাড়ীর ভাল মন্দ এই নাড়ীতে যদি না রহিবে তাহার মনুষ্যজন্ম না ছাই, নাড়ী তোমার কি হইয়াছে, এতেক তরাস কিসের! পেট ফুলিয়াছে কেন বল।

অতীব সম্ভ্রান্ত ভদ্র নিমন্ত্রিতরা মহা সঙ্কোচে সবিনয়ে লোকটির নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিলেন, লোকটি অনুমতি দিল।

মহোদয়গণ আমারে অপরাধী করিবেন না, আপনাদের যদি পেট ভরিয়া থাকে সে অন্য কথা। জানিনা অজ্ঞান বশত কত না দোষের ভাগী হইলাম।

আমার মা অন্তরীক্ষে আমার হটকারিতায় অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

মহাশয় আপনার কথায় দেখুন পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, যজ্ঞী বাড়ি সার্থক!

মহোদয়গণ আপনারা যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আহার্য্য সকল যদি আপনাদের মর্য্যাদা অনুযায়ী হইয়া থাকে, তৃপ্তিদায়ক রুচিকর হইয়া থাকে, তবে সত্যই যে আপনাদের সেবা করিতে পারিয়া আমার মায়ের কৃপা যাহা —আমি ধন্য মনে করি।

সেই বাচাল লোকটি বলিয়া উঠিল, তবে এইটুকু নিন্দার আছে, যে সত্যই বাঙালী সে বলিবে, দইটি আর একদিন থাকিলে বাসি হইয়া যাইত। তাহার এই বাঙলা তামাসাতে সকলেই সভয়ে হাস্য করিল! কেন না লোকটি কিছুক্ষণ আগে মাত্র লঙ্ঘনের পরিচয় দিল; বলিল শাস্ত্রকাররা এবং অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষরা, শ্রাদ্ধে অন্ন খাইতে নিষেধ করেন কিন্তু বাবা আমি ভাত খাইতেছি। (অবশ্য ইহা নিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠান। শ্রাদ্ধের অন্ন নিষেধের কারণ এই যে, পরলোকগত-র স্বভাব চরিত্র গ্রহীতাকে প্রভাবিত করে। এখানে প্রকাশ থাক, যিনি আজ ইহজগতে নাই তাঁহার ন্যায় পূজনীয়া মহীয়সী নিষ্ঠাবতী মহিলা দুর্লভ!) আশ্চর্য্য তখন উহার ব্যঙ্গ উক্তি ভোজন স্থান অতি মাত্রাতে নিজ্জর্ন হইল।

সম্ভ্রান্ত মহাশয়গণ পুনঃ ঐ লোকটিকে, যে খাইতেছিল, তাহার উদ্দেশে প্রায় জোড় হস্তে (এক হাত এঁটো) নিবেদন করিলেন, মহাশয় যদিও জানি আমাদের····

পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়াছে।

জানি আপনকার নিকট উঠিবার আজ্ঞা চাহিয়া আমরা ভারী কাণ্ডজ্ঞান রহিত বিবেকহীনের ন্যায় লোকাচার বিরুদ্ধ কাজ করিলাম, মহাশয় আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন!

লোকটির নিকটস্থ মহিলা দুইজন তাহারা সস্নেহে কহিলেন, কোন কিন্তু নাই আপনার উঠুন!

মহিলাগণ লোকটিকে অপরিমেয় মাতৃবৎ যত্নে খাওয়াইতেছিলেন। দিদি যিনি, মধুর কণ্ঠে শাসাইলেন, মা তোমাকে যা ভালবাসিতেন, তিনি ছাড়িয়া যাইবার দিন তিনেক পূর্ব্বে অদ্যও মনে আছে, '—' দিদি আলু-শাক রাঁধিয়া পাঠাইলেন তখন বেলা প্রায় দুইটা এমনইতে যাহা ভাল হইয়াছে বুঝিত রান্না নামাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের পাঠাইত—শুনি খুলনার লোক উহাদের সম্পর্কে ছড়া আছে নাতি খাতি বেলা গেল, শুতি

পারলাম না। এই ছড়া কাটিয়া মৃদু হাসিলেন, আহা '—' দিদি ভারি ভালমানুষ, বেচারীর জন্য বড় কষ্ট হয়, উহার ছোট ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগিতেছিল জানালা দিয়া আম গাছে পাকা আম দেখা যাইত, রুগ্ন ছেলেটি বায়না করিত আম খাইব '—' দিদি প্রত্যহ তাহারে প্রবোধ দিতেন, ভাল হইয়া উঠ! ঐ গাছের আম সব তোমার কেউ হাত অবধি দিবে না। ছেলেটি উহাদের মায়া ত্যাগ করত চলিয়া গেল, আর '—' দিদিও আম আর স্পর্শ করিলেন না! ও মা কি বলিতে কি বলিলাম মন না মতি হ্যাঁ সেই আলুশাক রান্না দেখিয়া মা বলিল, আমার —রে পাঠাইয়া দাও, শেষে দাদার সেরেস্তায় কে ছিল তাহারে সাইকেল করিয়া তোমার বাড়ি যাইতে হুকুম! তুমি না খাইলে মা বড় কষ্ট পাইবেন না বলিও না! খাও।

বালক দেখিল ছায়া, সে মুখ তুলিয়াছে প্রত্যক্ষ করে জনা তিনেক কাহারা যেন—ইহারাও যেন ধুকিতে আছে গায়ে জামা ইহাদের অধস্তন পাঁচদশ পুরুষ পরিতে পাইবে না ইহাদের মুখ সহানুভূতিতে আরও বদমাইশের মত হইয়াছে।

মাছ আনিয়াছি ভেটকী রুই।

রাখিয়া দাও! মা বলিতেন, কি কষ্ট করিয়াই না রোজ ভগবৎপাঠ করিতে আসে।, জাতে বামুন হইলে উহাতে অনেক পয়সা পাইত। মজিল পুরের লোকরা এক বাক্যে স্বীকার করে এমন পাঠ তাহারা শুনে নাই। ধীরে ধীরে খাও ইস তোমার বৌ বেচারী সে আসিলে কি আনন্দই না হইত!

ঘাটে যাহারা মুখ ধুইতে ছিল, তাহারা আলোচনা করিতে থাকে, কি ভাবে চালাইতেছে! এত খাওয়া!

মনই খায়! মন যদি না খাইয়া থাকে তবে সে কিছু বোধ করে না··· শ্রুতি আছে ব্যাসদেবকে গোপিনীরা যমুনা পার করাইয়া দিবার জন্য ধরিল ব্যাসদেব উহাদের নিকট কিছু খাদ্য চাহিলেন, বলিলেন, আমি ক্ষুধার্ত্ত। গোপিনীরা ক্ষীর ননী দিল ব্যাস তাহা খাইয়া যমুনার নিকট যাইয়া দেখিলেন একটি নৌকা পর্য্যন্ত নাই, কহিলেন, হে যমুনে আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি তবে দুই ভাগ হইয়া যাও। যমুনা দুভাগ হইল! গোপিনীরা পার হইতে থাকিয়া ভাবিল বুড়া বলে কি! কিছু না খাইয়া থাকি! (ইহা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন)। আছে হটযোগের খেলা!

কিরূপে কোন পন্থায় কষি আলগা করা যায় এমতকিছু যে সে ভাবিত আছে, ইহা অন্তত বালকের মুখের চেহারাতে বুঝায়! গোবর কুড়নী

তাড়া দিল, অমন বসিয়া থাকিলে রাত পোহাইয়া যাইবে। হাত লাগাও।

বালক আপন আড়ষ্টতা কাটাইয়া গোবর কুড়নীর প্রতি নিরখিতে আছে, এখন নিশ্চয় করে যে বৃদ্ধা নাড়ী না ধরিয়া থাকিলেও, মুখেও কোন ভাবান্তর নাই ; ইস। যখন সে নাড়ী আপন শিকরের তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শিল, তখন বৃদ্ধার চক্ষু শিব নেত্র (অর্দ্ধ নিমীলিত যাহা) হইয়া আছে ; তখন বালকের বক্ষঃদেশ সিঁটাইয়া উঠিল, নিঙড়াইল ! তখন তাহার দৃষ্টি তীর বেগে ছুটিতে আছে, হঠাৎ থমকাইল, তদীয় বুদ্ধি অদ্ভুত সংস্কার লভিয়াছে, বিশ্বাস যাহাতে করিল সমগ্র ত্রিভুবনের নাড়ীর খবর তাহাতে কিছু সে বিহিত জানে ! এই কি সেই অনেক জন্মের সুকৃতির পুণ্যে বাবা বলিয়াছে যাহা সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—ইহারা সত্যযুগের মানুষ ইহারা শালতমাল বৃক্ষে, কাক পক্ষীর ন্যায় (আর বিষ্ণু ব্যাস আদি নয় জন, আবার অন্য মতে, সাত জন) বহুকাল এই পৃথিবীতে আছেন !

নিশ্চয় কৈ আমি ত আমার মায়ের জ্বর আমার নাড়ীতে টের পাইনা—অবশ্য এমন যে করা যায় ইহা আমি জানিতাম না ! কি দারুণ ঐ বৃদ্ধা ! গরীব ছেঁড়াছুটা উহার ছলনা—আমি উহার নিকট এই ম্যাজিক শিখিব !

তুমি জজ ব্যারিষ্টার হইবে, সি আর দাস হইবে পাঁচ মোহর তোমার ফি (সি আর দাস অর্থে চিত্তরঞ্জন দাস ; ইহা কি লজ্জার কথা, মাথা হেঁট হয়, যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে, আমাদের মত লোককে পাঠকের নিকট পরিচয় দিতে হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে জানিনা সত্য কিনা। তাই ওই নামটি ভুলিয়াছি।) বেচারী বালক জানে, ঐ আকাঙখায় সে নিজেকে ভবিষ্যতে শয়তান তৈয়ারী করিবে। অবশ্য ঠাকুর যদি উহাকে দয়া করেন—তবেই রক্ষা।

বৃদ্ধা নিশ্চয় বাবার কোন একটা বিহিত করিতে পারে। বাবা কেন গৃহিণীদের কথা শুনিতে গেল। আঃ সেই ছেলেটি, যাহার একটি দাঁত পোকা খাওয়া—কি অসভ্য ছোটলোক বলিল, এই সব লোক (তাহার বাবার উদ্দেশে) পরের পয়সাতে টিনচারাইটিনও খায়। (টিনচার আইওডিন) এখানেই সে থামে নাই ; মন্তব্যিল, জাত ভিখারীরা এমন হয় না এবং সহানুভূতির ভানে প্রকাশিল, বেচারা খাইয়া লউক, গরীব মানুষ এত ভাল আর কোথায় পাইবে। ইহাতে নিকটস্থ বালকগণ মহা চাপল্যে হাস্য করে।

বালকের চোখ ফাটিয়া জল আসিল, সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের কর্মচারীর পুত্র তাহারে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ; বালকের বিবৃতিতে সে

সত্বর কুলকুচির জন্য একমুখ জল লইয়া সেই ব্যাদরা বালকের মুখে কুলকুচি ছিটাইয়া কহিল, তোর মত ছোটলোকেরে হাত দিয়া মারিতে লজ্জা হয় শালা ছোটলোক, এক নম্বর চোর তোর বাপ্। (ইহার বাপ কোন প্রতিবেশীকে সোনার বোতাম বলিয়া ধার দেয়—প্রতিবেশী দুর্ভাগ্যবশত উহা হারাইয়া ফেলিল, ইহার বাপ শুনিয়া বলিল, উহা নিরেট সোনার ছিল, এবং দাম আদায় করিল, কিছুদিন পর ঐ বোতাম পাওয়া গেল,- স্যাকরা কহিল, ইহা সোনার জল করা রূপার বোতাম) জালিয়াত। হ্যাঁ হাঁ স্যার ডেভিড এজরা তোমাদের পত্তনিদার—গড়ের মাঠের জমিদার।

ব্যাদরা বালক ইত্যাকার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না,তাহার নিকটস্থ বালকরা পালাইয়া গেল এই ব্যাপার নিমিত্ত বটে উপরন্তু বয়সীরা এই সময় ঘাটে মুখ ধুইতে উপস্থিত হইলেন: একজন খড়কে দাঁতে দিতে থাকিয়া বলেন তবে এই মনে হয় আহার্য্য সব বড়ই গুরুপাক যেমন গরম মশলার ব্যবহার তেমনই সরিষা লঙ্কা ইত্যাদির তাহার পর তৈল ঘৃতের ছড়াছড়ি। পাঁচ/ছ রকম মাছ। হজম হওয়া দুষ্কর, এত ঐ ব্যক্তির খাওয়া ঠিক নহে।

গুরুপাক মানিলাম ; তবে গল্প আছে, এক একজনের সহ্য ক্ষমতা অবিশ্বাস্য ; লর্ড ক্লাইব নবাব সিরাজদ্দৌলা যাহা খাইয়া থাকেন তাহাই খাইতে চাহিলেন : বাবুর্চি কহিল, মহাশয়, যেভাবে মাংস তৈয়ারী হয় শ্রবণ করুন, (জানিনা কতদূর সত্য) গোখর সাপ একটি মুরগীকে ছোবল মারিয়া মারিল, ঐ মৃত মুরগী খণ্ড খণ্ড কবিয়া অন্য একটি খাওয়ান হইল সেইটি মরিল, এই ভাবে পর পর কয়েকটি ; সর্বশেষ যে মুরগীটি বেশ চলাফেরা করিবে, সেই মুরগীর মাংস নবাব খাইতেন। ক্লাইব তেমনই পাক করা মুরগী খাইলেন, খাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে লাফালাফি, গরম। কোট সার্ট অন্তর্ব্বাস খুলিয়া ক্লাইব পুকুরে পড়িলেন। যাহার পেটে যাহা সহে। নিশ্চয় ঐ ব্যক্তিরও অভ্যাস আছে।

গোবর কুড়নী বুড়ী কহিল, ও বাপ কষিটা খুলিয়া ফেল।

বালক পুনঃ সার্ট উঠাইল, পুনঃ সেই উদর সেই বিপুলত্ব ঢাউস স্ফীত। একদা বালক বিচারিল, তবে বাবা খাওয়া দাওয়ার পর মুখ প্রক্ষালনাদি কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদন করিল। কেননা করিতে সম্মুখের দিকে দেহ অন্তত এক আধবার বাঁকাইতে হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে একাগ্র হওয়া মাত্র শুনিল বাতাপি।

ইহাতে এক যুবতীরমণী যাঁহার কানে উহা আসিল, যিনি ঐ টায়রা

পরিহিতা বৌটির অসভ্য কাণ্ড দেখিলেন, তিনি বিশেষ মর্মাহত হইলেন, আঃ কি মহীয়সী, কি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার ইহার ভাব গাম্ভীর্য্য, তিনি তৎক্ষণাৎ নিদারুণ চাবুক কণ্ঠে নিন্দিলেন, ছি ছি বৌ তুমি কি চিমটি কাটিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় তোমার রক্ত মাংসের শরীর কি না, এই সব অসভ্যতা শিখাইতেছ, লোকে তোমার বাপ শ্বশুরকে কি বলিবে। ইতরের ঘর। ছি ছি—তুমি না আজ বাদে কাল বিয়াইবে। লজ্জা নাই। এবম্প্রকার ভর্ৎসনা কালে, তাঁহার রূপ কি অবাক সম্ভ্রান্ত শত শত লোক তাঁহারে কুর্নিশ করিতে আছে, যেমন সম্রাজ্ঞী। নিশ্চয় গত জন্মে রাণীভবানী উনি ছিলেন, আঃ উহার হাতের টালি প্যাটার্ন-এর চুড়ি কি সুন্দর। আমি জলপানির টাকা জমাইব মাকে গড়াইয়া দিব! মাগো আমরা এত গরীব কেন?

মা সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, কখনও বলিতে নাই, ভগবান অসন্তুষ্ট হন।

তুমি বাবা সবাই ত বল।

বলি, কিন্তু কখনও কেন জিজ্ঞাসা করি না। জিজ্ঞাসার মত পাপ নাই। আর জানিবে নিশ্চয় গতজন্মে কোন পাপ হয়।

এই লোকটি কে। নিশ্চয় ভিখারী, কাঁধে থলি, বাম হাতের অর্দ্ধেক নাই, একটি পা ছোট শীর্ণ বাঁকাচোরা—শরীর ক্রাচে ভর দেওয়া লোকটি উচ্চিংড়ির মতন, ছোট লাফে তাদের পরিক্রমণ করিতেছিল।

যা খেলে যা! অমন চক্কর দিতেআছিস কেন! বৃদ্ধা ধমকাইল।

দেখিতেছি বেচারার বাবুর কি হইল। এই এক রত্তি ছেলে, উহার দ্বারা কষি খোলা কি সম্ভব। ওহে তোমরা এসনা, বৃদ্ধা ঐ যাহারা তিনজন রাস্তার ওপর বসিয়াছিল তাহাদের কহিল। এবং পরক্ষণেই চোপ বেটা ভিখারী, ভিক্ষা চাইবার সময় বাবুমহাশয় এখন একেবারে মাথায় বাঃ।

ঘাট হইয়াছে।

ঐ তিনজন কহিল, আমরা উহাতে নাই, উঁচু জাত, যাই তাহার পর নালিশ ঠুকিবে আমার গেঁজে (লম্বা কাপড়ের থলি বেল্টের মত কোমরে বাঁধা হয়) বা ট্যাঁকে এক কুড়ি টাকা ছিল নাই।

বৃদ্ধা কহিল তুমি চেষ্টা কর।

ক্রাচের ভিখারী, উপদেশ দিল, বাবু আপনি পেটটা একটু যদি টানিতে পারেন তবে গয়রা হয় (গভীর) অনায়াসে কষি খুলিয়া ফেলা যায়।

তোর কি কোন জ্ঞানগম্য নাই। গয়রা করিতে পারিলে, এইকান্ড হয়। সর্। লও বাপ তুমি হাঁ করিয়া রহিলে যে, কোঁচার পরত আস্তে করে খুল, একটির পর একটি। হ্যাঁ কষি জাঁকিয়া বসিয়াছে তাই প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বালক বৃদ্ধার কথামত কোঁচা খুলিতেছিল, সে বেশ আড়ষ্ট কেন না ক্লাচের ভিখারীটা অনবরত সাবধানিতেছে, খুব ধীরে খুব আস্তে। যেহেতু বাবা বেচারী এতটুকুতেই অর্থাৎ কোঁচা যাহা চাপিয়া বসিয়াছে, তাহা শিথিল করণে যন্ত্রণাদায়ক যদি হইল তখনই মহাবেদনাতে ডাক ছাড়িয়াছে। ক্লাচের ভিখারী একবার এইপাশ মুহূর্ত্তে অন্য পার্শ্বে যায় আর মন্তব্যায়।

আ খেলে মহা আতান্তরে পড়িলাম ত। কেন ঘাবড়াইয়া দিতেছ, যাও একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক। এবং পরক্ষণেই লোকটিকে সস্নেহে বিরক্তি ভাবে কহিল, একটু সহ্য করিতে হইবে, বটে ছোট ছেলে সহায় সম্বল নাই। তুমি হাওয়া কর থামিও না, মেয়েটিকে আদেশিল। এখন কোঁচার দিকে তাকাইয়া বলিল, বাঃ আর কয়েকটা পরত। বুঝিলে সব খুলিবাব পর কাজ আছে বুঝিলে, তেল আর কোথায় পাইবে শুধু জল মালিশ করিতে হইবে। পেট কি ঢাউস।

লোভী।

ইনি আমার বাবা।

নোলা সর্ব্বস্ব।

ইনি আমার বাবা।

পেটুক।

ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধা হাত তালি দিল লুঠেরা গলাতে ঘোষিল, যাক্ একটা গাঁট পার হইয়াছে ও বাবু কিছু আরাম পাইতেছ। এবং সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বালককে নির্দ্দেশিল, এবার কাছার কাপড়টা খুলিতে পারিলে কেল্লা ফতে। তখন জল মালিশ।

এ নিশ্চয় অনিয়মে অমন ধারা হইয়াছে, বেটাইমে অবেলাতে খাওয়াতে যাহাদের গ্যাসের রোগ আছে। ইহা অদূরে যে কয়জন বসিয়াছিল তাহাদের একটি প্রকাশিল। তাদের এরূপ হয়। একটু লেবু দিয়া সোডা শুধু সোডা থাকিলেও....

সোডার অভাব কি আমার কাছেই আছে—আমার যে অম্বল সোডা ব্যতিরেকে দুই পা চলিতে পারি না। সোডার অভাব নেই।

তাহা সেই গল্পটি কত চমৎকার, যাহা এইরূপ, একজনা ব্যক্তি অতি-মাত্রায় ভোজন করিল প্রাণ যায়। এমন সময় লোকে হাকিম ডাকিল। হাকিম হজমের দাওয়াই দিলেন। সকালবেলা লোকে উঠিয়া দেখিল, যে, যে ব্যক্তি দাওয়াই খাইয়াছিল, সে বেমালুম সশরীরে হজম হইয়া গিয়াছে—পরণের জামা কাপড় তক্তাপোষে পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা ধমকাইল, মহা বেআক্কেলে দেখি! সোডা ইহার উপর, কোথাকার হাতুড়ে, সোডা দিলে বায়ু ঠেলিবেনা! দেখিতেছ পেটটা উদরী রোগী (ড্রপসী) সমান হইয়াছে, তোমাদের কি মায়া দয়া নাই! এখন তেল জল, অভাবে শুধু জল! মালিশ। এই পোড়ার মুখো ঐখানে কেন—এই গঞ্জনা সে ক্রাচের ভিখারীকে দিল, পুনঃ অন্য কণ্ঠে লোকটিকে কহিল, একটু সিধা হইয়া বাবু বসিতে হইবে।

বাবার বড় কষ্ট হইবে।

তুমি থাম ত। হ্যাঁ আর একটু, তুমি সার্টটা আস্তে করিয়া টান, বাবু তুমি সার্টটা ছাড় দাও। টান। আবার তুমি অমন করিবতেছ।

ইহা শ্রবণে ক্রাচের ভিখারী থতমত হইল, নিশ্চয় বেচারীর একটু উপকারে লাগিবার সাধ ছিল. তাই সে ঈষৎ অস্থির। এমত সময় বৃদ্ধা কহিল, কিছু যদি কাজে লাগারই মন ত একটা বড় কচু পাতা লইয়া রৌদ্র আড়াল করিয়া মরণ দাঁড়াও না এবং বালককে জিজ্ঞাসিল, তুমি কাছাটা সব খুলিয়াছ। ব্যাস এবার দেখ দেখি কষিটা শিথিল করিতে পার কি না। এবং উদগ্রীব হওয়ত দেহ ও ঘাড় বাঁকাইয়া বৃদ্ধা তাকাইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই লোকটি হঠাৎ মরিয়া হইয়া যা থাকে কপালে সংকল্পে, কোন উপায়ে আপন কষির একটি দিক খুলিয়া দিল, তদ্দর্শনে বৃদ্ধা জয় মা দুর্গা! কাঙালের মা-গো দুখীজনের মাগো! ফুকারিয়াছিল এবং বিশেষ গম্ভীর কণ্ঠে নির্দ্দেশিল, লও খুব সন্তর্পণে আলগা টান দিতে থাকিয়া ডান দিকেরটা খুল; দেখিতেছ ত মানুষটা কেমন কাতরাইতে আছে, যে জ্বালায় কোমর জ্বলিতেছে। খুব সাবধান। বাঃ ও মেয়ে তুমি বাপের কষির এখানে হাওয়া দাও কিংবা ফুঁ দাও দেখি।

এইভাবে যখন কিছুটা সময় অতিবাহিত হইবার পর, লোকটি চীৎকারিল ওরে মা ওরে মা আমার কোমর জ্বলিয়া গেল। আমি গেলাম।

বালক বালিকা ক্রাচের ভিখারী কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না, বৃদ্ধা নির্ব্বিকার এবার দারুণ রুক্ষ কণ্ঠস্বরে উচ্চারিল, মরণ, হা দাও, ফুঁ দাও,

যমের সঙ্গে লড়াই এমনই হইবে। ভিজাকাপড় এখানে দিয়া ফু দাও ; দেখ কেমন আরাম পাইতে আছে ; লও বাপ তুমি, একটা কিছুতে করিয়া জল আনিতে পারিলে ভাল হইত।

বালক ভগনীকে নিম্ন স্বরে প্রশ্ন করল, ছাঁদাগুলিতে সরা আছে না····

লোকটি ঐ অর্দ্ধমৃত অবস্থা হইতে থাবাইয়া নিষেধিল না না উহাতে হাত দিবে না, সরা লইবে না, মরি সেও ভাল।

তাহা হইলে কচু পাতায় কতটা আর হইবে।

ক্লাচের ভিখারী সভয়ে কহিল—আমার নিকট একটা কৌট আছে। আনকোরা আমাকে পত্তানিদার দিয়াছে।

লোকটি বলল, উহাতে দোষ নাই। জলের ছিটা দিয়া লও।

দেখ এঁটো হাত ফাৎ লাগ্যস্ নাই ত। তুমি বাপ একটা পাতা দ্বারা ধরিয়া লইয়া যাও বেটার পাপ না হয়।

মাইরী না। হাতফাৎ, আমার পাপের ভয় নাই।

আনিয়াছ, বেশ পেটে জল আছড়া দিয়া মালিশ কর। দেখ এখনই আরাম পাইবে কর। কর। তুই—ক্লাচের ভিখারীকে আজ্ঞা দিল, মাথার কাছে হাওয়া কর। ওগো তোমরা ঐ গাঁয়ের কাউকে ডাকিয়া পাও কি না। জিজ্ঞাসা কব সালতি কার।

উত্তর দিকে মাঠের মধ্যে ছোট একটি গ্রাম এই খাল হইতে সরু এক জল পথ ঐ দিকে গিয়াছে। ঐ লোকগুলি তারস্বরে চীৎকার করিয়া প্রথমে সাড়া লইল এবং পরে জিজ্ঞাসিল সালতি কার এইধার আইস।

বৃদ্ধা কহিল, ঘরে পেঁীছাইয়া অবগাহন! বুঝিলে ভুলিও না।

সালতি উঠিয়া ভ্রাতা ভগনী বড় ছলছল চোখে গোবর কুড়নী ও ক্লাচের ভিখারীর দিকে, ভগনী ভ্রাতাকে, সে মস্তকে দুই হাত স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঈষৎ ঠেলা দিয়া বলিল, দাদা আইস উহাদের আমাদিগের বাটি যাইতে কহি! আশ্চর্য বালক ইহাতে নিমেষমাত্র উহাদের প্রত্যাক্ষিল, একটি গোবর কুড়নী অন্যটি ভিখারী তৎক্ষণাৎ নিজেরে ধিক্কার দিবার বিবেক তাহাব ছিল। এবং অন্যমনস্ক আছে, কাহারে সে ভাবিয়া ছিল, জলাতে থাকে, আলেয়া হয়! তখন নিমন্ত্রণ করিল এ যাবৎ তাহারা তেমনই দাঁড়াইয়া ছিল।

এমত সময় লোকটি মেয়েকে বলিল, মা রে ছাঁদাগুলি ধরিয়া থাক, উল্টাইয়া না পড়ে, কোটটা, উড়ানী বিঁড়ে করিয়া দাও! এক ছিটে উহার

না পড়ে, এক ছিটে উহার যদি পড়িয়া যায় আমার বড় কষ্ট হইবে।

বালকের মনে রওনা হইবার প্রথম পর্ব্ব আভাসিত হইল। বাবার দুই হাতে লম্বাটে পাশ বালিশের ওয়াড়ের মত দুইটি পুরাতন কাপড়ের থলি ; ঐ থলিতে যে হাঁড়ি সকল আছে তাহা কাপড়ের উপর হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, বালক অসম্মানে লজ্জায় লোক সমাজের টিটকার বিদ্রূপ—পুড়িতে আছিল ; এখানে ঈষৎ নির্জ্জনতায় সে বিলম্বিত সর্পের ন্যায় বাবাকে আক্রমণ করিল। লঘুগুরু জ্ঞান তাহাতে ছিলনা। উন্মাদ হওয়ত প্রকাশিল, লজ্জা করেনা, সকল ব্যক্তি হাস্য করিতেছিল। গান্ডে পিন্ডে সাত জনম যেন...., এখানে তোতলাইতে লাগিল ; এ সময় কানে আসিল 'দাদা কি হইতেছে' কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করিল না পুনঃ কণ্ঠস্বর শানাইয়া ব্যক্ত করিল, লোকে হাততালি দিতে বাকি রাখিয়াছে, তাহার উপর এত লইয়া যাইতে ছিছি আমাদের ভিখারী বলিবে না ত কাহাকে বলিবে !

আমি কি চাহিয়াছি ? তুই কি ! আমাকে কি ভাবিস্ ? বলত মা.... । আমি না তোর বাপ !

মেয়েটি বাপের কাতর উক্তিতে বড় পীড়িত হওয়ত কহিল, ও ছোট লোককে কি বলিবে !

আর অনেক নিন্দনীয় কথাই বালক মহাদম্ভে তাহার বাবাকে শুনাইল, যাহাতে লোকটির চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল এবং সেখানে বসিয়া কান্দিতে থাকিয়া আক্ষেপিল, তুই আমাকে শেষে এই বললি, তোর কি মনে হইল না আমরা এত ভালমন্দ খাইয়া যাইতেছি, তোর মা বেচারী একা পড়িয়াছে একটু যদি লইয়া থাকি তাহাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় ! আর আমি চাহি নাই তাহারা আহ্লাদ করিয়া দিয়াছে।

বালক দমিবার পাত্র নহে কিন্তু বাবার চোখে জল তাহাকে একটু ভ্রমে ফেলিয়াছে কি বলিবে, ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে কুলাইল না উত্তর দিল চাও নাই আবার ঐ পকেট ভর্ত্তি নেবুর পাতা। ঝাড়া এক ঘণ্টা ঐ জন্য দেরী।

বাপ ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল।

মেয়েটি এতেক ক্ষিপ্ত যে দৌড়াইয়া গিয়া বালককে এক ঠেলা মারিয়া গাল দিল, ছোটলোক শালা !

ইহা কি। হ্যাঁ। ছিঃ। ক্রন্দিতে চোখে লোকটি কোনক্রমে সংস্কার বশত ব্যক্ত করে, ইহার সহিত যার পর নাই মায়িক স্বরে জানাইল, ঐ দুটি নেবুর

পাতা তোর মায়ের জন্য, একটিই ত জিনিষ ভালবাসে, কোন কিছুতে জ্বরের জন্য মুখে পর্যন্ত দেয় না জ্বরে কালাইয়াছে মুখে তাহার তিক্ত লাগিয়া থাকে—তুমি জাননা। তাই নেবুর পাতা তেঁতুল দিয়া একমাত্র খাইতে ভালবাসে তাই চাহিয়াছি তাহাতে কি আমার মান গেল। এখানে তাহার বুক মহা অভিমানে ক্ষোভে আলোড়িতেছিল, সেই কারণে ইহার পরে উক্ত শব্দ বেশ জড়াইয়াছে যাহা এই, নেবুর পাতার জন্য ভিক্ষা করিতে হয় তাহাও স্বীকার।

বাবা কান্দিতেছিল।

মা কোন মতে বিছানা ছাড়িয়া দুই হাতের ঐ বোঝা দেখিয়া অত্যধিক হেয় হইল, তদীয় চোখ ছিঁড়িয়া জল আসিল এবং দাওয়ার খুঁটিতে আপনকার কপাল নিদারুণ অবমাননা বোধে ঠুকিতে লাগিল; মেয়েটি অদ্ভুত স্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া মা মা বলিয়া উহার হস্ত ধারণের চেষ্টা করিলে মা তখন তাহার স্বীয় হাত দিয়া দূরে সরাইয়া অযুতে কোপে উচ্চারিল, খবর্দার আমায় মা বলবি না, আমার কপালে এত····আমার মরণ হয় না, ঠাকুর আমি কি এমন পাপ করিলাম যে আমাকে জন্মান্তরের শত্রুর হাতে তুলিয়া দিল,····পাত কুড়নীরাও এমন করে না। ছাঁদা বাঁধিয়া আনিলে—লক্ষ্মী আর কখনও এখানে আসিবেন।

মেয়েটি দাওয়াতে পা ছড়াইয়া ভয়ঙ্কর কাঁদে, ল্যাম্পোর আলো পিতা পুত্রের মুখে কম্পিত হইতেছিল, দুইজনে দুই জনকে নেহারিবার জন্য প্রয়াসিল। বালকের মুখ বাপের মত শুকাইয়াছে এবং সে বাপের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। কেননা বাপের মমত্ব বোধ যে কি তাহা কে জানে।

বাপ কহিল, মাগো, তোর মাকে বলিবি না যেন, তোর দাদার আমাদের কোন কথা! তোর মা বড় দুঃখ পাইবে।

না বাবা। হ্যারে দাদা কৈ মাছের পরই ত রুই তারপর।

না মা কৈ এর পর চিঙড়ীর মালাইকারী।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা তোর সব মনে আছে আয় মিলাইয়া লই। যদি ভুল হয় মা'র যে কি। সব বলিতে হইবে।

এখন ল্যাম্পোর আলোয় বাবার পেটের প্রতি দৃষ্টি পাতিয়া বালকের জিহ্বা শুকাইয়াছিল। তবু বিভ্রান্তিতে মায়ের খেদকে প্রশমিত করনে সহসা বলিয়াছিল, বাবা যে ফিরিয়া আসিয়াছে ইহা ঢের। (ইহা গোবর

কুড়নীর কথা)।

ইহায় মা'র কপাল ঠুকিতে থাকা ঈষৎ ধীরে হইতে আছিল। তদ্দর্শনে বালক মনোবল লভিয়া, যতখানি না বলিলে নয় তত অবধি বিশদিল।

ইহাতে মা স্থির মেয়েটি মাকে বুঝিয়া লইয়া কহিল সব দোষ তোমার তোর, তুই ত যাহা করিলি, এই অবধি বিস্তারিয়া শেষে যথেষ্ট বুক ফাটা অভিমানের গলা করিয়া প্রকাশিল, তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাব্বাঃ যাহা নীলা (লীলা) দেখাইলি।

বাপ তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়াছে, তোর মাকে আর কষ্ট দিসনি মা।

মা গোবর কুড়নী পৈ পৈ করিয়া বলিয়াছে, অষ্টপ্রহর পরে হইবে তবে দুটি জলভাত নেবু দিয়া দিবে মা আমাদের এখানে কাঁজি কেউ করে।

থাম থাম তোর দাদা কি করিয়াছিল বল ?

উহাকে ছাড়, আমিই বলিতেছি, আমার ভীমরতি তোমার পুত্র বড় রাগিয়াছিল।

মা তোমার নেবুর পাতা।

ঝাঁটা মারি নেবুর পাতায়, আবার সোহাগ দেখাইবার জন্য দুইটা নেবু পাতা, মরে যাই লোকে বলিবে, আহা অমুক বাবুর মতন মাগ পেরান, মাগ অন্ত পেরান লোক আর দুচারটি থাকিলে রামরাজ্য হইত। ছি ছি কোন লজ্জায় তুমি খাইলে, সারা যজ্ঞী বাড়ী তোমারে লইয়া রঙ্গ তামাসা করিল। মাগো আমায় আঁতুড়ে নুন দাও নাই কেন....উঃ। মার কণ্ঠ নিদারুণ অপমানে রুদ্ধ হইয়া আসিল, একে জ্বর তদুপরি এই মরণ-যন্ত্রণা - মা প্রায় উন্মাদ। অনবরত এক কথা আমার মরণ হয় না। এবং ভূমিতে শুইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাপের নিমিত্ত ব্যথিত কন্যা কহিল ঢের হইয়াছে উঠ কি যে কর।

ইহার পর বালক নিশ্চই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ এখন ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং ছতরিতে বিরাট একটা হাতের ছায়া সে দেখিল শুনিল বাবাকে বলিতেছে, আর একটা খাও পারিবে না। তোমার কতটা খাইলে পেট ভরে আমি জানি না, উহাদের দিয়াছি, এ সন্দেশ থাকিবে না কাঁচা পাকের ত কাল খারাপ হইয়া যাইবে। লহ আর একটি।

বারীন ঘোষাল

জিন্দাবাদ খালকো

আমার দেখা বেস্ট গ্ল্যাডিয়েটর স্পার্টাকিউস। সে সিনেমায়। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের রঙে খুনখারাপির গল্প মনে করে বিষণ্ণ হওয়া সেই থেকে। এর পর আরও দেখেছি। বাদল সরকারের নাটকও। কিন্তু কোন যুক্তি বা পারফেকশনই সিনেমার সেই ইমোশনকে জাগাতে পারে নি। মরণপণ দুই যোদ্ধার মধ্যে একজন হারবেই। সে নেমেই বুঝতে পারে আজ তার শেষ। এই শেষ হওয়াটা ঠেকিয়ে রাখতে, 'মা-গো' শব্দটা পিছিয়ে দিতে তার অনবরত পিছলে যাবার মনসংযোগ—প্রাণ ভিক্ষার দিকে না এগোতে পারা জিভ তার মুখে একটা আতঙ্ক লিখে দেয় যা অন্যপক্ষের নিষ্ঠুরতার চেয়ে গাঢ়।

'পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে দাদা'—রাজেন সাউ সতর্ক করে দেয়। হাতের পাতাটা ক্ষত হয়ে পড়ে যাচ্ছে—অনেকটাই পড়ে গেছে—চুমুক দিয়ে বাকি রসিটুকু খেয়ে ফেললাম। ফেলে দিলাম পাতাটা। একটা ঝিমঝিমানি আসছে। হাত একটু নড়বড়ে। থেকে থেকেই ডুবে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে গাঙের জলে মাথা তুলে নিঃশ্বাস নিতে পারছি মাত্র।

খালকো, কি যেন নাম বলল রাজেন, এমনিই বসে। কিছুতেই বন্ধুত্ব পাতাবে না। 'আপনি খাবেন না ?'—'না।' 'একটু নিন না।'—'না।' 'এই দাও, এর হাতে পাতা দাও।' —'না।' এ ভাঙ্গার লোক। আমি নিরস্ত ও আকর্ষিত। বছর তিরিশ বা কুড়ি চল্লিশ। আমার চোখে তার সব কিছুই মানানসই। একটা নীল উইন্ডচিটার গায়ে হলুদ গেঞ্জীর ওপর। ফুলপ্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। পেছনে হাতের ওপর ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে।—'এই যে জমিগুলো দেখছেন, কত টুকরো—এখানে বসে জমি দেখতে পাবেন না—শুধু আল। আল দিয়েই ইন্ডিয়ার এক পার্সেন্ট চাষ জমি আটকে আছে। আমি এসে এই আল ভেঙ্গে দিয়ে কোঅপারেটিভ চাষ করতে চেয়েছিলাম। মাগনা। আমার কিছু নেই। কোন স্বার্থ নেই। যে দশ বারো ঘর চাষী আছে—এখানে জোতদার বলে

কিছু নেই। মহাজন আছে।—মাঠে নেমে আল কাটতে শুরু করেছি সবাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নাগেন সারিং লোকজন নিয়ে'—

মানুষ একজন আর একজনের পোষ মানে। বলে বন্ধুত্ব। যে লোক মিশবেই না সে কোন ভরসায় বক্তৃতা দেয়। রাজেনের মনে হল বহুবার শোনা। সে স্পষ্টতই মজা করে বলে—'ও খালকো, পলাশ কবে ফুটবে দাদাকে বল। তোমার পাখীগুলোর নাম বলো না। আপনি শুনে হাসবেন। একশোটা পাখী পেলে অতগুলো নামও রাখতে পারে ও। বল, বল। স্পেন, ইটালী—বল না দাদাকে। ও মিশনের সাথে নানা জায়গায় গিয়েছিল, জানেন তো—খুউব ভাল ছাত্র। নাগেন সারিং হচ্ছে এই জনগণের, আমাদের নেতা।'

মাথা চেপে বসে আছে খালকো। রাজেনের পরিহাসের সুর তার পরিচিত। বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি মেয়েটাকে সে আর দেখছে না। এ মেলায় সে বেমানান। যেন মেলার মধ্যে নেই সে। আমার আসার আগেই সে বসেছিল মেয়েটার মুখোমুখি। মেয়ের সাথে কথা বলে না। রসি খায় না—মেলার মধ্যে এ কেমন আদিবাসী? কোন কিছুই দেখছে না। সারা চরাচরে সে একলা বসে আছে। আর কেউ নেই। আমাদের ইতিহাসে কো-অপারেটিভ কোথায়? শুধু ভাগ হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ। সংখ্যায় বেড়েছে, কিন্তু এক এবং একা।

মেলায় ভিড় বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। হাওয়ায় তত শীত নেই এখন। সোয়েটার বিরল। মেয়েটার নাম মুণ্ডরি—সে আবার পাতার দোনা এগিয়ে দিল। সেই সঙ্গে রসি। মাইকে হিন্দী ফিলমের গান। রসিতে আস্তে চুমুক দিচ্ছি। লোকজন আসছেই। দু একটা প্রতিমা নামানো খুব কাছে! হলুদ রং বেশি। নাচ চলছে। বারোটা পর্যন্ত এখানে বিক্ষিপ্ত সময় কাটাতেই হবে। আমার হাতে হিন্দীতে লেখা হ্যাণ্ডবিল। পড়তে জানি না। তবে লড়াইয়ের জায়গায় একটা দুধ সাদা কম্বল দেখে এলাম রাখা আছে। ওটাই বারোটার বাজী। কম্বলটা আমাকে টানছে। টানছে খালকোও।

—'যখন এসে এদের বললাম, এরা রাজী হয়ে গেল। হো কোল মুণ্ডা সাঁওতাল এদের মতো আধুনিক আর খোলামন কোথায় পাবেন? আর কোন প্রান্তে কেউ বুঝতো? কি লাকি দেখুন আমি। আমাদের পয়সা না থাকাটা কোন গরীবি দেয়নি কখনো। বিশরা, লাধো, কাণ্ডিল, রোমু

টিকি' এমন কি মোকতার, টপনো, সবাই চলে এলো। মাটি পূজা করে যে যার আল কাটা শুরু করেছে। আমি সবার কাছে গিয়ে দু-চার ঘা কোদাল মেরে আসছি। এমন সময়—এদেশের যত দুষ্কর্ম ঐ দিকুদের কাছ থেকে শেখা। আপনাদের কাছ থেকে। রোগ। রোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে শালারা।' খালকো একটু উত্তেজিত আমি কিছু মনে করব কিনা—তার শ্রোতাকেই বাঁশ দিচ্ছে দেখো।

আমি তবু তাকে একটু উসকে দিতে বললাম—'নাগেনকে নেতা করেছে কে?'

'এরা ভেবেছেন নাকি? নাগেনকে নেতা করেছে আপনাদের সরকার।' সাফ জবাব খালকোর। কিন্তু এতক্ষণে একটা জবাব। সমস্তটাই বেশ বোঝে। তবু তার একটা প্রতিপক্ষ দরকার। 'কান্ডিল, রোমু—এরা আলাদা থাকলে নাগেন নিজেকে শক্তিশালী ভাববে। কি বুদ্ধি! কিছুতেই এককাট্টা হতে দেবে না। প্রজারা একদম ভাগ হয়ে গেলে রাজা ভাবে তার বিক্রম বাড়ল। বাঃ! এই করে আপনাদেরও বারোটা বেজেছে। জেনে শুনে সেটা আমাদের মধ্যে পাচার করে দেয়া কেন বাবু? ল্যাজ কাটা শেয়ালের গল্প মনে আছে?'

রাজেন বুঝতে পেরেছে যে খালকো তাকে পাত্তা দেবে না। সে এক মনে তার মোরগের গায়ে হাত বোলাচ্ছে। ঘাড়ের কাছে আলতো ছুঁয়ে পিঠের ওপর দিয়ে হাত পিছলে এনে একদম পিছনে হাতটা মুঠো করে চেপে দিচ্ছে। পুচ্ছ বলে কিছু নেই। একেবারে গোড়া থেকে কাটা। সেখানে মুঠোর জোর পড়তেই মোরগটা একটু এগিয়ে যেতে চাইছে। ঝুঁটিও সামান্য রেখে কেটে ফেলা হয়েছে। বাড়তি ওজন কমাবার ব্যবস্থা। বেশ বাজে দেখতে গুণ্ডামার্কা চেহারা। লালচে পালকের শেষভাগে কালো স্ট্রাইপ। এগিয়ে যাবার সময় ডান পা-টা সাংঘাতিক ভাবে তুলছে। পায়ের চারটে নখই খুলে যাচ্ছে তাতে। এখন পর্যন্ত রাজেনের সমস্ত কথাবার্তার আড়ালে তার ডান হাতটা মোরগটাকে সেই তখন থেকে এক নাগাড়ে বিরক্ত করে যাচ্ছে। মোরগটার পায়ে মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা রাজেনেরই পায়ের সাথে।

খালকো পরিষ্কার দুটো পক্ষ তৈরী করে ফেলেছে। আমরা আপনারা। ভারতবাসী যে এক, এ গর্ব যে আমাদের মহান করেছে, নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রস্তাব হয়েছে, এ্যান্টার্কটিকা, রাকেশ শর্মা,

এশিয়ার একমাত্র গণতন্ত্র—এসব কথাও ওর রাজনৈতিক মনে হবে। মেলার আনন্দ না কেচাইন হয়ে যায়। রোমান এরেনার বারান্দায় আরামচেয়ারে বসে মদ খেতে খেতে একটা আপসেট গ্ল্যাডিয়েটরের দিকভ্রান্তি নষ্টামি —ওঃ।

স্পার্টাকিউস!

এইখানে আমার মনে পড়ে যায়। সমস্ত তর্ক ভুলে আমি দেখতে থাকি খালকোকে। সে বলছিল—'ক্ষমা কিজিয়ে।' সে হিন্দীতেই বলছিল—'আমি এখানে আর থাকবো না ঠিক করেছি। আমার বোঝার ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। ওদের বোঝালাম—ওরা বুঝল কো-অপারেটিভ। আসলে তত বোঝেনি। নাহলে নাগেনের গুন্ডাদের দেখে সরে যেত না। আলাদা আলাদা হয়ে দুর্বল সবাই। এই ওদের ভাগ্য বোধ হয়। আমার মাথায় এই ভুল বোঝার দাগ দেখুন। অন্য কোথাও শুরু করতে হবে। কো-অপারেটিভ সফল করতে পারলে আদিবাসী আবার শক্ত হতে পারবে। একটা সাফল্য চাই। করবই কোথাও।'

লক্ষ্য করলাম, এক গাঁয়ের লোক হয়েও রাজেনের এসব কথায় আগ্রহ নেই। রাজেন তার মোরগকে ডাকছে না, কথা বলছে না। বোধ হয় কোন নামই দেয়নি, যন্ত্রবৎ ট্রেনিং দিয়েছে। এখনও উত্তেজিত করে চলেছে শান্ত মনে। একটা নাম ডাকলে তার সাথে মানুষের আবেগ এসে পড়বে। মায়া মমতা বা দুশমনি এসে পড়বে। মানুষমাফিক অনুভব-গুলো লড়াইয়ের অন্তরায় ভাবছে নাকি সে? মজা নেই স্পোর্টস নেই এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই একজনের ইচ্ছায় আর একজন করবে কেন? ওঃ জন! রোমান এরেনার কূপে একটা সন্ধ্যার মতো নেমে আসা তরবারি। ওপরে দর্শকের মুখে একটা নাম কত আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। স্পার্টাকিউস। নরবলি থেকে চালকুমড়ো পর্যন্ত পূজার ইতিহাস আর গ্ল্যাডিয়েটর থেকে মোরগ পর্যন্ত খেলার ইতিহাস আমাদের একই ভাবে এগিয়েছে। বাঃ!

এখন আবার সে একা ও আলাদা। ওর মুখে আর আমরা আসছে না। তাতে আমার আমার গর্ব কিছু পুনরুদ্ধার হচ্ছে না। তবে অন্ধকার এসে আগুন নেভায় এ আস্থায় স্বস্তি পাচ্ছি। ভুল, তা হোক। আপাতত খালকোর একাগ্রতা না বুঝলেও সুন্দর। তার ব্যর্থতাই তাকে নায়ক করে তুলছে। যেজন্য সুভাষ বোস এখনও আমাদের দেশের নায়ক।

স্পার্টাকিউস। সে সমস্ত দাস লড়াকুদের একত্র করতে চেয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে।

খালকোর কো-অপারেটিভের পাগলামি বিদেশী। এদেশের সাঁওতাল আদিবাসীরা বনজঙ্গল চেনে, চাষ চেনে না। খাবার দাবার রহস-সহন শিক্ষা-দীক্ষা—ভিক্ষার মতো পাওয়া মিশনারীদের এসব তো আর এক সভ্যতার এঁটোকাঁটা। খালকো রুর‍্যাল ইকনমিক পরীক্ষা চালাতে গেছে এই মানুষদের কাছে যারা সিধু কানু বিরসার গল্প ধুয়ে জল খাচ্ছে আজ দেড়শ বছর। হাতটা খালি হতে একটা সিগারেট ধরালাম। আমি তাহলে ভাবলাম যে খালকো এখানে ফেরার আগেই পাগল ছিল। নাগেন সারিং-এর চোট খেয়ে পাগল হয়েছে সে কথাটা গল্প?

'খালকো ভাইয়া। এই মুর্গাটার একটা নাম দিন তো। ওকে নামটা চিনিয়ে দিই। যখন লড়বে, তখন নাম ধরে ডাকলে উৎসাহ পাবে। খেলার মাঠে দেখেন নি—'আবে শালা বিদেশ, এগো বে।' আমি খালকো ভাইয়া বলি। সে বোধ হয় ভাবে আমি রাজেনের মজার পিঠে কথা বলছি। এর'ম চোখে তাকায়।

'নাম ধরে ডাকলে জানোয়ার আপনার কাছে চলে আসবে। লড়বে না। আপনার খুনী আনন্দটা বুঝবে না। তাই চান?' খালকো বলে। আমি একদৃষ্টে চেয়ে থাকি তার দিকে। লম্বাটে চুল, কপাল চওড়া। নাক চিবুক ঠোঁট—যেমন হয় এদের। সারা শরীরে, হাতের থাবায়, হাঁটু থেকে খোলা পায়ে একটা আমিষ তেজ। চোখ দুটো তবু শান্ত। উত্তেজনায়, বিষণ্ণতায় সমান শান্ত। খালকোকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। একটা লড়াইয়ে মার খাওয়া লোক আবার নতুন লড়াই চাইছে। ডাকি খুব ধীরে —'জিন্দাবাদ খালকো, খালকো।'

খালকো উঠে চলে গেল। উইন্ডচিটারের পিঠে লেখা 'উইন'। চলে গেল নদীর যেখানটা ফাঁকা সেই দিকে। মুখ ছিল হার না মানা শান্ত— স্বপ্নের উল্টোদিকে হাঁটা গ্ল্যাডিয়েটর। সাদা ধবধবে কম্বলের ওপর একট লাল ফোঁটা দিয়ে গেল।

একটা নাম ছাড়া কিভাবে আমি জিতব বুঝতে পারছি না। আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রাজেনকে এলাও করব না বারোটার খেলায়। একজন বক্সার, কুস্তিগীর, ফুটবলার বা গ্ল্যাডিয়েটরের নাম থাকবে না? একজন মাতাদোর যখন ক্ষেপিয়ে তোলা একটা ষাঁড়ের একেবারে চুমুর দূরত্বে তখন

কেউ কেউ ষাঁড়ের বা মাতাদোরের নাম চেঁচিয়ে শিউরে উঠবে না ? ওঃ, আমার যদি থাকত একটা মোরগ—আমি তাকে বাংলায় শেখাতাম এগিয়ে যেতে, পালিয়ে যেতে। নাম ধরে ডেকে উঠতাম ভোরবেলা, তাকে অবাক করা ঘুম ভাঙ্গাতাম। লেলিয়ে বলতাম—'গলায় পোঁচ মার গাধা, দেরীতে লাফিয়ে গলায়, যখন দুশমনটা লাফ থেকে নেমে পড়ছে, যখন তার পতন রোধে নজর'—গলার নিচেই ভেইনটা চিনিয়ে দিতাম। খালকো এর একটা নাম দিয়ে গেল না। কো-অপারেটিভের দুঃস্বপ্নের কাছে মোরগ লড়াইয়ের ব্যাপারটা নিতান্ত বালখিল্য মনে হল তার।

'আপনাকে ও পছন্দ করল না। সহানুভূতি দেখালেন না তো, কিছু জানতে চাইলেন না।' রাজেন সাউ এতক্ষণে সবাক হল—'খালকো আমাদের গ্রামের লোক হয়েও আলাদা। মাথা ফাটার সময় ব্রেনে চোট লেগেছিল।' ব্রেনে চোট লাগার কথা, পাগলামি—আমার বিশ্বাস হল না। তাই রাজেনকে কিছু বললাম না। আমি দৃশ্যটা দেখে কেঁপে উঠলাম। কোদাল হাতে লড়াই না দেওয়া ঘাম ক্লান্ত এক নির্ভীক অভিমন্যুকে ঘিরে লাঠি ফর্সা হাতে উদ্যত সপ্তরথী—সুনাবেড়ার মাঠে একটা সূর্যাস্ত রং, ক্ষীরার জলে কাঁপন লাগানো একটা খুন খুন শব্দ—মার খাওয়া কোণ ঠাসা একজন আহত গ্ল্যাডিয়েটর আমাকে হন্ট করছে—কিছুতেই ছবিটাকে নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না, প্রায় অবশেসনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

খালকো চলে যাবার পরেই যেন এতক্ষণে রাজেন দুষ্টু হতে পারল। মুণ্ডারিকে বলল—'দে দে দিয়ে যা। যা আছে তোর। কিরে, বাবুর সঙ্গে যাবি নাকি ?' মুণ্ডারি বিচিত্র ভাষায় কিছু কথা বলে হেসে। রাজেন বলে—'দেখ ভেবে, বাবু খুব ভালবাসতে পারে। দিল দরিয়া-দরাজ।' মেয়েটা ডান হাত তুলে ডান নাকের পাতায় হাত দিয়ে হাসে। এরপর প্রায়ই দেখি সে এটা করে। 'দাদা, জোগাড় হয়ে গেল, উঠুন।' রাজেন খুব খুশি।

'দাঁড়াও, বারোটা বাজুক।' মুণ্ডারি অর নো মুণ্ডারি—ওই সাদা কম্বলটা আমার চাই। সেই সাদা কম্বল পাতা এক ফুলবিছানায়—আমি যদি রাজেন সাউকে এখন ভারুয়া বলি তো সে রাগ করবে না। এসব তার একতরফা খাতির। রাজেন এই সুনাবেড়ার লোক। সে না থাকলে আমার এখানে আসাও তো হত না। লোকে মেলা থেকে কত কি কিনছে।

মেয়ে মানুষ নতুন কি। ওরকম সাদা কম্বল যে আমি পৃথিবী পেরোবার পর এই সুনাবেড়ায় দেখতে পাবো—

রাস্তার ধার থেকে ধামসার শব্দ ভেসে আসছে। মোটর সাইকেলটার পাম্প টাম্প কেউ খুলে না দেয়। কম্বলের সাথে গ্ল্যাডিয়েটারের কি সম্পর্ক কি জানি। রোদের তেজ কম। মাঝে মাঝে দু চারটে মেঘের টুকরো ভেসে যাচ্ছে! চিত হয়ে শুয়ে আকাশে তাকালে মেঘ থেকেই কত গল্প ছবি যে তৈরি হতে পারে। আর এক রাউন্ড রসির শেষে শুয়ে পড়লাম। মেঘকে হাঁস মনে হতে পারে। কম্বলটাকেও তো হাঁস মনে হতে পারে—হো হো মুন্ডারি ই-ই-ই—মুন্ডারি নাকের পাতা ছুঁয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে—কথা বলতে গিয়ে জিভ ভারী লাগছিল অনেক্ষণ। 'মুন্ডারি, লটারিতে তুই ফার্ষ্ট হবি। তোকে ফার্ষ্ট করবই—তোর নাম না উঠলেও প্রাইজ দেবো। শাড়ি সায়া জামা—কত সাইজ মুন্ডারি—রাজেন সাউ—এ শালা রাজেন—মুন্ডারির প্রাইজের জামাকাপড় যেন দোকানে পাওয়া যায়—ওকে নিয়ে দোকান ঘুরিয়ে ওর পছন্দ দেখে নাও। যাও খুকী—যাও। ভয় কি?' নরম মাটিতে আমি শুয়ে পড়ি।

মাথা বাঁকানো তীক্ষ্ম দুধার চাকু সুদ্ধ লাথি যেন এগিয়ে এল। দুটো মোরগ দুহাত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুখোমুখি। দুটোরই দুই পায়ে এক একটা চাকু। এমনিতে মনে হবে দুটোই সমান তেজী, কেউ কাউকে ছেড়ে দেবে না—যে কোনটাই জিততে পারে—আমাকে তো দেখতে হবে তাদের মুখ—মুখের আতঙ্ক—কে হারছে তা আমাকে চিনে নিতে হবে প্রথম নজরেই—এতো লেখাই থাকে মুখে। নাহলে কম্বলটা পাবো কি করে? বাজী বাড়াবো কি করে? মোরগের মুখ! ওষুধ খাওয়ানো অভুক্ত রাগিয়ে তোলা মোরগের মুখ।

রাজেনের মোরগের মুখের দিকে তাকালাম। চোখ দুটো ভাঁটার মতো লাল। সকাল থেকে কিছু খাবার দেওয়া হয়নি। এখনও মাটিতে মুখ নামাতে পারছে না। অনবরত পিঠের ওপর দিয়ে একটা হাত সরে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যখন চোখে আমার ঘোর লাগছে, তার ঠিক আগে ভয় করলাম—এই মোরগটার মুখে কোন ভাবলেশ নেই। কোন রাগ বা ক্ষিদে নেই। নেই কোন চঞ্চলতা। ঐ যে ডান পা-টা নখ মেলে তুলে ধরছে মিনিটে একবার—তা অন্য পায়ে সুতো বাঁধা বলেই। রাজেনকে বলি—'তুমি এই খুকীকে নিয়ে মেলায় ঘুরে বারোটা বাজিয়ে ফিরো।'

রাজেন ওঠে। 'আমার মুর্গাই আপনাকে জেতাবে দাদা। কেন ভাবছেন আনখাই। র'ন। আসছি ঘুরে।' সে মেয়েটার ব্যাপারে বড় উৎসাহী। লড়াইয়ের চেয়েও বেশী। যেজন্য তার আসা। রাজেন সুতো হাতে মোগরটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল যেভাবে একটা পেট-কে নিয়ে যায়। সুন্দরী তরুণীর সাথে মেলায় ঘুরতে হলে মোরগকে বুকে জাপটে ধরা চলে না। আমি শুয়ে শুয়ে মেঘ দেখছিলাম।

সকালে বৃষ্টি পড়েছিল। এখন রোদ এসে মেঘগুলো সরিয়ে দিচ্ছে, ভেঙ্গে দিচ্ছে। টুকরোগুলো এক একটা বা এক ফাইল হাঁস মনে হয়, বা বক। হাঁসের দল থেকে দু একজন উড়তে উড়তে পাশ ফিরে দেখল। ডানার তালে হঠাৎ অমিল হওয়ায় শুধরে নিতে নিতে ফাইলে ফিরে গেল। হাঁস ওড়ে বড় নিশ্চুপ। ছোট মেঘরাও। ওরা কেউ আকাশে কথা বলে না। মেঘের কোন ফাইল নেই আজ। বড় মেঘে ঢুকে যেতে পারলে যেন বাঁচে টুকরোগুলো। আজ হাঁসরা চওড়া বরফির প্যাটার্নে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সবচেয়ে পিছনের হাঁসটা পিছিয়ে পড়ল। পিছিয়ে ওটা সিসের মত পড়ে যাচ্ছে। পিছনের একটা শূন্যস্থান হাঁসরা টের পেল না। মেঘেরা টের পেল না কারো কারো হালকা হাওয়ায় মিশে যাওয়া।

মাটির দেয়ালে একটা কপাটহীন দেড় ফুটের জানালা। কাঠের শিক। প্রায়ান্ধকার ভেতর থেকে শিকে হাত রেখে খালকো দেখল হাঁসটা পড়ে যাচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে সে ছুট লাগাল। রাস্তা পেরোবার সময় ট্রাকের হর্ন পরোয়া করল না। মাঠ ক্ষেত নালা, উঁচু পাথরের ঢিবি। অনেকটা ছুটে আকন্দ ঝোপ পেরিয়ে। বিশরার সর্ষে ক্ষেত, আল। পরণে ফুলপ্যান্ট, পিঠে 'উইন' লেখা নীল উইণ্ডচিটার হলুদ গেঞ্জীর ওপর, খালি পা। পার্বণের ট্রাফিক ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় 'এই এই এই' শব্দ উপেক্ষা করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থামল হাঁসটার কাছে।

মুণ্ডারি ততক্ষণে তীরটা বার করে ফেলেছে। মেরুণ গর্তটাতে ফেনার বুজকুরি। খালকো বসে পড়ে হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরল। হাঁসের পা কদাকার। ডানা ঝাপটাতে চাইছে। সাদা ভেলভেটের ওপর লাল কলুষ। খোলা চোখ। গলাটা লম্বায় ছোট হয়ে আসছে। হাঁসমুখে ব্যথার বর্ণনা খালকো চেনে না। ঘাস তখনও ভেজা, মাটি নরম। মুণ্ডারি তীরটা ভেজা ঘাসের ওপর মুছতে মুছতে বলল—'জোরে চেপে ধর খালকো। খুন ঝরে গেলে মাংস পানসে হয়ে যাবে।'

গলা কেটে পালক ছাড়ানো হয়েছে। শিরায় শিরায় রক্ত জ'মে লাল মজ্জা, হাল্কা গৈরিক রঙের মাংস টুকরো কেটে মশলা মেখে, নুন লেবুর রস লংকা গুঁড়ো, বড় শালপাতায় মুড়ে কাঠি দিয়ে বন্ধ করে কাঠকয়লার আগুনে সাজানো হচ্ছে যেভাবে লিট্টি সাজায়। আগুনের তাতে পাতা জল ছেড়ে পুড়ে সেঁটে বসবে মাংসে। মাংসে গরম লাগলে জল বেরোবে। শালপাতা কালো হয়ে যাবে না। একটু রেগে যাওয়া লালচে হয়ে ধোঁয়া ছাড়তেই থাকবে। মুণ্ডরির গা থেকে যেমন সকালের ধোঁয়া—গা গরম বলেই তো ওপরের সোঁদা ভাবটা ধোঁয়া হয়ে ছেড়ে যাচ্ছে। চকচকে চুল টেনে মাথায় ফুল খোঁপা, শাড়িটা জমাটি ; টেনে সাপটে পড়া, যৌবন। হু হু করে মাটি মাড়ানো বাস চলে যাচ্ছে বড়াগাঁও-এর দিকে—উল্টোমুখি একটা মোটর সাইকেলে সাঁ-সাঁ হাওয়া—মুণ্ডরির চোখে আমিষ লোভে—খালকো কেঁপে উঠে মুণ্ডরির কাঁধে হাত রাখল।

পার্বণ মানে তুষু, ক্ষীরার উল্টো দিকের পাহাড়ে উঠলে দেখা যাবে গোটা এলাকাটার পাখি দৃশ্য। খাতার সবুজ পাতায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতে টানা পাঁচটা রঙীন লাইন সব দিক থেকে এসে মিলেছে ঘাটে। কোন রকমে ঘাট ছুঁয়ে শুয়ে আছে ক্ষীরার গেরুয়া। নালা বই নয়। এই ওদের নদী—ক্ষীরা। গাঢ় বর্ষার দু-একদিন ছাড়া বছরভোর হাঁটুজলও নেই। শীতে জায়গায় জায়গায় ক্ষীরার ওপর লংজাম্প কম্পিটিশন বসে ছেলেদের। দু-একজন পেরেও যায়। বুড়োরা গাল দেয়। মানুষ ডিঙ্গোলে যেমন, নদী ডিঙ্গোলেও তেমনি শুকিয়ে যায়। নাস্তিক ছেলেগুলোর জন্যই এই দেশ গাঁ দিন দিন হাড়-হাভাতে হয়ে যাচ্ছে। বন ফুরোচ্ছে। বনের ঝগড়া বেড়েই যাচ্ছে। ছোটলোকে রাজা হলে যেমন হাতির পাঁচ পা দেখে—নাগেন সারিং যেমন লিডার হয়ে ভেক নিয়েছে—বারো মাস হেটো ধুতি আর চাদর মাত্র গায়ে—কলমটা চাদরে গোঁজা। বাবু মোগল হয়েছো, হারেম রেখেছো, টাটাতে কলোনি করে ট্যাক্সো নিচ্ছ—আমরা কি জানি না এসব? হাতা পেরোলেই ঘর ভুলবে পোড়ো ছেলেগুলো—ফিরে এসে বুড়োবুড়ির পোঁদে আগুন দেবার কথাও মনে থাকবে না। যাবার আগে নদীটা আরো শুকনো করে দিয়ে যাবার দরকার কি বাপ? যা ভাগ শালারা।

তা এটুকু ক্ষীরারও জায়গায় জায়গায় কেটে এক একটা হাফ পুকুর। জল এসে খানিকটা একপাশে সরে দাঁড়ায়। খানিকটা সোজা বেরিয়ে যায়।

ঐ সরে দাঁড়ানো জল তুলে নেবার জন্য কোথাও গ্রামের তৈরী রহট, কোথাও ছেঁচা ডোঙ্গা বসানো। এভাবে দুপাশে কিছুটা ক্ষেত—বিশরার সর্ষে, কান্ডলের ধান, মোকতারের আকাড়া পোনে চার বিঘে। মোকতার নাকি তার কাঁড়াটা বকরিদের সময় বিক্রী করেছে লোভে পড়ে। বড় জানোয়ারের মধ্যে এখন তার খাসিগুলো। মোকতার দুই ছেলের সঙ্গে তুষু নাচছে। একটা মূর্তির চারপাশে অনেকের সাথে সেও উদ্বাহু। ঘেমে নেয়ে একশা, পোষ মাস কোন ব্যাপারই না। রাজেন সাউ খিক খিক করে হেসে মোকতারকে বলে—'ও মোকতার, একটা ছোট হাল দেখি তোমার খাসির মাপে—মাত্র তো পোনে চার বিঘে, কি বল? কামিং বকরিদের আগে খাসি-গুলোকে কাজে নামিয়ে দাও।' নাচতে নাচতেই মোকতার জবাব দেয়—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কাঁধের মাপে হলেই চলবে। মাগি নিয়ে ঘুরে চতুর হয়েছো। মালটা কে? সাউ?' তার ছেলেরা বাজনার তোড়ে কথা শুনতে পায় না। মোরগটা দেখে হাসে।

চাষবাস সামান্যই। জায়গা কোথায়? তবে চাষের আগে দিতে হবে আল, তফাৎ করতে হবে প্রতিবেশীকে, সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাওয়া ভাইকে—আমারটা আমার, তোমারটা তোমার। আল নামের শারীরিক বেড়াগুলো ভেঙ্গে ফেলে কো-অপারেটিভ করতে আসা খালকো মার খেয়েছে প্রচুর। এ যেন দেয়াল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ঘর বড় করা সহবাস কমিউনিটি। অথচ মানুষকে তো প্রাইভেসি শেখাতে হবে—শোনাতে হবে আলাদা ছোট-ছোট-ছোট হয়ে যাওয়া। মানুষকে স্ববৃত্তের স্বার্থ শেখানো তো মানুষেরই স্বার্থে। সেখানে হঠাৎ একটা লোক এসে বেড়া ভেঙ্গে দিতে চায়, বিরাদরিকে শেখায় বালক বয়সের কথা—তাকে তো আটকানোই উচিত। নয় কি? মারের জন্যই কি না কে জানে—খালকো তারপর থেকে পাগলের মত ব্যবহার করে। কু-লোকে বলে পাগল হয়েই ফিরেছিল। এটা শিখিয়েছিল নাগেন সারিং। সে এসে ভেঙ্গে দেয় কো-অপারেটিভ।

খালকোর হাতকে খামচানি ভেবে প্রথমে রেগে উঠতে চাইল মুন্ডরি। সেও জানে পাগলামির গল্প। আদিবাসী মেয়ে নিজের খাই নিজে কামায়। তার চাই একটা শক্ত পিষে ফেলার মত বাহুপাশ যা নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে। হাজার আশনাই কোন মেয়ের ভাল লাগে না—ওটা মিছে কথা। খালকো শক্ত আছে। তার থাবাতে একটা হালুম। হাসব কি? যদি সত্যিই পাগল হয়? চোখ তো ঠান্ডা। তাহলে হাসি?

খানিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে বোঝা যাবে লাইনগুলো কাঁপছে। কেন্দ্রমুখী ঘন হচ্ছে রঙে। ওঃ, কেন্দ্র। ওই নদীকাটা জলাগুলোর একটা। যে কোন একটা নয়। ওই বিশেষ একটা। ওপাশের পাহাড় থেকে হঠাৎ এগিয়ে আসা বিশাল একটা সাদা পাথর জলের গায়ে। জলের ছায়া দেখে চমকে চিনতে হয় পাথরটার আলাদা দাঁড়ানো, সাদা মসৃণতা ঠান্ডা লাগালো আমার ছবিতে। যে আমি দাঁড়িয়ে আছি অপসৃয়মান একনায়কের স্বপ্নগুলোর পাশে, হাওয়ায় ফুলে ওঠা একটা নীল উইন্ডচিটার আমাকে বিব্রত করে গেল। মুন্ডারির হাসি একটা চটা ডাস্টার। মুছেও মুছছে না, টানছে না। জলাটার কোন জল ছেঁচা জোগাড় নেই। পাশে একটা ছেঁড়া মাঠ। মাঠে অনেক লোকজন। ওপর থেকে শুধু কালোবিন্দু একগোছা হঠাৎ সবুজের মাঝে। পৌষ মাসে পৃথিবীর সবুজ। তায় সকালে বৃষ্টি পড়ে ঠান্ডা চকচকে।

আর একটু মনযোগ দিলে একটা সুরও পাওয়া যাবে শুনতে পাহাড়ের মাথা থেকে বেশ করুণ লাগে। সেই বাচ্চার ড্রইং খাতায় সুরটা গেঁথে দেবার কোন উপায় নেই। শুধু নাম দেওয়া চলে—করুণ সুরে সমবেত পৃথিবী। স্বাভাবিক যে পৌষ সংক্রান্তিতে তুষু মাথায় মানুষজন চলেছে বিসর্জনের লাইনে নেচে গেয়ে। তাদের পাশে দাঁড়ালে আনন্দ উল্লাসই চোখে পড়বে। নতুন কাপড়। প্রায়ই আকণ্ঠ রসি মহুয়া। নতুন মহুয়া আসা পর্যন্ত পুরনো স্টকে জল আর ধুতরা দিয়ে। এ গাঁয়ে গাঁয়ে : মহুয়া সিজনাল হলেও তাই অবাক হবার কিছু নেই।

জগন্নাথ টুডু, গোঁসাই টুডু, সুরেশ করিয়ালের তুষুগান মুখে মুখে। ছেলে মেয়ে বয়সে তফাৎ নেই। নাচতে নাচতে ছন্নছাড়া দিশাহারা—সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট বড় রথ বেরথ তুষু চলেছেন ঘাড়ে মাথায়। মুখ বিসর্জনের দিকে। চোখের জল হাসি গান কান্না কোন অবাক নেই। নতুন ছোকরারা বচ্চনের চুল, কপালে তেল সিঁদুর, লাল ফিতের ফেট্টি, সার্টপ্যান্ট—ফিলমী নাচ, খ্যামটা নাচ, মেয়ে পটানো নাচ—এসব শহরের বাবুদের দুর্গো পুজো কালী পুজো এমন কি গণেশ মাইকি জয় থেকে শেখা—শিখে খুব গর্ব। একমাত্র দুঃখ গানগুলো আনন্দ বকশীর না হয়ে জগন্নাথ টুডুর। আর হতে পারে রসি রোচেনা, পাক্কির দাম বেড়ে পুরো মজা খিঁচড়ে যাচ্ছে। ঘাটের কাছে তুষুকে মাটিতে নামিয়ে একটু জিরিয়ে—তারপর সেই ঘুরেফিরে নাচ আর গান। এখন তুষু চলে যাচ্ছে, বেদনার

গান। 'আবার এসো' বলে—ঝপাং। রাজকুমারী তুষু আত্মহত্যা করেছিল গাঙের জলে। কত দল এসেছে—আসছেই। ঝপাং ঝপাং শব্দ উঠেই যাচ্ছে। দিনের শেষে ভরে উঠবে জলা।

বিসর্জনে যাবে ঠিক করে হেসে উঠল মুণ্ডারি। হাতে তীর। পায়ের কাছে এখনো মরেনি হাঁসটা।

খালকো বলে—'মুণ্ডারি।'

আবেশে মুণ্ডারি বলে—'হু''।

ছেলেটা—'মুণ্ডারি। যা চাইব দিবি ?'

পুলকিত মেয়েটা—'হু''।

লোকটা—'হাঁসটা আমাকে দে। আমি বাঁচাবো। পুষবো।'

মুণ্ডারি বিশ্বাস করতে পারে না কথাগুলো। কোন মতেই বুঝে উঠতে পারে না উৎসব আর উৎসবহীনতা। বিসর্জনের জল কোথায় ? শরীরের জোয়ার কে থামাবে জংলীচাঁদ ? প্রচণ্ড গতির ওপর ব্রেক কষার একটা প্রচণ্ড ওলটপালট চলছে মনে। 'যা সর। তীরটা যার হাঁস তার। কাণ্ডিল কাকা হাঁসের জন্য বসে আছে। সর।'

খালকো—'হাঁসটা দে আমাকে। কাণ্ডিলকে বল পাসনি।' সে সিরিয়াস।

মুণ্ডারি—'মিথ্যা বলব ? সত্যিটা বুঝলি না—মিথ্যা শিখাচ্ছিস ? সে ভাবে—মরদ হলে আমাকে পোষ মানা। আমিও বহু ঘা খাওয়া, পোষ মানলে কোল ভরে দিতাম। হাঁসটা ডিম ছাড়া কি দেবে তোকে ? পাগলা, হট্।

এই হয়েছে। কোন কথা বলে—কারো সাথে মেলে না। এদের নতুন মনে হয়। গাছ কাটলে গাছ লাগাও। নতুন। কোঅপারেটিভ করো—নতুন। ভোট দিও না—নতুন। জানোয়ার শখে মেরোনা—নাকি খালকো রাঁচী থেকে পাগল হয়ে এসেছে। মুণ্ডার বেটা সে। তা শুধু রক্তের। লেখাপড়া না জানার গরিবী হটাবে বলেই না দুনিয়া ঘুরে এসেছে। দেশে এসেছে উদ্ধার করতে। তুষু করার এমনই চোট যে জাতধর্ম নাই কারো। সব তুষু করছে। দেবতাদের চেয়ে এও ভাল। তুষু দেবতা না। কিন্তু একথা বললেও পাগল। শেষ পর্যন্ত একটা মেয়ের কাছেও পাগল সেজে থাকবে ? হাঁস চাওয়াটা মুণ্ডারি বুঝতেই পারছে না। এদেশে আর কিছু হবে না। চাইবাসা বা অন্য শহরে চলে যাবে খালকো। মুণ্ডারিকে তুলে নিয়ে যাবে

না কি ? মেয়েটা পাগলামি চায় না। চালাকি চায়। দেখতে চায় বিদেশে ঘুরে কেমন হিরো হয়েছে জংলীচাঁদ। নাগেনের লোক যেখানটায় ফর্সা মেরেছিল সেখানটা এখন আবার চিনচিন করে উঠল। এক হাতে কপাল টিপে ধরে এক হাত কালো দুটো জোড়া হাঁসের দিকে তুলে দিল সে। মুন্ডারি খিলখিল করে হেসে উঠল।

একটা লাল ঝুঁটিওলা সাদা পাথরের পাশে রেগে উঠল একটা নিরীহ তীর। কেউ গেয়ে উঠল—'চল তুষু সিনানে যাবো।' মুন্ডারি শরীরটাকে পিছনের দিকে বেঁকিয়ে একটা ধনুক করে তুলতে পারে এখন। তাই করল সে কিন্তু শুয়ে শুয়ে। বারবার ধনুক হয়ে তার নিঃসীম তীর যোজন ইচ্ছা। সে মনে মনে আউড়ায়—জংলীচাঁদ আর তো কটা দিন। আল কেটে বরাবর করে দেবার জেদ তোমার ? কোদাল চালাও তো বাঘা। তছনছ করে দাও মাঠগুলো। আমার তো প্রায় কোঅপারেটিভের জীবন। এখন বুকে একটা হালুম দাও। তলপেটে একটা। উরুতে। উঃ উঃ উঃ। খালকো খালকো। শেষ হয়ে যাবার আগে আমি জেনে নিই কেমন ছিল খালকোর তেজগুলো। খালকোর প্রচণ্ড পেষণে কাদা নিস্তেজ এলিয়ে পড়ে মুণ্ডারি ভাবল—কেউ কোন দিন জানবে না—খালকোর প্রেমেও ছিল পাগলামি। শুধু আমি জানব। কিন্তু এ জানার কি মানে যা আমি কোনদিন কাউকে বলতে পারবো না। বললে তো ওরা আমাকেও—

মুণ্ডারি কেঁপে ওঠে। খালকো পেটের ওপর আড়াআড়ি হাতে সেটা টের পায়। মাথা তুলে চোখে জিজ্ঞাসা করে। মুণ্ডারি খালকোর হাতে তার মাটি কাঠ ছানা কর্কশ হাত বোলাতে বোলাতে ফিক করে হেসে বলে—'মরদ'। সে কি আর বলতে পারে—তোর চেয়ে বড় দেখিনি। সবাই সব কিছু জানলেও বলতে নেই।

মুণ্ডারি—'হাঁস নিবি না ?'

খালকো—'কালকে।'

মুণ্ডারি—'আর কালকে।'

রোজ কাল হয় রোজ একটা দিন কমে যায়। মুণ্ডারি গোণে। সাত ছয় তিন দুই—

'ব্যাস ব্যাস এই আমার বাড়ী। রোককে রোককে।' প্রায় চেঁচাতে হয় রাজেনকে। আমি ঝপ করে ব্রেক কষি মোটর সাইকেলে। পিছনে

সুনাবেড়ার রাজেন সাউ। আমার সঙ্গী বা আমি তার। থামতেই ডজন খানেক ছোকরা ঘিরে দাঁড়ালো। সঙ্গে কিছু বাচ্চা অতি অবশ্য। কে যে মাল খায়নি বোঝা ভার। একজনের গলায় ঝুলছে একটা ধামসা। গায়ে শুধু গেঞ্জী হাফ প্যাণ্ট। ঘাম। মাঘের শীত বাঘের গায়ে কেউ বলেছিল কি ?

'কি ব্যাপার'—রাজেন জিজ্ঞাসা করে।

'চাঁদা চাই চাঁদা।'

বুকে চেপে ধরা মোরগটাকে সামলাতে সামলাতে রাজেন বলে—'দিয়ে দিন কিছু। সেটাই জলদি রেহাই-এর পথ।' দশ টাকা বাড়িয়ে ধরে বলি—'বাইকটা এখানে রাখবো। কিছু হবে না তো ?' উত্তরটা ভুলে যাওয়া ভালো। ধামসায় দুটো লাঠি পড়ল। একজন একটা চোঙ্গা নিয়ে বলতে শুরু করল—

'সুখবর সুখবর, মুর্গাপাড়া। আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের মত এবছরও চোদ্দই জানুয়ারী শুক্রবার তুষু পরবের শুভ অবসরে ক্ষীরার মাঠে মুর্গাপাড়ার সাথে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। ১০টায় প্রথম বাজী মুর্গা বিজেতাকে একটা খাসি দেওয়া হবে। ১২ টায় দ্বিতীয় বাজী মুর্গা বিজেতাকে একটি কম্বল····১টায় ২টায়····ভেড়া টেবিল ঘড়ি বেবি সাইকেল ট্রাঞ্জিস্টর সার্ট প্যাণ্ট গেঞ্জি শাড়ি সায়া জামা····হাঁড়িয়া বিক্রেতা মহিলাদের লটারীতে শাড়ী সায়া জামা দেওয়া হবে-এ-এ-।' বহুক্ষণ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করে বক্তৃতা চলল। বক্তার দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট শুনছিল রাজেনের মোরগ। রাজেন বলল—'দশটা অলরেডি বেজে গেছে দাদা। অন্ততঃ একটা গেঞ্জী লস হল। হারলেও লাভ। দশটা টাকা উসুল হত।'

রাজেনের বাড়ীর ছায়ায় মোটর বাইক লক করে রাস্তা পেরিয়ে মাঠে নেমে এলাম। রাজেন আগে ভাগেই হেরে যাবার কথা চিন্তা করে রাখছে। আসার আগে তো এমন ভেঁজেছিল যেন সমস্ত প্রাইজ ও-ই নিয়ে যাবে। মোরগ লড়াইয়ের জায়গায় ভিড় বেশী নেই। বারোটার দেরী আছে। পেছনে চিমটি কেটে মোরগকে তাতানো হচ্ছে এখন। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সবগুলোই হারবে। মরে যাবে। সেই ভয়ে সিটিয়ে আছে সবাই। একজন ছুরিতে শান দিচ্ছে। একটা মোরগকে ঠোঁটে ঠোক্কর মেরে লাথি মারতে বলা হচ্ছে। তার পা আর উঠছে না। গ্ল্যাডিয়েটর দেখিনি

গল্পের বাইরে। কুস্তি বক্সিং এমন কি ভেড়ার লড়াইও হার জিতের লড়াই। মরণপণ নয়। বারোটার ফর্সা মোরগ কাউকে একটা কম্বল জিতিয়ে দেবে শুধু। এসবের ঊর্ধ্বে রাজেনের কোলে নির্ভীক বা বিরক্ত এক জানোয়ার যে একই জাতের আর একটা লড়াকু জানোয়ারকে দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না। এ মোরগ কি জ্ঞানী? রাজেন সাউ-এর মোরগ তার মালিকের চেয়েও জ্ঞানী হবে কি করে?

তুষু বিসর্জনের পরে ক্ষীরার জলে হাত পা মুখ ধুয়েই তুষু পর্ব ভুলে যাচ্ছে সবাই। মেলা বসে গেছে মাঠ ঘিরে। কাতারে কাতারে লোক। দোকান থেকে দোকানে চকচকে মুখগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বেশীর ভাগই মাটিতে চট পেতে পসরা সাজানো। দু একজন চৌকি নিয়ে। একজন বেলুনওলা এন্তার গাল দিয়ে নিজেই বোর্ডে রাখা বেলুনের দুটো ফাটালো। ফাটানো যায় দেখিয়েই তো পয়সা টানা। হরেক মাল এক টাকার কাছে বেজায় ভিড়। মটকা শিঙ্গারা গুলগুল জিলিপি চুড়ি আলতা চিরুণি ফিতে—মেলায় যা থাকে আর কি। কেউ কেউ সোজা গিয়ে বসে যাচ্ছে শালপাতার দোনা হাতে রসির হাঁড়ির পাশে। মেয়েগুলো জল মেশাচ্ছে আর হাঁড়িয়া থেকে ছেনে তুলে নিচ্ছে এ্যালুমিনিয়াম বা কাঁসার বাটিতে করে রসি মেটে হাঁড়ি থেকে। দোনায় ঢেলে দিচ্ছে। এত লোককে ক্যাটার করতে হবে তো। হাঁড়িয়া নিয়ে বসেছেই জনা তিরিশ। বাটি পিছু আট আনা। ক্ষীরার জলে রসির রং প্রায় মেটে।

দেখে শুনে একটি মেয়ের সামনে বসি আমি আর রাজেন সাউ। মেয়েটি পাশের হাঁড়ি থেকে হাঁড়িতে জল ঢেলে ঘুঁটতে শুরু করে। তার শরীরে একটা বহুতাচ্ছা নড়ন দেখে বলি— 'ভাল করে মেয়ে। তোকেই লটারিতে ফার্স্ট করব দেখিস।' মেয়েটি হাসে। উৎসাহ পায়। ওর নাম ফেলি মুণ্ডারি। এই আমাদের মুণ্ডারি। রাজেন বলে....'দে দে। ভাল করে খাওয়ালে আরো বড় লটারি পাবি।' হাঁড়িয়া থিতোচ্ছে। পাশাপাশি লাইন দিয়ে বসেছে মেয়েগুলো। প্রায় একই পোষাক, প্রায় একই রকম দেখতে। কারো সাথে একটা বুড়ো বা বুড়ী হেলপার। মেয়ে মানুষ বেটাছেলে ছোকরারা ওদের সামনে বসেছে। জলের অভাবে বাসনের বদলে পাতার দোনাই প্রশস্ত। আমাকে বাবু টাইপের দেখে বোধ হয় আমাদের কাছে কেউ এল না আর। কেউ কেউ রাজেনের সাথে দু একটা কথা বলার চেষ্টায়। শুধু এক খালকো, আমার অভিমন্যু। বসেছিল আমাদের

কাছে। গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই যারা দেখত তারা একটা জানোয়ারকে হারতে দেখার উত্তেজনা পেতো। নির্মম ভীষণ ও অমোঘ শেষ আঘাতের জন্য কাতর আওয়াজ দিতো। আমার অভিমন্যু কোদাল নামিয়ে রাখে সপ্তরথীকে বাধা না দিয়ে তাকিয়ে থাকে নিশ্চিহ্ন জমির বিভাগে—আততায়ীর দারুণ ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে দেখে পৃথিবীর তারতম্য ঘুচিয়ে দেবার স্বপ্ন। আমার চোখ খুঁজতে থাকে খালকোকে—ভিড় সরিয়ে। সুনাবেড়ার খালকো কোথায় গেলে গো—

চোখ চলে যায় মেলার লোকজন সরিয়ে জলার ঘাটে, তুষু বিসর্জন হচ্ছে যেখানে। জনহীন সেই প্রান্তরের কোণে জলের ধারে একটি মেয়ে ফুসলে নিচ্ছে একটি ছেলেকে—বুক খোলা নীল উইন্ডচিটারের পিঠে লেখা উইন। একটি ছেলে এগিয়ে যাচ্ছে তার হাঁস উদ্ধারে যা মেয়েটির বুকের কাছে, যা তার বশীকরণ। একটা সাদা কম্বল মাটিতে শোয়ানো। দুহাতে দুটো হাঁস ধরে খালকো ভাবে এই আমি পাগল বটি। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। পালক তছনছ করা হাত ঠেলে বারবার হাতকে জাগিয়ে তোলে মুন্ডারি। ঝুঁকে পড়া খালকোর মুখে প্রেমের কোন অভিব্যক্তি আজ দেখে না। সে মরণপণ প্রেমকে ডাকে। দুহাত তুলে এক পাগলকে ঠেকাবার চেষ্টা করে। তবু চেঁচায় না।

আজ খালকোর শেষ। হপ্তা আগে প্ল্যান হয় নাগেনের বাড়ীতে। মদের ঝোঁকে যে কান্ডিল একথা বলে ফেলেছে তা কান্ডিলও জানে না। খালকো তার কেউ ছিল না। কোঅপটিবে তার কি আসে যায়? বরং কাকার হয়ে একাজ করে দিলে নাগেনের কাছে কাকার খাতির বেড়ে যাবে। নাগেন তাদের নেতা। নাগেনের শত্রু তাদের শত্রু। যেন মুন্ডারি টোপ হবেই এ আর কি কথা—এভাবেই তাকে বলা হয় আজকেই।

শুধু তারা জানত না মুন্ডারির স্বভাব। কি বা জানলেও ভাবতে পারেনি মুন্ডারির এত সাহস হবে। এমনিতে খালকো দেখতে জবরদস্ত। লোকটা তো যাবেই। চেখে নিলে কে জানতে পারবে। এভাবে মুন্ডারির হাঁস সাজানো, এভাবে মুন্ডারির তুষুর মহড়া। এ কদিনে একটা দুর্বলতা এসেছিল তার। সত্যি কথা, এত শক্তিশালী প্রেম সে আজ পর্যন্ত দেখেনি কোথাও। মনে মনে কি এই বাসনা গড়ে উঠছে খালকো বেঁচে গেলে হয়? না! এসব বাঁকা রাস্তার দরকার কি? দেখাই তো যাচ্ছে—খালকোর জোর তার পাগলামীর জন্য। কোন সুস্থ মানুষ কি এভাবে পিষে ফেলতে

পারে ? যে স্বাদে সে বারে বারেই বিভোর হয়েছিল ? খালকোর চোখের দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলে ওঠে

—'আজ শেষ খালকো আজ শেষ খালকো।'

খালকো মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়। বোঝার চেষ্টা করে যা শুনছে। মুণ্ডারি যেন মজা পেয়েছে। এক পাগলকে আটকাবার ওষুধ হঠাৎ আবিষ্কার করে— বারবার বলে—'আজ শেষ খালকো আজ শেষ খালকো।'

—'কি শেষ, কি বলছিস ?'

—'আজ শেষ খালকো আজ শেষ খালকো।'

—'মুণ্ডারি।' ভরাট গভীর স্বরে ডাকে খালকো। 'চল আমার সঙ্গে। কোঅপারেটিভ আমি করবই। অন্য কোথাও চলে যাবো। কুরু বা ঝুণ্ডুতে। সেখানে বোঝাবো দুজনে মিলে। তুই থাকলে ভাল লাগবে। চল।'

চোখে জল আসে। মুণ্ডারি প্রায় ভাঙ্গা গলায় বলতে থাকে মাথা নেড়ে 'আজ শেষ খালকো আজ শেষ খালকো আজ শেষ'—সে চোখ বন্ধ করে বলতে থাকে—আজ শেষ। দেখতে পায় না খালকোর দুহাতে বাতাস আঁকড়ে ধরার ছবি। বুঝতে পারে না কখন তার কথা থেমে গিয়েছিল।

রাজেন বলেছিল—জলার মধ্যে কাদা খুঁড়ে লাশ দুটো তোলা হয়েছিল। দুটো একসাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা। মাথা নেই। বোঝা যাচ্ছিল মুখোমুখি বাঁধা ন্যাংটা দুটো বেদনাপুংসক। একটি ছেলে একটি মেয়ে। মাথা পাওয়া যায়নি। সাদা চট্টানে রক্তের দাগ চেটেপুটে পরিষ্কার করেছিল শেয়ালরা। পুলিশের কুকুর এর চেয়ে বেশি বলতে পারেনি। ওটুকু জলে আদিবাসী মরে না। পুলিশ বিদায় করেছিল নাগেন।

একজন গ্ল্যাডিয়েটরকে কতভাবে রাগানো যায় ? তার বউ কেড়ে নাও, তাকে অভুক্ত না রেখে অপমানের রুটি দাও, ভেঙ্গে দাও শ্যাক, ফেরার পথ বন্ধ করে তাকে টিজ করো পাগল করে তোলো, তার হাতের সামনে দাও হাতিয়ারের সমস্ত চমক, আর দাও বিদ্রূপের বিরোধী আস্ফালন—এর ওপরে রেখো একটা ক্ষীণতম মুক্তির আলোপথ। একজন স্পার্টাকিউস কি চিরকাল জন্মে ? মজা দেখতে আসা মানুষরা প্রাণভরে 'মাগো' ডাকটা শোনার জন্য এসে বসে থাকে রোজ। স্পার্টাকিউস শতাব্দীতে একটি দুটি। ভুষুর লাইন এখনো আসছে নানাদিক থেকে নানা গ্রাম থেকে। ওদের নাচ গান দেখে আর ভাল লাগে না। স্পার্টাকিউসের কত জয়গান

শোনা হল। ভাল লাগে না কেন? সাদা কম্বলের ব্যাপারটাও বুঝতে পারছি না, কেন মনে ধরে আছে।

রসি খেতে খেতে শুনলাম রাজেন বলছে—'দাদা, মেয়েটা রাজী হয়েছে। কাপড়-টাপড় দেখে এলো, বলো তো ব্যবস্থা হয়।' দোনাটা ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে মোরগগুলোকে দেখলাম আবার। খুঁজতে চেষ্টা করলাম। মনে হল না একটাও জিতবে। লাল উইন লেখা সাদা কম্বল। সাদা হাঁসের বুকে উৎসর্গ মাফিক একটা সিঁদুর টিপ। দৃষ্টি আবছা, শালা গ্ল্যাডিয়েটার—কোন বাঞ্চোতের নাম খালকো—খাল খিঁচে নেবো শালা—এ মুর্গাপাড়া জ্বালিয়ে দেবো—একটাও জিতবে? হারাতে এনে কম্বল দেখাচ্ছো, এঁ্যা? —রাজেন, এই শালা রাজেন সাউ—আমাকে ধরিসনা শুয়োরের বাচ্চা—মেয়ে গছাচ্ছিস—এ্যাঁ, তুষু? এ্যাঁ, তুষু?

রাজেন সাউ আমাকে একটু নাড়িয়ে দিতে দেখি হাতে নতুন দোনায় রসি ঢালছে নিঃশ্বাসের দূরত্বে লটারি পাওয়া মুণ্ডহি—একটা বিচিত্র ফুলের গন্ধে দই মেশানো। 'রাজেন' আমি বলি—'তীরটা আমার পায়ে বেঁধে দে মাইরি—ওই হাঁস মারা তীরটা। বারোটার লড়াইয়ে কেউতো জিতবে, কাউকে তো জিততে হবে?'

মনে পড়ে ঘাটির অনেক ওপরের রাস্তা থেকে দেখা নিচের দৃশ্যে যে বালকের হাতের ড্রইং দেখেছিলাম তাতে ভেবে রাখা করুণ সুরটাই আসলে তুষুর। এসব কি হচ্ছে নাচ গান—হ্যাঁহে গ্ল্যাডিয়েটার। মেয়েটি আরো একটা নতুন পাত্র গুঁজে দিচ্ছে হাতে। নাকের ডান পাতায় ডান হাত বারবার চলে যাচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে।

বারোটার হুইসিল বাজলো নতুন বাজীর। অভিমন্যুর মুখটা স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম সাদা কম্বলটার দিকে। রাজেন বলেছিল—দুটো লাশই পাওয়া গিয়েছিল। বলুক। খালকোর লাশ হতে পারে না। ও শালা হেরে গেলেও হারে না। ওইতো বেটা মাঠে নেমে লাথি মেরে আল ভাঙছে। ভেঙে ছত্রাকার করে দিচ্ছে সুনাবেড়া। তার বিশাল হ্যাক্টোরি-মার্কা আওয়াজে কেঁপে উঠছে সুনাবেড়ার মাঠে তুষু মেলার আয়োজন। চোখে কোথায় স্বপ্ন? শুধু আগুনে ভাঁটার মতো চোখ—এই আমার অভিমন্যু। জয় বাবা অভিমন্যু, খালকো, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ওই কালো মুরগাটার ওপর পঁচিশ টাকা, তিরিশ, লড় শালা কালিয়া।

পূর্ণেন্দু পত্রী

শহর এবং শব্দ এবং সুবিমল

সুবিমল আজকাল, মানে বেশ কয়েকটা মাস, বাড়ি ফিরতে ভয় পায়। বাড়ি ফেরাটাই তার কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক। তার অন্য বন্ধুরা যখন শেষ টান দিয়ে হাতের সিগারেটটাকে আঙুলের টোকায় জ্বলন্ত হাউয়ের মতো ছুঁড়ে দেয় কলকাতার হাড়-পাঁজরের ভিতরের কোনোখানে, আর তারপরই পতাকার মতো হাত-নাড়ায় বন্ধুদের গুডনাইট জানিয়ে ট্রাম বা বাসের স্টপেজে নাচের ভঙ্গীতে শরীরে অদ্ভুত একটা একানো মোচড় দিয়ে দাঁড়ায়, সুবিমল ঈর্ষায় জ্বলে। বাড়ি ফেরার মুহূর্তে কী অসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে তারা। যেন জীবনে কোথাও কোনো টেনশন নেই। নেই এমন প্রশ্ন যা ঘরে ফেরার সময়ও থ্যাঁৎলানো মাটির মতো বাঁকিয়ে দিতে পারে তাদের মুখরেখা। কী বিস্ময়কর রকমের হাল্‌কা হয়ে যেতে পারে ওরা মাত্র তিন মিনিট আগে নিজেদের ঘাড়ে চাপানো পাহাড়-প্রমাণ সমস্যা-সংকটের ভিতরে ছট্‌ফটিয়েও। তিন মিনিট আগেও কত চৌচির হিসেব-নিকেশ, যা কখনো রাজনীতির, কখনো সাহিত্যের বা সংস্কৃতির কখনো বা সময়ের সাত-সতেরো আধি-ব্যাধির। তিন মিনিট আগেও চায়ের টেবিলে এমন শব্দময় চিৎকার, যুক্তিযুদ্ধ, যেন সভ্যতার যাবতীয় সংকটের চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত থামবে না কেউ। চায়ের টেবিলের সেই শব্দচুল্লী থেকে বেরিয়ে কেউ কেউ হাতের ছড়ানো মুঠোয় মাথার চুলগুলোকে গোছা করে টেনে ক্রমশ উপরে তুলতে তুলতে অসম্ভব ক্লান্ত ভঙ্গীতে বলে, এ্যাই, আমি কাটছি, বাড়িতে গিয়েই চার মগ জল মাথায় না ঢাললে মরে যাবো। সুবিমল মনে মনে মুষড়ে পড়ে সে-রকম দৃশ্যে। তার বাড়িতেও রয়েছে চৌবাচ্চা, বাথরুম, জল এবং ক্রমাগত আয়রন ছোপে লালচে হয়ে যাওয়া নীল মগ। কিন্তু সে কী পারবে মাথায় চার কিংবা ছয় দশ মগ জল ঢেলে সারাদিন ধরে মগজের স্তরে স্তরে জমে-ওঠা শব্দ, শব্দ, যা আসলে প্রশ্ন, শব্দ, যা আসলে তার এবং তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাত, শব্দ, যা আসলে জড়ো হয় তার

জীবন-পরিধির সমস্ত খানা-খন্দ, নদী-নালা, গুহা-গহ্বর থেকেই অবিরত, সেসব শব্দকে ধুয়ে-মুছে দিতে? ধুয়ে-মুছে দিতে চাইলেই কি তার মগজটা হয়ে যাবে শব্দের সংঘাতহীন এক ফুরফুরে গন্ধের বেল কিংবা যুঁইয়ের বাগান? হবে না। হয় না। সুবিমল জানে হবার নয়।

পরশু কফি-হাউসে অমরদা লিবিয়ান ঘটনাটা নিয়ে এমনভাবে ফেটে পড়লেন, যেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-মরণেরও সমস্যা অথচ কফি হাউস-এর আলো নিভে যাওয়ার মুহূর্তেই দোতলার সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে নামতে অন্য মানুষ। যেন পার্ট বলা শেষ। আর নাটকের চরিত্র নন তিনি, নিজের চরিত্র। এখন চলেছেন নিজের বাড়ি, মুখ থেকে অন্য চরিত্রের মেক-আপ্ তুলতে। অমরদা যেখানে থামেন, সুবিমলের ভাবনার সেইখান থেকে শুরু। অমরদার উত্তেজনার প্রত্যেকটি শব্দ সুবিমলের মগজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সে বাড়ি ফিরলেও, এই সব শব্দের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে নিস্তার নেই তার।

সুবীর, তার আপিসের কোলিগ, মাত্র কদিন আগে প্রথম হাবিব তানবিরের নাটক দেখে উন্মাদ। আর তার পরমুহূর্ত থেকেই সে কলকাতার নব-নাট্য আন্দোলনের মুগ্ধ দর্শক থেকে ক্ষুব্ধ সমালোচক। তার বিরক্তি-বিদ্রূপ এমনই ঝাঁঝালো যে, কলকাতার হালফিল নাট্য আন্দোলনের ধরন-ধারন সম্পর্কে ততখানি সহানুভূতিশীল না-হওয়া সত্ত্বেও সুবিমল সুবীরের বাড়াবাড়ি রকমের একপেশে মন্তব্যগুলোকে ঘা-মারার জন্যেই রুখে দাঁড়ায় প্রতিপক্ষ হিসাবে। তর্ক গড়ায়। কিন্তু সেই সুবীর অমন তুলকালাম তর্কের মাঝখানে হঠাৎ বান্ধবীর টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিতে ছুটে যায় যখন, যখন গলা নামিয়ে আর গলায় সুর এনে কথা বলে ঠোঁটের কোণে হাসির টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে, শিল্প বনাম বাস্তবতার সমস্যা থেকে তখন সে হাজার মাইল দূরে। সেটাই স্বাভাবিক। কোনো কোনো প্রহরে সাংস্কৃতিক সংকট যতোখানি বড়ো, কোনো কোনো প্রহরে টেলিফোনে বারবার অভিমান-অভিযোগ ঠিক ততোখানিই। এ রকমই তো হওয়া উচিত। কিন্তু সুবিমলের বেলায় তেমন ঘটে না। ঘটে না বলেই সে সর্বক্ষণ ভারাক্রান্ত। সর্বক্ষণ আতঙ্কগ্রস্ত।

তারও বান্ধবী আছে। আগামী বছরের গোড়ায় বিয়ে করবে যাকে।

তনুশ্রী। নামের মতন অপরূপা না হলেও যথেষ্ট সুন্দরী। কোনো বা চিত্র-পরিচালক ফিল্মের নায়িকাও করতে চেয়েছিলেন তাকে। রাজী হয়নি। তনুশ্রীর সঙ্গে সেও তো গল্প করে, আড্ডা দেয়, টেলিফোনে কত রকমের গোপনীয় কথা বলে। প্রায় তিন বছরের প্রগাঢ় প্রেম তাদের। তবুও তনুশ্রীর হাসি, তনুশ্রীর ভালোবাসা, তনুশ্রীর হাতের-মুখের-বুকের ছোঁয়াকেও সুবিমল ব্যবহার করতে পারে না ডাস্টারের মতো, যা দিয়ে মন থেকে মুছে-ঘষে সাফ করে দেবে আগের যাবতীয় প্রশ্নময় উচ্চারণ, যাবতীয় সমস্যাসঙ্কুল শব্দ। তনুশ্রী শুধু পারে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিতে।

আবার তনুশ্রীও জোগান দেয় অন্য শব্দ, অন্য বাক্য-চাপ। গতকাল সন্ধের মুখে কাফে-ডি-মণিকোয় বসেছিল তারা অন্য আর দশটা দিনের মতোই। হঠাৎ 'পরমা'-র প্রশ্ন তুলেছিল তনুশ্রী। সুবিমলের উত্তর শুনে তনুশ্রী উঠেছিল ঝাঁঝিয়ে

—মুখে যতোই আধুনিক সেজে থাকো, আসলে তোমরা মেল-শভিনিস্ট। তোমাদের রক্তে এখনো রয়ে গেছে ফিউডালিজমের বিষ।

আরো কত কিছু বলেছিল সে। এবং আরো যত কিছু বলার ছিল তার। রাগলে ক্রমশ লম্বা হয়ে যায় তার গোল আর ওভালের মাঝামাঝি গড়নের মুখটা। ভুরু দুটো হয়ে ওঠে পুরু এবং ঘন কালো। অন্য আর সব কথায় যথেষ্ট মেয়েলি লজ্জা ও বিনয়। কিন্তু রাগের সময় রণচণ্ডী। তেমন তনুশ্রীও সুবিমলকে ঘায়েল করার যুক্তির তূণীরে বাছাই করা অগ্নিবাণ ভরে নিয়েও, বেয়ারা এসে খুচরো ফেরত-সহ মৌরি টুথপিকের প্লেটটা এগিয়ে দেওয়ার পরই চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে নিমেষে। নিমেষেই ভুলে যেতে পারে নারীর সুস্বাধীন অধিকার। উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফ্যাকাশে হয়ে যায় তনুশ্রীর ভুরু। মেল সোভিনিজমের বিরুদ্ধে এতক্ষণ লাল রঙের, অনেক রক্তপাত জমে জমে শুকিয়ে ঈষৎ কালচে হয়ে যাওয়া যে কুঠার নিয়ে লড়ছিল সে, সেটা পুনরায় হয়ে যায় ভেলভেটের ভ্যানিটি ব্যাগ। কেবিনের নিভৃতি, খুব নিভৃতি নয়ও আবার, দরজার প্রস্থের চেয়ে পর্দাগুলো এতো সরু আর পাতলা বলেই অল্প হাওয়াতেই এতো বেশি ডানা ছড়িয়ে উড়তে চায় যে, ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়েই সরিয়ে নিতে হয় নিমেষে। তবুও অন্যের গায়ের ধাক্কা বাঁচিয়ে পাশাপাশি বসার কিছুক্ষণের নিরুপদ্রব শান্তির নিরালা ছেড়ে কলকাতার এই ঘণ্ট-চচ্চড়ির মতো দলাপাকানো কুম্ভমেলা-

ভীড়ের ভিতরে ঢুকে হারিয়ে গিয়ে বাড়ি ফেরার মিনিবাস ধরতে তনুশ্রীর ভালো লাগে। সাতজন পুরুষের ব্যারিকেড ঠেলে কী অবলীলায় সে সেঁধিয়ে যেতে পারে গড়িয়াহাটার মিনিতে। আর তার শেষ-তাকানোয় সুবিমলের দিকে ছুঁড়ে দিতে পারে এক গোছা রজনীগন্ধার অমল হাসি।

গত সপ্তাহে সুবিমল জড়িয়ে পড়েছিল এক অপ্রত্যাশিত পলেমিকে। কবিতা জমা দিতে গিয়েছিল সে 'প্রতিদিন'-এর আপিসে। সেখানেই দেবাংশুবাবু, দেবাংশু চৌধুরীর সঙ্গে কথায় কথায় বেধে যায় তুমুল তর্ক। বিষয় এখনকার সচেতন বুদ্ধিজীবীদের অতিরিক্ত য়ুরোপ-মনস্কতা। দেবাংশু বলেছিলো, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যের। য়ুরোপের মুখ থেকে তাঁর মহাকবি পরিচয় জেনে যাওয়ার পর আমাদের আর তাঁকে নিয়ত অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়নি। এখন তাঁকে আমরা যা জানি, সেটা না-পড়ার জানা আবার তিনি যে য়ুরোপের প্রত্যাশার মাপের বড়ো কবি নন, সেটাও আমাদের বিশ্বাস করে নিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটেনি, যখনই তাঁর সম্পর্কে নিজেদের একদা উচ্ছ্বসিত সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেন পাউন্ড কিংবা ইয়েটস। প্রায় দেড়-এঘণ্টা-ব্যাপীই রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হয়েও সুবিমল সুস্থির বসে থাকতে পারে, বসে থাকতে তার ভালো লাগে, য়ুরোপ আমাদের পক্ষে কতটা এবং কীভাবে দরকার এই নতুন ভাবনার সংক্রমণে সে নিজেকে যেন এক সমুদ্র-কল্লোলের সামনে এনে দাঁড় করাতে পারে। দেবাংশু যখন বলছিল, লুকাচের ভুল-রবীন্দ্রনাথও আমাদের কাছে তাই সত্যি-রবীন্দ্রনাথ, ঠিক সেই সময়ে বেয়ারা ঈষৎ দরজা ঠেলে জানায়, গাড়ি এসে গেছে। কথা বলতে বলতেই দেবাংশু নিজের ব্রীফকেস গুছিয়েছিল। মুহূর্তে ব্রীফকেস নিয়ে দেবাংশু উঠে পড়তে পারে তাই। মুহূর্তে দেবাংশুর মুখের বাল্ব থেকে নিভে যায় বৈদ্যুতিক অগ্নিতেজ, যেহেতু নীচে তার ঘরে-ফেরার গাড়ি অপেক্ষমান।

সুবিমল যতক্ষণ অনেকের সঙ্গে, যতক্ষণ অনেক রকমের তর্কে-বিতর্কে, যতক্ষণ সময়ের নানাবিধ উত্থান-পতনের অভ্যন্তরে, আক্রমণে, আক্রান্তের মতো বেঁকে গিয়ে, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে, যুদ্ধে হারানো ভাঙা তরবারির তল্লাসে, ততক্ষণ সে আশ্চর্য রকমের জীবিত, স্বতঃস্ফূর্ত, ক্রমজায়মান। কিন্তু একা হলে, পরিচিতমণ্ডলীর সবাই যে-যার নিজস্ব তাঁবুতে ফিরে গেলে, সুবিমল নিজের কাঠামোয় অনুভব করতে থাকে কিসের এক বিষম ভার। শ্যাম-

বাজারের পাঁচমাথার মোড় থেকে তার বাড়ি অনেক দূরেই। তাকে ফিরতে হয় বাসে। বাস থেকে নেমে মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ। এই সাতমিনিটের প্রত্যেকটি দণ্ডে-পলে শরীর বা চেতনার সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়া ভার তাকে বাঁকিয়ে দিতে থাকে ক্রমে সে অনুভব করে তার পিঠে একটা বোঝা। আর তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ফুলে-ফেঁপে বড়ো হয়ে উঠছে বোঝাটা। সে ক্রমাগত বেঁকে যাচ্ছে ঐ ক্রম-বিস্ফারিত বোঝার ভারাক্রান্ত পেষণে। এ-রকম বেঁকে-যাওয়া মানুষকে দেখেছে সে অনেক। মানুষ অথবা শিশু। তারা সারা দিনমান ছেঁড়া কাগজ কুড়োয় চটের থলিতে। কুড়োতে কুড়োতে যতই এগোতে থাকে নিজেদের ডেরার দিকে, ততই পোড়া দেশলাই কাঠির মতো বাঁকতে থাকে তারা। পিঠের প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বোঝার চাপে মুছে যায় তাদের দেহরেখা। তাদের প্রায় ভূলুণ্ঠিত অস্তিত্বটাকে গাধা-খচ্চরের মতো অবোধ এক রকমের জন্তু বানিয়ে বোঝাটাই গর্বিত ভঙ্গীতে উপভোগ করে নেয় স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের সুখ।

সুবিমল, পিঠের বোঝার নিস্তারহীন চাপে কুঁজো হয়েই কলিং বেল টেপে। ছোট বোন এসে দরজা খুলে দিলে, বোঝাসহ দুমড়োনো ভঙ্গীতেই ঘর পর্যন্ত হেঁটে যায়। যতক্ষণ না দরজা খুলে, সুইচ টিপে ঘরের আলো ও ফ্যান চালিয়ে নিজের বিছানায় বসে, ততক্ষণ ঘাড় থেকে নামাতে পারে না সে বোঝা।

ছোট বোন এসে তিনটে চিঠি দিয়ে যায়। মা দূর থেকে ডাকে গা ধুবি তো ধুয়ে নে। খেতে দেবো। বাবা দরজার সামনে এসে প্রশ্ন করে, এল-আই-সির আপিসে খোঁজ নিয়েছিলি? সুবিমল সাড়া দিতে পারে না কোনো ডাকেই। সে পিঠের বোঝার ফাঁস খুলতে ব্যস্ত। খোলা হয়ে গেলে বোঝার ভিতরে তার লম্বা হাতখানা ঢুকিয়ে দেয় সে। ভেতরে শুধু শব্দ, শব্দ, শব্দ, সুবিমলের প্রত্যেকটা খামচা মুঠোয়, অবিকল হাজারো রকমের ছেঁড়া কাগজের দলার মতো, অজস্র গড়নের শব্দ। সুবিমল শব্দগুলোকে বোঝার ভিতর থেকে মুঠো-মুঠো উপড়ে এনে চোখের সামনে ছড়াতে থাকে। শব্দের অজস্র টুকরোয় ক্রমশ ভরে থাকে তার ঘরের মেঝে। মেঝে উপচিয়ে কেউ কেউ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে গড়িয়ে যেতে চাইলে সুবিমলকে ভেজিয়ে দিতে হয় দরজা। ক্রমে তার বিছানা, বালিশ, বইয়ের আলমারি, জামা কাপড় ঝোলানোর আলনা, দেয়ালে টাঙানো ভ্যান গগের

সূর্যমুখী, বক্তৃতারত লেনিন, সবকিছু তলিয়ে যায় শব্দের অঢেল ঘূর্ণীতে। সুবিমল সেই সব শব্দের দিকে তাকিয়ে থাকে এমন বিমর্ষ ও মৃতপ্রায় ভঙ্গীতে যেন সে বিশাল কোনো ইন্টারভিউ টেবিলের এপারে একা। আর শব্দগুলো একে অপরকে ঠেলে, সরিয়ে, ডিঙিয়ে, প্রতিযোগিতাময় দৌড়ের ভঙ্গীতে তার দিকে এগিয়ে আসে ছোবল মারার ভঙ্গীতে।

—নারীর সামান্য পদস্খলনেই যতো মহাপাপ?

—নবনাট্য আন্দোলনকে হত্যা করেছে তো নবনাট্যই।

—অতিরিক্ত য়ুরোপ-মনস্কতাই কি আমাদের ভুল পথে হাঁটাচ্ছে না?

—বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীই তো আজ ছক এঁকে দিচ্ছে সাহিত্যের, শিল্পের, সংস্কৃতির, সব কিছুর।

—লিবিয়াকে আক্রমণ আসলে ডিফেন্সের বাজেটটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার মার্কিনি কায়দা।

—আমরা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কত সহজে বুঝি। কিন্তু অসীম রায়কে বুঝি না। কারণ? কারণটা তো সোজা। অসীম রায় আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত একই সচেতন উপলব্ধির এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কিন্তু অসীম রায়ের ভিতর থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খুঁজতে গেলে আমাদের মেহনত করে এবং মাথা ঘামিয়ে পড়তে হয় কয়েক হাজার পুরো পৃষ্ঠা।

—ধর্ম যে আজকের ভারতবর্ষে কত বড়ো মাপের ব্যবসা তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ তো কুম্ভমেলাই।

—সিনেমায় ভারতীয় বাস্তবতার সবচেয়ে সমঝদার দর্শক তো এখন বার্লিন, কান আর ভেনিসে।

—সব কিছুই যেখানে পলিউটেড, রাজনীতি বাদ যাবে কি করে?

—বড়ে গোলাম শেষ গান গাইতেন হরি ওঁ তৎসৎ। সেই ভাবেই ভারতবর্ষের শেষ জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠবে একদিন 'রাখে হরি, মারে কে'।

—না, আমি সমসাময়িকতায় বিশ্বাস করি না।

—এ্যাবসলিউট মেজরিটি থেকেই ডিক্টেটর....

—খবরের কাগজ খুললে আমার নাকে পচা গন্ধ....

—০—